বাণী বসু

বাছাই গল্প

(প্রথম পর্ব)

BACHAI GALPA
Selected Short Stories
By—Smt Bani Basu

প্রচ্ছদ ঃ শংকর বসাক

প্রথম প্রকাশ ছাব্বিশতম কলকাতা বই মেলা ২০০১, দ্বিতীয় প্রকাশ ১লা মার্চ ২০০৩, প্রকাশক ভারতী দত্ত 'পুষ্প' প্রযত্নে ঘোষ লাইব্রেরী ১৩ 'বি', ব্লক বাঙুর এভিন্যু কলকাতা-৭০০ ০৫৫। বর্ণগ্রন্থনে ও মুদ্রণে শ্রীকান্ত বসাক জয়শ্রী প্রেস ৯১/১বি, বৈঠকখানা রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

[যোগাযোগ ও চিঠি পত্র পাঠাবার ঠিকানা ৫৭, 'এ' ব্লক ফ্ল্যাট নং ৬ বাঙুর এভিন্যু কলকাতা-৭০০ ০৫৫]

উৎসর্গ

ছোড়দা (ডঃ অজয় চৌধুরী) ও
ছোটবউদি (জ্যোৎস্না চৌধুরী) কে
—ভালোবাসা

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা
স্বৈরিণী	...	...	১
নাফা	...	...	১২
অপত্য	...	...	২৪
ওতুলের প্রতিদ্বন্দ্বী	...	...	৩৫
দীপশিখা	...	...	৪২
রোম্যান্স	...	...	৬১
বাচ্চু কেন ফিরে এলো	...	...	৭২
নকশা	...	...	৭৯
মাহ্ ভাদর	...	...	৮৮
সমুদ্র	...	...	১০৫
নন্দিতা	...	...	১১৭
দৌড়	...	...	১৩৪
স্বীকারোক্তি	...	...	১৬২
পাতী অরণ্যে এক উপদেবতা	..	...	১৯১
বিবাহ-বিভ্রাট	..	...	২১৪
বন্ধু	..	...	২২৬
করুণা তোমার	...	...	২৩৬
শিরিষ	...	...	২৪৬
আসন	...	...	২৫৩
হারান-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ	...	...	২৬২
বলাকা	...	...	২৭৫
বারান্দা	...	...	২৮৩
অবস্থান	...	...	২৯৪

স্বৈরিণী

'থলে দুটো দাও, বাজার যাব'—

—'একটু কুচো চিংড়ি এনো আর পেঁয়াজকলি। কলি কিন্তু, শাক নয়। সাদা পাঁপড় দেখো তো!'

—'লিস্ট করো, লিস্ট করো, ফরমাশগুলো এলোমেলো ছুঁড়ে মারলে হবে না।'

—'লিস্ট করার কি আমার সময় আছে এখন? জিনিসগুলো তো রিলেটেড। মনে রাখতে অসুবিধে কি?'

'তক্কো করো না, তক্কো ভাল লাগে না সাতসকালে, মেয়েমানুষ মানেই তক্কো।'

কথা শুনলে মনে হয় কথা কইছে কোনও উপমন্যু নয়, নির্জলা এক উপীন। উপেন্দ্রনাথ দেবশর্মা-টর্মা, এক্ষুনি শরৎচন্দ্রের চরিত্রদের গলায় বলে উঠবে, 'তোমার ছোঁয়া খাবার খেতে আজ আমার ঘৃণা বোধ হচ্ছে।'

শরৎচন্দ্রের ডায়লগ মনে করতে রিনার হাসিই পেয়ে গেল। ডাল ধুতে ধুতে সে ফিক করে হেসে ফেলল। শরৎচন্দ্র পড়তে দেখলেই মা রাগ করত। বলত, 'অন্য কিচ্ছু না, গুছিয়ে ঝগড়া করতে শিখবি, আমার ওপরেই শিক্ষাটা ফলাবি সবার আগে', দাদা বলত, 'শুধু ঝগড়া নয়, প্রেমালাপ করতেও শিখবে মা, বেশ গুছিয়ে প্রেমালাপ—দেবদা, নদীতে কত জল। অত জলেও কি আমার কলঙ্ক চাপা পড়বে না?'

—'তোরই তো কণ্ঠস্থ মুখস্থ দেখছি।' রিনা ঠাট্টা করত।

কিন্তু না, শরৎচন্দ্রের প্রেমালাপ রসালাপ নয়, উপীন প্রমুখদের বুড়োটে সেকেলেমিতেই উপমন্যু সব্বাইকে টেক্কা দেবে মনে হয়। আর কী নীরস! কী নীরস! টাকা-আনা-পাই কিলো-মিটার-লিটার ছাড়া কিছু বোঝে না, কিচ্ছু না।

ধরো, বন্ধুর বিয়েতে ভাল'করে সাজলো রিনা। একটা নতুন তাঞ্চোই শাড়ি, গয়না, প্রসাধন, আয়নায় নিজেকে দেখতেও দারুণ লাগল।

—'কেমন লাগছে গো?' —উপমন্যুর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে লজ্জা লজ্জা মুখ করে অতঃপর জিজ্ঞাসা।

উত্তর হল, 'ন্যাকামি রাখো। তাড়াতাড়ি নাও।'

'ন্যাকামি', 'ঢঙ' এই কথাগুলো যেন শুধু রিনাকে নয়, রিনার আত্মাকেও অপমান করে। ভেতরটা কুঁকড়ে যায়। মনে হয়, সে নিজেকে যা ভাবছে তা সে নয়, সে যত দূর সম্ভব অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ। আর উপমন্যুও তার জানাবোঝা মানুষ নয়। সে অন্য। একেবারে অন্য। ভয়-ভয় চোখে সে চারদিকে তাকিয়ে দেখে। ওই তো খাটের ওপর জয়পুরী বেডকভার বিছোনো। ভেবেছিল ওটা তারই, তাদেরই খাট কিন্তু তা বোধহয় নয়। ও আর কারও খাট, ওখানে অন্য কেউ শোয়, ওই আলমারি, বইয়ের র‍্যাক, পড়ার টেবিল, খাটের পাশে লম্বা এক ফালি কার্পেট, চিনে লণ্ঠনের মতো ওই আলোর শেডটা অনেক শখ করে যেটা

লাগিয়েছিল, মেমসাহেব-নাচা ঘড়ি যেটা তার রাঙাকাকু বেলজিয়াম থেকে এনে দিয়েছিলেন—এ সমস্তই চূড়ান্ত ন্যাকামি অর্থাৎ ভান, অর্থাৎ মিথ্যা।

কানে 'ন্যাকামি' শব্দটার অপমান প্রত্যাখ্যান নিয়ে রিনা বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়। রান্নাঘরের দিকে চোখ পড়ে। স্টিলের কয়েকটা বাসন দেখা যাচ্ছে। ঝকঝক করছে। ক্রিসমাস কার্ডের মতো একগুচ্ছ ফুল-আঁকা সাদা উনুনটা, ভীষণ প্রিয় রিনার। খুব যত্ন করে ব্যবহার করে। এগুলো? এগুলোও কি ন্যাকামি? ওই রান্নাঘরের তাক গোছানো, পেতল পালিশ করা, সোডা সাবান দিয়ে রান্নাঘরের মেঝে পরিষ্কার করা ঘষে ঘষে ....? না, সম্ভবত এগুলো ন্যাকামি নয়। খুব কেজো গোছের ব্যাপার এসব। কাজ করো, খাও দাও ঘুমোও, কাগজ পড়ো। দু-চার খানা বই পড়ো, আর হ্যাঁ রাত্তিরবেলা ডাক পড়লে সাড়া দিও। নির্ভাজ, নির্ভেজাল প্রকৃতির ডাক কিন্তু।

কেন? কেন এমন হল? বাচ্চারা এল না বলে? কিন্তু সে-ও তো তার অপরাধ নয়। ডাক্তারদিদি বলেই দিলেন, 'কোনও অসুবিধে নেই, কারওই কোনও ডিফেক্ট নেই। স্পার্মগুলো যে কেন কোনও ওভামকে ফার্টিলাইজ করতে পারছে না, তা ভগবানের বাবারও সাধ্য নেই বলার। মিস্টার দত্ত আপনি একটু টেনশন কমান তো! মিসেস দত্ত আপনি যেমন ভাল লাগে তেমন করে দিন কাটাবেন, যেমন খুশি থাকবেন, ধরুন ইচ্ছে হল মাথায় একটা ফুল গুঁজলেন, ইচ্ছে হল একদিন রান্না করলেন না, দোকান থেকে খাবার আনিয়ে চালিয়ে দিলেন। অনেক সময়ে বড্ড গতানুগতিকতার মধ্যে বাঁধা পড়ে যান আপনারা। প্লিজ....... লেট ইয়োরসেল্ফ গো। ইট ক্যান মেক আ গ্রেট ডিফারেন্স। তা নয়ত.. . আমি ডাক্তার হয়েও শনাক্ত করতে পারছি না ভাই আপনাদের স্টেরিলিটির কারণটা।'

ডাক্তারদিদি পারেননি, কিন্তু রিনা বোধহয় পারে। ওই যে উপমন্যুর স্পার্ম? ওরাও তো উপমন্যুরই মতো? একই ডি.এন.এ কোড মেনে তৈরি হয়েছে। সেই লক্ষ লক্ষ স্পার্ম রিনার গুটিকয় ডিম্ব বেচারির দিকে বাঁকা হেসে তেড়ে যায়, বলে, ইয়েস একটা বাচ্চার বডি তৈরি করতে রাজি আছি ঠিকই, কিন্তু খবর্দার নো ন্যাকামি। তার ভেতরে ওভামদের কুঁকড়ে যাওয়াটা আজকাল টের পেতে শুরু করেছে রিনা। তাই কেন তার ঘর শূন্য এ নিয়ে রিনার মনে খেদ থাকলেও কোনও প্রশ্ন নেই।

রুটিনমাফিক খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ফুস করে একটা সিগারেট ধরিয়ে সোফায় একটু কাত হল উপমন্যু। এটা ওর উত্তর-চল্লিশ সাবধানতা। ডাক্তারের পরামর্শ। অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে। সিগারেট আর মদ্যও বারণ, সে বারণটা অবশ্য সে শোনে না।

এইবারে চানে ঢুকবে রিনা। চুল খুলতে খুলতে আড়চোখে দেখল উপমন্যু উঠে পড়ছে। যাক এইবার বেরোবে, বেরিয়ে যাবে, আঃ বেরিয়ে যাচ্ছে! মস্ত বড় একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে রিনা উপমন্যুর পরিত্যক্ত সোফাটায় বসে পড়ল। শুধু চুলের বিনুনিই খুলছে না, যেন সারা শরীরে তার অঙ্গের সঙ্গে অঙ্গ, প্রত্যঙ্গের সঙ্গে প্রত্যঙ্গ বিনোনো ছিল, স্নায়ুতে স্নায়ুতে জড়িয়ে গিঁট পড়ে গিয়েছিল, সেইসব গিঁট খুলছে সে সযত্নে, জট ছাড়াচ্ছে, বিলি

কাটছে। কী আরাম! কী অসহ্য মুক্তিব আরাম। অনাবশ্যক একটা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় রিনা। চুলের ভেতর দিয়ে চিরুনি চালাতে চালাতে আরামে চোখ বুজে আসে। কিন্তু সেই কুঁড়েমিকে এক ভ্রূকুটিতে তাড়িয়ে সে বাথরুমে ঢুকে যায়। লাল বালতিটাকে কলের তলায় বসায়, তারপর ম্যাচিং লাল মগটা গবগব করে ডুবিয়ে এনতাব জল ঢেলে যায় গায়ে। সাবান লাগাতে লাগাতে যতক্ষণ না গাদা ফেনায় গোটা শরীর ভরে যায় ততক্ষণ সাবানটা ছাড়ে না। চন্দনের গন্ধে বাথরুমটা ভরে যায়। নিজের ঈষৎ নত বুক তুলে ধরে সাবান দিয়ে ধোয়ার নামে অনেকক্ষণ আদর করতে থাকে সে। অঞ্জলিটা ঝটপট মুঠো করে পদ্মকলির মতো আকার করে দেখে, নাঃ বেশ সুললিত সাবলীল আছে মুঠো, গিঁটপড়া শক্ত আড়ষ্ট হয়ে যাযনি এখনও।

তেমন গরম এখনও পড়েনি, তাই চুলটাও তেমন করে ভেজায়নি সে। সরু একটা সিঁদুরের রেখা আর একটা কুমকুমের টিপ পড়লেই মুখখানা বেশ হেসে ওঠে। সামান্য একটু ক্রিম ঘষে নেয়। পাটভাঙা একটা হালকা কমলা রঙের ছাপা শাড়ি পরতে পরতে নিজেকে ভীষণ ভাল লাগতে থাকে তার। মনে হয় আদর করুক। কেউ তাকে একটু আদর সোহাগ করুক। নিজেকে নিজের মুখটাকে চুমো খাবার জন্য অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ ফিবে বৃথা চেষ্টা করে সে। তারপর একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে এক কাপ দুধ খায় চকলেট দিয়ে। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। ঢালা উপুড় করে করে ফেনা ওঠানো। গান চালিয়ে দিতে হবে এখন তাকে। মাস্ট। অখিলবন্ধু ঘোষের ক্যাসেটটা বাছে সে, তারপর একটা পত্রিকা হাতে নিয়ে সোফাটায পিঠ এলিয়ে বসে। নিচু একটা বেতের মোড়া টেনে আনে সামনে, পা দুটো তুলে দেয় তার ওপর। তারপর বইয়েব পাতায় চোখ রাখে। এখন গানেব দিকেই তার মন পুবোটা চলে যাবে, না গল্পের বিবরণে মন হারাবে সেটা নির্ভর করছে সম্পূর্ণ গায়ক আর লেখকের আপেক্ষিক কেরামতির ওপর। তবে সত্যি কথা বলতে কি, সুরও নয়, সাহিত্যও নয়, আসলে তার মন ডুবে যায় একটা মনোরম অনুভূতির সাগরে। সুর তাল আর সাহিত্যরস দিয়ে তৈরি তার জলরাশি। কী পড়ল, কী শুনল সেগুলো তাব মনে থাকে আবছাভাবে, শুধু হৃদয়ের ভেতরটা কূলে কূলে ভবে যায়।

হৃদয়ের এইরকম টইটম্বুর অবস্থাতেই দরজার ঘণ্টাটা সেদিন পাখির গলায় ডেকে উঠল—'কুব কুব কুব কুব, কুব কুব কুব কুব।' ম্যাজিক আইতে চোখ রেখে কাউকে দেখতে পেল না রিনা। অগত্যা ছিটকিনি খুলে একটু ফাঁক করতেই হল দরজাটা। প্রথমেই একটা সাদা ঝলক। বাইরের সকাল দশটার প্রখর আলো আর সাদা শার্ট, সাদা প্যান্টের সুহৃৎ ঝলক।

—'তুমি? তুমি এখানে? তুমি হঠাৎ?' আশ্চর্য হয়ে আনন্দের তুঙ্গে উঠে গিয়ে রিনা কোনওমতে বলল।

কোনও কথা না বলে, প্রাণখোলা হাসিতে মুখ ভাসিয়ে ও ভেতরে ঢুকে এল। হাতের ব্রিফকেসটা দেখিয়ে বলল, 'ভাল বিজনেস হয়েছে আজ। এখন আমি একটু বিশ্রাম এবং এক কাপ ভাল দেখে ধোঁয়া-ওঠা চা অর্জন করেছি। তোমার হাতের।'

—'কী আশ্চর্য, বসো না, বসো আগে—' আহ্লাদে কিশোরীর মতো শরীর মুচড়ে রিনা বলল।

ও বসে আছে। আধা-অন্ধকার বসার ঘরটায় আলো জ্বলছে বলে মনে হচ্ছে। ওর হাত-পা নাড়া-চাড়ার মধ্যে একটা হালকা অ্যাথলেটিক ভাব আছে। যে কোনও মুহূর্তে উঠে দাঁড়াবে। সরে এক সোফা থেকে আর এক সোফায় যাবে, কি এক লাফে পৌঁছে যাবে ঘরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে। এই লঘুতা ও পেয়েছে যোগ থেকে। যোগ করত রোজ।

—'এখনও চালিয়ে যাচ্ছ?'—গ্যাসে চায়ের জল বসিয়ে দরজার ফাঁকটুকু দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বলল রিনা।

—'কী?'

—'যোগ।'

—'বাঃ, ওটা তো আমার প্রকৃতির দ্বিতীয় অংশই হয়ে গেছে। সেকেন্ড নেচার। চালাব না! যোগ বাদ দিয়ে আমার দিন শুরুই হয় না।'

খবরের কাগজের পাতা উল্টোচ্ছে। খড়মড় খড়মড় শব্দ হচ্ছে একটা। ওর ছোঁয়াচেই যেন রিনার পদক্ষেপেও কেমন একটা হালকা ভাব এসে যায়। ভেতর থেকে কী একটা ঢেউয়ের মতো ফুলে ফুলে উঠছে। তার মনে হয় না ন বছর বিয়ে হয়ে গেছে। আগের চেয়ে ভারী আর আলগা হয়েছে শরীর। শাড়িটা অগোছালো। ভুলে যায়, সে পুরো মানুষটাই, যত চেষ্টাই করুক, আগের মতো লাবণ্যময় হতে পারে না কিছুতেই।

ধোঁয়া-ওঠা দু কাপ চা একটা সাদা ট্রেতে।

—'এই দ্যাখো কেমন তোমার সঙ্গে ম্যাচ করা ট্রে, ম্যাচ করা কাপগুলো........'

—'আরে, তাই তো!' খুশি ছড়িয়ে যায় ওর সর্বাঙ্গে। বলে, 'আসল কথাটা বলছ না কেন? একদম আসল কথাটা?'

—'কী!'

—'তুমি নিজেই যে আমার সঙ্গে ম্যাচ করা। তাই বাকিগুলো আপনিই ম্যাচ হয়ে যায়।'

—'ধুত।' দেয়ালে টাঙানো গোল আয়নার দিকে তাকাবার চেষ্টা করল রিনা। দেখতে পেল না। কিন্তু আয়নার দিকে তাকাবার দরকার কী? নিজের বোধ দিয়েই তো নিজেকে চিনে নেওয়া যায়। ভাঙা-চোরা থ্যাঁতলানো ধামসানো দাবড়ানো এই রিনা কি ওর সঙ্গে মানানসই হতে পারে?

হঠাৎ কয়েকটা লাল গোলাপ ঝলসে ওঠে ওর হাতে।

—'দ্যাখো তো এগুলো ম্যাচ করে কি না!'

গোলাপের আরক্ত সংরাগ ওর হাত থেকে তার হাতে, ক্রমে তার সর্বাঙ্গে চারিয়ে যাচ্ছে বুঝে রিনা কাছে, ওর আরও—আরও কাছে চলে যেতে থাকে। ঘন, আরও ঘন হয়ে যায় দুজনে।

ধরা গলায় রিনা বলে, 'ছাড়ো, এবার ছাড়ো।'

—'মনে আছে সেই সব দিন? রিনঠিন রিনরিন দিন? যখন কলেজের পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে তুমি আর ডাক্তারদের চেম্বার পালিয়ে আমি........ মনে আছে সেই রোদের গন্ধ, বাতাসের রং, ভিক্টোরিয়ার পুকুরের সেই যমুনা-যমুনা জল?'

রিনা মন্ত্রমুগ্ধর মতো বলল, 'মনে আছে সেই অনন্ত চিনেবাদাম, আইসক্রিমের সেই ক্ষণ-মধুর, উট্রামের গোলঘরের সেই মহাকাশ? মনে আছে?'

—'আর ঘাসের তবকে মোড়া মাঠের উষ্ণতা, মেঘের তবকে মোড়া দুপুরের দুপুরালি! হিমের তবকে মোড়া ....'

রিনা দেখল, ওর চোখ চকচক করছে। ওরা পুরুষ কখনও কাঁদে না, ওদের নাকি কাঁদতে নেই। কিন্তু সে তো মেয়ে, নেহাতই মেয়ে, তাই তাব চোখ উপচোচ্ছে। উপচোতে দিল সে। আর তখনই এলো সেই চুমো যা সকাল থেকে সে নিজেকে নিজে দিতে চাইছিল, ব্যর্থ হচ্ছিল বারবার। জলেব ফোঁটাগুলো, গাল বেয়ে নেমে এসে ঠিক যেখান থেকে গালের কিনার বেয়ে শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই কিনারে, এ কিনার থেকে ও কিনারে চোখের পাতায়, কানের লতিতে, তারপর? তারপর ঠোঁটের কূল থেকে মুখের গভীরে ক্রমশ প্রবিষ্ট হয়ে যেতে থাকে........ ক্রমশই।

শেষ বিকেলে সমস্ত প্রকৃতি আবির মাখে। ছাতে না উঠলে প্রকৃতি দেখা যায় না এখানে। কিন্তু কেমন করে যেন তার নজরে একটা টেলিস্কোপ, পেরিস্কোপ জাতীয় কিছু এসে যায়। সে দেখতে পায়। ওপরে এবং নীচে সব। গোটা পরিপার্শ্বই যদি হোলির রঙ্গভূমি হয়ে যায় তো না দেখে উপায়?

আসলে প্রেমই আমাদের দিয়ে যায় এক ধরনের সুস্বাস্থ্য, যাতে করে শরীরটা থাকে সর্তক, সব সময়ে চনমনে, প্রেম আবও দেয় এক অদ্ভুত অভিনিবেশ। গোটা পৃথিবীর অন্তর্নিহিত খেলাটা পরিষ্কার বোঝা যায় যেন। হঠাৎ যেন একটা শক্ত পাটীগণিতের অঙ্ক সোজা হয়ে গেল। বেশ হেসে হেসে ভাল বেসে বেসে সেই সব প্রতিদিনের কর্তব্যকাজগুলো করতে থাকে রিনা যেগুলো ভূতুড়ে রকমের বিশ্রী লাগত আগে। যেমন বালিশের ওয়াড় পরানো, মশলাপাতির কৌটো পরিষ্কার করা, ন্যাতা ফুটিয়ে কাপ, অ্যাশট্রে পরিষ্কার করা........ এবং এবং এবং।

—'হঠাৎ টিপ পরেছ যে?' বাঁকা চোখে উপীন।

—'হঠাৎ এ সময়ে এত সাজ?' ভুরু কুঁচকে উপীন।

আশ্চর্য! টিপ না পরাটা কোনওদিন চোখে পড়েনি। পরাটাই চোখে পড়ল। টিপ? কপালে হাত চলে যায়। তাই তো! টিপই তো! কালচে ম্যাজেন্টা রঙের একটা টিপ! ঠিক *আছে টিপ লাগিয়েছি। কিন্তু সাজ? সাজ কই? সেই একই কলকা ছাপের সুতির শাড়ি।* সেই একই ব্লাউজও সামান্য একটু মাড় পড়েছে কী? ইস্ত্রি চলেছে? হবেও বা। অন্য

মনেই এসব করে গেছে রিনা। তবে এগুলো কিছু না। আসলে ভাল লাগার রং লেগেছে গায়ে হোলির সন্ধেবেলার আবিরের মতো। খুশির প্রসাধনীতে মুখ-হাতের চামড়া মসৃণ হয়ে উঠেছে। ওসব শাড়ি-টাড়ি টিপ-ফিপ কিছু নয়।

—'কেউ কি এসেছিল?' —কেমন একটা সন্দেহের ছোঁয়া উপীনের গলায়।

—'কে এসেছিল আজ?' —ক্রমশ আরও জোরাল আরও নিশ্চিত হতে থাকে প্রশ্ন।

—'কে আবার আসবে?'

—'না। তাই জিজ্ঞেস করছি। ঠিক যেন মনে হল আমি ঢুকবার দু'মিনিট আগেও কেউ ছিল। কেউ এসেছিল।'

অনেক কথা বলে ফেলেছে। চটপট সে মোজা ছাড়ায় পা থেকে। জুতোর মধ্যে ঢোকায় মোজাগুলো, বাড়ির চটিতে সন্তর্পণে পা গলায়, তারপর কুকুরের মতো হাওয়ায় নাক ঢুকিয়ে ফোঁস ফোঁস করতে করতে শোবার ঘরে চলে যায়।

চা করতে করতে হেসে ফেলে রিনা। টের পেয়েছে ঠিকই। কিন্তু যার জন্য নাক ফোঁস ফোঁস করা সেই কাঁটালিচাঁপা যে তার বুকের খাঁজে, কেমন করে তার সন্ধান পাবে ভদ্রলোক?

এসেছিল, সত্যিই তো এসেছিল। উপমন্যুর অনুপস্থিতির সময়টাই ওর 'প্রেজেন্ট প্লিজ' করবার সময়। তবে, কবে, কখন, ঠিক কোন মুহূর্তে ও আসবে সেটা বলা থাকে না, জানা যায় না। সত্যি কথাই, ও-ও তো ইচ্ছেমতো আসতে পারে না, কাজের মাঝে সময় করে ওকে আসতে হয়। কবে সে সময় পাবে সে কথা কি ও-ই জানে?

হয়তো কোনওদিন একটা শিরশিরে মতো হাওয়া বইল। চৈত্রের শেষেব দিকে কী শরতের গোড়ায় যে রকম একটা মন-কেমন-করা হাওয়া দেয়। রিনরিন, রিনঠিন দিন। হয়তো সারা সকাল ধরে নিজেকে প্রস্তুত করল রিনা। প্রস্তুত মানে কী? সাজগোজ? দূর! ঘর-দুয়ার গুছোনো, লেপা-পোঁছা? ধুর! ভাল-ভাল টি.ভি-তে শেখানো খাবার-দাবার করা? ধুত্তোর! ওসব কিছুই লাগে না। চোখের কাজল ও দেখে না, দেখে চোখের ভেতর, বাড়ির সাজসজ্জার মধ্যেও কিছুই দেখে না, দেখে যেটা তার নাম ছটা। প্রভা, দ্যুতি। রিনার। রিনা নামক মানুষীর বিশেষ রিনাত্বের যে ছটা তার মধ্যে থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, সেটাই, সেটাই ওর অনুভব করে আনন্দিত অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠার অবলম্বন। আর কিছু লাগে না। আর খাবার-দাবার? পাছে রিনার কষ্ট হয় অসময়ে খাবার খুঁজতে তাই ও পেট ভরিয়ে আসে, আর তেমন ভাল-ভাল জিনিস খেলে নিয়ে আসে রিনার জন্যে।

—'ছি ছি ছি, এমন এক গোছা অর্কিডের পাশে তুমি তেলেভাজা নিয়ে এলে?'

—'আ রে! তেলেভাজা বলে কি ফেলনা? কাচের কেসের মধ্যে রাখে আজ্ঞে। কড়া থেকে ঝুড়িতে পড়তে পায় না, এমন কাটতি।'

—'তা হলে শো-কেসে কোনগুলো যায় শুনি?'

—'শো-কেসেরগুলো বিককিরির না, ওগুলো বিজ্ঞাপন, তা তুমি যদি বলো তো ফিরিয়ে নিয়ে যাই। বেগনি অর্কিডের ফুল দেখেই তোমার খিদে মিটুক।'

—'ইসস্ ঠোঙাটা দেখি একবার, গরম আছে কি না।'

তেলেভাজার সঙ্গে চা-টাই ভাল জমে। কিন্তু তৈরি করতে একটু দেরি লাগবে, একটু হাঙ্গামা বলে—কফির জেদই ধরবে ও। এমন করবে যেন কফির জন্যে প্রাণটা কাতরাচ্ছে ওর। কফি ছাড়া অন্য কোনও পানীয় যেন ওর চলে না।

তুলনা করছে না বিনা, কিন্তু উপমন্যু? উপমন্যুকে কিছু তৈরি করে দিতেও ভেতরটা ভয়ে টিপটিপ করে, কিংবা বিবক্তিতে গা-টা কিসকিস করতে থাকে।

—'চা-টা কে করেছে?'

—'আমি, কেন?'

—'চিনি নেই।'

—'রুটিটা কে সেঁকেছে?'

—'আমি। আবার কে?'

—'চামড়া।'

—'আলুর দমটা কে রেঁধেছে?'

—'কেন?'

—'নুন বেশি। আলু আর একটু সেদ্ধ হত।'

কোনও হোটেলে ফুড-টেস্টারের চাকবি নিক না তার চেয়ে। প্রতিটি খুঁটিনাটিতে এত খুঁত ধরবার বাতিক যদি! এতই কি খারাপ রান্না করে বিনা? ধরে বেঁধে কোনওদিন রান্না শেখেনি হয়তো। কিন্তু দেখে দেখে শুনে শুনে শেখাও তো শেখা। ভয়ের চোটে না চেখে রান্না নামাতেই পাবে না বিনা। চেখে মনে হয় এই রে নুনটা একটু বেশি হয়ে গেছে, ঝপ করে একটু চিনি দিয়ে দেয়, আবার চাখে, এই রে মিষ্টি একটু বেশি হয়ে গেল, দে একটু জল ঢেলে, যাঃ পাতলা হয়ে গেল ঝোলটা, শেষে একটু ময়দাগোলা, একটু ঘি, একটু গরমমশলা দিয়ে গলদঘর্ম হয়ে যে জিনিসটা নামায় সেটাকে যদি উপীন যাচ্ছেতাই একটা নামে ডাকে, তাকে দোষ দেওয়াও যায় না। ভয়, আসল কথা, স্নায়বিক ভয় একটা কাজ করে তার কাজকর্মের পেছনে। অথচ ভয় পাওয়ার তো কথা নয়, টানা তিন বছর পরিচয়ের পরেই তো বিয়ে হয়েছে তাদের। তখন তো মনে হয়নি এমনি ভয় হবে। তা ছাড়া এমনি এমনি যখন সে নিজের ভাল লাগায় শখে কিছু রান্না করে, ছোলার ঘুগনি, কি বাঁধাকপির কোফতা, দিব্যি তো হয় জিনিসগুলো।

—'তুমি করেছ? দা-রু-ণ!' ও তো বলে।

—'আমি করেছি বলেই দারুণ নাকি?'

—'আরে আমি তো ভাবতেই পারিনি তুমি করেছ।'

'আমার বাড়িতে আমি করব না তো কি বড় হোটেলের শেফ এসে করে যাবে?'

'তা কেন? ওই সব হারুর মা নাড়ুর মা থাকে না? ভাবলাম হয়তো তেমনই কেউ........ তা সে যে-ই করুক, ফ্যান্টাস্টিক হয়েছে। আর একটা দেখি!'

আর একটা আর একটা করতে করতে দুজনে মিলে সব সাবাড়। ফুড টেস্টার মশাইকে দিয়ে আর যাচিয়ে নেওয়া হয় না জিনিসটা সত্যি সত্যি উতরোলো কি না।

পয়লা এপ্রিল যে রিনার জন্মদিন সেটা ও ছাড়া পৃথিবীর আর সব্বাই ভুলে মেরে দিয়েছে। সেই কবে মা জন্মদিনে ঠাকুরবাড়ি পুজো পাঠাত আর পায়েস রাঁধত। একবার সাত-আটজন বন্ধুকে শখ করে নেমন্তন্ন করেছিল সে, মাকে কত সাধাসাধি করে। ভাল ভাল রান্না হল, দোকান থেকে কেক-টেকও এল, আইস্ক্রিম পিঙ্ক নতুন ফ্রক পরে রিনাও রেডি। হায় রাম। একটা বন্ধুও এল না। মা তো রেগে লাল। 'ভাল করে বলতে পারিসনি, আমাকে না হোক এত খাটালি, এত্ত খাবার-দাবার, কী হবে এখন?' তার যে অপমানে অনাদরে চোখ ফেটে জল এসে গেছে সে খেয়াল মায়ের নেই। পরদিন স্কুলে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে ঝগড়া করতে গিয়ে আর এক ফ্যাসাদ। —'সে কি রে? আমরা ভেবেছিলাম এপ্রিলফুল করছিস। সত্যি-সত্যি তোর জন্মদিন পয়লা এপ্রিল। সত্যি-সত্যি নেমন্তন্ন করেছিলি? এ মা! ভাগ্যিস।'

ভাগ্যিস কেন? না আটজনে মিলে ঠিক করেছিল একটা টুপি পাঠাবে। ফুল'স ক্যাপ আর কি। তা শেষ পর্যন্ত সেটা হয়ে ওঠেনি। এমন বিদঘুটে জন্মদিন কে মনে রাখে!

কিন্তু একজন, সেই একজন ঠিক সেই মভ রঙের চমৎকার সিল্কের শাড়ি নিয়ে এসেছে! জন্মদিন তো তবু একরকম। বিবাহবার্ষিকীতেও মনে করে এক গোছা লম্বা লম্বা ফুল, আর সেই চমৎকার জয়পুরি মিনের গয়না নিয়ে এসেছে। ঠিক ওই গযনা, ওই শাড়িই রিনার সাঙ্ঘাতিক পছন্দ ছিল। উপমন্যুব এক বন্ধুব বিয়েতে উপহাব কিনতে গিয়ে দেখেছিল। এক এক সময়ে এমন হয় না, যে মনে হয় ওই জিনিসটা না পেলে মরে যাব, জীবন বিস্বাদ হয়ে যাবে? এ সেই রকম চাওয়া। কিন্তু মুখ ফুটে উপমন্যুকে বলতে ইচ্ছে হয়নি। ওর টাকা ওর রোজগার ওর হিসেব। আর ওর খেয়াল—ও-ই বুঝুক।

উপমন্যুকে বলা হয়নি, কিন্তু ওকে কি বলা হয়েছিল? রিনার মনে নেই। কত কথাই তো গলগল করে বলা হয়ে যায়। হিসেব থাকে কি? কিন্তু বিবাহবার্ষিকীর উপহার নিয়ে রিনা খুবই রাগারাগি করেছিল। —'এমন করছ যেন বিয়েটা তোমার সঙ্গেই হয়েছে।' মুখটা বেচারির একটু ম্লান হয়ে গেল, কিন্তু হারবার পাত্র তো নয়, অমনি ঝলমল করে বলে উঠল, 'আমার না হোক তোমার তো বটে! আর বিয়ে একটা আনন্দের, একটা বেশ শুভ ব্যাপার! উপহার দিতে ইচ্ছে হল, চোখ চকচক, ঠোঁট তুলতুল দেখতে ইচ্ছে হল!'

বলল আর রিনা অমনি গলে জল হয়ে গেল।

—'হারুর মা, কেউ কি এসেছিল, আজ দুপুরে?' —উপমন্যুর ভাবটা যেন এই হঠাৎ কথাটা মনে হয়েছে তাই এমনিই জিজ্ঞেস করছে। কিন্তু ভেতরটা তার উৎকর্ণ-উদগ্রীব হয়ে আছে।

হারুর মা-ও তেমন, হেঁকে বলল—'অ বউদি দুপুরে কেউ এয়েছিল নাকি?' বাবুর দিকে ফিরে বলল, 'আমার তো পেটে ভাত পড়লেই ঘুম ধরে গো বাবু।'

—'আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে—' বিরক্ত গলায় বাবু বলেন।

অবশেষে নিজেরই এক বন্ধুকে কাকুতি-মিনতি করে উপমন্যু। কিন্তু কিন্তু করে বলেই ফেলে। খুব ছোট লাগে নিজেকে। কিন্তু কি করা যাবে, এ যে প্রাণের দায়।

—'বারীন, প্লিজ, তোর কলেজে সকাল সকাল ছুটিও তো হয়, একটু আমার বাড়িটা ঘুরে যাস।'

—'সে আবার কী? দুপুরবেলা তুই কোথায়?'

—'আমি না-ই থাকলাম, ও তো থাকে?'

—'ও কে? তোর স্ত্রী? রিনা?'

—'হ্যাঁ।'

—'তা আমি হঠাৎ তোর অনুপস্থিতিতে তোব শ্রীমতীর কাছে যেতে যাব কেন? আচ্ছা পাগল তো!'

—'না, মানে এই, অনেকক্ষণ একা থাকে তো! বুঝতেই পারছিস একেবারে যুবতী মেয়ে........ একলা।'

—'পাহারা দিতে পাঠাচ্ছিস?'

—'বলতে পারিস।'

—'ব্যাপারটা ঠিক কী বল তো?'

—'না মানে, ওকে আজকাল কেমন কেমন লাগে, যেন মনে হয় ওর লাইফে অন্য কেউ, মানে অন্য কারও প্রবেশ ঘটেছে।'

—'তাই বলো। টিকটিকি লাগাচ্ছ আমাকে। তারপরে আমাকেই সন্দেহ শুরু করবে। মাফ করতে হল ভাই, এসব গোলমেলে ব্যাপারে আমি নেই। তা ছাড়া, রিনাই বা কী মনে করবে তোর অ্যাবসেন্সে গেলে?

কথাটা সত্যি।

তবু বন্ধুর পীড়াপীড়িতে রাজি হয়ে যায় বারীন।

ভরদুপুরবেলা রিনার বেল বেজে ওঠে 'কুব-কুব-কুব-কুব।' খুলে—'আরে আপনি? কী ব্যাপার?'—আলুথালু রিনা বলে ওঠে।

—'আর বলবেন না, সাঙ্ঘাতিক জ্যাম, এক ঘণ্টা বাসে বসে বসে তিতিবিরক্ত হয়ে ঘেমে-নেয়ে নেমে পড়লাম, কোথায় একটু কাটিয়ে যাই ভাবতে ভাবতে উপমন্যুর কথা মনে পড়ল। প্রচণ্ড তেষ্টা পেয়েছে কিন্তু। এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াবেন?'

—'কী আশ্চর্য বসুন বসুন।' —পাখা চালিয়ে দেয় রিনা।

ঠাণ্ডা জল আনে, চা কববে কি না জিজ্ঞেস কবে, মিষ্টান্ন বার করে। তারপর বারীনের আপত্তিতে আবার ঢুকিয়ে বাখে। কিছুক্ষণ গল্প করে তারপর বারীনও কথা খুঁজে পায় না, রিনাও না। বারীন বলে, 'দেখি, জ্যামটা ছাড়ল কি না।'

'না রে উপমন্যু, ঠিক দুপ্পুরবেলা গেলাম, একেবারে দি টাইম ফর দি অ্যারাইভ্যাল অফ পরকীয়, তো পৌনে দু ঘণ্টা ছিলাম, কেউ এল না তো, তোর বউকে দেখেও মনে হল না কারও প্রতীক্ষা করছে। খুব সভ্য, ভদ্র বউ তোর, যাই বলিস।'

বন্ধুর প্রশংসায় খুশিও হয় উপমন্যু, আবার কোথায় যেন একটু আহতও হয়। বলে, 'এ উপকারটা কর প্লিজ, একটু লেগে থাক।'

—'আর একবার গেলে কিন্তু ও আমার সম্পর্কে খুব খারাপ কিছু ভাববে।'

রিনা কিন্তু কিছুই ভাবল না। কারণ বারীনের বেচারি-বেচারি অপ্রস্তুত-অপ্রস্তুত বিরস মুখখানা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল সে উপরোধে ঢেঁকি গিলছে। খুবই অস্বস্তিতে আছে।

—'আজকেও জ্যাম তো?' —রিনা হাসিমুখে বলল, অর্থাৎ ছুতোটা ও-ই যুগিয়ে দিল।

—'অসুবিধেয় পড়লে চলে আসবেন বই কি!' – জল এল, শরবত এল। বিকেল গড়াতে চা এল, সঙ্গে ডালমুট, রসগোল্লা, সয়াবিনের ঘুগনি ....

তৃতীয় দিন জল শরবত এসব সরবরাহ করে রিনা বলল, 'আপনার জন্যে কতকগুলো পত্রিকা এনেছি, যদি আমি ভেতরে একটু বিশ্রাম করি গিয়ে, কিছু মনে করবেন?' —সে হাতের পাতা দিয়ে একটা হাই আড়াল করল।

চতুর্থ দিন হাজার কাকুতি-মিনতি করেও উপমন্যু বারীনকে আর পাঠাতে পারল না। তবু তো সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরে বারীন বিষয়ে রিনার মন্তব্যগুলো শোনায়নি।

—'আজ দুপুরে হঠাৎ তোমার বন্ধু বারীনবাবু এসেছিলেন। নাকি ট্র্যাফিক জ্যামে আটকে হাঁফ ধরছিল।'

একটু চুপ। তারপরে, 'তাই ভদ্রলোক আমাদের বসার ঘরটা জ্যাম করে দিয়ে গেলেন। হাঁফও ধরালেন ফাউ হিসেবে।'

—'কেন? তোমার কি কেউ আসার ছিল?' উপমন্যুর ধারালো প্রশ্ন।

—'আসবার আর কে থাকবে ভুবন ছাড়া? তা ভুবন তো আর বসবার ঘরে বসে না, বসে কলতলায়। বাসনের পাঁজা নিয়ে।'

—'আজ না তোমার বারীন-বন্ধু আবার এসেছিলেন। অনেকক্ষণ গল্প হল, জানো? তুমি ওঁর থেকে নাকি অঙ্কে টুকেছিলে স্কুলে পড়তে, এ মা! তুমি টুকলি?'

—'উঃ আবার বারীন, বুঝলে? তোমার বন্ধুর কি আমাকে মনে ধরল না কী বলো তো! নিজে ঘরে বউ আনলেই তো পারেন, পরের বউয়ের কাছে ঘুরঘুর কেন?'

—'ছি, ছি। বারীন আমার ছোট্টবেলার বন্ধু তা জানো?'

—'ছোট্টবেলার বন্ধুরাই বন্ধুদের বউ নিয়ে বেশি হ্যাংলামি করে।'

—'ইস, নিজেকে ভাব কি?'

—কী আবার ভাবব, আমি যা তা-ই। স্রেফ একজন পরের বউ!'

এ হেন প্রতিক্রিয়ার পর বাল্যবন্ধুকে টিকটিকিগিরি করতে পাঠানোটা ঠিক বন্ধুজনোচিত কাজ বলে মনে হয় না।

তখন উপমন্যু নিজেই হঠাৎ ভীষণ শরীর-খারাপের অজুহাতে দুপুর আড়াইটের সময়ে বাড়ি ফেরে। দরজা খুলে দেয় হারুর মা, বলে ভালই হয়েছে বাবু আপনি এসে গেছেন, বউদি ভীষণ বমি করতেছে। যা খাচ্ছে উগরে দিচ্ছে, যা খাচ্ছে উগরে দিচ্ছে।

—'সে কী? কখন থেকে?'

—'কখন মানে? কদিন থেকেই এমন করতেছে। ধুন্ধুমার বমি।'

—'কী খেয়েছিল? ফুচকা-টুচকা? আলু-কাবলি?'

—'কই, আমি তো দেখিনি বাপু। দেখো এখন ঘরে যাও।'

বিনার চোখের কোলে গভীর কালি। যেমন শীর্ণ দেখাচ্ছে। বুকের সামনের কাপড় ভিজে টুসটুস করছে।

—'কী ব্যাপার তুমি?'

—'তোমারই বা কী ব্যাপার?'

বিকেল হতে না হতেই ডাক্তার মিসেস বাবনানি। বললেন, ওঃ, অ্যাট লং লং লাস্ট, মিঃ দত্ত আপনার একটা ছোট্ট অণু পরিমাণ স্পার্ম প্রচণ্ড ফাইট করে তার কাজটি করতে সফল হয়েছে। এখন সাবধান। বিয়ের অনেকদিন পরের কনসেপশন তো।'

কালিপড়া চোখ, কিন্তু উদ্ভাসিত, যেন রাজ্যজয় করেছে। উপমন্যু আড়ে আড়ে দেখে। তার বুকের ভেতর পাথর। পাথরগুলোকে ডিনামাইট বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেওয়া দরকার। কিন্তু সে পারছে না, কিছুতেই পারছে না।

অবশেষে যথাসময়ে একটি সুস্থ, সবল আট পাউণ্ডের পুত্রসন্তান প্রসব করে বিনা। কোনও জটিলতা নেই। খুব সহজ নির্গমন। আজকাল চট করে এমনটা দেখাই যায় না। বিশেষ করে এত পরের জাতক। বাচ্চাটার কান্নাটাও অদ্ভুত। যেন কাঁদছে না। গমক দিয়ে দিয়ে হাসছে।

উপমন্যু যখন শোনে তার পত্নীর প্রসবক্লান্তি কেটে গেছে তখন সে কেবিনে যায়। অস্বস্তিতে নাড়াচাড়া করে উপহারের রজনীগন্ধা। তারপর নিচু হয়ে স্ত্রীর চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি রাখে। কঠিন অনম্য স্বরে এতদিনের পুষে রাখা প্রশ্নটি করে, 'কে বাবা? বাচ্চাটার?'

চমকে ওঠে বিনা, কিন্তু পরক্ষণেই সরিয়ে নেয় শিশুটির জাতবস্ত্রের ঘোমটা, আর সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর চোখে লাফিয়ে ওঠে নির্ভুল প্রতিবিম্ব, তার নিজের।

জিজ্ঞাসা-মুছে-যাওয়া বোকা-বনে যাওয়া সেই মুখের দিকে ক্লান্ত চোখে তাকায় বিনা, ফুঁপিয়ে উঠে বলে, 'কে আর? এক মিথ্যে মিথ্যে-মিথ্যে উপমন্যু।' এমন করে বলে যেন একই সঙ্গে তার পুত্রলাভ ও পতিবিয়োগ হল।

নাফা

শামতাপরসাদ। না, যাঁকে শান্তাপ্রসাদ তবলিয়া বলা হত, তিনি নন। ইনি নেহাতই শামতাপরসাদ কালোয়ার। বঙ্গালিলোগ শান্তাপ্রসাদ বললে তিনি কখনও কখনও শুধরে দেন। তাঁর ছেলে কামতাপরসাদ সাউ। তাঁরও ছেলে ওম্‌পরকাশ নামের 'ওম'টুকু গ্যাংগ্রিনগ্রস্ত প্রত্যঙ্গের মতো বাদ দিয়ে সে জায়গায় আনলো একটা আস্ত সুস্থ ইস্পাত-শাণিত 'জয়', 'পরসাদ'ও সে আর থাকল না, 'পরকাশ' হয়ে গেল। জয়প্রকাশ গুপ্তা।

এরা ফৈজাবাদের লোক। সেই যে উত্তর প্রদেশ, অযোধ্যার কাছাকাছি ল্যাংড়া-লুলা, হতদরিদ্র ফৈজাবাদী গাঁও! সেই। আর কালোয়ার? কালোয়াররা খুচরো লোহার বেওসা করে। রেসিডেনশ্যাল এরিয়ার মধ্যেই কুচি কুচি অন্ধকার কুলুঙ্গির মতো গোঁজা এক একখানা বে-সহবৎ নাঙ্গা দোকান, তার ভেতর থেকে ভিখিরির অপুষ্ট পুরুষাঙ্গর মতো রাশি রাশি লোহার রড বেরিয়ে আছে। একখানা পাথরের খণ্ডর ওপর টকটকে লাল একটা জিনিস রেখে উলটেপালটে দিচ্ছে এক যমদূত, আর একজন পেল্লাই হাতুড়ি দিয়ে তাকে পেটাচ্ছে। এরকম ছবি প্রাগৈতিহাসিক সময়ের ছবিতেও আমরা হিস্ট্রি বইয়ে আকছাব দেখেছি। তা জিনিসটা কী? অবাধ্য আত্মা-টাত্মা না কি? উঁহু, নেহাৎ ছেলেমানুষেও জানে ওটা লোহা। লোকদুটোও যমদূত নয় স্বভাবতই, কালোয়ারের ভাড়া-করা মজদুর, খিদমতগার, কখনও বা কালোয়ার নিজেই। লোহা পিটিয়ে পাত বানানো হচ্ছে। রাস্তাটা জনগণের সবাইকার, সুতরাং জনগণের প্রত্যেকেরও, আপনারা জানেন বোধহয়। সেই রাস্তার ধারে দেখা যাবে লোহার পাতের জায়গায় জায়গায় কী যেন একটা যন্তর ধরা হচ্ছে। শোঁ শোঁ আওয়াজ, গাঁক গাঁক নীল আলো, না না, কোনও রামদিন বা আলাদিনের দৈত্য নয়, ওটা অক্সি-অ্যাসিটিলিন গ্যাস, লোহার সঙ্গে লোহা জোড়া হচ্ছে। ওয়েল্ডিং।

তা, এই লোহার বেশির ভাগটাই আবার চোরাই। অনেক রাতে শামতা-কামতাপরসাদেব কুলুঙ্গি দোকান ও তৎসংলগ্ন টিনের চালের ঘরের সামনে শোনা যাবে ঝনঝনঝনঝন ঝনঝনঝনঝন, আগে পিছে চলন্ত হেভি ট্রাকের মুখ চেপে ধরা গোঁয়ার আওযাজ। কী বে বাবা? পড়ছেটো কী? আলিবাবার মোহর? তার আওয়াজ তো আর একটু মিঠে হওয়ার কথা! উঁহু! মোহর নয়, কিন্তু মোহরের কাছাকাছি কিছু তৈরি করবার উপায়। ওগুলোই চোরাই লোহা। কিছু পয়সা খেয়ে লরি-ড্রাইভার খানিক লোহা ফেলে দিয়ে যায়। ড্রাইভাবেরও কিছু হল, কালোয়ারেরও কিছু হল। ভেজনেওয়ালা, লেনেওয়ালা উভয়েই জানে কিছু মাইনাস ধরতেই হবে, এমনটা হয়ে আসছে, এমনটাই হওয়ার কথা। লিভ্ অ্যান্ড লেট লিভ্। খারাপ কিছু?

কিন্তু বালক বয়সেই জয়প্রকাশের এই দুপুর রাতের ঝনঝনানি সাক্ষাৎ কুম্ভীপাক নরকের আওয়াজ বলে মনে হতে থাকে। কারণ, প্রথমত তার অ্যাংলো-স্যানিসক্রিট স্কুল, আর দ্বিতীয়ত তার প্রতিবেশী গৌতম সরকার, তার চেয়ে কিছু বড় এক বালক, বা কিঁশোর, তাব মতো খাঁটি গৌরবর্ণ নয়, কিন্তু চোখেমুখে, কথাবার্তায় খুব ধার। পরদিন

সকালে উঠেই সে জয়প্রকাশকে জিজ্ঞেস করবে কি না—কী রে জয়? কাল রাত্তিরে তোর ঠাকুর্দার গো-ডাউনে আবার চোরাই মাল এল? বেশ ঘন ঘন আসছে দেখছি, এবার তোদের টিনের চালি পাকা হয়ে যাবে, দ্যাখ। —বলতে বলতে ফিচকে হাসি হাসবে গৌতম।

একটা বোবা রাগে তখন জ্বলে জয়প্রকাশের তনুমন।

—তাজ্জব কি বাত? চোরাই? চোরাই হতে যাবে কেন?

—মাঝবাত। বুঝিস না? আমাদের এ রাস্তা দিয়ে ট্রাক চলে? পুলিশকেও কিছু দিয়ে ঢুকেছে। আর কিছুই যদি না বুঝিস, তো দাদুকে জিজ্ঞেস করিস, বাবাকে জিজ্ঞেস করিস! আব্বার কয়লার গুঁড়ো দিয়ে দাঁত মার্জছিস?

—এক তাড়া দেয় গৌতম।

কয়লা গুঁড়ো! কালোয়ারের বাড়ি কয়লার গুঁড়ো ছাড়া আর কিছুই দাঁত মাজবার জন্য সরবরাহ করবেন না জয়প্রকাশের দাদা বা বাপজি। এক যদি লোহাচুর দেন। জয়প্রকাশ নয়, জয়, জয়, জয়। গৌতমদাদার শত ধিক্কার অবজ্ঞা, খামখা নাক গলানো, গালাগালি সব সে মাফ করে দিতে পারে ওই নামটুকুর জন্যে। জয়! জয়! কী মধুর! কী সম্মানের! যেন অন্য কোন সাফসুতরো জগতের অন্য কোন দেবোপম বালকের নাম। কয়লাগুঁড়ো দিয়ে দাঁত মেজে মেজে যার দাঁতের চটা উঠে যায়নি, যার বাড়ির চালি জন্ম ইস্তক পাকা। রীতিমতো দোতলা হাবেলি, যার বাড়ির সামনে অন্ধকার কুলুঙ্গির মতো দোকান নেই, আর........ আর যে দোকানে রাত্তিরে ঝনঝনঝনঝন লোহা পড়ে না। চোরাই কিংবা অ-চোরাই।

সুতরাং এই ছেলে যে শুধু জয় গুপ্তা না হয়ে জয়প্রকাশ গুপ্তা হয়েছে এই-ই তার তিন চোদ্দং বিয়াল্লিশ পুরুষের ভাগ্যি।

দাদাজি অর্থাৎ শামতাপরসাদ গোড়ার থেকেই তাঁর বউমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন—বহু, পোতাটাকে বড়লোকের বাড়ির লড়কাদের সঙ্গে মিলতে মিশতে দিও না। ওরা আমাদের ছোট নজরে দেখে।

সাত হাত ঘোমটার ভেতর থেকে কাঁসার কাঙ্গন বাজিয়ে বহু বলত—দিলে কী হয়? এক ইস্কুলে যায়, বড় হাভেলির লড়কা হলে হবেকি মোটেই ছোট নজরে দেখে না। কতরকম শিখায় আমাদের লড়কাটাকে এক টিব-পুরা মাজন কিনে দিয়েছে ওকে তা জানেন? বলেছে যতদিন তোর দাদা তোকে না কিনে দেন, আমি দেব। আমাদের লড়কার রকমসকম বদলে গেছে, ভদ্দর আদমি বলে মনে হয়।

এখন সেটাইতো সবচেয়ে শঙ্কার কারণ জ্ঞানবৃদ্ধ শামতাপরসাদের। পড়ালিখা কিছু শিখতেই হয়, নইলে বেওসায় ঠকে যেতে হবে, নুকসান। সহবৎও কিছু শিক্ষণীয়। সে অবশ্য তাঁদের আছেই। আসতে নমস্তে, যেতে নমস্তে। হাত জোড়। মুখে দরবিগলিত হাসি। এ সমস্তই মন্তর। তা এসব তো ছেলেকে, পোতাকে ছোট্ট থেকে তার শেখানই। কিন্তু এর পর যদি বলে এ লোহা কি দুকানে বসব না, অন্য কাম করব! দেখেন তো এ

মুলুকের ছেলেপিলেদের। বাপ-মায়ের প্রাণান্ত খরচ করিয়ে এতগুলি পাস দেয় এরা, তারপর দু পয়সার কেরানিগিরির জন্যে হাঁটাহাঁটি শুরু করে। সে নোকরি পেলে আবার গলায় টাই-মাই ঝুলিয়ে হাতে ব্রিফ-বাকসো, দশটা পাঁচটা করে। নিজেদের বলবে—অ্যাসিস্ট্যান্ট, মেনেজমেন্ট অ্যাসিসস্ট্যান্ট, সেলস এগজিকিটিব। তিনি মনে মনে হাসেন, ঘাসে তো আর মুখ দিয়ে চলেন না। তাঁর খাটিয়ার তলায়, কোমরের গেঁজেতে অমন হাজার হাজার টাকা গোঁজা আছে। ইচ্ছে করলেই তিনি এ কোঠির টিনের চালি সরিয়ে ঢালাই ছাদ বানিয়ে নিতে পারেন, এমন একখানা দুখানা হাবেলিই কি পারেন না? কিন্তু তাঁর এতেই চলে যায়। লোহার কালো গুঁড়ো আর রাস্তার ধুলো মাখা, ময়লা ধোতি, চোখের কোণে পিচুটি, সব্বাইকার চোখের সামনে বসে তিনি মজুর খাটান, একটা পয়সা বেশি কাউকে দিতে কালঘাম ছুটিয়ে দেন। সবার সামনে এই দড়ির খাটিয়াতেই তাঁর দুপুরের খানা আসে—পিতলের কাঁসিতে চার-পাঁচখানা গেঁহু কি চাপাটি আর মোটা মোটা সিমলাই লংকার আচার। তাঁর মজুরদের থেকে বেশি কিছু না। লোটা ভর পানি পিয়ে নেন। বাস মহাপ্রাণী শান্ত। আবার কী চাই? ইনকমট্যাক্সঅলারা দূর থেকে পালায় এখন। গেঁজের টাকার কথা ঢালাইয়ের ছাদ বানিয়ে জানান দিলেন আর কি। বাস করেন যে কোঠিতে তা ছিল এক বুড়টি বেওয়ার, বেনারস থাকত। সেখান থেকেই ভাড়া করে আসেন। যতদিন বেঁচেছিল ভাড়া গুনেছেন, সে মরে যেতে তার ভাইপো-ভাগ্নেদের এখানে দাঁত ফোটাতে দেননি কিন্তু। কার্যত সুতরাং এ কোঠি তাঁর। কে কতদিন টিনের চালির গো-ডাউনের উত্তরাধিকার নিয়ে ঝগড়া করবে, সব কেটে পড়েছে। একটা পয়সা ট্যাক্স দিতে হয় না। কর্পোরেশনের খাতায় এ কোঠির কোনও অস্তিত্বই নেই। জল ফ্রি, বিজলি নিয়েছেন রাস্তার তার থেকে হুক করে। তা-ও সবসময় জ্বলে না, বলেন—বিল উঠবে, বিল উঠবে। বহু বা পোতা অতশত জানে না, তাড়াতাড়ি করে রসুই, পড়ালিখা সব সেরে নেয়। কিন্তু ছেলে তো জানে। সে একটু অবাক হয়ে তাকায়। বিল উঠবে? ক্যা বিল? কিসকা বিল? পরক্ষণেই তার মুখে একটা বোঝার হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। বাপজি এই বুঢ়াপাতেও তাকে কত কিছু শিখলাচ্ছেন, সাব্বাশ পিতাজি। যে বিজলি বিল উঠবে করপোরেশনের, কিংবা কোনও অজানা কোঠির কোঠিয়ালের সেই বিলের দোহাই পেড়ে তিনি লোককে এবং আপন পরিবারকে জানাচ্ছেন তাঁর বিজলি খরিদ করা বিজলি। মাঙ্গা নয়, আবার সংসারে খাওয়া-পরা-শোওয়ারও একটা ডিসিপ্লিন আনছেন। ওয়াহ্, ওয়াহ্!

তা, শাম্‌তা বা কাম্‌তা কেউই এ সব কথা বহু বা জয়পরকাশকে বলতে যান না। বলেন—মছলিখোর বঙ্গালি, মছলি খেতে শিখবে, নাস্তিক বঙ্গালি, ভগোয়ানকে মেনে চলবে না। বুঢ়া বাপ-মা-দাদার কদর সম্মান করবে না।

কিন্তু কে শোনে কার কথা? বহুও না পোতাও না। বহু দুপুরবেলা তার ঘুংঘট খুলে রসুইঘরের চাতাল থেকে গৌতমের মা-জেঠিমাদের সঙ্গে লংকার আচার আর ভিসিটিব্‌ল চপের রেসিপি দেওয়া-নেওয়া করে। নাকের বেসর খুলে রাখে। প্রথমে বলে নাকে লাগে, পরে বলে শরম লাগে। আর জয়পরকাশ—গৌতমদাদার দেওয়া টুথপেস্টে মেজে, ওরই

মতো ঝকঝকে হয়ে ইস্কুলে যেতে যেতে, সম্পূর্ণ বাঙালি টোনে বলে—গৌতমদা লেফ্‌ট হ্যান্ডার ব্যাটকে রাইট হ্যান্ডার বোলার দিলে কার সুবিধে কার অসুবিধে হয় আমাকে বুঝিয়ে দাও তো!

কিংবা,

—কাল অঙ্ক সার আমায় এমন কড়কালেন এক ক্লাস ছেলের মধ্যে! সুধু বাবার জন্যে। কিছুতেই আমাকে ইনস্ট্রুমেন্ট বক্স কিনে দেবেন না।

—আমি তোকে আমার পুরনোটা দিয়ে দিতে পারি।

—উঁহু, তা কেন? আমি কেন তোমারটা নেব? কেনবার ক্ষমতা না থাকলে আলাদা কথা......

গৌতম বলে—আমার আর একটা নতুন আছে। এটা এক্সট্রা, আগেকার। তবে তোর যদি মনে লাগে জয়, লাগতেই পারে, তা হলে আমার বলার কিছু নেই। আসলে কী জানিস, এ তো গরিবের ভিক্ষা নেওয়া নয়, বড়রা অবুঝ হলে, ছোটদের পরস্পরকে সাধ্যমতো সাহায্য করতেই হয়।

জয়, জয়, জয়। কী সুন্দর। কী মধুর। কী ভদ্র। এভাবেই জয়পরকাশ হয়ে ওঠে জয়-পি-গুপ্ত। এভাবেই স্কুল-ফাইনাল, হায়ার সেকেন্ডারি, বি-কম সে পাস দিয়ে ফেলে। খুব ভালভাবে না হলেও খারাপভাবেও নয়। জয়-পি-গুপ্ত। সে যখন বি.কম পাশ করছে তখন তার দাদাজি পঁয়ষট্টি বছর বয়সে অতিবৃদ্ধ অবস্থায় দেহ রেখেছেন, বাবা বাড়িটাতে আর. সি সি.-র ছাদ তৈরি করে ওপরে ছেলের জন্য একটি কামরা এবং নাহা-কামরা বানিয়ে দিয়েছেন। তাতে বিজলি বাতি, ফ্যান, টি ভি. সব এবার সি.ই.এস.সি-র নিয়মমাফিক। সে বাঙালিদের মতো মাছ-মাংস খেতে ভালবাসে, খায়। তবে বাড়িতে নয়। তার ছোটবেলাকার বন্ধু সেই গৌতমদারা আর ৫ নং পাশের বাড়িতে নেই। শরিকি বিবাদে তাদেরই কাছে বাড়ি আধা দামে বিক্রি করে কোথায় চলে গেছে। কিন্তু জয়ের অনেক ইচ্ছে সত্ত্বেও কামতাপরসাদ সে বাড়িতে উঠে যাননি। বলি বলেন - 'পাপ হোবে, পাপ হোবে।' বাড়িটা তিনি ভাড়া দিয়ে রেখেছেন। বাড়িভাড়ার পুরো টাকাটা এখন জয়ের হাতখরচ।

কেন ও বাড়িতে থাকতে যাবেন না এর সপক্ষে যুক্তির জন্য ছেলে কিন্তু তাঁকে কচ্ছপের মতো কামড়ে থাকে। উঠতে বলে, বসতে বলে, শুতে বলে। অবশেষে জেরবার হয়ে কামতাপরসাদ ইতস্তত করে বলেই ফেলেন কথাটা। তাঁদের বসতবাড়ি ও গো-ডাউন গৌতমের ঠাকুর্দার কাছে বাঁধা রেখে অনেক টাকা ধার করেছিলেন একসময় শামতাপরসাদ। তাতেই তাঁর কারবার বিশেষরকম ফলাও হয়। কিন্তু তার পরেই আসে সাংঘাতিক মন্দা। তিনি সে টাকা আর ফিরিয়ে দিতে পারেননি। শামতা তো পারেনইনি, কামতাও পারেননি। অবশেষে সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে দেখে গরুচোরের মতো মুখ করে কামতা যান গৌতমের ঠাকুর্দা সেই দ্বিজুবাবুর কাছে।

—বাবু, আমাকে আর কিছুদিন সময় দিন।

দ্বিজুবাবু ইতিমধ্যে তিনবার সময় দিয়েছেন কামতাকে। কামতা একটা পয়সাও ঠেকাননি। আজ হাজারখানেক এনেছিলেন।

ময়লা গেঁজে থেকে টাকা বার করতে দ্বিজুবাবু সেগুলো হাতে নিয়ে বলেন-—এ যে লাখ টাকার পনেরো বছরের এক বছরের ইনটারেস্টও হয় না হে!

—তা হলে? কামতার বুক গুরগুর করছে।

—তা হলে এই। —দ্বিজেনবাবু তাঁর সিন্দুক থেকে বন্ধকী কাগজপত্র, দলিল-দস্তাবেজের ফাইলটা এনে কামতার হাতে গুঁজে দিলেন। বললেন—তুমি আমার কতকালের পড়শি কামতা, তোমার ভিটেমাটি চাটি করে আমি কি নরকে যাব? যাও, এ সব নিয়ে যাও। তোমার ও টাকা আমি ছেড়ে দিলাম। বিপদের দিনে পরস্পরকে যারা দেখে তারাই হল পড়শি। আমি যেমন তোমার, তুমিও তেমনি আমার।

টাকা না নিয়ে যে দলিল ছেড়ে দিলেন এ কথা দ্বিজুবাবু নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত বলেননি। ছেলেদের তো দূরের কথা। তিনি তার পরে পরেই মারা গেলেন। ক্রমে তাঁর স্ত্রীও মারা গেলেন। ধীরে ধীরে ওদের পার্টিশনের ব্যবস্থা হল। কামতা দরাদরি করে বাড়িটা আধাদরে কিনে নিলেন। তখন সরকারবাড়ির সব ভিন্ন হবার জন্য ব্যস্ত। পৈতৃক সম্পত্তি কত দামে গেল সে নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। কামতা বলেন— বাড়িটা তো পুরনো হল কি না, পঁয়তাল্লিশ বছর ভরে গেল, ডেপ্রিসিয়েশন হয়ে আর কী আছে? বাড়ির তেমন ভ্যালু নেই। ভাঙতে বরং খরচা। জমিটুকুরই যা দাম। তা পাঁচ কাঠার উচিত মূল্যই আমি দেব। পড়শি বলে আপনারাও একটু কনসিডার করুন।

বাস, মার্বেলের মেঝে, সেগুন কাঠের দরজা জানলাসুদ্ধ পুরনো বাড়িটা আধা দরে কামতার হয়ে গেল।

এত কথা খুলে অবশ্য তিনি ছেলেকে বললেন না। শুধু বন্ধকি কাগজপত্র ফেরত পাওয়ার কথাটাই বললেন। ও কোঠিতে থাকলে বুঢ়াবাবু আমার উপর গুসসা হোবেন। আমার কোঠি তিনি ফিরিয়ে দিলেন, তিরিশ বছর আগেকার সেই লাখ টাকা এখন সুদে-আসলে কত হয় কে জানে বাবা, ও বাড়িতে আমরা থাকতে যাচ্ছি না।

ছেলের কাছ থেকে ঘেন্না, কিছু রি-অ্যাকশন, অন্তত কিছু অস্বস্তিকর প্রশ্ন আশঙ্কা করেছিলেন তিনি। কিন্তু সেসব কিছু এল না। জয়. পি. গুপ্তর গম্ভীর মুখ দেখে তার ভাবান্তর অন্তত কামতাপরসাদ সাউ কিছুই ধরতে পারলেন না। ভয়ে ভয়ে যখন ও বাড়ির সাড়ে চার হাজার টাকা ভাড়াটা ছেলের হাতে হাতখরচা বলে তুলে দিলেন, তখনও সে কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাল না। হাত পেতে নিল টাকাটা। এবং নিয়েই যেতে লাগল চুপচাপ। এবং ঠাকুরদাদার ভবিষ্যদ্বাণী সত্য করে সে কিছুতেই সেই লোহার দোকানে বসল না।

ঠাকুরদার অন্য ভবিষ্যদ্বাণীটাও সত্য হয়েছিল। কিন্তু কামতাপরসাদ সে কথা জানতেন না। জয়প্রকাশ চাকরি খোঁজা শুরু করে দিয়েছিল। সেই কণ্ঠ-ন্যাঙট বাঁধা—হাতে বই-বাক্সো-টাইপের চাকরি। কিন্তু ভাল কোথাও সে কিছু পেল না। সাড়ে চার হাজার টাকা সে হিসেবহীন মাসোহারা পায় তার তো খুব অল্প-স্বল্পের চাকরি পছন্দ হবার কথা নয়। সরকারি অফিসের তো কথাই নেই, এক্সচেঞ্জ ছাড়া সেখানে ঢোকাই যায় না। কেতাদুরস্ত

মার্চেন্ট অফিসগুলোও তাকে ফেরালো। মারোয়াড়ি ফার্মে সে পেয়ে যেত; যদি মারোয়াড়ি হত। কিন্তু সে তো ফৈজাবাদী, উত্তরপ্রদেশীয়। এরা ও মারোয়াড়িরা পরস্পরকে তাচ্ছিল্য ও অবিশ্বাসের চোখে দেখে। সে রোজগার ছেড়ে অন্য ধান্দায় মন দিল।

তাব, সত্যি কথা বলতে কি, এখন বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা। চার্রাদকে কোমল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সব ঘুরে বেড়াচ্ছে। নবনীত কোমল। কত রকম। পাকা ধানের রং, কাঁচা ধানেব বং, গেঁহুর মতো, জওয়াবের মতো, চিনেমাটির ফুলদানিব মতো, জ্যান্ত একেবারে জ্যান্ত। ধরতে চাইলেই ধরা যায। সাড়ে চাব হাজার তো হাতেই, তা দিয়ে কিনতেও পাওয়া যায়। কিন্তু তাব অত দুঃসাহস নেই। অসুখের ভয়েই হোক, আর ধরা পড়ার ভয়েই হোক সে ব্লু-ফিলম এবং স্বমেহনেই ক্ষান্ত রইল। হুইস্কির পেগে চুমুক দেয়, নীল ছবি দেখে, আর শরীবেব নিম্নাঙ্গে তার হাত চলে যায়। কিছু বন্ধুবান্ধবও জুটল। তারাও একই পথের পথিক। একসঙ্গেই সব কিছু উপভোগ করে।

শেষে একদিন তার মা কপাল চাপড়ে সাশ্রু নয়নে কামতাপরসাদকে বললেন— আমাদের বহু কি আনবে না? বেটা যে হয যোগী নয় জাহান্নমবাসী হতে চলল।

শাদি? কামতা আকাশ থেকে পড়লেন। শাদি আর এমন কি ব্যাপাব? তিনি হাত ঝাড়া দিলে অমন একশোটা শাদি হয়ে যাবে। তো ছেলেকে রাজি করাও। তাঁর ধারণা ছিল রাজি হবে না। ছেলে কিন্তু দু-চারবার নিয়মরক্ষার 'না, না' কবেই রাজি হয়ে গেল। খালি মাকে বলল—কুৎসিত মেয়ে সে শাদি করবে না। সুন্দর চাই।

তো তারই বা অভাব কী? ফৈজাবাদী আওধওয়ালীদের মধ্যে কি সুন্দরী নেই? একেবারে দেশঘরের আসলি ঘিউয়ের মতো আসলি সুন্দরীই জোগাড় হল। খোসা ছাড়ানো ঘিয়ার মতো বং। কুচকুচে কালো চুল। গালের ভাঁজে নাক-চোখ দুই-ই ডোবে, ডোবে। চোখের তো দরকাব নেই। তিন হাত ঘোমটা। আর নাক তো গহনা পরবার জন্য, নাকে নথ উঠল, হিরের নাকছাবিও উঠল। হাতভর্তি কাচের চুড়ি। সুহাগ রাতের সুহাগের অত্যাচাবে সেই সুহাগনের কাচের চুড়ি যখন মটমট করে ভাঙল তখন ফর্সা রঙে রক্তের ফোঁটাগুলো চুনির মতো জ্বলছে দেখে বাসনায় জে. পি. গুপ্তর শরীরে আগুন। কিন্তু হায়, ও আগুন তো বারবার জ্বলো না। জড়সড় একটি কাপড়-গহনার পুঁটলি, তিন হাত ঘোমটা, একটি মোটাসোটা তাকিয়া ছাড়া জয়প্রকাশ আর কিছুই পেতে পারল না। না দুটো কথা, না একটা সলাহ্, একটা দুটো শায়রী কি গানা, কিচ্ছু না। কিচ্ছু না। খালি বছর বছর পয়দা হতে লাগল নাকে পোঁটা, যেখানে-সেখানে পিসাবকরনেওয়ালা, ন্যাংটা, হ্যাংলা, ভোঁদাটে ছেলেপিলের পাল। তাদের মধ্যে মেয়েগুলোকে দেখলে জয়প্রকাশের আরও ঘিন্না লাগে। এগুলোও তার কাছ থেকে কাপড়-গয়নার পুঁটলি হয়ে আর কারও ঘরে যাবে, চিত হবে আর আরও একপাল শূকর-শূকরী পয়দা করবে।

কিন্তু শাদিসুদা মানুষ, তার ওপরে বাপ হয়েছে, কামে-কাজে তো যেতেই হয়। অতএব কামতা ও কামতানীর ইষ্টসিদ্ধি হল। জে. পি. গুপ্ত বাপেব ভাঙা লোহার কারবারে গিয়ে বসল। তবে তার চেহারা বদলে দিল সে। এখন লোহার গুদাম আলাদা, অফিসঘর আলাদা,

অফিসঘরে সানমাইকা-ঢাকা টেবিল, রিভলভিং চেয়ার। ভেপার-ল্যাম্প জ্বলে। আরও নানান ধান্দা বার করতে লাগল সে। এই ভাঙা চোরাই লোহার খাঁচা থেকে তাকে বেরোতেই হবে, হতেই হবে নিয়মনিষ্ঠ ভদ্র ব্যবসায়ী, খানদানি ভদ্রলোক। মানিয়ে নিচ্ছে সে, মানাতেও বাধ্য করছে ক্রমাগত। তার মা ঘুংঘট ছেড়েছেন, খোঁপার ওপর আর তা ওঠে না, বাপ ভদ্র পোশাক পরিচ্ছদ পরছেন। সেই পড়ে-পাওয়া কোঠাবাড়ি এখন হয়েছে মোজেইক করা দোতলা, দোতলায় শুধু তার বসবাস। একতলায় খাবার টেবিল, গ্যাস, ফ্রিজ, গ্যারাজে মোটর সাইকেল, আধুনিক জীবনের সকল অনুষঙ্গে সে ভরিয়ে দিচ্ছে বাড়ি। তবু বাড়িতে ঢুকলেই তার মাথায় খুন চাপে। একটি জড়পুঁটলি এগিয়ে এসে জুতো খুলে দেবে, মোজা খুলে পাটসাট করবে, ফ্যান থাকা সত্ত্বেও কোথা থেকে একটা ঝালর দেওয়া গোলমতো দেশোয়ালি পাখা এনে একটি হাত বার করে হাওয়া করবে যেন একহেতে পেত্নী। শূকরের পাল—নোংরা, সর্দিঝরা নাকে কেউ উলঙ্গ, হামা দিতে দিতে, কেউ টলটল করতে করতে, কেউ আবার দিব্যি ছুটে কিংবা হেঁটে বাপকে তাদের দৈনিক আদর সোহাগ জানাতে আসবে। তাদের মা তাড়া দেবে, কিন্তু তারা নড়বে না, অবশেষে তার পকেট থেকে লজেন্সের ঠোঙা বার হলে একটা একটা নিয়ে পশ্চাদপসরণ করবে।

যাচ্ছেতাই একটা গালাগাল সে চাপা গলায় উচ্চারণ করবে, তার স্ত্রীর পাখাধরা হাতটা একটু জোরে জোরে নড়বে। স্বামীর পৌরুষে সে ভীত এবং প্রীত। ওদিকে মা তার হনুমানজির পরসাদসমেত লাড্ডু-কচৌরির ভোজনের থালি নিয়ে এসেছেন এবং বহুর দিকে বাড়িয়ে ধরেছেন। যেন মা না দিয়ে বহু দিলে খাবারগুলোর বিশ্রীত্ব একটুও দূর হবে।

রাত্তিরে পুঁটলিটি খানিকটা পদসেবা করবে তার, তারপর পরম কর্তব্যবোধে পতিদেবতার বুকের কাছটিতে আরও পুঁটলীকৃত হয়ে শুয়ে পড়বে। কী বলবে, জয়পরকাশের মনে হয় লাথ মেরে ওই পুঁটলিটিকে সে খাটের বাইরে ফেলে দেয়। কিন্তু কী করে, সে তো খানদানি হতে চাচ্ছে কিনা, তা ছাড়া ঘি আর আগুন পাশাপাশি থাকলেই একসময়ে জ্বলবেই, বহুদিন আগে মহাজনরা বলে গিয়েছেন।

তবে ধীরে ধীরে লোহার খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসার সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা তার ফলতে লাগল। পুরনো জিনিসই। কিন্তু এখন সে কেনে পুরনো জাহাজ। কেনে আর তাকে ভেঙে তার লোহা, কাঠ, নাটবল্টু স-ব বেচে দেয়। এই কেনাবেচা করতে করতে ক্রমে তার মাথা এমনি পাকা হয়ে উঠল যে সে জলের দরে জাহাজ কিনে ফেলতে লাগল। একটার পর একটা। কামতাপরসাদ গোড়ার দিকে ভয় পেয়েছিলেন, এ কলেজে পড়া বেটার দ্বারা বেওসা হবে কি না হবে। তারপর যখন সে জাহাজ কেনা ধরল আতঙ্কে তাঁর মহাপ্রাণী খুবই লম্ফ-ঝম্ফ করেছিল। কেননা টাকাপয়সা একগাদা লগ্নি করেই বেওসা করবে তো তোমার নাফা হবে কেন? তাঁর ক্যাপিটাল থাকত প্রায় শূন্য। তাই নাফার পরিমাণ আর পার্সেন্টেজ হত চমৎকার। প্রায় হানড্রেড পার্সেন্ট। তা বেটা তো তাঁর নয় দেখা যাচ্ছে, কোনও সাধুসন্তের হবে। সে তো চোরাই জিনিস ছোঁবে না।

এই সময়ে একদিন জে. পি-র বন্ধুস্থানীয় এক সুরজলাল তাকে বলল—বড় বড় বাড়ি

ভাঙা হচ্ছে। বাড়ি তো নয় প্রাসাদ। তা সেসব বাড়িব জানলা, দরজা, ইটালিযান মার্বেল, টাইলস, মূর্তি, ফার্নিচার ... . সবই আচ্ছা আচ্ছা চিজ। সে যদি কিনে নেয় এক লটে তো বহোৎ নাফা আসবে। কথাটা জয়পবকাশের মনে ধরল। সুরজ তার বন্ধুলোক। চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট-এর কাম কবে, কিন্তু মার্কিট সম্পর্কে তাব ধারণা খুব ভাল।

এইরকম এক বাড়িব মাল কিনতে গিযে ক'দিন তার এক অদ্ভুত দম্পতিব সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ভাঙা বাড়ির রাশীকৃত জঞ্জালেব মধ্যে স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। ভদ্রলোক ফর্সা, ভদ্রমহিলা আধা-ফর্সা। ভদ্রলোক অনেকটা লম্বা। ফুট ছয়েক হবেন, আদ্দির পাঞ্জাবি আর কুঁচোনো ধুতি পরা। মহিলাও তাঁর সঙ্গে মানানসই, এত সুন্দর কুঁচি দিয়ে কালো পাড় একটি হলুদ কি নীল শাড়ি পরেন যে জয়প্রকাশের একটা অদ্ভুত সম্ভ্রম বোধ হত। একদিন, দুদিন, তিনদিন, সে সেদিন একাই ছিল, একটু সাহস কবে এগিয়ে গিয়ে বলল—নমস্তে, আপনারা কি কুছু খুঁজছেন?

ভদ্রলোক তার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বিস্ময়েব সুরে বললেন—আপনি........ মানে তুমি, জয না?

'জয়' নামটা বহু বহুদিন পব শুনল সে। সুরজরা তো শুধু পরকাশ বলেই ডেকে থাকে।

সে এবার বলল—আপনি আমাকে চিনেন?

—বাঃ চিনব না? গৌতমের কত বন্ধু ছিলে। দিনরাত তো আমাদের বাড়িতে পড়ে থাকতে।

—আপনি?

—আমি গৌতমেব বড়দা, এখনও বুঝতে পারছ না?

—ও হো হো, আপনি সেই দুশমনদা, হায় হায়!

জয় নিচু হয়ে তাঁকে প্রণাম করতে যেতেই তিনি হাত দুটো ধরে নিলেন। হা-হা করে হেসে বললেন—শুনছো, আমাব নাম এরা কী দিয়েছিল? দুশমন! গৌতমটা এত শয়তান ছিল! ওব শযতানি সব আমি কাকাবাবুর কাছে ফাঁস কবে দিতাম, মাস্টারমশাইদের বলে দিতাম কিনা তাই আমাকে ও দুশমনদা বলত! তা জয়, তুমি তো বাংলা বুলি বেশ ভালই বলতে!

'জয়' সম্বোধনে পুনঃপুলকিত হয়ে জয় বলল—এখনও তো বলি। বলতে পারি। তবে বলবার সুযোগ তো হয় না! বাঙালিরাও আমাদের সঙ্গে ভাঙা হিন্দিতে কথা বলেন। তা দর্শনদা, কী ব্যাপার?

সুদর্শন বললেন— আগে তোমার বউদিদির সঙ্গে পরিচয় করো। শিপ্রা, এ হল সেই জয়, তোমাকে বলতাম না আমাদের পাশের বাড়ি থাকত। আমাদের পুরনো বাড়ি গো.... .. সেই যখন যৌথ........

'হ্যাঁ হ্যাঁ' হাসি-হাসি মুখে ভদ্রমহিলা বললেন।

জয়প্রকাশ বুঝতে পারল দর্শনদা কোনওদিনই তার বা তাদের কথা স্ত্রীকে বলেননি।

বলবেনই বা কেন? ওঁরা অনেকদিন ওখান থেকে চলে গেছেন, অনেক বছর পার হয়ে গেছে। তা ছাড়া তার বন্ধু ছিল গৌতমদা, সে হলে হয়তো তার স্ত্রীকে বললেও বলতে পারত। কিন্তু এই ভাবীজি স্রেফ ভদ্রতার খাতিরে অমন বড় করে হ্যাঁ হ্যাঁ করলেন।

সে জিজ্ঞেস করলো—গৌতমদা কোথায়?

—সে তো বহুদিন ইংল্যান্ডে পাড়ি দিয়েছে। সেখানেই ডাক্তারি করে, সেখানেই বিয়ে শাদি করেছে। আসে মাঝে মাঝে.....

—তা আপনারা এখানে? কী ব্যাপার দাদা?

—আর বলো কেন? শিপ্রার বাবার বাড়ি এটা। বিক্রি হয়ে গেল।

শিপ্রাভাবী যেন কেমন একরকম করে দাদার দিকে চাইলেন। পুবো চোখে চেয়েই আবার চোখটা ফিরিয়ে নিলেন।

—তা সে যাই হোক, এসো আমার বাড়ি একদিন........ ভাল কথা তুমি এখানে কেন?

—আমি এই ভাঙা বাড়ি কিনেছি দাদা।

—আচ্ছা! অবাক হয়ে উনি বললেন—কিনেছ!

—আজ্ঞে।

—কী করবে?

—এই সব কাঠ-কাঠরা, জাফরি, মার্বেল সব আলদা আলদা দামে বিক্রি হবে দাদা।

ভাবী তখন দাদার দিকে চেয়ে মিনতিব সুরে বললেন—তা হলে ওঁকে বলো না!

—কী হবে? —দর্শনদা হাত উলটোলেন।

—কী ব্যাপার? বলুনই না!

দর্শনদা বললেন—আরে ওব কিছু প্রিয় ছবি ছিল বাড়িতে। সে ছবিগুলো তো উনি বিক্রি করেন নি। কিন্তু প্রোমোটারবা সবসুদ্ধ নিয়ে নিয়েছে। ভেঙে চুরে একাকার সব। আমরা ছবিগুলো খুঁজতে আসি। এটা ওটা সরিয়ে, যদি পাওয়া যায়।

জয়প্রকাশ দেখল ভাবী অন্য দিকে চেয়ে আছেন। খুব সম্ভব, সজল চোখ দুটো আড়াল করবার চেষ্টা করছেন।

—আপনি কীভাবে বেচেছিলেন দাদা?

—আরে ভাই আমি কি অত কুটকচালে জানি? তবে 'অ্যাজ ইজ হোয়্যার ইজ' বেচিনি। বেচেছি 'উইথ ফিটিংস অ্যান্ড ফিক্সচার্স'। এখন তুমিই বলো না ছবি কি ফিটিংস এর মধ্যে পড়ে? ও তো হুক থেকে খুলে নিলেই হয়ে যায়। সে কথা প্রোমোটাবকে বলতে বলল—আমি তো বাড়ি কিনেই ভাঙার অর্ডার দিয়ে দিয়েছি। কোথায় কী ছবি আমি জানি না। তো এখন দেখো, তুমি যখন ভাঙার কনট্রাক্ট নিয়েছ, ছবিগুলো তুমি উদ্ধার করতে পারো কি না। মামলা-টামলা করাই যায়। কিন্তু এখন আব এর জন্যে মামলাব খবচ চালাতে আমি রাজি নই। আমার ক্ষমতা নেই।

—দেখি কী করতে পারি ভাবীজি—জয় বিনীতভাবে বলল—তবে ভাঙাব কনট্রাক্ট আমার নয়। তার জন্য অন্য লোক আছে। আমি ভাঙার পর এই সব মাল কিনেছি। যদি খুঁজে পাই নিশ্চয় আপনাকে দিয়ে আসব। আপনি কোনও চিন্তা করবেন না।

সল্টলেক পূর্বাচলে সুদর্শন সরকারের ফ্ল্যাট। বেশ প্রশস্ত, সুন্দর। তাতে পুরনো বাড়ি থেকে কিছু কিছু ফার্নিচার রেখেছেন ভাবী। যেমন ডাইনিং চেয়ার। সে সব কবেকার, কোন আমলের ফার্নিচার, কিন্তু গ্লেজ দিচ্ছে কী! আলমারিটা অবশ্য বেডরুমে। একবার পর্দা সরিয়ে ভাবী বেরোবার সময়ে এক ঝটকা দেখা গেল। যেমন বিরাট, তেমন সুন্দর।

দর্শনদা বললেন—বেশির ভাগই এত বড় আর এত ভারী যে আমাদের ভাই সাধ্যে কুলোল না যে রাখি। তোমার ভাবীর এজন্য অবশ্য খুবই নালিশ আমার কাছে।

আকাশি রঙের ডুরি শাড়ি-পরা ভাবী চা দিচ্ছিলেন। এক গোছা চুল হাত দিয়ে সরাতে সরাতে শুধু বললেন—আমি কিন্তু আনরীজনেবল নই জয় ভাই। একেবারেই না।

—আচ্ছা দাদা, মনে কিছু করবেন না, আপনি আজকাল করেন কী? এঞ্জিনিয়ারিং পড়তেন, না?

ভাবী তাড়াতাড়ি বললেন—আরে সে তো অনেক দিনের কথা। বিচ্ছিরি ধরনের লম্বার স্পন্ডিলাইটিস হল, উনি কাজ ছাড়তে বাধ্য হলেন।

—কোনও চিকিৎসা নেই এর?

—চিকিৎসা তো হচ্ছেই, হয়েই চলেছে, কিন্তু রোগটা বাড়ে কমে, একেবারে সারে না।

দু-চারদিন আসা-যাওয়া করেই জয়প্রকাশ অবশ্য বুঝে গেল। এই কাজ না করে করেই শ্বশুরের বাড়িটি ফুঁকে দিয়েছেন ইনি। সম্ভবত ওই বাড়ির মূল্য দিয়েই এই ফ্ল্যাট কেনা এবং কিছু আমানত করা—তাতেই এঁদের চলে। ছেলেপুলের কথা তুলতেই দুজনে উদাস হয়ে যান। এ কথা জয়প্রকাশ কিছুতেই বুঝতে পারে না তার পুঁটলি পত্নী যদি তাকে বারো বছরে ছটি সন্তান উপহার দিয়ে থাকতে পারে তা হলে এই পরিপাটি চমৎকার চাঁপা রঙের ভাবীটি কেন এতদিনে একটিও .... না, না এসব ভগবানের খেলা।

চিৎপুরের বাড়ির চিত্রের খোজও চলেছে, এদিকে জয়প্রকাশও সুদর্শন সরকারের বাড়ির নিয়মিত অতিথি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর কিছু না, এই চমৎকার কারুকার্যের নিচু টেবিল সামনে নিয়ে আরামদায়ক মেরুন সোফায় হলুদ কালো কুশনে ঠেস দিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকা, মাছের চপ, কি মাংসের কাটলেট রেস্তোর্রার মতো, কি তার চেয়েও ভাল বানান শিপ্রাভাবী আর চা-টা তো দার্জিলিঙের ফ্লেভারে ভরা। ঢাললে গোটা ঘরটাই সুগন্ধে ভব ভর করে। আর কিছু নয়, হলুদ কিংবা গোলাপি কিংবা আকাশি কিংবা সাদা শাড়ি পরা একজন সভ্য সুশ্রী মহিলা, যাঁর গলার স্বর, ভাষা, চলনের ধরন সবই মানুষকে নেশায় ফেলে দেয়। নেশাও নয় ঠিক। একটা শান্তি, শান্তি দেয় মানুষকে, সেই তাঁর সমীপে বসে নিজেকে শান্ত, সুস্থ, স্বস্তিমান করে তোলা, আর সেইসঙ্গে সেই ছেলেবেলার অমল দিনগুলো, গৌতমদার সঙ্গে অচ্ছিন্ন অভিন্ন খেলাধূলোর খেলাভোলার দিনগুলোর স্মৃতি নিয়ে নাড়াচাড়া করা।

এই সময়েই সে খবর পেল প্রোমোটার রামলগন বৈদ মুম্বই থেকে ফিরে এসেছে। রামলগন তার বন্ধু না হতে পারে, চেনা-শোনাও খুব না থাকতে পারে, কিন্তু দেশোয়ালি তো! বলা-কওয়া কিচ্ছু না করে জয়প্রকাশ একদিন প্রায় প্রত্যুষে রামলগনের কোঠিতে হাজির হয়ে গেল। রামলগন তখন লোটাভর ভঁইসের দুধ গিলছে।

—আরে আরে জয়পরকাশজি, আপ ইৎনা সবেরে!

কোনও ভূমিকা না করেই জয়প্রকাশ বলল—ধান্ধে মে আয়া ভাই। পেইণ্টিং হ্যায় না ও চিৎপুর কী কোঠির? উও সব নিকলাইয়ে।

--কাঁহা তসবির? ক্যা তসবির। রাগ রাগ মুখ রামলগনের। কিন্তু জয়প্রকাশের কঠিন দৃষ্টির সামনে সে ফ্যাকাশে হতে শুরু করেছে তা বুঝতে জয়প্রকাশের দেরি হল না।

'উইথ ফিটিংস অ্যান্ড ফিক্সচার্স' কিনেছেন শুনছি, তা তসবির 'ফিটিংস' না 'ফিক্সচার্স' কোন ক্যাটিগরিতে পড়ে রামলগনজি? --তার গলা উত্তরোত্তর কড়া হচ্ছে—সুদর্শন সরকার আর তার মিসেস আপনার বিরুদ্ধে কেস করবেন। খাস গাওয়া আমি আনব। বাস, হয়ে যাবে আপনার মাল্টিস্টোরিড, বারোটা বেজে যাবে আপনার রিয়্যাল এস্টেটের কারবারের।

—আরে, ভাই বৈঠেন, বৈঠেন। এই কে আছিস রে? জয়পরকাশজির জন্যে মসালা চায় আর কচৌড়ি নিয়ে আয়। বসুন ঠান্ডা হয়ে, তবে তো কথা করবেন!

রামলগনের চেয়ে জয়প্রকাশের ব্যক্তিত্ব বেশি দেখা গেল। ছবির কথাটা সে বেশিক্ষণ অস্বীকার করতে পারল না। তবে কিছুক্ষণ পরেই তার চোখদুটো অন্য কোনও মতলবে চকচক করে উঠল। সে আসলে এই বিশেষ কাজেই মুম্বই গিয়েছিল, সেখান থেকেই বুঝে এসেছে কত গেঁহুব দানায় কত আট্টা। ছবির বান্ডিলটা সে বার করে আনল। ভাবীর দেওয়া লিস্টটা আজকাল জয়প্রকাশের পকেটেই ঘোরে। লিস্টে আসলে মেলানো শুরু হয়।

১ নম্বর—রাজা নল দময়ন্তীর কাছে হংসদূত পাঠিয়েছেন। থামের ওপর সেই হংস, সামনে থামে কনুই রেখে দময়ন্তী।

২ নম্বর--দ্রৌপদী স্বয়ম্বর। অর্জুন লক্ষ্যভেদ করছেন। দ্রৌপদী ধৃষ্টদ্যুম্নর সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন বরমাল্য হাতে।

৩ নম্বর—নীলচে সাদা জলের টইটম্বুর সরোবর। ভেতর থেকে উঠে আসছেন গোলাপবর্ণ দেহত্বকের এক লাবণ্যময়ী সিক্তবসনা সুন্দরী।

৪ নম্বর—সাদা-কালো আরও কিছু গাঢ় রঙের আলোছায়ায় নকশা মতো। যেন ভূতের বাড়ি।

৫ নম্বর—খোয়া-ওঠা গর্ত-অলা লালচে মাঠ। গরুর পাল তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে রাখাল। সময় গোধূলি শেষ।

৬ নম্বর—একটা লম্বা টেবিলে বারোজন আলখাল্লা পরা শিষ্য বসে আছে। মাঝখানে যিশু। রুটি ভাগ করে দিচ্ছেন।

৭ নম্বর--কাটা ছেঁড়া মানুষের হাত পা ঘোড়ার মুণ্ডু—এসব দিয়ে এক আজব নকশা।

রামলগন বলল—সমঝলেন না জয়পরকাশজি। এই ছে আর সাত হল ছবির প্রিণ্ট। বিলাইতি ছবি, ছেপে ছেপে বিক্রি করা। এগুলোর তেমন কোন দাম নেই। কিন্তু বাকি পাঁচটা একেবারে আসলি চিজ। এসব আর্টিস্টদের নিজের হাতে আঁকা, কেউই আর জিন্দা

নেই। আজকাল ছবির বাজার গরম। এসব পুরনো পেইন্টিং কোনওটা লাখ, সওযা লাখের কম হবে না। এসব ফিরৎ দিব কেন? আপনি আমি শেয়ার করে লিবো।

কথা না বার্তা না। বাঁধানো ছবির বান্ডিলটা জয়প্রকাশ তুলে নিল। তার মুখ থমথম করছে।

রামলাল হাঁ হাঁ করে উঠতে না উঠতেই সে কড়া গলায় বলল—চোরির এতো গন্ধা কামে আমি আপনাকে মদৎ করবো সোচছেন তো ভুল সোচছেন রামলগনজি। হয় এ ছবি ফিরত, নয় মামলা। ওঁরা আমার বন্ধুলোগ।

—দেখেন উ সব মামলা-উমলা আমি থোড়ি ভয় পাই। —রামলগন বলল—খালি ডেট লিব, খালি ডেট লিব। ও বাঙ্গালিবাবুকে আমি চিনি, ও সির্ফ হ্যারাস হয়ে ছেড়ে দিবে। লেকিন, আপনি যখন বলছেন আপনার বন্ধুলোগ, তো ঠিক হ্যায় জি, এক কাম করুন, ও পাঁচটার মধ্যে থেকে একটা অন্তত আমায় দিন।

ঝুলোঝুলি করে প্রথম ছবিটি আদায় করে নেয় রামলগন।

অতঃপর ছবির বান্ডিল নিয়ে একদিন সুদর্শন সরকারের ফ্লাটে গিয়ে ভাবিজির পায়ের কাছে পুষ্পার্ঘ্যের মতো সেগুলো নামিয়ে রাখে জয়প্রকাশ। শিপ্রাভাবী ভীষণ আগ্রহে, ভীষণ স্নেহে খুলছেন ছবির মোড়ক। কাচ একটু আধটু ফেটেছে, ধুলোর দাগ কাচের ওপর।

—আর ? আরগুলো? রবি বর্মা, হেমেন মজুমদার, আমার গগনঠাকুর, যামিনী গা,........ কথা শেষ করতে পারেন না শিপ্রাভাবী। গলা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

—এইসব মানুষদের পোট্রেট ছিল বুঝি? আপনাদের আপনজন? তা এসব তো আপনার লিস্টে ছিল না ভাবীজি।

শিপ্রা কোনও মতে বল্লেন—না, না, পোট্রেট নয়, ওঁদেব আঁকা ওগুলো।

—এ দুটো অনেক কষ্টে রাব্‌ল-এর মধ্যে থেকে উদ্ধার করেছি ভাবীজি। দেখুন না সিসা কেমন ফেটে গেছে। রামলগন আপনার প্রোমোটার বলছে বাড়ি কিনেই সে ভাঙতে দিয়ে খালাস, আর কিছু জানে না।

ফ্যাকাশে মুখে চা ঢালতে লাগলেন হলুদ শাড়ির ভাবী। হাত থরথর করে কাঁপছে। প্রাণপণে আত্মসংবরণ করতে চেষ্টা করছেন তিনি। নেহাৎ বাইরের মানুষ যেন বুঝতে না পারে তাঁর ক্ষতির পরিমাণ, আবেগ, কষ্ট, হতাশা। চোখ ভরে সেই বেপথুমতীকে দেখতে থাকে জয়পরকাশ, নাক ভরে নিতে থাকে বাস আর ভাবতে থাকে যদি লাখ দেড়েক করেও হয় গড়, তা হলে চারটেতে সে পায় ছয় লাখ। আর একটু কমিয়ে ধরলে পাঁচ। পিতাজি বলেন—আমি আর আমার বাবুজি জিরো ক্যাপিট্যাল থেকে এত বড় কারবার বানিয়েছি বেটা—এই মকান, হাবেলি, এই গাড়ি। আর তুমি খালি টাকা লাগাচ্ছ, টাকা লাগাচ্ছ।

জয়পরকাশ একটু হাসে। এখন এটাকে পিতাজি কী বলবেন? জিরো ক্যাপিট্যালই তো? আর নাফা?

অপত্য

ব্যায়াম সমিতি থেকে ফেরবার পথটা অর্থাৎ শর্ট-কাটটা একেবারে কাদা-জলা হয়ে আছে। অনুষ্টুপদা বলে বাবড়ি-কাদা। এই কাদার সঙ্গে রাবড়ির নাম জড়িয়ে থাকলে রাবড়িতে ঘেন্না ধরা বিচিত্র না। অবশ্য, রাবড়ি যেন কতই জুটছে! চটিজোড়া খুলে নিয়ে প্যান্ট গুটিয়ে নিতে থাকলো অঞ্জু। সে জানে কাদায় বা জলে এভাবে খালি পায়ে নামা আর প্রাণটাকে নামিয়ে দেওয়া মোটের ওপর একই কথা। ওই কাদার মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকতে পারে কাচের ফালি, পেরেক, ধারালো যে কোনও জিনিসের টুকরো। পায়ে ফুটলেই আই ডি হসপিট্যাল, বেলিযাঘাটা। সেখান থেকে ফেরার কোনও গ্যারাণ্টি নেই। তবে, পঁচিশ বছর বয়সের একটা বি-কম বেকার ছেলের ফেরাও যা, না ফেরাও তা। দাদা আছে গড়িয়াহাটার মোড়ে একটা দোকানের সেলসম্যান। ছোট বোনটাও এক ডাক্তারের চেম্বারে অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ জুটিয়ে নিয়েছে। একমাত্র অঞ্জুরই দু-পাঁচটা টুউশনি ছাড়া কিচ্ছু হল না। এদিকে ব্যায়াম সমিতিতে মুগুর ভেঁজে, প্যাবালাল বারে উলটে পালটে খিদেটি আছে সাধা। মুগকলাই, ছোলা, সয়াবীন, রাজমা সবই পেটের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে। যখন রান্নাঘরের একপাশে বাবা চেয়ারে আর তিন ভাই-বোন মেঝেতে খেতে বসে, দেয়ালগুলো যেন মুখ বাঁকিয়ে বলতে থাকে—'কম্মের তো ঢিপি! খালি থালা থালা ভাত মারতে আছিস!'

কে বলে দেয়াল থেকে? অঞ্জুর সতের বছর বয়সে মৃত মা না কি! দরিদ্র সংসারে দিবারাত্র খেটে খেটে মায়ের মেজাজ খুবই তিরিক্ষি ছিল। তার ওপর ছিল মাথার যন্ত্রণার রোগ। হলে, মাথায় কষে ছেঁড়া শাড়ির পাড় বেঁধে শুয়ে থাকতো। কিন্তু মা অঞ্জুকে বড্ড ভালোবাসতো। বোন যদি এ নিয়ে নালিশ করতো, মা বলতো—'দ্যাখ মঞ্জু, পেটের সব সন্তানকেও সমানভাবে ভালোবাসা চাট্টিখানি কথা নয়, নিজে মা হলে বুঝবি। যে সন্তান সবচেয়ে হাসিমুখ, মায়ের দুঃখ বোঝে, যার ওপর ভরসা করা যায়, সে একটু বেশি পাবেই। তবে সেটুকু উথলোনো দুধ। আর কারো ভাগ থেকে কেড়ে কুড়ে নেওয়া নয়।' অঞ্জু চিরদিনই হাসিখুশি, আড্ডাবাজ, গুমোট কাটিয়ে দিতে ওস্তাদ, মায়ের ফরমাশ, সামান্যই সব, তবু সেই সামান্যটুকু মেটাবার কথা কখ্খনও ভুলতো না অঞ্জু। সরু ক'রে কুচনো একটু কাঁচা সুপুরি চিবিয়ে বোধহয় মায়ের একটু নেশামতো হতো। সুপুরির যোগান আসতো অঞ্জুর হাত দিয়ে। কাছাকাছি ঠাকুরের আশ্রমে যেতে ভালোবাসতো মা। অঞ্জু ওসব ঠাকুর-টাকুর কস্মিনকালেও পছন্দ করে না। তবু যেত মাকে নিয়ে। সেই মাকে জীবনে যেই একবার মাত্র সে এন-সি-সি-র সঙ্গে ট্রেনিং এ গেল ঠিক সেবারই মারা যেতে হল? স্ট্রোক! তাকে খবর দেওয়া গেল না। সে যখন ফিরলো শ্রাদ্ধ-শান্তি শুদ্ধু মিটে গেছে, মায়ের ছবিতে রজনীগন্ধার মালা শুকনো! ছোট ছেলে, প্রিয় ছেলের কাছ থেকে, মার কি শেষ সময়ে একটু জলও যাচঞা ছিল না? মানুষটা যে ছিল এবং এক সময়ে তার না থাকা নিয়ে এই বাড়িতে মানুষগুলির আচার আচরণ পোশাক-আশাকে কিছু সাময়িক

পবিবর্তন হয়েছিল সে সব কিছু তখন বোঝবাব উপায় পর্যন্ত নেই। শুধু দাদা আরও গম্ভীর, বোন আবও ক্লান্ত, বাবাব আরও বিছানাব সঙ্গে মিশিয়ে যাওয়া। হতভম্ব অঞ্জু বাড়ি ঢুকতে বাবা শুকনো মৃত চোখে চেয়ে বললো—'যাক, তোমাদের সংসারে, একটা মুখ কমলো।' সংসারটা যে কী ক'রে তাঁব না হয়ে তাঁব ছেলেদেব হযে গেল তা অঞ্জু বোঝে না। সে তো তখন বাচ্চা, দাদা শুদ্ধ চব্বিশ পেরোয় নি। কিন্তু যবে থেকে চোখ খারাপেব অজুহাতে বাবাব কাজটা গেছে তবে থেকেই বাবা সুযোগ পেলেই 'তোমাদেব সংসার' কথাটা বলতেন। এখন বাবাব চোখে গ্লকোমা, পাযেব নার্ভ শুকিয়ে আসছে। শিরদাঁড়ায় লাম্বাব স্পন্ডিলাইটিস' যথাসাধ্য চিকিৎসা কবানো হয়। কিন্তু সেই একটা কথা আছে না, তোমার যথাসাধ্যটাও যথেষ্ট নয়! এ হল সেই।

দাদা ভালো ক'বে কথা কয় না। মঞ্জুও ভুরু কুঁচকে থাকে। বাবার সদাই দীর্ঘশ্বাস। তবু অঞ্জু যখন বাস্তা দিয়ে হাটে, শহবেব এ প্রান্ত থেকে হেঁটেই যাতায়াত কবে সে, তখন তাব মনে হয় সে বাজা। এই পৃথিবী, এই আকাশ বাতাস, সূর্যেব কিবণ, চাঁদের আলো সব তার। কোনও ভিক্ষুক, বিকলাঙ্গ বা বৃদ্ধ দেখলে মনে হয় কাছে গিয়ে বলে---'ভয় কী? আমি তো আছি!' যেন সে বোদ থেকে তাব নবীন ত্বক ব্যবহার ক'বে অনায়াসে সালোক সংশ্লেষ কবে যাচ্ছে। যেটুকু পুষ্টি ছোলা, মুগকলাই, রাজমা ইত্যাদি দিতে পাবছে না, সেটুকু সে নিজেই বানিয়ে নিচ্ছে প্রতিনিয়ত তার কোষকলায। খোলা গলায় সে হাসতে পারে যেন পৃথিবীর সর্বসুখ তার আয়ত্তে। বাড়ির মধ্যে তাব এমন হাসি শুনলে মঞ্জু ভুরু কুঁচকে ওঠে—'কী বে, কী খেয়েছিস?'

—কী আবার খাবো?

—এত হাসছিস যে?

—হাসিব সঙ্গে খাওযাব সম্পর্ক কী?

মঞ্জু মুখ ঘুবিয়ে নেয়। বলে--'আজ এক এক বেলায় কটা স্লিপ কেটেছি জানিস? দুশ, পঞ্চান্নটা ক'বে। একবার ওপব, আবাব নিচ, আবাব ওপব । ভাতেব ফ্যান গালতে গিয়ে আবার হাত ফসকে একটু গরম ফ্যান পড়ে গেছে হাতে। যদি বাংলা-ফাংলা পাস তো আমাকেও দিস দু-এক ঢোক। নইলে এত খাটুনি সয় না।'

---হাতে ফ্যান পড়েছে তো কী দিয়েছিস?

—কী আবাব দেবো? হাতের কাছে নুনেব বাটি ছিল এক খাবলা চেপে ধরেছি।

—খুব ভালো করেছিস। কিন্তু এবার ওষুধ লাগাতে হবে।

—থাক থাক তোকে আব ওস্তাদি কবতে হবে না। তুই নিজের নিয়ে থাকগে যা।

অর এই এগিয়ে আসা, এই সদিচ্ছাটাকে যেন তুড়ি মেবে উড়িয়ে দেয় মঞ্জু।

অথচ অঞ্জু আদৌ নিজের নিয়ে থাকে না। বাবাই বরং তাকে কিছু ছাড়তে চায় না। সে না কি অল্প পয়সায় গুছিয়ে বাজার করতে পারবে না। সে না কি একদিনেই গেরস্তকে ডকে উঠিয়ে দেবে। বাবার সেবার খুঁটিনাটিও বাবা মঞ্জু ছাড়া কারো কাছে করতে চায় না। কলঘরে, খাবাব জায়গায় নিয়ে যাবার সময়ে খালি অঞ্জু। কিন্তু অঞ্জু যথাসম্ভব পবিষ্কার

পরিচ্ছন্ন রাখে বাবার ব্যবহারের জিনিস। জামা-কাপড় কেচে দেয়। শুধু নিজেরটা নয়, সবারই। তবু তাকেই সবচেয়ে ফিটফাট দেখায়। সবচেয়ে ঝকঝকে। উজ্জ্বল। আর সব সময়ে মনের ভেতর দিয়ে একটা আনন্দের বাতাস হিল্লোল তুলে বয়ে যায়।

অনুষ্টুপদা বলেন—'আরে ছোকা, শরীরমাদ্যং শাস্ত্রে যে বলেছে সে কি আর এমনি বলেছে? গভীর উইজডমের কথা বলেছে। এই যে ব্যায়াম করছিস, শরীরের যন্ত্রপাতিগুলো ঠিকঠাক কাজ করছে। গ্ল্যান্ড-ফ্ল্যান্ড সব পার্ফেক্ট। যেখান থেকে যতটা স্টিমুলেশন দরকার আসছে। আর তার ফলেই একটা চমৎকার মানসিক ভারসাম্য, একটা স্থিতিস্থাপকতা। এটাই মানুষের আসল অবস্থা। সচ্চিদানন্দ স্টেট। বুঝলি ছোকা? —ছোকরা না বলে ছোকা বলেন অনুষ্টুপদা।

বোঝে অঞ্জু। খুব বোঝে। এই শারীরিক আনন্দ বা সুস্বাস্থ্য থেকে ক্ষরিত আনন্দ না থাকলে যে কী হত, বাবাকে দেখে খানিকটা বোঝা যায়। দাদা, মঞ্জু, শুধু তার পরিবার কেন, আরও কত ছেলে-মেয়ে-নারী-পুরুষ এই শারীরিক আনন্দের খোঁজই রাখে না। তবে আরও একটা জিনিস আছে। ব্যায়াম সমিতির সবাই কি অঞ্জুর মতো? বোধ হয় না। অনুষ্টুপদা হয়তো বলবেন, যে কোন কারণেই হোক সবাইকার শরীরের ভেতরটা সমান ভালোভাবে চলে না। তাই তারতম্য হয়ে যায়। কিন্তু কথাটা বোধ হয় ঠিক নয়। মানুষে মানুষে একটু তফাত আছেই! এই যে নেপাল, ওই ব্যায়াম সমিতিরই ছেলে তো! নিজের এলাকাটাকে ভয়ে জুজু ক'রে রেখে দিয়েছে একেবারে। কাউকে তোয়াক্কা করে না। যখন তখন ভয় দেখায়, চোখ গরম করে। নেপাল এখন নেউল হয়ে গেছে। অঞ্জুকে দলে ভেড়াতে চেয়েছিল। এলাকার পলিটিক্যাল দাদার কাছে নিয়ে যাবার কথা বলেছিল। সোজাসুজি কি আর?—'কী রে অঞ্জু, কমার্স গ্র্যাজুয়েট তো হলি। আর কদ্দিন ভ্যাবেণ্ডা ভাজবি? চল একদিন রবীনদার কাছে নিয়ে গিয়ে তোর একটা হিল্লে লাগিয়ে দিই।'

অঞ্জু বলেছিল—তুই অ্যাদ্দিন লেগে আছিস তোরই কিছু হল না!

—আমার? কিছু হয় নি? বলছিস কি রে? তুই একটা গ্র্যাজুয়েট আর আমি ইস্কুলের চৌকাঠ ডিঙোই নি। দু'জনের হিল্লে কি একরকম হবে? তাছাড়া এখন আমি পার্টির হোল-টাইমার। কিছুদিন পরেই দেখবি একটা লরি কি বাস বার ক'রে নিয়েছি। মনমোহন সিং-টা আবার সময় বুঝে লোন-ফোনে গুচ্ছের গ্যাঁড়াকল ঢুকিয়ে দিল কি না!

—চলি রে দেরি হয়ে যাচ্ছে। টুউশনি আছে।—অঞ্জু পা চালায়।

— কোন কেলাস? ছাত্র না ছাত্রী?

—ছাত্র। তিনটে একসঙ্গে। হায়ার সেকেণ্ডারি।—অঞ্জু কেটে পড়ে। এইভাবেই সে নেপাল-নেউলকে কাটাতে কাটাতে আসছে। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যও করে না, আবার মাথায় তুলে নাচেও না। খুব সাবধানে চলতে হয়। যেন ঘুণাক্ষরেও বুঝতে না পারে। ওদের অহং প্রচণ্ড। ভুলেও সেখানে লেগে গেলে সর্বনাশ ক'রে ছাড়বে।

ইদানীং নেপাল ঘন ঘন ধরছে তাকে। বিকেল তিনটে। অঞ্জু বেরিয়েছে। ছাত্রীর বাড়ি রিচি রোড। স্বভবতই সে হেঁটে যাবে। মোড়ে নেপাল।

—কী রে অঞ্জু ছাত্তর ঠ্যাঙাতে চললি?

—আব বলিস কেন? পরীক্ষা এসে গেছে, এক্সট্রা দিন যেতে হচ্ছে।

—ছাত্রী নিশ্চয়ই।

—একটা নয় আবার, দুটো।

—তাই এত গবজ। হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছিস একেবারে।

—কী যে বলিস নেপাল, ক্লাস ফাইভের দুটো পুঁচকে।

—রবীনদার কাছে কবে যাচ্ছিস?

—সময় কবতে পাবছি না রে। বাবার জন্যে ডাক্তারেব কাছে যেতে হয় ফি-মাসে। তিন ঘন্টা লাইন। তাছাড়াও কত কাজ।

—বেশি দেরি হয়ে গেলে তুই-ই পস্তাবি, আমাব কী।

—চলি রে! তার শক্ত হাতের মুঠোয় নেপালের হাতের পাঞ্জা ধরে কষে ঝাঁকুনি দেয় অঞ্জু।

ছাত্রীদের দেড়তলার ঘরে যখন ঢোকে তখন তার মুখ দেখে তারা বলে ওঠে —কী অঞ্জুদা, রাজ্য জয় ক'রে এলেন মনে হচ্ছে?

রাজ্য জয়ই বটে! মনে মনে ভাবে অঞ্জু। জানো না তো আর তোমাদের দুটো হায়ার সেকেণ্ডারির মেয়ের এক ঝটকায় ক্লাস ফাইভে ডিমোশন হয়ে গেছে!

এভাবেই চলে অঞ্জুর, চলে যায়। তার বয়সের অন্যান্য ছেলেরা যখন হতাশায় ভুগছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তখন অঞ্জু নীরবে চেষ্টা ক'রে যাচ্ছে চাকবির, আর প্রাণপণ টিউশনি। সেই সঙ্গে ব্যায়াম। ব্যায়াম ট্যায়ামের সুবাদেও তো অনেকেব চাকবি বাকরি হয়ে যায়। অঞ্জুর তাও হল না। কোনও ব্যাপারেই সে বোধ হয় প্রথম সারিতে আসতে পারে নি। প্রথম সারিতে আসতে না পারলে বিধিসম্মত, সম্মানজনক আয়ের দরজাগুলো বন্ধ থাকে। তখন কি না খেয়ে মরে যেতে হয়? তা নয়। তখন থাকে উঞ্ছবৃত্তি। যেমন এটা-ওটার দালালি, যেমন নেপালের রবীনদার চামচাগিরি, যেমন অঞ্জুর টিউশনি। টিউশনিতে সে মন্দ রোজগাব করে না। নিজের খরচ তো চলে যায়ই। বাড়িতেও কিছু দিতে পারে। তবু ....লোকে যখন জিজ্ঞেস করে, বলা যায় না কিছু করি। বেকার! এত বড় ছেলে বেকাব! বাবা মাথা নুইয়ে, দাদার মুখে নির্বেদ, মঞ্জু ভুরু কুঁচকে আছে। সবাইকার হীনম্মন্যতা।

ল্যান্সডাউন দিয়ে হাঁটছে অঞ্জু। হাঁটতে হাঁটতে মনের কোণে ডেলা পাকিয়ে আছে তার ব্যর্থতার চিন্তা। কিন্তু তার ওপর দিয়ে একটা আনন্দের ভালোলাগার হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। আষাঢ় মাস। দুপুর বেলা প্রচণ্ড একটা ঝড়-বৃষ্টি হয়ে গেছে। বেশ কিছুদিন গুমোটের পর। রাস্তা ভিজে, বাতাস ভিজে, ভিজে-ভিজে হাওয়া। আকাশে মেঘগুলো তখন হুড়হুড় ক'রে ভেসে যাচ্ছে। ভীষণ একটা তাড়া পড়ে গেছে যেন। সন্ধেবেলাটা একটু কালি-কালি হয়ে আছে তাই। মেঘের ছায়া পড়েছে পিচ-রাস্তার পাতলা জমা জলের আয়নার মতো গায়ে। রাস্তায় বেশি লোক নেই। গাড়িগুলো খুব জোরে ছুটছে। এটা ঠিক নয় কিন্তু। বৃষ্টিপিছল রাস্তায় গাড়ি স্কিড করতে পারে। মানুষ আজকাল খুব বেপরোয়া হয়ে গেছে। জেনে-শুনেও কেন যে সাধারণ নিয়মগুলো মানে না!

শরৎ ব্যানার্জী রোড থেকে এক ভদ্রমহিলা বেরোলেন। হাতে ব্যাগ, এক হাতে শাড়ির কুঁচি তুলে আস্তে আস্তে হাঁটছেন। ঠিক অঞ্জুর সমকোণে। তাই সে ভালো ক'রে দেখতে পাচ্ছিল। উনি রাস্তা পার হচ্ছেন। ওদিকের দোকানটায় চলে গেলেন। রাস্তার আলোগুলো মিটমিট করছে। অঞ্জু আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। হঠাৎ একটা তীব্র কিঁ-চ্ শব্দে তার চোখ চলে গেল রাস্তার মাঝবরাবর। সে কিছুক্ষণ আগেকার দেখা ভদ্রমহিলাকে শূন্যে দেখলো। জামা-কাপড় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের একটা খাপছাড়া বল শূন্যে, ভীষণ বেগে নেমে আসছে নিচের দিকে। একটা ম্যাটাডর পাশ কাটিয়ে তীব্র বেগে চলে গেল। পেছনে হেলমেট মাথায় একজন মোটরসাইকেল-আরোহী ছুটছে। ধর ধর—আশপাশের দোকান থেকে কিছু লোকও ছুটে যাচ্ছে ভ্যানটার পেছনে। অঞ্জু দৌড়ে গিয়ে ওঁকে রাস্তা থেকে তুলে নিল কোলে। মুখটা ওর ভেঙে যাচ্ছে। অঞ্জুর দু'হাত জামাকাপড় রক্তে ভেসে যাচ্ছে। আর. কে. মিশনে স্ট্রাইক চলছে--সে তাড়াতাড়ি ভেবে নেয় –'ট্যাক্সি-ট্যাক্সি........শীগগীর শীগগীর।' খালি ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছে একটা। 'দু একজন চলুন আমার সঙ্গে চটপট।' ব্যস, ভিড় ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। কে ওঁর ঝুলতে থাকা পা দুটো ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। কে একটা ব্যাগ তুলে দিল গাড়িতে। পুলিসের ঝামেলা...... কে হ্যাঁপা পোয়াবে? ওপাশের দরজা খুলে তবু একটি অল্প বয়সী ছেলে উঠে এলো।.......'যদি কেউ এঁকে চেনেন, বাড়িতে খবর দিয়ে দিন। এস.এস.কে.এম.এ-নিয়ে যাচ্ছি....... শরৎ ব্যানার্জী থেকে বেরিয়েছিলেন.......।'

হু হু ক'রে ছুটছে গাড়ি। রক্তে ভেসে যাচ্ছে মুখ। উনি যেন কী বলছেন! অঞ্জু কান নামালো, কিছু শব্দ, কিছু গোঙানি। মানুষের ভেতরে আরো অনেক কিছুর মতো একটা ধ্বনি-ভাণ্ডারও থাকে। সেই ভাঁড়ারের দরজা ভেঙে পড়েছে। তাই ধ্বনিরা বেরিয়ে আসছে। অঞ্জুর কাঁধে জলের বোতল। সে একটু জল দিল মুখে। 'আরো জোরে, আরো জোরে ভাই। হর্ন বাজাতে বাজাতে বেরিয়ে যান' ......অঞ্জু প্রাণপণে ঝাঁকানি থেকে তার কোলের মানুষটিকে রক্ষা করতে করতে বললো।

হাসপাতাল দেখা যাচ্ছে অবশেষে। এমার্জেন্সির আলো। কে হন আপনি? কেউ না। সে কী? আননোন? এ তো পুলিস কেস হবেই। আপনি পালাবেন না যেন। সিস্টার, ব্যাগটা নিন।

—শুনুন ডাক্তার, ব্যাগ-ট্যাগ, পরিচয়-টরিচয় পরে হবে। আগে ওঁকে অক্সিজেন আর কী কী লাগে দিন প্লীজ। টেবিলে তুলুন। ফর গড্‌স্ সেক।

তরুণ ডাক্তারটি চোখ ফিরিয়ে বললো—জানেন না তো পাবলিক আর পুলিসের হয়রানি! আগে পেপার্স ঠিক করতে হয়।

—ওহ্ ডক্টর, উনি আমার মা, ধরুন আমারই। আপনার, আপনারও। মায়ের মুখ মনে করতে পারছেন না? কুইক, কুইক, প্লীজ, ফর গড্‌স্ সেক।

স্যালাইনের বোতল। অক্সিজেন। অবাক চোখে চেয়ে তরুণ ডাক্তার, প্রৌঢ় নার্স......শী ইজ গ্যাসপিং। সরি, ইয়াং ম্যান।

—কী হল?

— শী হ্যাজ এক্সপায়র্ড।

—এক্সপায়ার্ড?—হতভম্বের মতো তাকিয়ে আছে অঞ্জু। ওহ, পারলুম না, পারলুম না, পারি নি, কত চেষ্টা করি পারি না।

—শুনুন, কী নাম আপনার?

— অঞ্জন পোরেল।

—ও. কে। এই ব্যাগে একটা কার্ড রয়েছে। ডক্টর শিশির বিশ্বাস। সাদার্ন অ্যাভিনিউ। ঠিকানাটা নিন। চটপট কনট্যাক্ট করুন।

ট্যাক্সি-ড্রাইভার এখনও দাঁড়িয়ে। দিশেহারার মতো অঞ্জুকে এদিক ওদিক চাইতে দেখে ডাকলো।

—কী হল ভাই? ম্যাডাম কেমন আছেন?

—অঞ্জু মাথা নাড়লো ডাইনে-বাঁয়ে। অন্য ছেলেটিও বের হয়ে এসেছে। সে অন্যদিকে যাবে এবার। ড্রাইভার অঞ্জুকে বলল—

—কোন দিকে যাবেন?

—খবর দিতে।

—ঠিকানা পেয়েছেন?

—হ্যাঁ।

—চলুন নিয়ে যাচ্ছি।

বিশাল বহুতল বাড়ি। জানলায় জানলায় পর্দা ভেদ ক'রে আলো এসে পড়ছে। নির্দিষ্ট ফ্ল্যাটের সামনে এসে অঞ্জু নিজের পোশাকের দিকে তাকালো। কালো প্যান্ট, তার ওপরে মেরুন টিশার্ট। জায়গায় জায়গায় শুকিয়ে খরখরে হয়ে উঠেছে রক্তের দাগ। বোঝা যাচ্ছে একটু লক্ষ্য করলেই। হাতগুলো? হাতগুলো কি কোনও সময়ে ধুয়েছিল? বেল টেপবার সঙ্গে সঙ্গেই দরজাটা খুলে গেল। একটি যুবক। এক্ষুনি বোধহয় অফিস থেকে ফিরেছে। হাতের ব্যাগটা এখনও রাখে নি। পেছনে একটি প্রৌঢ় মুখ। চোখে হাই পাওয়ারের চশমা।

—তোর মা ফিরলো না কি রে রঞ্জন? অনেকক্ষণ গেছে।

—কাকে চান?

—এই কার্ড কার?

—দেখি। ও, আমার বাবার।

—শুনুন, এক্ষুনি এস এস. কে. এম.-এ এমার্জেন্সিতে চলে আসুন। একটা দুর্ঘটনা হয়েছে। মায়ের। বোধহয় আপনার মায়ের।

—কে রে রঞ্জন? কী বলছে? কী?

রঞ্জন নামের ছেলেটির মুখ পাল্টে যাচ্ছে। সে প্রায় রুদ্ধ গলায় চিৎকার করলো— 'কৃষ্ণা, আমার ব্যাগটা ধরো।'

ভেতর থেকে একটি অল্পবয়সী মেয়ে বেরিয়ে এলো।

— আমি পি. জি.-তে যাচ্ছি। মায়ের অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।

—'কী - ই - ই?' প্রৌঢ়ের গলায়, তরুণীর গলায় আর্ত জিজ্ঞাসা শুনতে পেলো অঞ্জু। প্রৌঢ় ভদ্রলোক, ইনি ডক্টর শিশির বিশ্বাস, বেরিয়ে এলেন।

—আমি যাবো।

—না বাবা।

—যেতে দিন। অঞ্জু বললো।

নিচে নেমে সেই ট্যাক্সিই ছুটলো। ডক্টর বিশ্বাস বললেন—সিরিয়াস কিছু নয় তো? কত ক'রে বললুম সেলোটেপের এক্ষুনি দরকার নেই। সকালে হলেও হবে। কৃষ্ণা আনতে পারে। পূর্ণিমাকে পাঠালেও হয়। সেই এক গোঁ! কী বাবা! সিরিয়াস কিছু নয় তো?

শিশির বিশ্বাস ওদিকে। মাঝখানে রঞ্জন। এদিকে অঞ্জু। পূর্ণ দৃষ্টিতে রঞ্জন চেয়ে আছে তার দিকে। তার জামা-কাপড় ভিজে। রক্তের গন্ধ উঠছে। সে চোখ নামিয়ে নিলো।

—ওঁর নাম মাধবী। মাধবী বিশ্বাস। ব্যাগে চশমা ছিল এক জোড়া। বাই ফোক্যাল।

—কে আইডেনটিফাই করবেন? আপনি কে?

—আমি ওঁর হাজব্যাণ্ড।

—আর কেউ নেই?

—এই যে আমি, ছেলে।

—আসুন, আপনি আসুন।—ঘরটায় ঢুকতে ঢুকতে তরুণ ডাক্তার বললেন—মনকে শক্ত করুন। শী হ্যাজ এক্সপায়ার্ড। ন্যাস্টি উণ্ডস্। বিশ্রী অ্যাকসিডেন্ট একটা। আমি আমরা কিছু করতে পারি নি। ওই ছেলেটি, অনেক চেষ্টা করেছিল, পারে নি।

হাসপাতাল দুলছে। পৃথিবী দুলছে। ভূমিকম্প হচ্ছে দূরে কোন আগ্নেয় বলয়ে। ডক্টর শিশির বিশ্বাসকে শক্ত দু'হাতে ধরে আছে অঞ্জু। টলতে টলতে রঞ্জন বেরিয়ে আসছে— 'বাবা, ইটস মাদার অল রাইট। শী ইজ নো মোর।' নো মোর, নো মোর, চারদিকে একটা চাপা আর্তনাদ। তারপর স্তব্ধতা। বিনা নোটিসে যখন পৃথিবীর মানুষকে এভাবে ছিনিয়ে নেওয়া হয় তখন পৃথিবী বিবরে প্রবেশ ক'রে চুপ ক'রে যায়। একদম চুপ।

—শুনুন, জায়গাটা এ থানার অন্তর্গত হলেও সব রোড অ্যাকসিডেন্টস লালবাজার ডীল করে। আমি চেষ্টা করছি। কনট্যাক্ট করছি। কিন্তু আপনাদের ওখানেই যেতে হবে। ও. সি. বললেন।

লালবাজার বললো—পোস্টমর্টেম হবেই। আটকাতে পারবেন না। আপনাদের এটাতে গোলমাল নেই। কিন্তু গোলমাল হয়, হয়েই থাকে। কেসগুলো ওভাবে আলাদা করা যায় না। আমাদের রেকর্ড ঠিক রাখতেই হবে। একটা কাজ করতে পারি। পি. এম. যিনি করবেন সেই ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারি। কথা বলুন। চট ক'রে কাজটা হয়ে যেতে পারে। আগলি সীন। ডোম বডি আগলে আছে। পার্টির স্ট্রেন্‌থ্ বুঝে দরাদরি করছে.......এটা অ্যাভয়েড করতে পারেন, দেখুন।

রাত বারোটা নাগাদ মোমিনপুর থেকে রঞ্জনকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে অঞ্জু বললো— আমি আসছি একটু বাড়ি থেকে। ঠিক সময়ে আবার এসে যাবো।

রঞ্জনদের ফ্ল্যাটের সামনেটা এখন লোকারণ্য। রঞ্জন আত্মীয়স্বজন-প্রতিবেশীদের হাতে প্রায় বাহিত হতে হতে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। এত আলো এখন চারদিকে। তখন সেখানে যথেষ্ট আলো ছিল না। এত লোক! সেই বিন্দুতে একটি মাত্র মানুষকে কে আসতে বলে রেখে ছিল। নির্বাচিত একজন।

—এই যে ভাই!—

—আপনি এখনও আছেন?

—কী করি। বলুন—ঘামে ভেজা জবজবে মুখটা মুছতে মুছতে জবাব দিল ট্যাক্সি-ড্রাইভার ভদ্রলোক।

—আপনি তো বাড়ি যাবেন, চলুন পৌঁছে দিই। কোনদিকে?

—যাদবপুর।.কিন্তু আপনি কি পাগল হলেন? সেই সন্ধে থেকে ...... মিটার তো আপ ক'রে রেখেছেন দেখছি। আমি কিন্তু গোটা বিশেকেব বেশি দিতে পারবো না।

—'আরে ভাই, কী টাকা দেখাচ্ছেন? আমরা সেন্টিমেন্টাল জাত জানেন তো? যত গরিব তত সেন্টিমেন্টাল। পয়সা নেই...... তাই বলে... .·যাক গে চলুন, পৌঁছে দিই। আমাকে একটু ব্যাক ক'রে বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে গ্যারাজ করতে হবে। এতক্ষণ সমানে আপনিও তো ঘুরলেন নিজের কাজ-কম্মো ফেলে।'

ট্যাক্সির দরজা বন্ধ করতে করতে অঞ্জু বললো—আমি তো বেকার!

হাত জোড় ক'রে কপালে ঠেকালো ড্রাইভার, বললো—ভাগ্যিস, আপনি বেকার ছিলেন, তাই একজন মা শেষ সময়ে ছেলের হাতের জল পেলেন। আপনার ওই ঢাউস ওয়াটার-বট্‌ল্—এ কি গঙ্গাজলই নিয়ে যাচ্ছিলেন?

—গঙ্গাজল? ধুর। কলকাতাব জল এখন খেলেই আন্ত্রিক। জানেন না? আমি সব সময়ে ফোটানো জল ক্যারি করি। অনেক জল খেতে হয় কি না!

—ওই হলো! ওই-ই আধুনিক গঙ্গাজল ভাই। ভগবানের কী বিচিত্র লীলাই না দেখলুম।

গলির মোড়ে নেমে যেতে যেতে অঞ্জু জোরে ক'রে দশটাকার দু'খানা নোট গুঁজে দিল ভদ্রলোকের হাতে।

—আপনি বেকার না?

—আপনারও তো লস হলো অনেক।

—ওই ওঁদের থেকে বেশী কী? আচ্ছা আবার দেখা হযে যাবে। আমার নাম বিজন সরখেল। আপনি?

—অঞ্জন পোরেল।

সাড়ে বারোটা বাজছে। জানলার কাছে উৎকণ্ঠিত মুখ।

—কী ব্যাপার, অঞ্জু? এত রাত?

—আর বোলো না। মর্মান্তিক একটা রোড অ্যাকসিডেন্ট। আটকে পড়েছিলুম। জামা-কাপড়গুলো জলে ভিজিয়ে আবার যাবো।

—আবার যাবি? তোর কিছু হয় নি তো? —মঞ্জু চৌকাঠে।

—আমার? অঞ্জু ভাবলো, তারপর ব' '— ' 'যা দরকার। তুই যা হোক কিছু খাবার দে। আমি চান ক'রে আসছি।

রাত তিনটেয় মোমিনপুর থেকে গাড়ি বেরোল। সৎকার সমিতি, গুরুদ্বার কারো গাড়ি পাওয়া যায় নি। টেম্পোয়ও আজকাল অনুমতি দিচ্ছে না। একটা গাড়ি মর্গ থেকে বাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে চলে গেছে। সকাল এগারোটার আগে কোনও গাড়ি পাওয়া যাবে না। এগারোটা মানেই বারোটা, কিম্বা একটা। বহু অল্পবয়সী ছেলে চারদিকে। এদের আত্মীয়স্বজন, এ ফ্ল্যাটের বাসিন্দা। সেদিকে তাকিয়ে নিজের ঘড়ির দিকে চাইলো অঞ্জু। পাঁচটা বাজছে। বললো—'আসুন না, আমরাই নিয়ে যাই, এই তো! কতটুকু আর পথ!' সে ডান পাশের সামনের খুরোতে হাত দিল।

আজও মেঘভর্তি আকাশ। চুঁইয়ে পড়ছে সকালের আলো। একজন বয়স্ক মানুষ বললেন—মঙ্গলবারে কাজ। কী যেন নাম তোমার? অঞ্জন? এসো বাবা। এসো কিন্তু।

অঞ্জু বাড়ির পথ ধরলো। গতকাল এ সময়েও মাধবী বিশ্বাস ছিলেন। হয়তো চা দিচ্ছিলেন তাঁর স্বামী শিশির বিশ্বাস, ছেলে রঞ্জন বিশ্বাসকে। ডাকাডাকি ক'রে কিছু নির্দেশ দিচ্ছিলেন পুত্রবধূ কৃষ্ণাকে। সামনের ি চুলগুলো পাকা। সিঁথিতে অল্প সিঁদুর। রোগা, লম্বা, বেশ টরটরে। যখন কুঁচিগুলো হ ারে রাস্তা পার হচ্ছিলেন! বেশ স্মার্ট! রাস্তায় চলাফেরা আজকালকার গৃহিণীদের তো বেশ অভ্যাসই আছে। তাহলে কী হল? চোখ? চোখের নজর কম হয়ে এসেছিল না কি? তার ওপর বর্ষা-সন্ধ্যার ঘোলাটে আলো। ম্যাটাডরটা জ্ঞানহারা হয়ে ছুটছিল। রাস্তা দিয়ে যে মানুষকেও চলতে হয় সে হুঁশ নেই। যন্ত্র ক্রমাগত মানুষকে চাপা দিয়ে চলেছে। সংঘর্ষ। সংঘর্ষের একমাত্র সাক্ষী, সংঘর্ষের কালে একমাত্র আশ্রয়, একটি বলিষ্ঠ বেকার যুবক শরৎ বোস রোড ধরে সোজা চলে আসছে। কে তাকে টেনে আনছে? তার তো এ রাস্তা দিয়ে যাবার কথা ছিল না। তাহলে কেন? একি মানুষীর জন্য মনুষ্য-শাবকের ব্যাখ্যাতীত টান?

অজস্র ভিড়। প্রচুর জুতো। সেদিনের সেই ঘরখানাকে চেনা যাচ্ছে না। শ্বেতপদ্ম, রজনীগন্ধা, জুঁই। ট্রেতে ক'রে সন্দেশ পরিবেশন করছে দুটি মেয়ে। অনেক পরিচিত, অনেক বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজন। বেশিরভাগই পরস্পরের সঙ্গে গল্পে মত্ত। জড়ো হবার একটা উপলক্ষ্য পেলেই শব্দরা উথলে ওঠে। সেতু বাঁধতে চায়। মৃত্যু? মর্মান্তিক। শেষ। কিন্তু জীবন? অহো জীবন। আহা জীবন! আমি, আমরা, তুমি, তোমরা যে পর্যন্ত আছি, আছো। আছিস? আছেন? আর থাকা দাদা। হাইপারটেনশন। ব্লাড শুগার তিনশ ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বসুমল্লিকদের বাড়ি দেখা হয়েছিল না? হ্যাঁ, নাতির অন্নপ্রাশনে। সেই আর এই? এ তো আসতেই হয়। থাকি কোথায়? সিঁথি, নতুন বাড়ি করলুম যে! সিঁথি থেকে সাদার্ন অ্যাভেন্যু—বুঝুন। আপনি কি এখনও আই সি আই তেই? জামাইটি তো খুব ভালো হয়েছে। লস এঞ্জেলিস। আরে বাবা আজকাল ভালো ছেলে মানেই মার্কিন দেশ। ও লিলিদি! দেখতেই পাচ্ছো না যে। সেদিন তোমার লেকচার শুনলুম। ওই তো গুরুসদয়ে।

এখন সাঁই ভজনে যাস না তো কই আর? এক একটা হুজুগ আসে যেন! তা হোক, মানুষ বড় অসহায় রে! বুঝিস তো! একটা ভরসা চাই! কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ........ দেখলি তো? নিদানকালে কিছুই কাজে আসে না। পথে পড়ে বেঘোরে যাওয়া যদি কপালে থাকে তো তাই! আহা মাধবী বড় ফিটফাট ছিল রে! কথায় কথায় বলতো হাসপাতালে যাওয়ার চেয়ে বরঞ্চ আমি বিনা চিকিৎসায় থাকবো! উঃ! সাবধানও ছিল খুব! কী যে হয়ে গেল! এক বিঘৎ দূরে বাড়ি, স্বামী, ছেলে-বউ! ভাবা যায় না। শিশিরদার দিকে যেন তাকানো যাচ্ছে না। চুলগুলো ক'দিনে আরও শাদা...... বিনোদ, হ্যাঁ আমি ডাকছি। ওদিকের জানলাটা বন্ধ ক'রে দাও না একটু। পুরুতমশাই দেশলাই জ্বালাতে পারছেন না।

অঞ্জু মুখ বাড়িয়ে দেখলো মুন্ডিত মস্তকে রঞ্জন আসনে বসে, হাতে কুশ, সামনে কোশাকুশি। পাশে শাদা লাল পাড় শাড়ি পরে সেদিনের সেই কৃষ্ণা বলে মেয়েটি। সে গোলাপ এনেছিলো রক্তগুলো। মাধবী দেবীর ছবির তলায় নামিয়ে রাখলো। ইনি? খুব সম্ভব কয়েক বছর আগেকার। তখনও সামনের চুলগুলো অতটা পাকে নি। ছবির চোখ তার দিকে সোজা তাকিয়ে হাসছে। —'শেষ সময়ে বড় তেষ্টা পায়, অঞ্জু তুই জল দিয়েছিলি। ধুলোয় পড়েছিলুম। তুই কোল দিয়েছিলি।' বলুন........ বলুন পিতৃকুলের উর্দ্ধতন তিন পুরুষ, মাতৃকুলের উর্দ্ধতন তিন পুরুষ। আর এই পিন্ডটি সবার জন্য। যাঁরা জল পান নি, তাপিত, পিপাসার্ত, অথবা যাঁরা পেয়েছেন, আরও পেলে আরও তৃপ্তি। গতাসবঃ। তাঁদের কথা মনে করে, হ্যাঁ.....।

অঞ্জু আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো। শ্রাদ্ধবাসর থেকে সবার অলক্ষ্যে সে পথে নেমে এসেছে। একটা মন্ত্রের ঘোর, একটা দৃষ্টির সম্মোহন তাকে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যাচ্ছে।

মাতৃশ্রাদ্ধ করবেন? অপমৃত্যু? তা মস্তক মুন্ডন করেন নি কেন? অশৌচান্ত কোন পুরুতে করালো? আমি পারবো না মশায়। ওই দিকে দেখুন গেঁজেল ঠাকুর রয়েছে। ওই যে থামে ঠেস দিয়ে! ওর কাছে যান। ও রাজি হয়ে যাবে। যত্ত তো অশাস্ত্রীয় কান্ড.....।

কয়েকবার ডাকবার পর গেঁজেল ঠাকুর লাল চোখ মেলে বললো—বেশ বাবা, বেশ বেশ। মাতৃশ্রাদ্ধ করবে, কিছু নেই? আরে বাবা স্বয়ং পৃথিবী মাতা এত থাকতেও নিঃস্ব। কিছু নেই তাতে লজ্জা কী? প্রকৃত বস্তু হচ্ছে অন্ন, জল আর শ্রদ্ধা। আর সব ভেবে নিলেই হবে। সবই বাহ্য। অন্ন আর জলের সূক্ষ্ম অংশ আত্মা নেন। তা বাপু, ক'টি টাকা দাও, অন্নজলটুকুর যোগাড় করি।

—চান ক'রে এসো।

—করেছি।

—নব বস্ত্র পরো।

—পরেছি।

—তা একরকম ঠিকই বলেছো বাবা। একই বস্ত্র দেখার গুণে প্রতিদিন নতুন হয়ে ওঠে বই কি! সময়কে যদি পল-অনুপলের মালিক বলে দেখো, বস্তুকে যদি প্রতি নিমেষে লয় পেতে আবার জন্মাতে দেখো, তো নূতনে পুরাতনে কোন ভেদ নাই। গঙ্গোদক একটু

মাথায় দিয়ে বসো তবে। ....নাম বলো মায়ের! মাধবী দেবী? বাঃ! গোত্র? মনু? এরকম কোনও গোত্রনাম তো শুনি নাই বৎস! পিতৃপুরুষের নাম বলো। পিতামহ?

—মানব।

—পদবী নাই? নিরুপাধিক? বেশ বেশ। তা, তৎপূর্বে? প্রপিতামহ?

—মানব।

—তৎপূর্বে?

—ইনিও মানব? বা বা বা। মাতৃকুলের নামগুলি জানা আছে বৎস? মাতামহ?

—মানব।

—নিরুপাধিক? প্রমাতামহ?

—মানব।

—তৎপূর্বে? বৃদ্ধ প্রমাতামহ? ইনিও মানবই হবেন নিশ্চয়! চমৎকার। তবে বলো বৎস—বিষ্ণুর্ ওম্ মনুগোত্রস্য প্রেতস্য মন্মাতুর মাধবীদেব্যা........পিতামহস্য মানবদেবস্য....... মাতামহস্য মনুগোত্রস্য মানবদেবস্য অক্ষয়স্বর্গকামঃ এতদ্ অন্নজলং শ্রীবিষ্ণুদৈবত যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।

ওতুলের প্রতিদ্বন্দ্বী

অতুল নিজেকে গুঁই বলে না, ইংরিজি বানান অনুযায়ী বলে গুইন। এতে অতুলের বাবার আপত্তি আছে যথেষ্ট, কিন্তু গুইন হিসেবে ছেলের দাপট অর্থাৎ সাফল্যে চমৎকৃত হয়ে তিনি এ বিষয়ে আব বিশেষ উচ্চ-বাচ্য করেন না। কেউ মিঃ গুইনকে ডাকতে এলে এখন তিনি বেশ গর্বের সঙ্গেই কবুল করেন এই মিঃ গুইন তাঁরই কুলপ্রদীপ, তিনি দেখছেন সে বাড়ি আছে কি না, ভারী ব্যস্ত মানুষ তো। অতুল মস্তান নয় কিন্তু। সে নিজেকে বলে মস্তানের বাবা। অর্থাৎ তাদের এলাকার মস্তানরা—খেঁদা, ন্যাড়া, বীরু এরা ওতুলদার পরামর্শ ছাড়া এক পা চলে না। খেঁদা-ন্যাড়াদের কবজায় রেখে অতুল পুরো এলাকাটাকেই কব্‌জায় রেখেছে বলা চলে। এই প্রতিপত্তি অবশ্যই একদিনে হয়নি। এমনি এমনিও হয়নি। প্রথমত, অতুলের শরীব স্বাস্থ্য ঠিক যে তুলনায় দশাসই, ঠিক সেই তুলনায় মোলায়েম তার গলার স্বর এবং আচার-ব্যবহার। যে পাবলিক রিলেশনস প্রতিভা তার বাপ-ঠাকুর্দা খদ্দের চরাতে চরাতে বহু জেনারেশন ধরে আয়ত্ত করেছেন, সেই দুর্লভ জনসংযোগক্ষমতা একরকম জন্মসূত্রেই তার হাতের আমলকি। অতি কৈশোর থেকে সে প্রথমে তার পাড়ার, তারপর তাদের এলাকার, তারপবে আরও বৃহৎ এলাকার যাবতীয় ঝগড়া-কাজিয়া মেটানো ইত্যাদি অভিভাবকগিরি করে এসেছে অত্যন্ত সফলভাবে। প্রথম প্রথম পাড়ার বড়রা তাকে 'জ্যাঠা ছেলে' বিশেষণে বিশেষিত করতেন। পরে ঠিক তাঁরাই বলতে আরম্ভ কবেন—'ওতুল বড় বিচক্ষণ ছেলে।' তাঁদের কারও ছেলে ঘোঁতন, কারও নাতি ট্যাঁপা, কারও মেয়ে বুঁচি এদের কেসগুলো অতুল সমুদয় জট ছাড়িয়ে একেবারে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দিত। সুতরাং প্রতিপত্তি অতুলের হবে না তো কি সুবিকাশ সরখেলের হবে? এর ওপরে অতুলেব একটা সাংস্কৃতিক অ্যাঙ্গল আছে। সে সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট তো বটেই। উপরন্তু গান কবতে পারে, বক্তৃতা করতে পারে, এমনকি কলমের জোরও তার আছে। বিশাল কালীপুজো এবং সরস্বতীপুজো হয় তাদের পাড়ায়। দুটি পুজোরই জাঁকজমক এবং পরবর্তী সাংস্কৃতিক উৎসব-সূচী আপনার আমার চোখ ট্যারা করে দেবার মতো। বিশ ফুট কালীপ্রতিমা বিসর্জনের সময়ে অতুল যখন তার প্রকাণ্ড সাদা কপাল তেল-সিঁদুরে চর্চিত করে, সিল্কের পাঞ্জাবির মধ্যে দিয়ে লাল, রোমশ বক্ষপট বিদ্যুচ্চমকের মতো দেখাতে দেখাতে শার্দুলবিক্রীড়িত ছন্দে চলে, এবং তাকে কেন্দ্র করে খেঁদা, ন্যাড়া, বীরু ও সম্প্রদায় প্রবল বিক্রমে স্ট্যাম্প-মারা বিসর্জনী নাচ নাচতে নাচতে তার সঙ্গ নেয়, তখন বিশফুটি কালীপ্রতিমাই পূজ্য ছিলেন, না হলুদসিল্কের ওতুলকৃষ্ণই সত্যিকারের পূজ্যপাদ ছিল বোঝা শক্ত হয়ে ওঠে।

তবে কোনও মানুষের পক্ষেই সব মানুষের মন রাখা সম্ভব নয়। জনপ্রিয়তার বত্রিশপাটি হো-হো হাসিব মাঝে মধ্যে দু-একটা ফোকলা দাঁতের ফাঁকি থেকেই যায়। কিছু হিংসুটে মানুষ বিসর্জনী মিছিলে সিল্কের বুকখোলা পাঞ্জাবি-পরিহিত ওতুলকৃষ্ণকে পুতুলকৃষ্ণ, বিপুলকৃষ্ণ ইত্যাদি বিকৃত নামে ডেকে নিজেদের মধ্যে মজা পেয়ে থাকে। কিন্তু

বেশির ভাগ ঝুল বারান্দা থেকেই সদ্য বয়ঃপ্রাপ্ত নারী-জনতা বাবা-মা, জ্যাঠা-কাকাদের চোখ এড়িয়ে অতুলদার এই উদ্দণ্ড নৃত্যপর শ্রীচৈতন্যরূপ বা প্রভুপাদরূপ দেখে পুলকিত হয়ে ওঠে। এই সময়টায় জেগে এবং ঘুমিয়ে তারা কত রকম স্বপ্ন দেখে। সে-সব কিশোরী তরুণীস্বপ্নের গোপনীয় ডিটেলের মধ্যে আমাদের না যাওয়াই ভালো।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা জলসার সময়ে ঘোষক বা ঘোষিকা অফ বম্বে ফেম থাকে, জনপ্রিয়তম লোকসংগীত গায়ক থাকে, নেচে নেচে গান-গাওয়া বিখ্যাত গায়িকা, সুন্দরী আবৃত্তিশিল্পী, সুকণ্ঠ শ্রুতিনাটানট ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হয়। সবচেয়ে বড় কথা পাড়ার উঠতি প্রতিভাদের অতুল এই সময়টায় সুযোগ করে দেয়। সুচন্দ্রা সান্যাল যে অবিকল আশা ভোঁসলেকে নকল করতে পারে, ট্যাঁপা ওরফে অরুময়কে যে কুমার অরু নাম দিয়ে অনায়াসে নামকরা আধুনিক-গাইয়েদের পাশে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যেতে পারে, ছোট্ট গেনি যে জাত-বাউলদের মতো নাচতে এবং গাইতে পারে এসব অতুলকৃষ্ণরই আবিষ্কার। সুচন্দ্রা সিনেমায় চান্স পেল বলে, গেনি তো সেই কবেই চিচিং-ফাঁক-এ ঢুকে বসে আছে। কুমার অরু 'তরুণদের জন্য'র জন্যে শিগগিরই অডিশন দেবে।

এই মরশুমটাতে এনতার প্রেমও হয়। পাড়ার কিশোরী-তরুণীরা পুজোয় বাবার বোনাস ভাঙানো মহার্ঘতম শাড়িটি পরে। রঙে-চঙে সুন্দরতম হয়ে ওঠার চেষ্টা করে, তারপর পরম অবহেলায় আয়রন করা চুল দুলিয়ে, পিন-করা আঁচল উড়িয়ে ওতুলদা, ন্যাড়াদা, বীরুদাদের ঝাপটা দিয়ে দিয়ে চলে যায়। মতামতের আদান-প্রদান হয়, জলসার নানা কাজের ভার পায় এরা, আর্টিস্টদের মনোরঞ্জন, খাবার-দাবার এগিয়ে দেওয়া, অটোগ্রাফের খাতা দফায় দফায় সই করানো, পেল্লায় দায়িত্ব সে সব। এবং এই সব চলতে চলতে আঙুলে আঙুল ঠেকে, কাঁধে কাঁধ। শাড়ির আঁচল খসে, কোমরের রুমাল থেকে উৎকট সুগন্ধ বার হতে থাকে। পাটভাঙা কাগজের পোশাকের মতো কড়কড়ে পাজামা-পাঞ্জাবি, পেখমধরা, ঘাড়ে কেয়ারি চুল, দু আঙুলের ফাঁকে পৌরুষ-ব্যঞ্জক সিগারেট। ওতুলদা তখন আড়চোখে কার দিকে চাইল রে? রূপার দিকে। ধ্যাত্, ও তো সোমালির দিকে। টিঙ্কু কিছু বলছে না। মুখ টিপে টিপে হাসছে। সে, একমাত্র সে-ই জানে ওতুলদা, ন্যাড়াদা, ইত্যাদিরা কার দিকে চাইল। কার দিকে আর চাইবে? এমন ফিগার, এমন ঠোঁট, এমন কাজলপরা চোখ আর এ শহরে দুটো আছে নাকি? টিঙ্কু আয়নায় নিজেকে যতই দেখে ততই নিজে নিজেই মস্ত্ হয়ে যায়। তাই বলে কি আর পাড়ার সব ছেলে মেয়েগুলির পাড়ার মধ্যেই বিলি-ব্যবস্থা হয়ে যায়? তা হয় না। তা হবারও নয়। এসব হল মরশুমি প্রেম। নতুন শীতের হাওয়ার কারিকুরি। কার সঙ্গে বিয়ে হল? না ন্যাড়া-গুণ্ডার সঙ্গে। মিসেস ন্যাড়া গুণ্ডা! ছ্যাঃ। মেয়েরা আজকাল আগের মতো রাম-বোকা আর নেই।

অনেক দিন খালি পড়েছিল শম্ভু উকিলের জবদগব বাড়িটা। অতবড় বাড়িটায় দুটি মাত্র মানুষ। খালি পড়ে থাকা ছাড়া একে আর কী বলে? শম্ভু উকিল মারা যাবার পর একতলা বাড়িটাতে রইল শুদ্ধ শম্ভু উকিলের আইবুড়ো বোন বিরিঙ্গি দুগগা, বা দুগগা দিদি, আগেকার দিনে হলে যাকে ইন্দির ঠাকরুণের মতো দুগগা-ঠাকরুণ বলে ডাকা হত। তো এই দুগ্গা

অতুলের সঙ্গে লড়ে গেল। অনেকদিনেব নজর ছিল অতুলের বাড়িটার ওপর। অনায়াসে একটা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র খোলা যায়। বিঘেখানেক জমিব ওপর একটেরে একতলা। চার পাঁচখানা বড়সড় ঘব। লাইব্রেরি, ইনডোর গেমস্, আড্ডা বা অফিসঘর, সব এক ছাতের তলায় হতে পাববে। খোলা জমিটা সাফ-সুফ করে ব্যাডমিন্টন কোর্ট, ব্যায়ামাগার, পাড়ার ছেলেমেয়েদেব নিয়ে ড্রিল-টিল, দবকাবমতো জলসাব আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা সবই এক জায়গায় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কত সুবিধে বলো তো? শম্ভু উকিলের ক্যানসারের যন্ত্রণা যতই বেড়ে ওঠে, অতুলকৃষ্ণদের হৃদয়ও ততই আশা উদ্বেল হয়ে উঠতে থাকে। ঠাকুবপুকুরে নিয়ে যাওয়া, শেষমেশ হিন্দুসৎকারের গাড়ি, ঠোঙাভর্তি খই-পয়সা, সাদা পদ্মের রিদ সবই ওরা করল। পাড়ায় বিবাট কবে শোকসভা হল। কনডোলেন্স। শম্ভু উকিল যে কত বড মহামানব ছিলেন, শ্রীঅরবিন্দ, বিবেকানন্দ, চিত্তরঞ্জনের মতো গুপ্তযোগী, দেশপ্রাণ, মহাপ্রাণ সেসব কথা জ্বালাময়ী ভাষায় অতুল সবাইকে বুঝিয়ে দিল। অনেকেবই চোখে জল। কারও রুমাল ভিজে সপসপ করছে, কেউ থাকতে না পেরে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলছে, খালি দুগ্‌গা মুখ বেঁকিয়ে, পানেব পিক ফেলে বললে—'ঢ-অ-অ-ং। বক্তিমে শুনে আর হেসে বাঁচিনে।' সুতরাং দুগ্‌গার হাত থেকে শম্ভু উকিলের বাড়িটা চটপট উদ্ধার করা আর হয়ে উঠল না। শম্ভু উকিলকেও মরণোত্তর পল্লীরত্ন, কি দানবীর উপাধি দেওয়া গেল না।

দুগ্‌গা রক্ষিত আবার আরেকটি কম্মো করলে। একঘব ভাড়াটে এনে বসালে। অতুল কত করে বোঝালে আজকালকার দিনে সব আইন ভাড়াটেদের পক্ষে। ভাড়া-বসানো আর খাল-কেটে কুমিব আনার মধ্যে কোনই তফাত নেই। ওই ভাড়াটে দুগ্‌গাদিদি শেষ পর্যন্ত ওঠাতে পারবে না। এই বাজাবে লাখ-লাখ টাকার জমি দুগ্‌গাদিদির হাতছাড়া হয়ে যাবে। দুগ্‌গা রক্ষিতের ওই এক কথা। 'তোদেব গভভে যাওয়াব চেয়ে ববং ভাড়াটেতেই গিলুক। তোরা আমাকে দূর করে দিবি। ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরুবি। তাস পিটে, টাসা পিটে, হল্লা করে নরক গুলজার করে তুলবি। তার চেয়ে ভদ্দরলোক তার পুত-পরিবার নিয়ে শান্তিতে থাকুক। নিজের ঠেঁয়ে নিজের মতো। অকালকুষ্মাণ্ডর দল, তোদের তাতে কি? দাদা নেই, আমার এখন নিজের খবচা-খর্চা নিজেবই চালাতে হবে। বুঝলি? যা এবার পালা।' অতুল যাদের দাঁতে কাঁকরের মতো ফুটে থাকে সন্দেহ নেই দুগ্‌গা রক্ষিত তাদেবই একজন।

ভাড়া তো হল। ঝাঁকড়া চুল, মোটা চশমা পরা ধারালো চেহারার এক যুবক, তার পেছন পেছন মেরুদণ্ড সিধে এক বিনুনি করা এক রোগা যুবতী এবং দুটি প্রায় এক সাইজের ভারি-ভুরি বাচ্চা এক টেম্পো মাল নিয়ে এসে নামল। দু চাব দিনের মধ্যেই শুনতে পাওয়া গেল—এ ভদ্রলোক যে সে নয়। উদীয়মান কবি আর্যশরণ ঘোষ। কবি আর্য ঘোষের আবার প্রধান বৈশিষ্ট্য সে নাকি লড়াকু মানুষ। শুধু পদ্যই লেখে না, নানারকম সমাজসেবামূলক কাজ কম্মো করে থাকে। যুবতটি তার স্ত্রী নয়, বোন। আর্য ঘোষ আসবার কয়েক মাসের মধ্যেই শম্ভু উকিলের বাড়ির সংলগ্ন জমির চেহারা ফিরতে লাগল। ওরা

নাকি ফুল ভালোবাসে। মাথাভর্তি ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল নিয়ে আর্যশরণ আর তার বোন যখন চুবড়ির মতো ডালিয়া আর চন্দ্রমল্লিকার দেখাশোনা করে, পাঁচ রকমের জবা আর সাতরকমের গোলাপ গাছে সার দেয়, তখন কাছাকাছির ঝুলবারান্দায় উঁকিঝুঁকি চলে। রূপা বলে—'ফ্যানটা, বল টিঙ্কু।' টিঙ্কু বলে—'কোনগুলো? ডালিয়া না ক্রিসেনথিমাম না গ্ল্যাডিওলাস?' রূপা মুচকি হেসে বলে—'তোর মাথা।' টিঙ্কু বলে 'আই সি।' দুজনেই দুজনকে বোঝার মজায় হাসতে হাসতে ভেতরে ঢুকে যায়।

সেবার কালীপুজোর ফাংশনে সভাপতি করা হল আর্যশরণ ঘোষকে। অতুলই করল। অতুল বড় উদার চরিত্রের ছেলে। একথা বলতেই হবে। সে গুণের আদর কবতে জানে। তা সেই সভার সভাপতির ভাষণ, এলাকাকে কাঁপিয়ে দিল। সে কি কবিতা, না জ্বলন্ত ফুলঝুরির মতো শব্দঝুরি, সে কি উপদেশ না অনুপ্রেরণা পাড়ার লোক ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারল না। কিন্তু তারা একেবারে বোওল্ড হয়ে গেল। এমন অপরূপ করে যে কেউ শক্তিপুজোর ব্যাখ্যা করতে পারে, এমন কাব্যময় ভাষায় অনর্গল বলে যেতে পারে কাউকে মুহূর্তের জন্যেও 'বোর' না করে, বলবার সময়ে কারুর চেহারা যে এমন প্রদীপ্ত মশালের মতো হয়ে উঠতে পারে, এলাকার লোকের অভিজ্ঞতার মধ্যে এসব ছিল না। সেবার কালীপুজোয় যা হবার হয়ে গিয়েছিল। সরস্বতীপুজো হল একেবারে অন্যরকম। স্থানীয় আর্টিস্ট সুকেশ মিত্তিরকে দিয়ে কাগজের প্রতিমা হল! বাসন্তী রঙের মণ্ডপ হল। পলাশ গাঁদায় ছেয়ে গেল বেদি। আলপনা হল মনে রাখবার মতো। পুষ্পাঞ্জলি দিতে এল দফায় দফায় সব্বাই। সবোদ, সেতার, বাছা বাছা গান, এবং সন্তুর ছাড়া আর কিছু বাজল না, তা-ও মৃদুস্বরে। শ্বেতপদ্মাসনা দেবী স্তোত্র গানের মধ্যে দিয়ে শান্তভাবে ঘটবিসর্জন হয়ে গেল। সবার মনে হল এমন পুজো আর কখনও হয়নি, আবার হবে কি?

পাড়ার সাংস্কৃতিক কমিটির চেয়ারম্যান অতুলকৃষ্ণ। তাই বলে স্থায়ী নয়। একেবারে গণতান্ত্রিক উপায়ে, সবাইকার মতামত নিয়ে ব্যাপারটা হয়, তবু জানা কথাই অতুলই প্রেসিডেন্ট হবে। এবার আশ্চর্যের বিষয়, পাড়ার কিছু মাতব্বব ব্যক্তি বললেন—'আর্যকে করা হোক না কেন? ছেলেটার এলেম আছে।' ততোধিক আশ্চর্যের বিষয়, ন্যাড়া, মস্তান ন্যাড়া, ওতুলদার ডান হাত ন্যাড়া, যাকে বেপাড়ায় ন্যাড়া গুণ্ডা বলে উল্লেখ করা হয়, সেই ন্যাড়া এতে সায় দিল—'সত্যিই তো ওতুলদা কদ্দিক সামলাবে? তবে হ্যাঁ, ঝামেলা পোয়াতে হয় সেক্রেটারিকে, আর্যদা না হয় সেক্রেটারি হোক, ওতুলদা যেমন প্রেসিডেন্ট ছিল প্রেসিডেন্ট থাক।' সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি পাস হয়ে গেল। ক্লাবের খাতা-পত্তর, বিল বই, অডিট-রিপোর্ট, সুভেনিব এভরিথিং চলে গেল আর্যশরণের খপ্পরে।

সমস্ত ঘটনাটার পর ন্যাড়াকে ডেকে রক্তচক্ষে অতুল বলল—'এর পর ফের ওতুলদা আজকে একটু মাল খাওয়াও বলিস, বলতে আসিস।'

ন্যাড়া অবাক হয়ে বলল—'যাচ্চলে, তুমিই তো প্রেসিডেন্ট, মানে সব্বেসব্বা রইলে। আযযদা খালি খেটে মরবে। আসলে কি জানো, পাবলিক যা চায় মাঝেমধ্যে তা দিতে হয়, নইলে শালা ডেমোক্র্যাসিও মচকে যাবে, পাবলিকও খচে যাবে। রূপা-টিঙ্কুরাও আযযদাকে চাইছে। দাওই না চান্স একবার মাইরি।'

মাসখানেকের মধ্যে খাতা-তহবিল সব মিলিয়ে-টিলিয়ে আর্যশরণ একদিন অতুলকৃষ্ণকে ডেকে পাঠাল। বেশ সুগন্ধি চা খেতে খেতে, খাওয়াতে খাওয়াতে বলল—'আচ্ছা অতুল, তুমি কী করো?'

—'কী করি? মানে? দেখতে পান না কী করি আর কী না করি?'

—'এগজ্যাক্টলি। দেখতে পাই। অতুল, আজকালকার দিনে কেউ আশা করতে পারে না একটা মানুষ দিবারাত্র আর পাঁচজনের জন্যে বিনামাশুলে খেটে যাবে। দিস ইজ টু মাচ। তুমি, ন্যাড়া, খেঁদা, বীরু এবং আরও যারা ক্লাবের বিভিন্ন কাজ সারা বছর ধরে করে যাও, অথচ যাদের কোনও আয় নেই, তাদের একটা লিস্ট করে ফেলা যাক। জনা ছয় সাতের বেশি হবে না বোধহয়। আমার প্রস্তাব তাদের প্রত্যেককে ক্লাবের হোলটাইমার হিসাবে কিছু মাসোহারা দেবার ব্যবস্থা করা যাক।'

অতুল বলল—'দে দ্দেখুন আর্যদা, এটা আমাদের অপমান করা। ন্যাড়া বীরুদের অপমান করা। আমরা যেটা করছি সেটাকে বলে মানবসেবা, কথাটা শুনেছেন?'

আর্যদা প্রশান্তমুখে বললেন—'শুধু মাসোহারা নয়, পুজো বাবদ সুভেনির ইত্যাদির জন্য যে যত বিজ্ঞাপন আনবে তার কিছুটা পার্সেন্টেজও কমিশন হিসেবে তোমাদের দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হোক। হিসেবের খাতায় যে বিরাট বিরাট গরমিলগুলো রয়েছে সেগুলোকে তোমাদের প্রাপ্য বকেয়া বলে অ্যাডজাস্ট করে নেওয়া হবে। তাহলেই হল। নইলে এইসব খাতাপত্তর, সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত টাকার থেকে ট্যাক্স নিয়ে তৈরি তহবিল, এসব প্রহসন হয়ে যায় অতুল।'

আর্যশরণের পরের চালটা এল আরও সাংঘাতিক। সে কালীপুজোর প্রস্তুতিপর্বে বলল—বিশ ফুট প্রতিমা করে প্রতিবছর বিসর্জনের সময় ওভারহেড তার-কাটা সে বড় বিশ্রী। দশ ফুট প্রতিমা আরও অনেক সুন্দর হবে। কুমোরটুলির নারায়ণচন্দ্র পালকে দিয়ে করাও, অপূর্ব শ্যামামূর্তি করে দেবেন। আর রাস্তা আটক করে লরি, টেম্পো, ট্যাক্সি, প্রাইভেট কার, রিকশা এদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় কোরো না। মানুষকে এভাবে প্রেশারাইজ করা ঠিক না। ভয়ে কেউ কিছু বলতে পারে না। কিন্তু আমি জানি গতবছর মুদির দোকানের তারাশংকরকে সাড়ে চার হাজার চাঁদা দিতে বলেছিলে বলে সে বেচারির স্ট্রোক হয়ে যায়। এগুলো ঠিক না।'

কালীপুজোর রাতে একটি জম-জমাট কারণসভা বসত। সেটাও এবার বসল না।

অতুল যেমন উদারতায় বশিষ্ঠ, তেমনি বুদ্ধিতেও আবার সত্যি-বৃহস্পতি। সে সাপের লেজে পা পড়ার অপেক্ষাটিতেই ছিল। খ্যাঁদা, বীরু, নেড়ার সঙ্গে তার গোপন বৈঠকগুলো ঘনঘনই বসতে লাগল।

টিঙ্কুর বাবা রতনমণি ঘটক, রূপার বাবা সারদাচরণ সরকারকে ডেকে বললেন—'সারদা, এসব কি শুনছি?'

সারদাচরণ বললেন—'শুনেছো? তুমিও শুনেছো তাহলে? ছোকরা ভদ্দরলোকের মতন থাকে.....' রতনমণি বললেন—'শুনব না, মানে? পরস্ত্রী ফুসলিয়ে এনে বোন সাজিয়ে সবার চোখের ওপর বাস করবে, আর শুনবো না?'

—'কী কেচ্ছা, কী কেলেঙ্কারি, শেষকালে কি সেই লিভিংটুগেদার না কী বলে সেসব ব্যভিচার এইখানে, এই পাড়াতেই আরম্ভ হল?'

সুচন্দ্রার মা একদিন শম্ভু উকিলের বাড়ির ভেতর গিয়ে কখানা শোবার ঘর দেখে এলেন। রিপোর্ট হল, একটা ডবল বেড। আর একখানা তক্তপোশ। বেশ লম্বা চওড়া, ইচ্ছে করলে দুজনেও শোয়া যায়।

এক রবিবার সকালে হতভম্ব আর্যশরণ দেখল তার বাড়ির সামনের বাগান তছনছ করতে করতে এগিয়ে আসছে বেশ বড়সড় একটা মারমুখী জনতা। তাদের মুখে অসন্তোষ, ঘৃণা, জিভে অকথ্য গালাগাল। একেবারে সামনে কিছু প্রৌঢ়, গুটিকয় বৃদ্ধ। তাঁরা বললেন, তাঁদের চক্ষুলজ্জা, মানসম্ভ্রম ইত্যাদি অনেক কিছুর বালাই আছে। হঠকারিতা তাঁরা প্রাণ গেলেও করতে পারেন না। তাঁরা তাকে কিছুই বলবেন না। শুধু এই ভদ্রলোকের পাড়া ছেড়ে আর্যশরণ অন্যত্র উঠে যাক। যে সব জায়গায় এসব চলে, যাক না সেখানে। সাতদিনের মধ্যে যদি না যায়, তাহলে পরিণামের জন্যে তাঁরা দায়ী থাকবেন না। ছেলেপুলে নিয়ে ভদ্রপাড়ায় ঘর করেন কি না সকলে। ছেলেদের এড়ুকেশন, মেয়েদের বিয়ে সবই তো তাঁদের ভাবতে হবে। জনতার মধ্যে অতুল, কিম্বা তার সাকরেদরা লক্ষণীয়ভাবে অনুপস্থিত ছিল।

আর্যশরণ ঘটনার ল্যাজামুড়ো কিছুই বুঝতে পারছিল না। কিন্তু দুগ্গা এ পাড়ারই মেয়ে। সে ঠিকঠাক বুঝেছিল। ভাঙাবাড়ির ন্যাড়া ছাতে উঠে সে পরিত্রাহি চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'জানিস, অলপ্পেয়েরা গীতুকে গীতুর শ্বশুরবাড়ি থেকে যতুকের জন্যে পুড়িয়ে মারতে চেষ্টা করেছিল, ওর বাপ জেঠা অনেক কষ্টে উদ্ধার করে এনেছে, জানিস রাস্তায় দু দুবার অ্যাসিড বালব ছুড়েছে, ফস্‌কে গেছে তাই। আর ওর পিসির দ্যাওর, যদি বিপদের সময়ে মেয়েটাকে আশ্রয় দিয়ে থাকে তো বেশ করেছে, খুব করেছে, ডাইভোর্স মামলা হয়ে গেলে যদি ওকে বিয়ে করে তো বেশ করবে, খুব করবে, আমার বাড়ির মানুষ। সে কী রকম আমি জানি না তোরা জানবি ঘোড়ার ডিমের দল? এক্ষুনি এখান থেকে বিদায় হ', আমার সম্পত্তির ক্ষেতি করিছিস, আমি শম্ভু উকিলের বোন, হরিহর উকিলের বেটি, তোদের নামে মামলা রুজু করব। ক্ষেতিপূরণ দিতে তোদের ইয়ে বেরিয়ে যাবে।'

জনতা আস্তে আস্তে পিছিয়ে গেল। দুগ্‌গা তখনও চেঁচিয়ে চলেছে—'এসব ওই ওতুল হতচ্ছাড়ার কাণ্ড। কালীপুজোর ফণ্ড নিয়ে সোমবচ্ছর নেশাভাঙের ব্যবস্থা চলছিল। আর্য সেটি বন্ধ করেছে কি না ।'

পরের ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত। কোনও জনতাকে মারমুখী করে তুললে, সে যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তো আরেকটি লক্ষ্য সে বেছে নেবেই। শক্তিটার খরচ হওয়া চাই তো। জনতার মধ্যে শুধু সারদা-রতনমণির মতো প্রৌঢ়ই ছিল না, বেশ কিছু তাগড়া জোয়ানও ছিল যারা কুৎসা শোনবার আগে আর্যশরণের ভক্ত হয়ে পড়েছিল। এরা ফিরে গিয়ে চাঁদমারি করে অতুলকে। আর্য এবং তার বউদির ভাইঝি গীতা মাঝে পড়ে না থামালে অতুলকে হাসপাতালে যেতে হত। আপাতত সে শুধু নাক-আউট হয়ে ছাড়া পেল।

কিন্তু আর্যশবণ দুগ্গাদিদিব শত অনুবোধেও, পাডাব মাতব্ববদেব হাজাব ক্ষমাপ্রার্থনাতেও ও পাডায় আব বইল না। বলল—'গীতাব ছোট ছোট ছেলে দুটিব পক্ষে অভিজ্ঞতাটা বড মাবাত্মক হয়েছে। গীতাও মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছে।' একদিন সকালে শম্ভু উকিলেব শূন্য বাডি যেমন হঠাৎ ভবে উঠেছিল চায়েব গন্ধে, ফুলেব শোভায় উৎসুক যুবক যুবতীদেব কলকণ্ঠে, বাচ্চাদেব খেলাব আওয়াজে আব একদিন সকালে তেমনি আবাব পূর্ণ বাডি শূন্য হয়ে গেল। বাগানময় শুধু সটান শুয়ে বইল কিছু মবশুমি ফুলগাছেব মৃতদেহ। পা দিয়ে মাডিয়ে যাওয়া থ্যাতলানো টোমাটো আব বেগুন। ঘবগুলোব মধ্যে দু'চাবটে ছেঁডা পাতা, ফেলে যাওয়া ক্ষয়াটে অ্যালুমিনিয়ামেব ঢাকনি, খালি শিশি বোতল, ফাটা বল আব ডাঁই কবা খববেব কাগজ।

অনেক অনে-ক দিন হয়ে গেছে। প্রতিভাবান অতুল তাব পাডাতে আবাব আগেব প্রতিষ্ঠা ফিবে পেয়েছে। যদিও কালীপুজোব সমাবোহেব দিন আব কখনোই সেভাবে ফেবে নি। ন্যাডা, খ্যাদা এখন সোজাসুজিই বাজনৈতিক নেতাদেব মাসলম্যান। বাঁক একটা বহুতলেব কেয়াবটেকাব। অতুল তাব বাবাব গয়নাব দোকানে নিয়মিত বেবোচ্ছে। বেশ জমাট প্রতিপত্তিঅলা ভবিষ্যত ধনী ভদ্রলোক। বাবাব আমলেব বাক্সসে তেলখাওযা অ্যামবাসাডবটাকে বিদায় কবে সে একটা ঝা চকচকে দামী মাকতী ভ্যান কিনেছে। ধবধবে শাদা। বধমানেব ভেতব দিকে গাঁয়েব চাষবাস দেখতে গিয়েছিল, ফেববাব সময়ে কাইতিব কাছাকাছি একটা মাঠে দেখল প্রচুব ভিড জমেছে এবং ভিডেব মধ্যে থেকে ঝাঁকডা চুলের মধ্যে সাদা সুতোব ছডাছডি এক পবিচিত চেহাবাব ভদ্রলোক মোটা ফ্রেমেব মধ্যে অন্যমনস্ক চোখ নিয়ে বেবিয়ে আসছেন গাডি থামিয়ে অতুল তাব গিলেকবা পাঞ্জাবিব হাতা গুটিয়ে নেমে এল। সে খুবই উদাব স্বভাবেব মানুষ।

– 'আযদা নাথ কেমন আছেন?'

হাসি মুখে ভদ্রলোক বললেন আবে ... না চেনা লাগছে খুব, প্লেস কবতে পাবছি না তো ঠিক ... ।

'আমি অতুল। সদব বক্সাব অতুলকৃষ্ণ ওইন।'

'অতুল। অতুলকৃষ্ণ ওহো সেই লাইব্রেবি কবতে তেত্রিশ হাজাব টাকা দিয়েছিলেন নাথ' বড বড চোখ কবে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাব দিকে তাকিয়ে থাকেন আযশবণ। আত্মগত বলতে থাকেন – টাকাব ' অ্যামাউন্টটাই বড কথা নয় অতুলবাবু, দেবাব ইচ্ছেব মূল্যটা টাকাব মূল্যেব থেকে অনেক বেশি। আমি আজকেব পথনাটকে এটাকেই আমাব থিম কবেছিলাম। গ্রামেব লোকে বেশ নিল কিন্তু ভাবী এনজয় কবল, দেখি আবাব আমাব গ্রুপেব ছেলেমেয়েবা গেলো কোথায় গো ... আসছি।

অতুল দেখল, আর্যশবণ যাব তাবে তাব সঙ্গে জডিত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত ঘটনাবলি বেমালুম ভুলে গেছেন।

দীপশিখা

নিফটের কোর্সটা শেষ করেই বেগম বম্বে চলে গেল। রাহুল আগেই দিল্লি গেছে। রানা জামনগর। সপরিবারে। শ্রুতি তার বউ এবং দিয়া তার পুঁচকি-সহ। রাজেন সমাদ্দারের নিজেকে কেমন অপরাধী-অপরাধী লাগে। সুমিত বাড়ি ফিরলে তিনি নিজেকে সরিয়ে নেন। তাঁর স্ত্রী তপতীর অতশত নেই। প্রথমত তিনি রাজেনবাবুর মতে বিশ্বাসী নন।

বলে থাকেন—'যখন আমরা বিয়ে করেছিলাম, কার ভরসায় করেছিলে? কেউ কি দাঁড়িয়েছিল? না দাঁড়াবার মতো কেউ ছিল? প্রায় চল্লিশ বছর কাটিয়েছি কার ভরসায়? অসুখ-বিসুখ কি করেনি? তোমার অ্যাকসিডেন্ট, আমার সূতিকা, সুমিতের তিনবার টাইফয়েড, জিমির রক্ত-আমাশা এবং শেষ কালে র‍্যাবিজ কে সামলে দিয়েছে? আমরাই তো!'

জিমি নামে গতাসু অ্যালসেশিয়ানের বিভিন্ন মুডের ল্যামিনেটেড একে সাত সাতে এক ফটোগ্রাফাবলির দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন রাজেনবাবু। মুন্নি আবার বাপের বাড়ি গেছে। এবার পুরো সাতদিনের জন্যে। যাবার আগে শ্বশুরে-বউয়ে যে কথোপকথন হয়েছিল, তা এইরকম—

—বাবা, রোববারে আমি রামরাজাতলা যাচ্ছি।

—বেশ তো, দুজনেই যাচ্ছ তো?

—হ্যাঁ, একটু সকাল-সকালই যাব। ব্রেকফাস্ট করেই বেরিয়ে পড়ব।

—ভালই তো। ফিরোও সকাল সকাল।

—ও ফিরে আসবে, রাতের খাওয়া তাড়াতাড়ি খাইয়ে দেবে। আমি তো এখন থাকব।

—থাকবে? ক' দিন?

—দিন সাতেক তো বটেই।

—তোমার বাবা মা ভালো আছেন তো?

—হ্যাঁ-আ।

—রুনি?

—রুনি ঠিক আছে।

—বাপের বাড়ির ওদিকে কারও বিয়ে-থা নাকি?

—না তো! ভাদ্রমাসে বিয়ে হয় না তো বাবা!

—তাই তো, তবে?

—তবে কী?

—থাকতে যাচ্ছ যে?

এই সময়ে তপতী এসে পড়েন।

—রামরাজাতলায় মুন্নির বাবা-মা-ছোট বোন থাকে। বুঝলে? মুন্নি এক বছর আগে পর্যন্ত ওখানেই ছিল, তোমার এই মান্টিস্টোরিড-এর নাম জানত না ও। ওকে জিজ্ঞেস করছ ও কেন রামরাজাতলা যাবে? বাঃ।

আসলে বাজেনবাবু তো রাজেনবাবুর মতো করেই ভাবেন। মুন্নির মতো করে ভাবতে হবে এ কথা জানার প্রয়োজন তো তাঁর এতদিন হয়নি। ছেলে বড় হয়েছে, ভাল চাকরি করছে, তার জন্যে ভারি মিষ্টি ছেলেমানুষ বউ এনেছেন, সে পায়ে একহারা নূপুর পরে মৃদু একটা রিনঠিন শব্দ তুলে ঘুরে বেড়িয়ে এত বড় ফ্ল্যাটটার মধ্যে গান এনেছে, এতদিন রাজেনবাবুর নিজেকে একটা নিতান্ত কেজো কেঠো মানুষ মনে হত। এখন মনে হয় তিনি একজন বাবা, তাঁকে মেয়ের ফরমাশমতো চকোনাট্‌স আনতে হবে। রুনুঝুনু চুল ঝুলিয়ে সে কী এক নাম-না-জানা লোশনের সুরভি ছড়াতে ছড়াতে তাঁদের টেবিলে চা পবিবেশন করবে, টোস্টার থেকে লাফিয়ে ওঠা রুটির পিসগুলোকে সংগ্রহ করে জিজ্ঞেস করবে— 'বাবা, আজকে মাখন দোব, দিই না দিই?' মুন্নি তো তাঁর বউমা, বড় জোর তাঁদের। মুন্নির বাবা মা বোন তারা তো মুন্নির অতীত, সে অতীতকে মুন্নি ইরেজার দিয়ে মুছে ফেলে চলে এসেছে তাঁর ছেলে সুমিতের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে। তিনি নিয়ে এসেছেন নিজে সঙ্গে করে। রামরাজাতলার বেয়াই-বেয়ানকে একগাল হেসে তিনি কি বলেননি—আপনাদের সব ভালো। দই ভালো, ক্ষীর ভালো, রাবড়ি ভালো, নতুনগুড়ের তালশাঁস ভালো, আপ্যায়ন ভালো, ব্যবস্থাপাতি ভালো, কিন্তু সবার চাইতে ভালো আপনাদের এই মেয়েটি। তা সেই মেয়ে তো এখন তাঁর। তার আবার অন্য বাবা-মা কী? বোন কী? বাড়ি কী? সাতদিন শুধু-শুধু থাকা কী?

এর চেয়েও তিনি অবুঝ হন সুমিতের রামরাজাতলায় থাকার ব্যাপারে। সুমিত যে প্রায় তার গোটা স্কুল-জীবন হস্টেলে কাটিয়েছে বাবার বদলির চাকরির সুবাদে, সে সব কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে তিনি বলে থাকেন—নিজের বাড়ি ছাড়া আবার অন্য কোথাও থাকা কী? বাড়ির ছেলে বাড়িতে থাকবে। আমি কখনও শ্বশুরবাড়ি থাকিনি।

তপতী বলেন—তোমার কি শ্বশুরবাড়ি ছিল?

—বাঃ, জ্যাঠাশ্বশুর কি শ্বশুর নয়?

—একরকমের শ্বশুর নিশ্চয়ই, কিন্তু বাবা-শ্বশুর নিকটতর এটা তো মানবে? রাজেনবাবু যখন যুক্তিতে হেরে যান, তখন চুপ করে যান। সুতরাং তিনি কথাটি বলেন না। কিন্তু তাই বলে তাঁর অন্তরের বিদ্রোহ কি যায়? যায় না। অথচ সুমিত কতক্ষণই বা বাড়ি থাকে? সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে বেরিয়ে যায়, ফিরতে ফিরতে সাড়ে সাত, আট। রাতেব খাওয়াটা সবাই এক সঙ্গে হয়। শনি-রবিবার সব, ওদের কিছু না কিছু থাকে—এর বাড়ি, ওর বাড়ি, এগজিবিশন, মেলা, গানের জলসা, তাঁদেরও থাকে। যে রবিবার বাড়ি থাকে সুমিত, ঘুমোয়, সারা দিন ঘুমোয়, বিছানায় কাদা কাদা হয়ে থাকে। তার চা ঘরে যায়, দুপুরবেলা কোনওমতে চারটি খেয়ে ম্যাগাজিন নিয়ে আবার গড়ায়, সন্ধে হলে টিভি খুলে বসে গেল। তা সত্ত্বেও তার প্রিন্সটন, মেরিল্যান্ড আর আইওয়া যাবার তিনটে চান্স তিনি নিতে দেননি। সোজাসুজি কি আর বলেছেন? বলেছেন এটা ভাল না, ওটা সুবিধে হবে না। ওজর তুলেছেন এখান থেকে আর একটু এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করে যাওয়া ভাল নইলে এশিয়ানদের ওরা যত পারে চেপে রাখবে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

লিফটে সৌমিত্র শেঠের সঙ্গে দেখা। বলল—শুনেছেন?

—কী শুনব?

—উদয়ন সিনহার মেয়ে বেগম বম্বে চলে গেল। ফ্যাশন ডিজাইনিং পড়ছিল। দুর্দান্ত রেজাল্ট করেছে। বম্বেতে ফার্দার কোর্স করবে। তারপর নো বডি নোজ হাউ হাই শি উড সোর, স্কাই ইজ দা লিমিট।

উদয়ন সিনহা আর তাঁর স্ত্রী বুলা এ বিল্ডিং-এর সবচেয়ে সুন্দর দম্পতি। শ্বেত পাথরের মতো রং বুলার, শাদা শাড়ি পরলে মনে হয় সরস্বতী প্রতিমা। উদয়ন পুং জগতের লেটেস্ট ফ্যাশন? কাঁচাপাকা দাড়ি, এক ঝাঁক কাঁচা পাকা চুল, লম্বা শিথিল, যাকে বলে লুস-জয়েন্টেড চেহারা। শীতকালে ব্লেজার পরে। ওরা বরাবরই খুব লিবার‍্যাল টাইপের, রাহুলকে নাকি নিজে সিগারেট ধরিয়েছিল। রাহুল ওর ছেলে। এক দিন ডোভার লেন রমণী চ্যাটার্জির ক্রসিংয়ে বন্ধুদের নিয়ে ফুঁকছিল, বাবার গাড়ি সামনে দিয়ে চলে যেতে লুকোতে পথ পায় না। রাত করে বাড়ি ফিরে দেখল—ডিনারের আগে ককটেলের ব্যবস্থা।

—হাফ পেগ দিয়েছি আজ, দ্যাখ খেয়ে কেমন লাগে।

বেগম বলল—ফ্যানটাসটিক বাপি, আর হাফ দেবে না কি?

—আজ থাক। ভাল জিনিস। খাবি, খাবি না কেন? তবে রয়ে সয়ে, বুঝে সুজে, আফট্রল ইনটক্সিক্যান্ট তো! আগুন নিয়ে খেলা করতে নেই।

ডিনারের পরে ছেলের হাতে একটা ক্যাপস্টান ধরিয়ে দিয়ে বলে—দ্যাখ দিকি, বেশ কড়া লাগে কি না! তবে কি জানিস সিগারেটে ক্যানসারের ইনসিডেন্সটা সাঙ্ঘাতিক বেড়ে যাচ্ছে, বড় মামাকে তো দেখলি, গলাটা ওপন, কথা বলতে পারে না, খেতে পারে না, অসহ্য যাতনা, ওই ভাবে সতেরো মাস, প্রাণ কিছুতে যায় না। মেজকার মানে তোর মেজদাদুর হার্ট অ্যাটাক হয়ে চলে গেল দুম করে, চেইন স্মোক করত। আমি তো আজকাল কমাতে কমাতে তিনটেয় দাঁড় করিয়েছি। যা করবি ভেবে করবি। র‍্যাশলি কি ব্রাভাডো দেখাবার জন্যে করবি না। লাইফ ইজ নট আ প্লে থিং। তোর লাইফ তোর। তোর ডিসিশন তোর। বাট ওয়ান্স ইউ টেক ইয়োর ডিসিশন ডোন্ট কীপ ডাম্পিং ইয়োর প্রবলেমস অন মি। তার মানে কি তোকে হেলপ করব না, তোর বিপদে পাশে দাঁড়াব না? নিশ্চয়ই দাঁড়াব, কিন্তু যদি শুধু-মুদু বীরত্ব দেখাতে গিয়ে চেইন স্মোকার কি ড্রাংকার্ড কি ড্রাগ-অ্যাডিক্ট হয়ে যাস, তবে বলব মাফ করতে হল রাহুল, এর মধ্যে আমি নেই। সেন্ড্ ইয়োর এস ও এস টু সামবডি এলস।

উদয়ন এগুলো বলে বেশ তৃপ্তি অর্থাৎ রেলিশ নিয়ে। রাজেনবাবুর অভিজাত ধরনধারণ, মৌনতা, গাম্ভারি মেজাজ এ সবের জন্য তাঁকে ওরা বলে সার রাজেন।

উদয়ন বলেছিল, কী বলেন সার, ঠিক বলিনি। দা বিগ ব্যাড ওয়ার্ল্ড ইজ ওয়েটিং জাস্ট রাউন্ড দা কর্নার টু গালপ দেম। এইটুকু সাইরেনের বেশি আমরা আর কী বাজাতে পারি?

সেই উদয়নের বেগমও উড়ে গেল। মেয়েদের বাপ-মায়েরা ছেলের চেয়েও বেশি ভালোবাসে যদি তাদের স্বাস্থ্য এবং চেহারা ভালো হয়। অর্থাৎ বিয়ের জন্য এক্সট্রা ভাবনা তারা না ভাবায়। বেগম রোগা হলেও স্বাস্থ্য ভালোই ছিল। মুখটিও যার-পর-নাই মিষ্টি। স্কুল পাশ করার পর থেকেই ভালো ভালো সম্বন্ধ আসছে। কিন্তু বেগম নিজের কেরিয়ার গড়তে চায়। মেঘনাদ সরণি থেকে সল্টলেক নিফটেব কোর্স নিতে গিয়ে বেগমকে প্রচুর কষ্ট স্বীকাব করতে হয়েছে। যাতায়াতেই অর্ধেক এনার্জি কাবার। কুচকুচে কালো হয়ে গিয়েছিল শেষেব দিকে মেয়েটা। তাব মা এ নিয়ে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করলে সে বলে—তা হলে কী করতে বলো আমায়? কালো হয়ে যাচ্ছি বলে পড়াশোনা ছেড়ে দেব? রূপটান মেখে বাড়িতে বসে দিবানিদ্রা দেব না কি?

রানা অংশুমানবাবুব একমাত্র সন্তান। আর একমাত্র দুমাত্র ছাড়া আজকাল আব কার বাড়িতেই বা আছে? থাকলে তাকে জাতে ঠেলা হবে। চার ছেলে মেয়ে? দাদা করেছেন কী? রানা ছেলেটি ব্রিলিয়ান্ট। তা পড়লি তো পড়লি ইলেকট্রনিক্স যাতে নাকি কলকাতার আশেপাশে মোটে চাকরিই নেই? ক্যাম্পাস ইনটারভিউয়েই চাকরি, তার পরই তেইশ বছর বয়সে বিয়ে, ফার্স্ট ফ্লাইটেই বম্বে, ভাবতেব কর্মাশিয়াল ক্যাপিটাল, তারপর অংশুমানরা আশা করেছিলেন ছেলে কাছাকাছি আসবে। হল না জামনগর। নাতনিকে হাতে করে গড়ে পিটে ছেলে-বউয়ের কোলে চড়িয়ে দিয়ে বিমর্ষ মুখে হাসি ফুটিয়ে বাড়ি ফিরলেন অংশুমান আর রীনা। এঁবা রাজেনবাবুদেব মাল্টি স্টোরিড-এর পাশে একটি বাগানওলা দোতলা বাড়িতে থাকেন। সেই থেকে অংশুবাবুর বাগানের শখ ধরল। বেশ চমৎকার ঘাসের লন করেছেন সামনেটায়। ছোট রুমালের মতো লন। ধারে ধারে হরেকরকমের গোঁড়ি গোঁড়ি ফুলেব ঝাড়। বাড়ির পাশে একটি লম্বমান চকচকে রবার গাছকে দেখিয়ে অংশুবাবু বলেন আমার রিটায়ারমেন্টের সমবয়স্ক। আর রীনা? রীনারও হবি আছে। আগেকার দিনের বিরাট বাড়ি উঁচু সিলিংয়ে বড় বড় বেডরুম চার পাঁচখানা, বৈঠকখানা দুটো। আয়তাকার দালানে দোলনা বাঁধা। কদিন আগে দীর্ঘ রোগভোগের পর অংশুর মা দেহ রাখলেন। সাবা বাড়ি রং হল। জানলা দরজা সব। কাচ পালিশ, কাঠ পালিশ। অংশু বেশ তৃপ্তির সঙ্গে একমাথা পাকাচুল ঝাঁকিয়ে তাঁর দুষ্টু-দুষ্টু ছেলেমানুষি মুখে মিটিমিটি হেসে বললেন—'আমার শেষ সম্বল দিয়ে বাড়িটা হ্যাবিটেব্‌ল করে দিলুম। ভালো করিনি? কী বলেন সার?' রীনার আপাত নির্লিপ্ত বৌদি-বৌদি মুখে একটা অন্যমনস্ক ভদ্রতার হাসি লেগে থাকে। তিনি সপ্তাহে একবার হবি-সেন্টার পার্ক স্ট্রিটে যাবেনই, বাছা বাছা খেলনা, তার রং তার উপাদান সব বায়োফ্রেন্ডলি, ছবিব বই, চকচকে ল্যামিনেটেড চট করে ছেঁড়া যাবে না—এই সব তিনি কিনে আনেন। দিযা আসবে বছরের কোনও না কোনও সময়ে একবার। তাই।

অ্যামেরিকা অ্যামেরিকা কবে সব পাগল। আবার অ্যামেরিকা বলে না। স্টেটস। তা সেই স্টেটস-এ যে তিনিও যান নি তা তো নয়, গেছেন। নিউ জার্সিতে স্বামী স্ত্রী অন্তত দেড় বছব বাস করেছেন। সুইজারল্যান্ডে তেত্রিশ মাস। সেই সময়েই তো সুমিত হল।

লুসার্ন লেকের ধারের পথ দিয়ে ওয়াকারে-পা সুমিতের সেই গড়গড়িয়ে চলা আর তার পাশে পাশে ছুটন্ত জিমি—এখনও কী পরিষ্কার মনে পড়ে। প্লে-পেনের মধ্যে রাজ্যের ছোট্ট ছোট্ট গাড়ি নিয়ে খেলা করছে সুমিত। অদূরে টিভি ঠিকমতো টিউনিং ছিল না বোধহয়, হঠাৎ গাঁক গাঁক করে বেজে উঠল—চমকে উঠে ছোট্ট ছোট্ট দুটো হাত বাড়িয়ে সেই বোধহয় প্রথম বলে উঠল—মাম মাম মাম মাম। তপতীকে কোলে তুলতে দিতেন না রাজেনবাবু। এমনিতে তখন তপতীর খুব শরীর খারাপ। তা ছাড়া প্রিন্সিপল! প্লে-পেনের বাইরে থেকে তিনি তখন বলেছিলেন দেয়ার দেয়ার দেয়ার দেয়ার, ডোন্ট বি আ সিলি ক্রাই-বেবি সুমিত, মাই সন, আ অ্যাম হিয়ার, স্টপ, স্টপ দিস হোয়াইনিং, লুক অ্যাট জিমি। দেয়ার দেয়ার। আস্তে আস্তে সুমিত বুঝে গিয়েছিল তাকে নিজেকেই শান্ত হতে হবে, যাবতীয় ভয়ের মোকাবিলা নিজে নিজেই করতে হবে। বাবা মা শুধু আছেন দিস মাচ। বাবা-মার পাশের ক্রিব থেকে নিজস্ব ঘরে ট্রান্সফার্ড হল সুমিত ফিলাডেলফিয়ায়। বাচ্চার আলাদা ঘর ছাড়া অ্যাপার্টমেন্ট নিতে গেলে পাপী পামরদের দিকে যে চোখে তাকায় সেই ভাবে তাকাতো ওখানকার ল্যান্ডলেডিরা। কত যত্ন করে নার্সারি সাজানো। দেয়াল থেকে ডানা-মেলা পরী ঝুঁকে আছে। কুকুর কোলে বাঘ সিংহের ফটো, ওয়ার্ডরোবের গায়ে ওয়াল্ট ডিজনির সব জলছবি। আর খেলনার তো শেষ নেই। তবু কি সুমিত যেতে চায়! ঘুমোবার সময় হলেই মুখের মধ্যে দুটো আঙুল পুরে বাবা-মার বিছানায় চুপটি করে শুয়ে পড়বে। কত কষ্ট করে সে সব ছাড়ানো হয়েছে। নইলে কি আর ছ'বছর বয়সে অত সহজে সেন্ট পলস্-এ দেওয়া যেত? ওর সঙ্গে ভর্তি হয়েছিল আরেকটি ছেলে, ভাস্কর নাম, সে তো কেঁদে কেটে রেকটারকে আঁচড়ে কামড়ে মা বাবাকে গালাগালি দিয়ে একশা। তাকেও নাকি সামলেছিল ছোট্ট সুমিত—'দেখো ভাইয়া অ্যায়সা মত করো। আঙ্কল ঔর অ্যান্টিজি তো বহোত বড়া কামমে এনগেজড হ্যাঁয়, তো তুমারা দেখভাল কৌন করে গা। দেখো না হম ভি তো একঠো ছোটা বাচ্চা হ্যায়, হ্যায় না?' —রেকটরের কাছ থেকে শুনে তো রাজেন-তপতী হেসে বাঁচেন না। তো সেই ভাস্কর রোটিওয়ালা আজ সুমিতের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু।

পুজোর সময়ে সবচেয়ে হাঁফ ধরে। গোটা ফ্যামিলি নিয়ে সার রাজেন মিহিজাম চলে গেলেন। এক সময়ে শেয়ার থেকে হাতে অকল্পনীয় টাকা আসে। সেই সময়েই মিহিজামের বাংলোটা তৈরি। এখন মেনটেইন করতে একটু অসুবিধা যে হয় না, তা নয়। কিন্তু সুযোগ পেলেই রাজেন এখানে চলে আসেন। ছেলে-বউ-স্ত্রী এমন কি বাড়ির কাজের লোক খনা-সুদ্ধু চলে এলেন ষষ্ঠীর দিন।

বেরোচ্ছেন, গাড়ির স্টিয়ারিং-এ হাত সুমিতের, পাশে তিনি, পেছনে খনা, মুন্নি আর তপতী। চিরঞ্জীব দত্ত মুখ বাড়িয়ে বলল—আরে বউদি যাচ্ছেন কোথায়? ঠাকুরের ডেকোরেশন কে করবে?

—কেন? আমি ছাড়া কি আর কেউ নেই? তোমার কন্যেই তো রয়েছে।

—ও, জানেন না বুঝি। ওর দাদার কাছে থেকে চিঠি এসেছে ওর হার্ভার্ডে হয়ে গেল। কাল সন্ধের ফ্লাইট।

সুমিত ফট করে গাড়ি ছেড়ে দেয়। মুখ অত্যন্ত গম্ভীর, রাজেন আড়চোখে দেখেন। এই জন্যে, স্রেফ এই জন্যেই কোনও জমায়েতে থাকতে চান না রাজেন। কার ছেলে হংকংয়ে কত হংকং ডলার অর্জন করছে। দুর্দান্ত স্ট্যান্ডার্ড অব লিভিং। কার জামাই বস্টনে, সেটলড। কার মেয়েও ডক্টরেট পেয়ে গেল বলে। কার বাচ্চা কী ভীষণ চালাক, চতুর স্মার্ট হয়েছে। কার বাড়ির ইয়ংগার জেনারেশন এক জনও কলকাতায় নেই। কানাডা, হিউজটন, ডুসেলডর্ফ, বার্লিং, প্রাগ, সব হাতছানি দিয়ে তার পরে সত্যিকার গোল্ডেন হ্যান্ডশেক করে এদের নিয়ে গেছে। পুজোর প্রসাদ খেতে, দ্যাখো, নিতান্ত স্কুলের ছেলেমেয়েরা, একেবারে বেবিরা আর আধবুড়ো পুরো বুড়োর দল। খিচুড়ি খেতে গিয়ে কার দাঁত খুলে এল। কে চোখে কালো ঠুলি বেঁধে এসেছেন। কে স্টিলের গ্রিপ হাতে নিয়ে ঠুকঠুক করে আসছেন। পরিবেশন করতে করতে বুলা বলল, মৃদুলাদি এবার তুমি একটু করো আমার পা দুটো গেল, চিরঞ্জীব পোলাওয়ের বালতি উদয়নের হাতে ট্রান্সফার করে দেয়, উদযন এক লাইন শেষ করেই সেটা ধরিয়ে দেয় বিজয় সাহানিকে। পারবে কেন? সবচেয়ে যে ছোট তারই তো পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। আর সেই জমায়েতে আলোচনার বিষয় ওই একটাই। এ দেশে চাকরি নেই, পরিবেশ নেই, ওয়ার্ক কালচার নেই, সৎপথে টাকা নেই, কী করবে এরা? ওদের ধরে রাখলে চলে? ওদের জীবন, ওদের কেরিয়ার, ওদের আশা আকাঙ্ক্ষা, ওদের ভবিষ্যৎ.. ...। চোর-চোর লাগে নিজেকে এ সময় রাজেনবাবুর। তাঁর ছেলের যোগ্যতা নেই। বাইরে যেতে পারছে না। ডলার রোজগার করতে পারছে না। অন্যের ছেলেমেয়েদের তুলনায় সে বড়ই বেচারা। রাজেনবাবু যেতে দিচ্ছেন না এটা আসলে বাজে কথা। ডাক আসছে না, সুমিত দত্তকে কোনও শ্বেতবর্ণ কেজো সংস্থা যথেষ্ট কাজের বলে মনে করছে না। তাই তিনি পুজোর ছুটিতে মিহিজামে পালিয়ে যান। সুমিত সারা ছুটি গম্ভীর থাকে, মুন্নি কলকল করে এবং গান গায় এবং বাবা-মা-রুনিও যদি আসত তাহলে কী মজা হত এবংবিধ মত প্রকাশ করে, তপতী উল বুনে যান এবং রাজেন বাগান করেন, মিট পাই আর চকোলেট সুফলে রাঁধেন, সে সুফলে খেয়ে আর সবাই হাসলেও সুমিত তার হাসি-খুশিটা অকস্মাৎ গিলে নেয়।

জাস্ট স্কুল পাশ করা মেয়েও তা হলে চলে গেল? কিন্তু তখনও বাকি ছিল। পুজোর পর ফিরে এসেই এঁরা শুনলেন রুনির বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। পাত্র মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এম আই টি-তে জয়েন করেছে। রেজিস্ট্রেশন অনেক আগেই রুনি করে নিয়েছে। পাসপোর্ট ভিসা রেডি, আর্লি নভেম্বরে একটা রিসেপশন হবে, দুদিন পরই যাত্রা।

মুন্নি যে অমন হাসি-খুশি মেয়েটা একেবারে মুহ্যমান। মুখে যেন কে কালি মেড়ে দিয়েছে। রুনি তুই আমায় বললি না? আমাকেও না?

—দ্যাখ দিদি, বাবুল মুসলিম ছেলে। আমাদের বাড়ি বলে তো নয়, ওদের বাড়ি তো আরও গোঁড়া। ধর্ম-টর্ম বদলাতে টদলাতে আমি পারব না। তাই চুপি চুপি আগেই বিয়ে করব আর সবার নাগালের বাইরে চলে যাব।

—মা বাবার জন্য মন-কেমন করবে না?

—মন-কেমন তো আছেই। আচ্ছা দিদি তুই তো থাকিস সাদার্ন অ্যাভিনিউ, বছরে কতবার কদিনের জন্যে এখানে আসিস বল তো? সে জায়গায় আমরা ধর প্রতিবছর আসব, সাত কি পাঁচ সপ্তাহের জন্য। একেবারে নিরঙ্কুশ মা-বাবার কাছে থাকব।

মুন্নির দুঃখ হতেই পারে। পিঠো পিঠি বোন। দুটিই মাত্র। কিন্তু রাজেনবাবুরও মন খারাপ। না না, মুন্নির বোন রুনি শ্বশুরবাড়ি চলল বলে নয়, রুনি রাজেনবাবুর কে? জামাই মুসলিম বলে? ধুর, রাজেনবাবু ও সব মানেন না। আসল কথা শিবনাথ-ভারতী অর্থাৎ রাজেনবাবুর বেয়াই-বেয়ানের অ্যামেরিকান জামাই হয়ে গেল। ঈর্ষা? না। ভয়! ভয়! আড়ে আড়ে সুমিতের মুখের দিকে চান। হাসছে, ফটো তুলছে, শিবনাথ-ভারতীর পুত্রতুল্য করছে, রাজেনবাবুর বুক পুত্রগর্বে স্ফীত হয়ে যাচ্ছে, সে-কথা নয়, কিন্তু তিনি সুমিতের পেছনে ছায়া দেখতে পান, সাদা ছায়া, সেটা গাঢ়, গাঢ়তর হচ্ছে।

তপতীও বড় গম্ভীর। ভারতীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। ভারতী গম্ভীর নিজের কোলের মেয়েটির আসন্ন বিরহে। কিন্তু তপতী কেন? রামরাজাতলা থেকে ফিরে এসে, তপতী জামা কাপড় বদলাতে বদলাতে সেই অনিবার্য অমোঘটিই বললেন।

—খুব খারাপ লাগছিল আমার, জানো?

রাজেনবাবু তো জানতে চাননি তপতীর কেন খারাপ লাগছে? হি ইজ নট ইন্টারেস্টেড। মেয়েদের তো কত তুচ্ছ কারণেই খারাপ লাগে। রাজেনবাবু ওসবকে প্রশ্রয় দেবার পক্ষপাতী নন।

—এবার আর তুমি সুমিতকে আটকিও না।

অসংলগ্নভাবে মেজাজ খারাপ হয়ে যায় রাজেনের। তিনি একরকম খিঁচিয়ে ওঠেন —কিসের আটকানো? কেন আটকানো? কে আটকাচ্ছেটা কে?

তপতী একটুও না হেসে বললেন—কে কি কেন তুমি ভালোই জানো। এ বার কিন্তু ছেলেটার একটা কমপ্লেক্স হয়ে যাবে। জনে জনে দেখা হলে জিজ্ঞেস করে—ওর সেই মেরিল্যাণ্ড যাওয়ার কী হল? ওর বন্ধু-বান্ধবরা কেউ এখানে নেই। ছুটিতে এলেই ওকে বহু কথা শোনায়।

—কে কী বলবে সেই জন্যে আমায় যেতে হবে? অদ্ভুত যুক্তি তো!

—কে কী বলবে সে জন্য নয়। ওর উন্নতির জন্যে, ভবিষ্যতের জন্যে, ও যদি মনে করে ওর যাওয়া দরকার তা হলে আটকিও না। শোনো হাসো। একটু হাসো তো। তুমিও তো ঘুরেছ বহু, ঠিক আছে তোমার আপন তেমন কেউ ছিলেন না, তোমার পায়ের তলায় মাটি ছিল না। কিন্তু গিয়ে তো ছিলে। বর্ধমানে তো তোমার ফ্যামিলি ছিল, বাবা না থাকুন মা না থাকুন, কাকা ছিলেন নিঃসন্তান। কাকিমা তোমাকে মানুষ করেছিলেন, তাকেই তো মা বলে!

—সেই কাকা-কাকিমার প্রতি আমার কর্তব্য আমি করেছি তপতী এবং তোমার জ্যাঠামশাই যিনি খুব অসুবিধে করেছিলেন আমাদের তাঁর ওপরও...

তপতী অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তার পরে বলেন—তা করেছ। কিন্তু অসুবিধে হবে বলে ছেলেকে, একমাত্র ছেলেকে দূরে সরিযে দিয়েছ। সুমিত আত্মনির্ভর হবে বলে, ছ' বছবের ছেলে... হোস্টেলে আপার বাঙ্কে শুচ্ছে, ঠিকমতো খাচ্ছে দাচ্ছে কি না, ভিজে জামা পরল কি না এই সব ভেবে ভেবে আমার ডিপ্রেশন হয়ে গিয়েছিল।

—সেটা আমার ভালোব জন্য নয়। ওর জন্যে। ওর পড়াশোনায় ক্ষতি হবে বলে।

—ঠিক আছে। এ ভাবে ভাবো তো! ছেলের পড়াশোনাব ক্ষতি হবে বলে তুমি দিল্লির অ্যাসাইনমেন্টটাই নিলে, ওখানে সেটল করে গেলে, প্রমোশন উইথ ট্রান্সফার রিফিউজ করলে, ভাবতে পারছ?

—কী আশ্চর্য। কী মুশকিল!

—আশ্চর্য তো বটেই। মুশকিলও। তপতী বললেন, তবে এ ভাবেও ভাবা যায়। কেউ যে ভাবে না তা নয়, কোটিকে গুটিক হয়ত, কিন্তু ভাবে।

সুমিত ও মুন্নি বস্টন চলে গেল জানুয়ারির গোড়ায়। অ্যামেরিকার উত্তর ঘেঁষে অবিরাম বরফঝড়, মজ্জা-জমানো ঠাণ্ডা এমনকী ঠাণ্ডায় মৃত্যুর খবরও এখন আসছে। এয়ারপোর্টে ওদের নিতে আসবে সুমিতের বন্ধু ললিত দেশাই আব রুমঝুম, ওরাই আনবে ওদের জন্য ওভারকোট, গালোশ দেওয়া বুট। এখান থেকে নিয়ে গেলে ভারীও হয়ে যাবে। এখানকাব জিনিস ওখানে কাজেও লাগবে না।

—এয়ারপোর্ট থেকেই ফোন করব বাবা—মুন্নি বলল, ভারতী-শিবনাথের দিকে তাকিয়ে বলল—বাড়ি পৌঁছে করব তোমাদের, খবর সব পরস্পরের মধ্যে দেওয়া-দেওয়ি কোরো কিন্তু।

ভারতীর মুখ শুকিয়ে এক্টকুনি হয়ে গেছে। শিবনাথ অনর্থক ডিপার্চার লাউঞ্জে ছোটাছুটি করছেন, কারওর মুখের দিকে তাকাচ্ছেন না। রাজেনবাবু অভ্যস্ত হাতে সব পরিচ্ছন্নভাবে হ্যান্ডল করলেন। খালি তপতীর মুখে হাসি আঁকা।

—হ্যাঁ রে ভালো থাকব।

—ভাবিস না মুন্নি।

মুন্নি একবার ভারতীর কাছে যাচ্ছে, মা এঁদের একটু দেখো, খবরাখবর নিও। আর একবার ছুটে যাচ্ছে রাজেনবাবুর কাছে, তপতীর কাছে, মা বাবা! মা-বাবার একটু খোঁজ রেখো।

—তুই ভাবছিস কী করে যে খোঁজ রাখব না? তপতী হাসি মুখে বললেন।

সুমিত-মুন্নির সঙ্গে সঙ্গেই 'দীপশিখা' বিল্ডিংটার যৌবন চলে গেল। শিশু? শিশুই বা কই? যৌবন থাকলে তবে তো শৈশব থাকবে? নইলে? নইলেও শৈশব বটে, তবে প্রথম নয় দ্বিতীয়।

ঠুকঠুক করতে করতে লিফটের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন ফিফথ ফ্লোরের হিরানি দম্পতি। মিসেসের একটা পা আর্থারাইটিসে বাঁকা। প্রচণ্ড পেটমোটা, ভ্যাট সিক্সটি নাইনের

বোতলের মতো চেহারাটা। পেছন-মোটা, ওপর-সরু। পাকা চুলগুলো বব করা, রং জ্বলে যাওয়া ঘাসের মতো দেখতে লাগে। হাতে থলি, কালোরঙের কার্ডিগ্যানের ওপর পাঁশুটে রঙের মোটা চাদর। মিসেস হিরানি হি-হি করে কাঁপছেন বয়সের ঠাণ্ডায় না কলকাতার জানুয়ারির ঠাণ্ডায়! মিস্টার হিরানি ঠিক একটি কড়ানে চিংড়ির মতো, সেদ্ধ করা কড়ানে চিংড়ি। এক হাতে লাঠি, অন্য হাতে থলি। স্বামী-স্ত্রী বাজার করে ফিরছেন। দুধ পাউরুটিই সাধারণত খেয়ে থাকেন। ইদানীং একটি রোটি মেকার কিনেছেন, বাজার থেকে তাই সবজি এসেছে—বিন, গাজর, মটরশুটি, টোম্যাটো, পুদিনা পাতা। আচার এসেছে, হিঙের আচার। কাচের বোতল সুদ্ধ থলিটা একবার মিস্টার মিসেসকে দিচ্ছেন, আর এক বার মিসেস মিস্টারকে। বইতে পারছেন না। উনআশি একজনের আব একজন আশি। ছেলে? প্রকাশ হিরানি—কানাডার বিখ্যাত বিজনেস ম্যাগনেট, টরোন্টোয় থাকে, সুধা তার বউ ডাক্তার। প্রচণ্ড পসার, চাপও তেমনি, ইনসিওরেন্সের টাকা গুনতেই কম্মো কাবার। ছেলে মেয়ে? তিন। ছেলেবেলায় যখন আসত সেজেল, নীলম আর শরদ তিনটে পুডলের মতো দাদা দাদির কোলে পিঠে খেলা করত। কী সব সুখের দিন গেছে তখন।

—দাদি, হাউ বিউটিফুল ইউ আর!

—সুইট, সুইট, সুইটি, সুইটি—হাম, হাম, হাম, শরদ চুমু খাচ্ছে দাদিকে। দাদির রুপোলি মুখে সরু সরু রেখার তখন কী চৌম্বক শক্তি। সেজেল চিঠি লিখেছে—গ্র্যাণ্ড পা ডিয়ার, দিজ ডেজ আ অ্যাম আর্নিং মাই কলেজ ফিজ, পা ডাজন'ট হ্যাভ টু বদার।

নীলম লিখছে—দাদি, ডিয়ারি আ অ্যাম ম্যারেড। হী ইজ আ চাইনিজ ইমিগ্রান্ট-ওয়াং। সো কিউট, ইউ'ড জাস্ট লাভ টু টিকল হিম। ইট ইজ পিওরলি এক্সপেরিমেন্টাল। ইউ সি দাদি, আ আম নট রিয়্যালি ম্যারেড দো। ইফ ইট ওয়ার্কস দেন...

অনেকদিন আসেনি ওরা। নাতি নাতনিরা হারিয়ে গেছে।

সুধা-প্রকাশ নিয়মিত ফোন করে, ডলার ড্রাফট পাঠায়।

—শরদ? মেরা শরদ কৈসা হ্যায়।

—ও ঠিক হ্যায় মাম্মি। অভভি তো গ্রিনল্যান্ড গিয়া হোগা।

—গিয়া হোগা? তুম্ জানতা নেই?

—নেই, মাম্মি, উসকো ট্র্যাক রাখনা বহোত ডিফিকাল্ট? আপকো পবেশানি কে বাত কুছ নেই। ঘাবড়াইয়ে মত।

আসল কথা শরদ হিরানি, হিরানি পরিবারের কুলপ্রদীপ কোনও কাল্টগুরুর খপ্পরে পড়েছে। প্রকাশ হিরানির কেন, ভগবানেরও সাধ্য নেই তাকে সেখান থেকে ফেরায়, নিজে বোঝে তো ফিববে। ইন দা মিন টাইম সময় নেই। প্রকাশ হিরানির সাম্রাজ্য ইউরোপেও বিস্তৃত হয়ে গেছে, বউয়ের সঙ্গে ইনটারকমে কথা হয়। সেজেল চলে গেছে নাসেরের মতো দেখতে এক ইজিপশিয়ানকে বিয়ে করে, তার বর্তমান নাম কনীজ। নীলমেব ওয়াং-এর সঙ্গে বনল না, তারপব এক ফিলিপিনিজ, তারপর এক রেড ইণ্ডিয়ান, এখন নীলম তিন রঙেব তিনটি বাচ্চাকে ফিলিপিনিজ ফ্যামিলিতে রেখে (পুরনো শ্বশুরবাড়িগুলির সঙ্গে

তার প্রীতির সম্পর্ক বজায় আছে) বেজিং গেছে। না-ও ফিরতে পারে, সে ক্ষেত্রে প্রকাশকে হয়ত বাচ্চাগুলির দায় নিতে হবে।

লিফটম্যান বলল—থোড়া ঠহরিয়ে সাব।

আটজন ধরে লিফটে, দুজনকে নিয়ে উঠলে তো শুধু গুচ্ছের কারেন্ট খরচা

আসছে। আসছে দীপঙ্কর ভট্টচারিয়া আর তার বোন দীপান্বিতা। দুজনেই ষাট ছুঁই ছুঁই। হিরানিদের কাছে বালক-বালিকা। বুড়ো চোখে অল্প বয়স দেখলে বড় ভাল লাগে। কেমন মসৃণ গাল, থলিহীন চোখ, ভুরু, চোখের পাতা পড়ে যায়নি, ঠোঁটের শেপ আছে। দীপান্বিতা কোনও কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, সে নিজেকে খুব ফিট রাখে। কিন্তু দীপঙ্কর অ্যালকোহলিক ফ্যাট জমিয়ে জমিয়ে বিশ্রী। মাথাটা বেলের মতো। দীপঙ্কর ইজ আ স্যাড কেস। স্ত্রী একদিন স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে বেরিয়ে যায়। রাতের গড়িয়াহাটে অ্যাকসিডেন্টই হল, না ইচ্ছে করে প্রাণটা দিল, আর সবাইকার মতো দীপঙ্করের কাছে এটা মিস্ট্রি। দীপান্বিতা বিয়ে করেনি, কলেজ কোয়ার্টার্স থেকে প্রতি উইকএন্ডে এসে—দাদার ঘর সামলে দিয়ে যায়। দীপঙ্করের ছেলে মিলিন্দ চিরকাল মাদার্স বেবি, সে মায়ের শ্রাদ্ধ শেষ করে জে এন ইউতে পড়াতে চলে গেছে, পিসিকে মাঝে মাঝে চিঠি দিলেও বাবাকে ফোনও করে না। চিঠিও লেখে না। অথচ কী-ই বা হয়েছিল দীপঙ্করের সঙ্গে সরিতার। নাথিং স্পেশ্যাল। ইগো-ক্ল্যাশ মাঝে মাঝে হতই। ও রকম হয়, হয়েই থাকে। সরিতার রাগ হয়েছিল ঠিক আছে। রাগ মানেই চণ্ডাল, তার হিসাব থাকে না। এখন প্রচণ্ড দুঃখের ঘটনা এটা, ট্র্যাজেডি, কিন্তু মিলিন্দ তাই বলে ঘরে ফিরবে না? সন্তপ্ত পিতাকে একটা ফোনও করবে না?

উদয়নের নতুন সিয়েলো এসে থামল। নামছে, আজকে অফিসফেরত সাউথ ক্লাবে গিয়েছিল। হর্তা-কর্তা গোছের কিছু হবে। টেনিস নিয়ে বেশ আছে।

—হ্যালো, দীপঙ্করদা, হ্যালো হিরানিজি, সব ঠিক হ্যায় তো?

—হ্যাঁ বেটা, সব ঠিক হ্যায়।

—কাম কুছ হ্যায় তো বোলনা, জরুর, হাঁ?

—হাঁ বেটা, শিওর।

—দীপান্বিতা হাউ আ য়ু।

—আমি তো ঠিকই আছি ভাই—দীপান্বিতা আড়চোখে দাদার দিকে তাকালো।

—কিছু দরকার হলে বোলো দীপঙ্করদা, সঙ্কোচ কোরো না। দীপান্বিতা, প্লিজ...

—আরে আরে ঠিক আছে। আপনাদের বলব না তো কাদের বলব?

আঠারশো স্কোয়্যার ফুটের ফ্ল্যাট। লিভিং রুমটা মাঠের মতো, চাবি দিয়ে দরজা খুলেই ঢোকাই অভ্যাস উদয়নের। কিন্তু বেল বাজালেন। বেলটা ঘরের ভেতর বাজছে—টিং টং, ডিং ডং ছড়িয়ে যাচ্ছে তাঁর বাড়ির সর্বত্র। কেমন একটা শিহরণ জাগল ভেতরে। এ রকম আগে কখনও অনুভব করেননি। তিনি চাইছেন, চাইছেন কেউ দরজা খুলে দিক।

বুলা। চট করে ভেতরে ঢুকেই বুলাকে জড়িয়ে ধরলেন উদয়ন। টিপটপ সেজে থাকে বুলা। পুরোপুরি ঘটি আদর্শে। চওড়া পাড় গোলাপি টাঙ্গাইল, গলায় সোনার হার চিকচিক করছে। গোছা গোছা চুড়ি হাতে। ঝমঝম করছে।

--আঃ ছাড়ো ছাড়ো। কী যে করো!

বুলাকে দেখলে কেউ বলবে না সে হিসট্রিতে এম.এ. করেছিল একদিন। শ্বশুর-শাশুড়ি-স্বামী-পুত্র-কন্যা এই নিয়েই জীবন। নিজেই নিজেকে বলে—নিবেদিতা। কোনও ক্ষোভ থেকে নয়। এমনিই। স্টেটমেন্ট অব ফ্যাকট। প্রতি সপ্তাহে দমদম নাগেরবাজারে তাদের আদি বাড়িতে উদয়নের বাবা-মাকে দেখতে যায় দুজনে। ওখানে উদয়নের বিধবা পিসিমাও আছেন। লোকজন, কুকুর।

বেগমের গলাটা ভুলে গেছেন উদয়ন। রাহুল-বেগমের মুখ ফটোর ভেতর থেকে তাকিয়ে রয়েছে তাই, নয়তো হুবহু মনে পড়ে না।

—'বু-লা।'

—'ও কি। ও ভাবে ডাকছ কেন? আমি কি কুকুর?'

—'ও বাড়ি থেকে পেঁপেকে নিয়ে এলে হয়, না?'

—'পেঁপে মা-বাবা-পিসিমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে কেন? কেঁদে কেঁদে তোমায় পাগল করে দেবে।'

কথাটা কেমন খট করে লাগল উদয়নের কানে। 'পেঁপে মা-বাবা-পিসিমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে কেন?' পেঁপে তো কুকুর, একটা বাঘের মতো অ্যালসেশিয়ান। ইদানীং বয়স হয়ে একটু শান্ত হয়েছে। নইলে একাই লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বাড়ি মাত করে রাখত। কিন্তু পেঁপের সম্পর্কে এমন করে কথা বলা হচ্ছে যেন পেঁপে মানুষ। একটা মানুষ। যার মন কেমন করে, পরিচিত পরিবেশ, দুধের বাটি, বিছানা, নিজের গৃহকোণ, নিজের মানুষ বাবা-মা-পিসিমা ছাড়া যার চলে না।

চান-টান সেরে পি.সিটা নিয়ে বসে গেলেন উদয়ন। বুলা বারান্দায় বসে। গোলাপি আঁচল উড়ছে। তারা-তারা শীতের রাত। ঘন করে শালটা জড়িয়ে নিচ্ছে বুলা। দীপশিখার এই সাততলা থেকে এমন পরিষ্কার শীতের রাতে লেক-তীরবর্তী কলকাতাকে দেখায় সম্রাজ্ঞীর গলায় হীরের নেকলেসের মতো। টিভি টাওয়ারটা পেন্ডেন্ট, দুলছে। ওটা খুব সম্ভব কোনও চার্ম-টার্ম হবে, একটা প্রতীকের মতো, অনুজ্জ্বল, ঝুলে রয়েছে।

কেন হঠাৎ আজকে হিরানিদের, দীপঙ্করকে, দীপান্বিতাকে সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে এলেন উদয়ন? হঠাৎ! কেন আগেও কি হিরানিদের সঙ্গে দেখা হয়নি! অসহায়, ভেঙে পড়া দীপঙ্করের মুখোমুখি আগে হননি!

—বাক আপ ম্যান, এভাবে ভেঙে পড়া মানুষের মানায় না, বোঝেনই তো। আগে বলেওছেন দীপঙ্করকে। কিন্তু এভাবে সোজাসুজি আশ্বাস? আমি আছি। দরকার হলেই ডেকো, যাব। ঠিক আছে। সবই করবে ভাই। কিন্তু তুমি কি স্ত্রী? তুমি কি আমার ছেলে? যারা আমায় ভুল বুঝে চলে গেল?

উদয়নদের ঠিক তিনটে তলা ওপরে সার রাজেনের ফ্ল্যাট। অবিকল এ রকম। আর্চ থেকে, অ্যালকোভ থেকে, মাঠের মতো লিভিং রুম থেকে। এল শেপের কিচেন থেকে। পুবের বারান্দা খাঁচাঅলা। দক্ষিণে বারান্দা খোলামেলা। তিন তলা নীচের বারান্দায় গোলাপি আঁচল উড়ছে, বাতাসে ঝিমধরা আতরের গন্ধ, অন্ধকারে-চমকানো গায়ের রং, তিন তলা ওপরে সবুজ পাড়ওয়ালা সাদা শাড়ির আঁচল, কালো কুলুর শাল। কান মাথা জড়ানো – তপতী। রাজেন ঘরের ভেতরে, তবে পি.সি নয় চৈতন্যচরিতামৃত – কৃষ্ণদাস কবিরাজ, সম্পাদনা—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পড়ছেন।

আরও একতলা ওপরে উঠলে দীপঙ্কর-দীপান্বিতা দু'জনকেই বারান্দায় দেখা যাবে। দুজনের হাতেই ডিনার-পূর্ব গ্লাস। হোয়াইট হর্স।

—আর খাসনি দাদা।

—আর একটু, জাস্ট একটু দে। আচ্ছা দীপু তুই কি বিশ্বাস কন্সি সবিতা সুইসাইড করেছিল।

—না, বিশ্বাস করি না—দৃঢ় গলা দীপান্বিতার।

—কেন? কেন তুই বিশ্বাস করিস না।

—বউদি পুনার মেয়ে। এমনিতেই ওরা ভীষণ প্র্যাকটিক্যাল হয়। খুব সেলফিশ ছিল বউদি। কিছু মনে করিস না। আমি কোনওদিন বউদিকে সেন্টিমেন্টাল হতে দেখিনি। গোঁ ছিল প্রচণ্ড, অহং। মিলুর বিয়ে হলে বউদি মিলুর বউয়ের সঙ্গে ঘর করতে পারত না। আসলে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বেরিয়ে যায়, গড়িয়াহাটে ট্রাম তুলে দিয়ে মোড়টা সমান করে দিয়ে কী সাংঘাতিক করেছে বল তো? ওইখানে অ্যাকসিডেন্ট না হওয়াটাই তো আশ্চর্য। বউদির বদলে তুই ওই মুডে বেরিয়ে গেলে তোরও হতে পারত!

—হল না কেন দীপু। তাই কেন হল না। মিলু তো সেখানে ছিল না। ঝগড়াটা আরম্ভ হয়েছিল সুদ্ধু লফট পরিষ্কার করা নিয়ে কোনও সিরিয়াস কিছু না। মিলু কিছুতেই বিশ্বাস করল না।

—দাদা একটা কথা বলব?

—বল।

—তুই দুঃখ করিস না—মিলু যাবে বলেই গেছে। বাবা-মা যতদিন ইয়াং, হেলপ করতে পারছে, যতদিন নিজের একটা পরিপূর্ণ জীবন তৈরি না হচ্ছে সুদ্ধু ততদিন এরা থাকবে—মিলিন্দ-গোবিন্দ-আনন্দ-অরিন্দম কেউ থাকবে না, কেউ থাকবে না দাদা। বউদির ওভাবে মৃত্যুটা মিলুকে একটা জুতসই এক্সকিউজ দিল এইমাত্র। ও যেতই। বউদি থাকলেও যেত।

—কিন্তু আমার ওপর এত রাগ! একটা চিঠি না। ফোন না।

—আরে বাপ, হি'ল হ্যাভ টু কিপ দা অ্যাপিয়ার‍্যান্স অব রাইচিয়াস ইনডিগনেশন ফর সাম টাইম, আদারওয়াইজ হি'ল ফিল গিল্টি। নিজের সঙ্গে তোর সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে মিলু।

—জীবন নিয়ে, স্নেহ-মমতা নিয়ে খেলা? আমরা তো এমন খেলা খেলিনি।

—খেলিনি দাদা, কিন্তু এফেক্টটা একই হয়েছে। তুই যখন সরিতাকে বিয়ে করলি ও দেশে, ব্যাপারটায় মা বাবা দুঃখ পেল। সেই দুঃখটাকে তুই একটা দিনের জন্যেও মূল্য দিয়েছিস?

—ম্যারেজ ইজ সামথিং ডেডলি সীরিয়াস দীপু।

—সে তো দেখাই যাচ্ছে, দীপান্বিতা অন্ধকারে হাসল—আমরা সীরিয়াস হয়েছি, নিজেদের জাস্টিফাই করবার কোন চেষ্টাই করিনি। মনে হয়নি বিবেকের কোনও দায় আমাদের আছে। মা বাবার দুঃখ পাওয়া তো অস্বাভাবিক কিছু না। কিন্তু চিরকাল সরিতা সেইটা নিয়ে ভেবে ভেবে মা বাবার সঙ্গে দূরত্ব রেখে গেল। আমিই কি কম কষ্ট দিয়েছি। অতীশের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল বলে বিয়েই করলাম না। একটা অবিবাহিতা মেয়ে যে কী ভীষণ অনিরাপদ, মা-বাবার তার জন্য যে কী দুশ্চিন্তা হতে পারে! এখন দ্যাখ তুইও ভাবতে পারিস, আমিও ভাবতে পারি। কিন্তু তখন তো ভাবতে পারিনি! রুক্ষ, খিটখিটে মেজাজ, কথায় কথায় মুখ হাঁড়ি, খাব না, কোথাও যাব না, কৈফিয়ত দিতে দিতে বেচারিদের প্রাণান্ত। এখন তো বুঝি! অ্যান্ড হু ইজ দ্যাট অতীশ? ইজ হি এনিবডি ইন মাই ফীলিংস নাউ? নো বডি, হি ইজ নো বডি। একটা লোক যখন পাঁচ বছর প্রেম করে ডিচ করে তখন তো একটা মেয়ের বোঝা উচিত যে সে খুব বেঁচে গেছে। এবং ভালভাবে পূর্ণভাবে বাঁচতে গেলে বিবাহের অভিজ্ঞতা, সন্তান এ সবই দরকার। আমারও দরকার ছিল, আমাদের মা-বাবারও দরকার ছিল।

—শেষে সময়ে মা বাবাকে আমরা দেখেছি। দেখিনি?

—হ্যাঁ, ওইটুকুই! বাবার শেষ সময়টা পাঁচ ছ'মাস তোরা খুব করেছিস। বউদিও তুইও। একটা সেরিব্র্যালের রোগী, আধা প্যারালিসিস, ছ'মাস শুয়ে আছে—একটা বেডসোর হয়নি, শেষ মুহূর্তে মুখে মধু গঙ্গাজল পেয়েছে? এ কি কম কথা! আমার কাছেও মা তারপর থেকে ভালই ছিল। বকাঝকা যে করিনি তা নয়, কিন্তু মোটামুটি সঙ্গ দিয়েছি, গল্পগুজব, বেড়ানো, যথাসম্ভব করেছি। করব না কেন? আমার মা তো। মাকে যে ভালবাসি। একটা টান আছে না?

দীপঙ্কর বললেন—তা হলে? এরা আর আমরা? আমাদের কী হবে?

—বললে কঠোর শোনাবে দাদা, আমরা ছেলেমেয়েদের সেবা-শুশ্রূষা ছেড়ে, হাতের আগুনটাও পাব না। তবে তাতে ক্ষতি কি? তুই কি সত্যিই মুখাগ্নি, শ্রাদ্ধশান্তি, কঠোপনিষদ, এ সবে বিশ্বাস করিস?

না। সত্যিই তো। বিশ্বাস করেন না। দীপঙ্কর বিশ্বাস করেন নি। ভট্চাযযি বামুন। আত্মীয়-স্বজনদের মুখ চেয়ে সামাজিক লজ্জায় মাথা কামাতে হয়েছিল, কাছা ধারণও করতে হয়েছিল, ষোড়শোপচারে শ্রাদ্ধ, অধ্যাপক-বিদায়, ব্রাহ্মণভোজন, নিয়মভঙ্গ সবই। বিশ্বাস না করলেও বিরক্ত লাগেনি। সেই বাবা যাঁর কাঁধে চড়ে পরেশনাথের প্রোসেসন প্রথম দেখা, সেই মা যার মুখের চিবোনো পান একটু এট্টুখানি খেতে গেলে মনে হত সলিড অমৃত খাচ্ছি। তাঁদের মনে করে কতকগুলো অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি।

—এসেছেন কাকাবাবু? হ্যাঁ শেষ সময়টা ওই আর কি পরপর দুটো স্ট্রোক হয়ে গেল। এক ঘণ্টার মধ্যে। বাবা নার্সিংহোমে আর দিতে বারণ করে ছিলেন।

—মিলিন্দ কই? মিলিন্দ।

—ওই তো ভুজ্যি দিচ্ছে! শেষ সময়টা নাতিকে চোখে হারাতেন।

বউমা কই?

শুকনো মুখে রুক্ষ চুল লাল পাড় শাড়িতে সরিতাকে এত সুন্দর লাগছিল যেন অমনটা দীপঙ্কর কখনও দেখেননি, সরু পাড় ধুতি পবে অশ্রুমুখী মা, বউমা শাশুড়িকে সামলাচ্ছে, কেঁদো না মা, দেখছিলে তো কী কষ্টটাই পাচ্ছিলেন। এক শোকের ডোরে তিন প্রজন্ম বাঁধা পড়ে গেছে। শুধু একটা পরিবার নয়, সেই পরিবাবের সঙ্গে বিন্দুমাত্র সম্পর্কিত সব্বাই।

—যেমন রাজার মতো মানুষ ছিলেন, তেমনি রাজা-বাজডার মতো চলে গেলেন। এটা লোকে বলবেই বলবে। দীপঙ্করের বাবা মোটেই রাজার মতো মানুষ ছিলেন না। সাধাবণ কাজ করতেন, কিছু পৈতৃক সম্পত্তি ছিল, মানুষ বিপদে পড়ে চাইলে-টাইলে বিমুখ কবতেন না—এই পর্যন্ত। আব চলে যাওয়া, তিন চার মাস ওযাটার বেডেব ওপর শুয়ে থাকা, কথাবলা গোঙানিব মতো, খেতে দিলে কষ বেয়ে অর্ধেক পড়ে যাচ্ছে। কংকালসার হযে গিয়েছিলেন যখন চলে গেলেন। রাজ-রাজড়ার মতোই বটে। তবু শুনলে কেমন তৃপ্তি হয বাবা রাজার মতো ছিলেন, রাজার মতো চলে গেলেন, ছেলের সেবা-যত্নেই তো ছিলেন। একটা শুভ ইঙ্গিত, প্রশংসাময় ইঙ্গিত যে ছেলে তাঁর রাজত্ব বজায় রাখতে পেবেছিল শেষ পর্যন্ত।

পবের বছর শেষ হতে যাচ্ছে। পুজো জাস্ট শেষ, কৃষ্ণপক্ষ শুরু হয়েছে, একটা সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হযে গেল দীপশিখায়। হিরানি-দম্পতি নিজেদের ফ্ল্যাটে নিঃশব্দে খুন হয়ে গেলেন। দশ বারো দিন কেউ জানতেও পারেনি। পাশের মিঃ বর্মন তাঁর মিসেসকে নিয়ে ডাবলিন গেছেন ছেলের কাছে। উল্টোদিকে ফ্ল্যাটে তিন ধাপ নেমে ডঃ সনৎ ব্যানার্জি একদম একা থাকেন। চেম্বার থেকে ফিরে সারা সন্ধে রাত্তির বণ্ডে থাকেন। বিশ্বাসী ভৃত্য আছে। সেই যা কববার করে। ডঃ সনৎ ব্যানার্জিব তিন বন্যাই ডক্টব, তিন জনেই বিদেশে। উনি অত শত লক্ষ করেন না কিছু। লিফটম্যানই উদয়নকে বলল—হিবানি সাবকে তো অনেকদিন দেখি না সাব। উনি কি কোথাও গেছেন?

—কোথায় যাবেন অশীতিপর বৃদ্ধ?

—আমি ভাবছিলুম রাতের ডিউটিতে মদন আসে ওকে জিজ্ঞেস করতে হবে। রাতের ট্রেনে কি প্লেনে কোথাও গিযে থাকবেন।

উদয়ন অফিস যাচ্ছিলেন ফিরে এসে আবার লিফটে উঠলেন। চলো ইলেভনথ ফ্লোর। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। বারবার বেল বাজিযে, ঠেলাঠেলি করে কোনও ফল হল না। পুলিস এবং ডাক্তারকে একই সঙ্গে কল দিলেন উদয়ন। তিনি যেন হঠাৎই এই ফ্ল্যাটের সত্যিকার কেয়ার-টেকার, পিতা বা পুত্র, এই ফ্ল্যাটের বিবেক হয়ে দাঁড়িয়েছেন। দরজা ভেঙে দেখা গেল সেই বীভৎস দৃশ্য। একজনকে ছুবি মেরেছে উপর্যুপরি, মিসেসকে স্রেফ

গলা টিপে শেষ করে দিয়েছে। রাইগর ধরে খাটে ঠেস দিয়ে বসে আছেন রাত-পোশাকের ওপর শুকনো রক্তজমা মিঃ হিরানি। মিসেস মেঝের ওপর শুয়ে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে আছেন। সারা ফ্ল্যাট লণ্ডভণ্ড। আলমারির লকার খোলা। দেয়ালের অ্যালকোভেও একটা সিন্দুক ফিট করে নিয়ে ছিলেন ওঁরা। বারবার ব্যাঙ্কে যাবার শক্তি বোধহয় ইদানীং থাকছিল না। কত ছিল কেউ তা বলতে পারবে না। তবে মনে হয় অনেক অনেক। যথেষ্ট খোঁজখবর নিয়েই সব এসেছে। বার-তের দিন পরে আর কী তদন্ত হবে। কুকুর এল, সিঁড়ি দিয়ে খপখপ করে নেমে গিয়ে লেকের দিকে ছুটে গেল। তারপর পাড়ে দাঁড়িয়ে ভৌ ভৌ করতে লাগল।

এই প্রথম এবং সম্ভবত এই শেষ প্রকাশ হিরানিকে দেখল 'দীপশিখা'। একটা বিশাল মার্সিডিজ থেকে নামলেন। বছর পঞ্চান্ন বয়স হবে. রোগা ধরনের একটা ডিসপেপটিক চেহারা। একেবারেই শ্বেতাঙ্গ সাহেব। তাজ বেঙ্গলে উঠেছেন। পুলিস মর্গ থেকে সোজা শ্মশানে নিয়ে গিয়ে শেষকৃত্য করে বাড়ির জন্য এজেন্ট অ্যাটর্নি ইত্যাদির ব্যবস্থা করে চলে গেলেন। তালাবন্ধ পড়ে রইল মহার্ঘ ফ্ল্যাটটা—পঁচিশ লাখ টাকা দাম। খুন হয়ে গেছে শুনে কেউ আর কিনতে চায় না।

—মা, দূরদর্শন নিউজ শুনলুম—'দীপশিখা'য় খুন হয়েছে? সত্যি? —বুলা ইতস্তত করছিল। উদয়ন চেঁচিয়ে বললেন—বলে দাও। সত্য গোপন করব কেন? বড় হয়েছে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে আর চেনা মানুষের খুনের খবর নিতে পারবে না!—উদয়নের গলায় অচেনা সুর।

—হিরানিরা।

—হিরানি আঙ্কল?

—আন্টিও।

—সে কী? কী করে?

—ডাকাতি আর কীভাবে হয়। খোঁজ রাখে সবাই, খোঁজ রাখে। কে একা, কে অশক্ত, কার বাড়িতে অনেক টাকা।

—মা!

—কী?

—বড্ড ভয় করছে, বাপীকে দাও না।

—হ্যাঁ, বাপী বলছি বলো। কাজকর্ম কেমন হচ্ছে?

—খুব ভাল, বাপী আমি সালমা আর রিয়া মিলে একটা বুটিক খুলব ঠিক করেছি।

—কোথায়?

—সেটা এখনও ঠিক করিনি।

—চাকরিটা কি পছন্দ হচ্ছে না?

—ভীষণ ভীষণ খাটায় বাপী, পেরে উঠছি না। রক্ত শুষে নিচ্ছে যেন কিন্তু ওসব কথা থাক। তোমরা ঠিক আছ তো?

—আমরা বেঠিক থাকব কেন?

—না, সাবধানে আছ তো? মাকে একা ফেলে তুমি অনেকক্ষণ সাউথ ক্লাবে থাকো।

—সাবধানে আছি। তবে মারের সাবধান নেই।

—মানে?

—মানে একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে, এমন কিছু শক্ত বাংলা নয়।

—তুমি তুমি করে কথা বলছ কেন বাপী আমার বড্ড মন খারাপ করছে। হিরানী দাদু ছোটবেলায় কত চকলেট দিতেন, ছোট ছোট কার্ড, তাতে জলছবি থাকত।

—হ্যাঁ, কাবার্ড লাভ।

—মানে?

—একটু ভাবলেই বুঝতে পাবরে, এমন কিছু শক্ত ইংরিজি নয়।

—বাপী তুমি একবার তুই বলো।

—আচ্ছা বলছি—তুই কেমন আছিস বেগম?

—বেগম ওদিকে ফুঁপিয়ে উঠল।

'অনন্তর রাত্রির দুকূলে আঁখাটি জড়িয়ে নিয়ে বসে থাকা'—তপতী অন্ধকারের দিকে চেয়ে বললেন। বেশ ভালোই বেঁচেছেন, তেষট্টি বছর বয়স কম কী? প্রথম তেরটা বছর বরিশালের কীর্তনখোলা গ্রামে খুব আনন্দে কেটেছিল। তারপর তো সারা ভারতবর্ষের আর কেউ ভাল থাকলো না। বাইশ বছর বয়সে ব্রেস্ট স্ট্রোকে সাঁতার কাটতে কাটতে আর এক সাঁতারু রাজেন দত্তর সঙ্গে দেখা। দুজনের লড়াই একসঙ্গে আরম্ভ হল। ভাল করে পায়ের মাটি শক্ত করার আগে কেউই সন্তান আনতে চাননি। ত্রিশের বেশি বয়স হয়ে গেল সুমিতের আসতে। কোনও সাধ অপূর্ণ নেই। স্বামীর ভালবাসা, সহমর্মিতা পেয়েছেন। পৃথিবীর বহু সুন্দর সুন্দর জায়গা ভ্রমণ করেছেন, থেকেছেন, সংসারে আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে বিবেচক, বিচক্ষণ, উদার বলে নাম কিনেছেন। বড় বড় ডিনার পার্টি, ক্লাবে, এদেশে বিদেশে, ভালো ভালো শাড়ি গয়না পরেছেন, এখন সামনের আঁধারের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মনে হয় কী আছে, কী আছে আর? ওখানে? খালি নীচ থেকে ওপরে ওঠাই তো মানুষের লক্ষ্য? কোনটা নীচ কোনটা ওপর? পেছনের জীবনটার দিকে তাকিয়ে সব কেমন অবাস্তব মনে হয়। তাঁর পেটেই আসব না আসব না করেও সুমিত এল? গর্ভধারণ করবার সেই কষ্ট তো তিনি মনে করতে পারেন না? সুমিত কি সত্যিই তাঁর উদর বিদীর্ণ করে এসেছিল? পুজোর ছুটিতে দার্জিলিঙে যেতেন তাঁরা নিয়ম করে। সেন্ট পলস বাড়ি যাবার ছুটি দিত না বাচ্চাগুলোকে। মা বাবারা এসে কয়েকদিন ছেলেদের নিয়ে হোটেলে কাটিয়ে যেতেন। সেবার ছিলেন স্টেশনের কাছে একটা মস্ত কম্পাউণ্ডওলা হোটেলে, সুমিত তখন সাত বছর। একটা লোমশ ভুটিয়া কুকুর হঠাৎ কেমন খেপে সেই কম্পাউণ্ডে সুমিতের পেছনে দৌড়তে লাগল। কাঁউ কাঁউ করে চিৎকার করছে আর ছুটছে। সুমিত যে নাকি জিমিকে দেখে অত অভ্যস্ত—কী যে ভয় পেয়ে গেল। প্রাণপণে ছুটছে, ওর পা দেখা যাচ্ছে না আর তারস্বরে চিৎকার করছে—মা, মা, মা।

রাজেনবাবু স্থির দাঁড়িয়েছিলেন—স্টপ সুমিত, ডোণ্ট রান, জাস্ট স্টপ, শি উইল ডু নাথিং টু ইউ। রাজেনবাবুর মতো ততটা নিশ্চিত তো হতে পারেনইনি তপতী, ছেলের অবস্থা দেখে তিনি একটা অদ্ভুত কাজ করেন। প্রথমে স্বামীর গালে প্রাণপণে একটা চড় মারেন তারপর কুকুরটার পেছনে নিজে ছোটেন। সুমিতকে যখন উদ্ধার করলেন কুকুরটা ওর ঘাড়ের ওপর, ছেলেটা হিস্টিরিক হয়ে গেছে।

সেই উদ্বেগ, হিস্টিরিয়া, কষ্ট, যন্ত্রণাব কথা এখন স্পষ্ট মনে পড়ল। ছেলেটার অবস্থাটা উপলব্ধি করছেন স্পষ্ট। এমন নয় যে তার বাবা-মা নেই, আছে। কিন্তু তারা দূরে দাঁড়িয়ে, হেলপ করছে না, আমি একা, পৃথিবীর নগ্ন কুরুক্ষেত্রে আমি এক অনাথ অসহায় শিশু অ্যাট দা মার্সি অব নেচার, অ্যাট দা মার্সি অব দা অ্যানিমল ওয়ার্ল্ড। বাবা-মা যদি দূরে দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে সে বাবা-মা থাকাও যা, না থাকাও তা।

তপতী! খেতে দেবে না! —বলতে বলতে রাজেন নিজেই রুটির কৌটো, স্টু-এব বাটি, নলেনগুড় সব টেবিলে সাজিয়ে ফেললেন।

—তপতী এসো! —সাড়া দেয় না কেন? কাছে গিয়ে দেখলেন চোখ জলে ভাসছে, কথা বলতে পারছে না।

—কী হল? কী হয়েছে?

তপতী শুধু তাঁর মুখের দিকে তাকান আর নিজের তর্জনী দিয়ে মুখের দিকে ইশারা করেন।

—কথা বলতে পারছ না? শরীর খারাপ লাগছে? চলতে পারবে?

পাশেই শোবার ঘর, তপতীকে শুইয়ে দিয়ে ডাক্তারকে ফোন করেন রাজেন। আশ্চর্য শান্ত, এবং অসম্ভব শক্ত।

সেরিব্র্যাল। স্পিচ সেন্টার অ্যাফেকটেড হয়েছে। নার্সিংহোমে দিন। কয়েকটা নম্বর ডায়াল করে অ্যাম্বুলেন্স, নার্সিংহোম, ডাক্তার সব ব্যবস্থা যখন হল, তখন একবার রাজেনবাবুর মনে হল উদয়নকে খবর দেওয়াই ভাল। উদয়নের নাম্বারটা টিপলেন। তাঁর সঙ্গে সে রাতে নার্সিংহোমে গেলেন উদয়ন এবং বুলা।

—ছেলেকে ফোন করেছেন?

—না। সময় পাইনি।

—নম্বরটা দিন, আমি একটা পাবলিক বুথ থেকে করে আসি।

—এখন তো ও অফিসে, বাড়িতে মুন্নিটা একা, ছেলেমানুষ ভয় পাবে। সকাল ছ'টা হোক তখন...

সকাল ছ'টাতেও ফোনটা করলেন না রাজেনবাবু। সাতটা কিংবা আটটাতেও না। তপতীর অবস্থা একই রকম। কোনও ইতর বিশেষ নেই। আটচল্লিশ ঘণ্টা দেখবেন ডাক্তার। একবারও তপতী কাউকে দেখবার জন্য হাঁকপাঁক করলেন না। এমনকী রাজেনবাবুকেও না। আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে চোখ বুজিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। যেন এইটেই তাঁর ঘুমের সময় ছিল।

—ছেলেকে খবর দিয়েছেন?

—সে হবে এখন, তাড়া কি?

—মানে?

—এ কি কলকাতা থেকে লিলুয়া?

—তবু তো লোকে আসে।

—ওর নতুন চাকরি উদয়ন, অনর্থক উদ্‌ভ্রান্ত করে লাভ কী? এসে তো দেখতেও পাবে না।

—এই সময়ে আপনারা পিতাপুত্র পাশাপাশি থাকবেন না?

—বড্ড কস্টলি হয়ে যাবে উদয়ন, ছেড়ে দাও।

—কী বলছেন সার, এ সময়ে ছেলের কিছু কর্তব্য থাকে। সেটা তাকে করবার সুযোগ দিন।

—একটা সময় ছিল যখন আমরা কাছাকাছি থাকতাম, তখন এই সব কর্তব্যগুলোর মানে ছিল। এখন পুরো ব্যাপারটাই শুধু হ্যারাসমেন্ট।

—মানতে পারলাম না সার। আপনি ওর নম্বরটা দিন তো।

তখন রাত্তির দশটা। ফোনটা বেজে উঠল।

—হ্যালো।

—বাবা, আমি সুমিত। অফিস থেকে করছি।

—ভালো আছ?

—হ্যাঁ। মুন্নি?

—মুন্নির শরীরটা একটু খারাপ।

—কী হল?

—কিছু না, মানে এই, কনসিভ করেছে মনে হচ্ছে।

রাজেনবাবু আর পারলেন না, ভাঙা গলায় বললেন—ওয়েল, টেক কেয়ার অব হার।

—বাবা! মাকে দাও।

ফোন রেখে দিয়েছেন রাজেনবাবু।

উদয়ন বললেন—খবরটা বললেন না সার, আপনি তো অদ্ভুত!

অফিস থেকে ফিরে সুমিত জিজ্ঞেস করল—কেমন আছ মুন্নি?

—একটু ভাল লাগছে এখন। সকালের দিকটাই অসহ্য।

—মুন্নি! বাড়ি যাবে?

—বাড়ি? কলকাতা? এক্ষুনি।

—কিন্তু তোমার বন্ধু শিরীন বা অলীনার বরের মতন লেটেস্ট গাড়ি কিনে দেওয়া তোমাকে আমার হবে না তাহলে। কানট্রির দিকে যে বাড়িটা দেখেছিলাম সেটাও না। ইউ'ল হ্যাভ টু ডু উইথ আ হাজব্যান্ড উইদাউট প্রপার্টি, উইদাউট...

—আমি কি তোমার কাছ থেকে এসব চেয়েছি সুমিত? কোনদিনও। শিরীনরা বলছিল, সেটা জাস্ট তোমার কাছে রিপ্রোডিউস করেছি মাত্র। আমার ভালো লাগে না, গাড়ি বাড়ির চেয়ে আমায় রামরাজাতলায় মায়ের কাছে দিয়ে এসো।

মুন্নির চোখে জল।

—বাবাকে আসলে ফোন করেছিলাম।

—কেমন আছেন?

—বলল ভাল, আমার মনে হল ভাল না। মাকে চাইলাম, বাবা ফোন কেটে দিল।

—অদ্ভুত তো! রামরাজাতলায় ফোন করো তো?

ভারতী ধরলেন—কবে আসছিস মুন্নি?

—যাব যাব ভাবছি, কিন্তু এখনও কিছু ঠিক হয়নি।

—বলিস কি রে? তের তারিখে কাজ আর আজ বলছিস ঠিক হয়নি।

—মা, কী বলছ মা? কার কাজ?

—সে কী, তপতীদি তোর শাশুড়ি যে চলে গেলেন।

—কী? কী বললে?

সুমিত দ্রুত গিয়ে ফোনটা ধরল—ভারতী তখন বলছেন—দিব্যি ভালোমানুষ বারান্দায় বসে, রাজেনদা ডাকতে গিয়ে দেখেন কথা বলতে পারছেন না। মাইল্ড স্ট্রোক বলল ডাক্তার, তা আটচল্লিশ ঘণ্টা পার করেই চলে গেলেন।

– কেউ আমাকে একটা খবর দিতে পারলে না তোমরা?

—তুমি খবর পাওনি আমরা কী করে জানব, সুমিত। আমাদের ফোন একমাস ধরে খারাপ, এই গতকাল ঠিক হয়েছে। আমরাও তো সমানে ওখানে যাতায়াত করছি। দিদি নার্সিংহোমে ভর্তি সে কি তোমার বাবা বলতে চান নাকি? জেরা করে করে বার করতে হয়। সুমিত ফ্লাইট বুক করো আর্লিয়েস্ট।

শ্রাদ্ধের দুদিন আগে ঝড়ো কাকের মতো পৌঁছল দুজনে। কাজকর্ম করল, মাথা কামালো সুমিত। সব কাজ শেষ। বাবা বললেন—কবে ফিরছ?

—ফিরছি না তো?

—মানে?

—আমি আবার আই.সি.আই.এ-ই জয়েন করছি বাবা।

—এত উন্নতির সুযোগ! ছেড়ে দিচ্ছ? সুমিত ইতস্তত করে বলল, বাবা... চাকরি-জীবনটা নিয়ে আমি মাথা না ঘামাতে শিখেছি ওখানে গিয়ে। জীবনটা বড্ড সেকেণ্ডারি হয়ে যায়। তা ছাড়া, সুমিত মাথা নিচু করে বলল, এই ঘটনা আমি আর ঘটতে দিতে পারি না।

রোম্যান্স

অবসরের জীবনে ধীরে-সুস্থে রয়ে বসে উপভোগ করার মতো জিনিসের অভাব আর যারই থাক, অতীশ ভট্টাচায্যির অন্তত নেই। শীতের ঘুম, তৃতীয় কাপ চা, হরেক বকমের বই, পত্র-পত্রিকা, মর্নিং ওয়াক.. ইচ্ছে হলে থিয়েটাব-সিনেমা, ইচ্ছে হলে বাড়ি বসে যৌবনকালের বাংলা গান কিংবা শুধু টিভির স্ক্রিনে আলগা করে চোখ ফেলে বসে থাকা. কিংবা পুরনো বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা জমানো।

পুরো যৌবনটা কেটেছে ছোটাছুটি করে। একটু বেশি করে বিছানায় গড়ানো সেটাও যেন একটা আলাদা উপভোগের স্বাদ বয়ে আনে। ধরো মাঘ মাসের ভোর ছ'টা। কথায় বলে মাঘের শীত বাঘের গায়ে। তা তেমন শীত হতভাগা কলকাতাতে আর পড়ে না। তবু ভোরের দিকটা ওরই মধ্যে একটু জমজমাট। জলযোগের 'পয়োধি' মার্কা হয়ে থাকে। তা এতদিন তো সে পয়োধি চাখবার সুযোগ পাওয়া যায়নি। অফিসের আগের আবশ্যিক প্রাতঃকৃত্যগুলো তো 'ধর তক্তা মার পেরেক' জাতীয় ছিল। এখন অতীশ ঘাপটি মেরে থাকেন। মাথার অর্ধেকটা অবধি বালাপোষ চাপা দিয়ে। জয়া উঠে পড়েছে টের পান। কেমন একটা অবৈধ প্রেমেব বোমাঞ্চ নিয়ে বালাপোষের মধ্যে আরও ঘন হয়ে যেতে থাকেন তিনি।

জয়ার উঠে-পড়ার মধ্যে আগেকার সেই তড়াক ভাবটা আর নেই। একবার-দুবার এ-পাশ ও-পাশ করল, হাউ-হাউ কবে গোটা পাঁচেক হাই তুলল, পটপট করে কটা আঙুল মটকাল, তারপর এক পা লেপেব ভেতবে, এক পা লেপের বাইরে ভেতরে... বাইরে, ভেতরে...বাইরে, —তুমি কি কুমির-ডাঙা খেলছ? পিটপিট করে চোখ খুলে সোঁদা সোঁদা গলায় অতীশ প্রশ্নটা ছোড়েন।

'আমার দুঃখু তুমি আর কী বুঝবে?' ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলেন জয়া—অবসর তোমারই হয়েছে, আমার তো আর হয়নি! সমাজ-সংসার, আত্মীয়-স্বজন, লোকজন। নিজেব ছেলে-মেয়ে পর্যন্ত স্বার্থপব। চোখ যতদিন না উলটোচ্ছি, কারও চোখ ফুটবে না। এক্ষুনি গিয়ে রামধনকে তুলতে হবে দুধ আনাব জন্যে। কত করে বললুম বাড়িতে দিয়ে যাবে ব্যবস্থা করো। তা ক'টা পয়সার জন্যে... এখন ওই বুড়ো মানুষটা! কদিনই বা আছে? ওকে তুলে পাঠাও, মেয়ে তো নামেই আধুনিকা। আমি মা হয়ে অনুমতি দিচ্ছি তুই দুধ আনতে যা, মুদির দোকানে যা, কিছু হবে না। না তাঁর মান যায়! মুদির সঙ্গে সুখদুঃখের গল্প করতে করতে সময় জ্ঞান থাকে না। কী না জনসংযোগ করছি, তৃণমূল স্তরে, এ দিকে আড়াই শো তেল নিয়ে আয় তো রে বললেই শ্রেণীচৈতন্য বেরিয়ে পড়ে। —আচ্ছা মা তুমি একটা যুবতী মেয়েকে মুদির দোকানে পাঠাচ্ছ? —বলতে বলতেই জয়া ঘর পেরিয়ে, দালান পেরিয়ে ওদিকে। কলঘরের দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ।

অতীশ আবার বালিশে মুখ গুঁজে জয়ার ফেলে-যাওয়া ভাষণের টুকরো-টুকরো শব্দ চাখতে থাকেন। জয়ার আগে এত কথার বাঁধুনি ছিল না, এ বাঁধুনি ছিল জয়ার মায়ের

কথাবার্তায়, তিনি চলে গেছেন, ভাষণগুলি মেয়ের কাছে ফেলে গেছেন। 'চোখ না উল্টোলে চোখ ফুটবে না', 'কটা পয়সার জন্যে', 'মুদির সঙ্গে সুখদুঃখের গল্প', কেমন লাগসই ছবির মতো শব্দগুলো! দু-তিন বছর আগে হলে এমন ভোর পার-হওয়া দৌড়ন্ত সকালে বিছানা মুড়ি দিয়ে শব্দের কবিতা উপভোগ করা যেত?

তবে অতীশের সবচেয়ে পছন্দের জিনিস হল পুবানো বন্ধুদের আসা-যাওয়া এবং তাদের সঙ্গে অতীতাচারণ।

শীতের বেলাটা ধরো মরে মরে আসছে।

আশপাশের বাড়ির আলসেতে, ন্যাড়াবোঁচা গাছগুলোর গায়ে মরাটে আলো। একেবারে বাসি মড়ার রং। এই সময়টা যতই চায়ের সঙ্গে মুচমুচে মুড়ি-কড়াইশুঁটি রেখে যাক জয়া, মনটা কেমন খারাপ-খারাপ করে। মরা আলোর সঙ্গে কেমন একটা তাদাত্ম্য এসে যায়। আয়না দেখতে ইচ্ছে যায়, মাথার ফাঁকা অংশটাতে আঙুল চলে যায়। নিজের হাত পা ধড় মুণ্ডু সব যেন ধোপার বাড়ি যাওয়ার যোগ্য ময়লা পুরনো কাপড়ের মতো লাগতে থাকে। এই সময়ে, যেমন আজ, বেলটা যদি মধুর সুরে বাজে এবং দরজা খুলে বাসন মাজুনি ঝোল্লার মায়ের বদলে শোভন-শোভনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় এক মুখ হাসি নিয়ে, তবে তার চেয়ে খুশির জিনিস আর কী হতে পারে?

বুকটা চিতিয়ে অতীশ বলে ওঠেন—যাক রে শোভন এবারের মতো বাঁচিয়ে দিলি, আরেকটু হলেই আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলুম।

—তা, সেইরকম চেহারাই করেছেন বটে। মুখ যেন খ্যাংরা ঝাঁটা। খোক্কসের মতো নখ, ও জয়া তোর কর্তার বোধ হয় নেল পালিশ পরবার শখ হয়েছে রে! শোভনা চেঁচালো।

জয়া সিঁড়ির মোড় থেকে রেলিং বুকে চেপে ঝুঁকে পড়েন—

—আরে আসুন আসুন...

—ঠিক বলছ তো? আসব? না চা দেবার ভয়ে নুকিয়ে পড়বে?

শোভন ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা খান। কবে জয়া থিয়েটারের টিকিট কাটা থাকায় পাড়ার বান্ধবীর সঙ্গে চলে গিয়েছিল বহুবার ক্ষমা চেয়ে, এবং দারুণ নাটকটা বাদ দিতে না পারার জন্য লজ্জিত হয়ে, শোভন আজও সে কথা তুলে খোঁটা দিতে ছাড়েন না।

জয়া বললেন— দেখুন অর্ধেকটা প্রকাশিত হয়ে রয়েছি। পুরোটা হলে না হয় আপনার বস্তা-পচা ঝগড়াটা শুরু করবেন। গ্যাসে অলরেডি জল বসিয়ে এসেছি।

—সর্বনাশ! সেবার গৃহত্যাগ করেছিলে, এবার কি গৃহদাহ?

এরই মধ্যে নীচের কোনও একখানা ঘর থেকে বেরিয়ে ঝিলিক হাত নেড়ে বলল—ওঃ বাবা মা কাকু, তোমাদের ভল্যুম একটু কমাও, নইলে ওপরে যাও, আমরা একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছি।

—'ভল্যুম তো বেশ কমিয়েছি রে', শোভন বললেন। সাড়ে পাঁচ কেজি কমেছে, ডাক্তার বলছে...

—আহা বুঝতে পারছ না যেন। দেহের নয়, গলার। নবটা একটু ঘোরাও....বলে ঝিলিক পরদা সরিয়ে আধো-অন্ধকার ঘরটার মধ্যে সেঁদিয়ে গেল।

দুই দম্পতি মেয়ের কাছ থেকে বকুনি খেয়ে কাঁচুমাচু মুখে ওপরে উঠে গেলেন। জয়া বললেন—চলুন আমরা বারান্দায় গিয়ে বসি। আপনারা বসুন গিয়ে, আমি চা-টা নিয়ে আসছি।

বারান্দায় ভাল করে গুছিয়ে বসে শোভন বললেন—ঝিলিকটা কী এমন রাজকার্য করছে রে? কোচিং ক্লাস খুলেছে নাকি? ঘরের আধা-অন্ধকারের মধ্যে জোড়া জোড়া চোখ জ্বলজ্বল করছে বলে মনে হল, যেন বনের মধ্যে বনবেড়ালদের সভা বসেছে।

—যা বলেছিস। অতীশ সায় দিলেন, ওয়াইল্ড একেবারে।

—বলেন কী? চেয়ার-টেবিল ভাঙে নাকি? শোভনা ঘাবড়ে গেছেন।

—ভাঙেনি এখনও, তবে ভাঙলেই হল, যা জোরে চাপড়ায়।

জয়া একটা জাম্বো সাইজের ফ্লাস্ক নিয়ে ঢুকলেন। শোভনা গলা নামিয়ে বললেন—হ্যাঁরে জয়া, ড্রাগ-ফ্রাগ খায় না তো! বিশ্রী একটা গন্ধ পেলুম যেন!

জয়া বললেন, অতটা বোধহয় না। ড্রাগ-নিবারণী সমিতি না কী একটা করেছে যে!

—কী জানি! শোভনা বলে উঠলেন, পুলিশেরও তো চুরি-ডাকাতি করার কথা না, মানছে কি? আসলে গাঁজার গন্ধটা একজনের দৌলতে আমার চেনা কি না!

—বিয়ে-থা-দে, বিয়ে থা দে, শোভন দরাজ গলায় বলে উঠলেন। শোভনার গাঁজা প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্যেই কি না কে জানে!

—বিয়ে কি আজকালকার ছেলেপুলেদের কেউ দেয় রে। বিয়ে আজকাল করে। অতীশের নিশ্বাস পড়ল।

শোভনা বললেন—হ্যাঁ, আপনার মতো আগেকার ছেলেপুলেদের বিয়েই যেন কেউ ঘাড়ে ধরে দিয়েছিল। হেদুয়ার মোড়ে হা-পিত্যেশ, বসন্ত-কেবিনে আধখানা কবিরাজি কি কফি হাউজে সাড়ে তিন কাপ কফি নিয়ে টানা তিন চার ঘণ্টা, এলিটে 'ফেয়ারওয়েল টু আর্মস' রূপবাণীতে 'জংলী'.....এ সব যেন আর আমরা জানি না।

—জানো তো দেখছি অনেক কিছুই, কিন্তু ম্যাডাম ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়া কি এত ডিটেল জানা যায়?

অতীশের কথায় জয়া হাততালি দিয়ে হেসে উঠল—খাপ খুলব না কি? শোভনা!....সামান্য একটু লজ্জা রুমাল দিয়ে মুছে নিয়ে শোভনা বললেন—সত্যি, দিনগুলো সব কোথায় গেল বল তো! কী দিনই ছিল!

—ইট ওয়াজ দা বেস্ট অফ টাইমস, ইট ওয়াজ দা ওয়ার্স্ট অফ টাইমস, সবার জীবনেই এই প্যারাডক্সিক্যাল দিনগুলো আসে, তারে কয় জৈবন।

—অতীশ বললেন, আমাদের এসেছিল, আমাদের পিতাদের এসেছিল, আমাদের পিতামহদের এসেছিল, এখন আমাগো পোলাপানদের আইসাছে।

—তা সে যাই বলু অতীশ, আমাদের যৌবনকাল যেন একটা বিশেষ রকম ছিল। ঠিক ওই স্বাদটা.....শোভনের গলায় রোমন্থনের আমেজ।

—জিভ বার কর, জিভ বার কর—এমন করে অতীশ বললেন যে ঘাবড়ে গিয়ে শোভন সঙ্গে সঙ্গে হ্যা করে একহাত জিভ বার করে ফেলেছেন।

—বলি জিভটা কার?

—এ আবার কী প্রশ্ন? এ জিভ আমার, আবার কার?

—তবে? নিজের জিভে অন্যের জৈবনের স্বাদ পাবি কী করে?

—কথাটা খানিকটা ঠিক অতীশ, কিন্তু তবু বলব দিনকাল পালটে গেছে ভাই। আমাদের সময়ের সেই সর্বাত্মক রোম্যান্স আর নেই। চিন্তা করে দ্যাখ মণিকা আড্ডি আর শান্তনু চক্কোত্তি—কী জুটি রে? মণিকা চার ফুট দশ ইঞ্চি, শান্তনু ঝাড়া ছয় কি আরও বেশি। একটা চুমু খেতে গেলে পর্যন্ত হয় মণিকাকে মই লাগাতে হবে, নয় শান্তনুকে হাঁটু গেড়ে বসতে হবে। প্রেমে কোনও বাধা হয়েছিল? দুজনে কলেজ স্ট্রিট দিয়ে গণ্ডোলার মতো ভেসে চলেছে, শান্তনুর টাকা পয়সা মণিকার জিম্মায়, মণিকার নোট-পত্তর শান্তনুর ঝোলায়।

—তোমরা আর কী জানো? কতটুকুই বা জানো? —শোভনা জয়ার দিকে চেয়ে হেসে বললেন—জয়শ্রী লাহিড়ীকে মনে আছে তো? দারুণ মিষ্টি দেখতে! তোমরা সবাই তো তার জন্যে পাগল ছিলে।

— কোনকালে? কোনকালে? — অতীশ চেঁচামেচি করে উঠলেন। শোভন বললেন —আরে বাবা বেথুন-বিউটি বলে কথা! একটু আধটু দোলা তো দেবেই। তার ওপর সাজ কী? সব সময়ে ফিলিম-স্টারের মতো সেজে আছে। গালে রুজ, ঠোঁটে লিপস্টিক।

জয়া বললেন— মোটেই না। ওর চেহারাটাই ওই রকম। গালের চামড়া এত পাতলা আর মসৃণ যে লাল ব্লাড ভেসলগুলো দেখা যেত, তাতেই মনে হত কিছু মেখেছে।

শোভনা বললেন—জয়া ঠিকই বলেছে। জয়শ্রীর চোখের পাতাই এত ঘন আর কালো ছিল যে মনে হত কাজল পরেছে, ঠোঁট এমনি এমনিই লাল। কীর্তি জানো ওর? হোস্টেলে থাকত তো! একদিন গিয়ে দেখি কপালে হাত দিয়ে শুয়ে আছে। আমায় দেখে বললে—ওহ ডগ-টায়ার্ড। ক্যাণ্ডিডেট ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। একই ফিলম উনিশবার দেখা হল। উনিশজনের সঙ্গে।

—কোথায় এখন জয়শ্রী?

—একা বোকা ব্যারিস্টারকে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করছে। আচ্ছা....তোদের অরিজিৎদার কথা মনে আছে? অরিজিৎ গোস্বামী!

শোভন বললেন—সেই রামস্বামী না কি মেয়েটা লেঙ্গি মারল বলে তো সুইসাইড করতে গিয়েছিল।

—রাইট। লাস্ট মোমেণ্টে পেট ওয়শ করে বেঁচে যায়।

—শুধু কি প্রেম? বাঁধনহারা, ছন্নছাড়া, ওয়াইল্ড, স্যাক্রিফাইসিং....আরও কত কি ছিল। জলসা ছিল, গড়পাড়ের, বাদুড়বাগানের, শ্রীকৃষ্ণ লেনের, বউবাজারের। বিসর্জনের বাজনা বাজতে না বাজতেই শুরু হয়ে যেত। অতীশ বললেন—জলসাগুলো ছিল রোম্যান্সের

আবহসঙ্গীত। মেজাজ তৈরি করে দিত। আহা! ঠিক রাতদুপুর, আসর সরগরম, কানাতের ফাঁক দিয়ে শীতের হাওয়া ঢুকছে! সতীনাথ সেই হাওয়ায় বিরহ ঢেলে দিয়ে গেলেন।

—শুধু বিরহ? অভিমান, আর্তি, আকুতি। তারপর শেষরাতে সেই বিরহের ঘুড়ি কেটে দিলেন দ্বিজেন মুখার্জী তাঁর ব্যারিটোন গলায়—শ্যামলবরণী তুমি কন্যা, ঝিরঝির বাতাসে ওড়াও ওড়না....আহা হা ভাবতে গেলে আর জ্ঞান থাকে না রে ভাই, জ্ঞান থাকে না।

এই সময়ে ঝিলিক হাতে একটা বড় প্যাকেট নিয়ে এসে বলল—কাকু, কাকিমা তোমরা মোমো খাবে? গরম গরম আছে।

—হঠাৎ? কোত্থেকে এল? অতীশ জিজ্ঞেস করলেন।

মুখ টিপে মুচকি মতো হেসে ঝিলিক বলল—বনবেড়ালরা এনেছে। এই নাও চায়ের সঙ্গে স্মৃতির সস মাখিয়ে খেয়ে ফ্যালো। ওড়না দুলিয়ে চলে গেল ঝিলিক। চোখদুটো ভ্যালভেলে করে শোভন বললেন—আমাদের বাল্যকালে ছিল লড়াইয়ের চপ, পকৌড়ি, দ্বারিকের শিঙাড়া। দেখতে দেখতে চপ হয়ে গেল....অতীশ তাড়াতাড়ি বললেন—ফ্লপ।

শোভনা বললেন—পকৌড়ি আর বলে না, বলে পাকোড়া।

জয়া বললেন—শিঙাড়াও বলে না, বলে সামোসা। এসে গেছে রোল, মোমো.....

মোমোয় কামড় দিয়ে শোভন বললেন—স্মৃতির সস মাখিয়ে খাওয়াই বটে। ঝিলিকটা বলেছে ভাল। আচ্ছা অতীশ, তখন বনবেড়াল বললুম ও শুনতে পেল কী করে বল তো?

জয়া বললেন—ওর মাথার পিছনে দুটো চোখ আছে। রোটেটিং কান। কিচ্ছু চোখ কান এড়ায় না।

—তা ঘরের মধ্যে ওগুলো বনবেড়াল না মন বেড়াল?

অতীশ হো-হো করে হেসে উঠলেন—বলেছিস ভাল। আমাদের যুগের জয়শ্রী লাহিড়ী যদি উনিশটাকে খেলাতে পারে তো এ যুগের ঝিলিক ভট্টাচার্যই বা কম যাবে কেন?

—না না ঠাট্টা নয়। আচ্ছা জয়া—ঝিলিকের বয়স কত হল? কিছু মনে না করলে বল তো শুনি!

—মনে করার কী আছে? ঝিলিক তো আপনার রিণ্টুর পরের বছরই হল। আটাশ পার হয়ে গেছে। এম. এ. হয়ে গেছে এক যুগ হতে চলল।

—করছে কী?

—কী করছে না তাই জিজ্ঞেস করুন। প্রথমে তো দিব্যি টুক করে কলেজে চাকরি পেয়ে গেল। করল বছর দুয়েক। তার পর একদিন খোঁজ পেলুম কলেজের চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছে।

—খোঁজ পেলি মানে? শোভনা অবাক হয়ে বললেন। তোদের সঙ্গে কি তোদের একমাত্র মেয়ের কোনও মানসিক যোগাযোগ নেই?

—আছে বললে আছে ভাই, নেই বললে নেই, জয়া বললেন।

—বুঝলুম না—শোভনা হতাশ।

—না বোঝার কী আছে? —অতীশ চেয়ার এগিয়ে বসেন, সকালবেলা চা করে দিচ্ছে,

বিছানা গুছোচ্ছে, বালিশ রোদে দিচ্ছে, দেয়ালে ঝুল দেখলেই ঝাড়ছে, মাকড়সা দেখলেই মুচ্ছো যাচ্ছে, ওর মায়ের আর ওর শতখানেক প্রসাধনের সামগ্রী নিয়ম করে কিনে আনছে।

জয়া হাঁ হাঁ করে উঠলেন—শতখানেক প্রসাধনের আইটেম মানে? ইয়ার্কি পেয়েছ?

—আরে বাবা ক্রিমই তো খান পঞ্চাশেক। ঠোঁটের ক্রিম, চুলের ক্রিম, নাকের ক্রিম, কপালের ক্রিম, গালের ক্রিম....

শোভনা বন্ধুর সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন—আহা, ঠোঁটের আর গালেরটা ঠিক আছে অতীশদা। বাকিগুলো আপনার উর্বর মস্তিষ্কের প্রোডাক্ট। কথা বলবার সুবিধের জন্যে মানে আলাপটা বেশ রঙ্গিলা করে তোলবার জন্যে ব্যবহার করছিলেন।

—তোমরা সাইড-ট্র্যাকে যাচ্ছ—শোভন বিরক্ত হয়ে বললেন, আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল মা-বাবার সঙ্গে কন্যার মানসিক যোগাযোগ, সেটা....

—হ্যাঁ হ্যাঁ, অতীশ বললেন, ওই যা বলছিলুম, সবই করছে, বেরোনোর সময়ে বলেও যাচ্ছে, ইচ্ছে হলে ডেস্টিনেশন এবং ফেরবার সম্ভাব্য টাইমও। কিন্তু 'কোথায়' 'কখন' বললে কী হবে, 'কেন' 'কেমন' এসব বিষয়ে চুপ। ওগুলো নাকি ব্যক্তিগত ব্যাপার।

—এই এক 'ব্যক্তিগত' উঠেছে আজকাল, শোভনা ফোঁস করে উঠলেন, রিণ্টুটাকে নিয়ে আমাদের কত জল্পনা-কল্পনা। ছেলে আমাদের বন্ধু হবে। বাপের বন্ধু, মায়ের বন্ধু। ছেলে তো বাপের ফাজলামি শুনতে শুনতে বড় হল। কিন্তু বন্ধু কই? এখন দেখছি সে গুড়ে বালি। 'ব্যক্তিগত'তে এসে সব ঠেকে যাচ্ছে। 'ব্যক্তিগত'টা আবার ঠিক কোনখান থেকে আরম্ভ হচ্ছে বোঝা দায়।

এই সময়ে ঝিলিক আবার এসে ঢুকল। ঝিলিক একটি অতি তন্বী পাঁচফুটি তরুণী। বয়সে যুবতী হলেও তাকে দেখলে আঠারো পার হয়েছে বলে মনে হয় না। রং মাজা। দেখতে সে ঠিক কেমন, সুন্দরী না বান্দরী সেটা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। কারণ অল্পবয়সের মহিমা তার সর্ব অবয়ব থেকে ঠিকরোচ্ছে। সে একটা ঝোল্লা কুর্তা পরেছে, যার ওপর কতকগুলো কার্টুন ফিগারের অ্যাপ্লিক সাঁটা। সালোয়ারটাও ঝোল্লা। ফলে ঝিলিককে আরও বেঁটে দেখাচ্ছে। কিন্তু তার চোখমুখ, হাঁটাচলা ইত্যাদি দেখলেই বোঝা যায় সে এ সব গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। ঝিলিকের মুখ তেলতেলে। প্রচুর চুলেও বেশ তেল। মাঝখানে সিঁথি কেটে দুদিক পেতে আঁচড়ানো। ঝকঝকে দাঁতে ঝিলিক হেসে বলল—বসতে পারি?

শোভন-শোভনা হাঁ-হাঁ করে উঠলেন—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই বসবি বই কি। এ তো আমাদের সৌভাগ্য!

—কেন? সৌভাগ্য কেন? — বলতে বলতে ঝিলিক বারান্দাতে গ্রিলের ফাঁক দিয়ে নীচের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বলল—সদর দরজাটা ভাল করে টেনে দিয়ে যাস। এই পটাশ, পরের দিন রেকর্ডগুলো, মনে আছে তো?

নীচ থেকে কতকগুলো উচ্চ আওয়াজ এল। চার পাঁচটি ছোট বড় চুল ছেলে, চার পাঁচটা এলোমেলো চুল মেয়ে রাস্তা কাঁপিয়ে তর্কাতর্কি করতে করতে চলে গেল।

ঝিলিক এবার মুখ ফিরিয়ে বলল—কেন? সৌভাগ্য কেন?

—সৌভাগ্য মানে সৌভাগ্য কেন হবে? তা সৌভাগ্য বই কি, শোভন-শোভনা আমতা আমতা করতে থাকেন।

ঝিলিক হেসে বলল—আসলে আমার কথা আলোচনা হচ্ছিল, খুব ঘাবড়ে গেছ আমি এসে বসতে। যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধে হয়। ঠিক? না, না, মিথ্যে কথা একদম বলবে না, মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। আচ্ছা কাকু, তোমরা এত পি এন পি সি করো কেন বল তো?

জয়া রাগ করে বললেন—তুই তাহলে আমাদের পর? তোকে নিয়ে আলোচনা করলে পি এন পি সি?

—দেখ মা, তা যদি বল প্রত্যেকটা মানুষই প্রত্যেকটা মানুষের পর। আমার পেট কামড়ালে তুমি বড় জোর ওষুধ দিতে পার। ডাক্তার ডাকতে পার, কিন্তু আমার ব্যথাটা তুমি ভোগ করতে পার কি?

অতীশ জোর গলায় বেশ ঘোষণা করার মতো করে বললেন—ঝিলিক আমরা কিন্তু মোটেই তোমাকে নিয়ে সারাক্ষণ আলোচনা করিনি, একদম শেষ দিকটায় তোমার সম্বন্ধে, মানে তোমার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে সামান্য কিছু আধা-সীরি য়াস আলোচনা হয়েছে। তাকে নিন্দা বা চর্চা কোনওটাই বলা চলে না।

—তা হলে কী আলোচনা হচ্ছিল এতক্ষণ?

—রোম্যান্স নেই, শোভন ঘোষণা করলেন, প্রেমও নেই, আমাদের সময়ে ছিল, এখন নেই। এই।

ঝিলিক হাসতে হাসতে বলল—খাবার দাবারগুলো এখন কেমন যেন লাগে, না কাকু? সে সবজিও নেই, সে মাছও নেই, সব ভ্যাসকা। সে রাঁধুনিও নেই। কাকিমা বাঁধে, টোক গিলে ভালো, কিন্তু কাকু তোমাব মায়ের মতো শুক্তো করতে কি পারে? বড়ির টক? শাকের ঘন্ট? বলো? জনান্তিকেই বলো না হয়, কিন্তু বলো! আচ্ছা বাবা, তুমি তো দিবারাত্র হা-হুতাশ করছ—নাই নাই সে-সব গান নাই বলে, তা তোমার বাবা মানে আমার দাদু গান বিষয়ে তোমাকে কিছু বলেননি? দাদু বা দিদা? বলেননি আহা জ্ঞান গোঁসাই, কৃষ্ণচন্দ্র দে.....সব কী গানই গাইতেন, তোদের আধুনিক গান সতীনাথ মুখার্জী, শ্যামল মিত্র তার কাছে দাঁড়াতে পারে না. একেবারে ছ্যা-ছ্যা। বলেননি?

—কী বলতে চাস তুই? অতীশ রে-রে করে উঠলেন, আমরাই বুড়ো হয়ে গেছি? আমাদের স্বাদ পাবার ক্ষমতা চলে গেছে আর পৃথিবীর সব কিছুই ঠিক আগের মতো আছে, এই তো?

—তুমিই বলছ বাবা কথাটা, আমি কিন্তু বলিনি—ঝিলিক মিটিমিটি হাসতে লাগল। —গা জ্বালানো চিড়িক চিড়িক হাসিসনি আর—জয়া এবার তাঁর কথার বাঁধুনি বার করে ফেলেন—আর সব ছেড়ে রোম্যান্সের কথাই ধর না। রোম্যান্স আর নেই, সেই সুদূর, সেই বিধুর, ঝিলিক যোগ করল—হ্যাঁ হ্যাঁ সেই তিয়াসা সেই হতাশা, সেই বিষাদ সেই বিরাগ, সেই অনুরাগ সেই অভিমান, সেই সর্বস্বত্যাগ সেই আত্মঘাত....

—হ্যাঁ হ্যাঁ সেই শরীরপাত সেই কুপোকাত—এভাবে বললে কমিক শোনাবেই কন্যে। কিন্তু কথাটা সত্যি। তোমাদের যুগে প্রেম নেই, সবই ক্যালকুলেশন। তোমাদের হচ্ছে 'ফ্যালো কড়ি, মাখো তেল, পোষালো তো পোষালো, নইলে কাটো।' চুটিয়ে ডেটিং করো, দায়িত্ব নেবার কথা বলো না, কিছু বলতে হলে শেয়ার-বাজারের কথা বলো, ব্যাঙ্ক থেকে কত লোন পাওয়া যাবে. কত ইণ্টারেস্ট, কতটা ফেরত দিলে কতটা মেরে দিলে চলবে, বাড়ি মর্গেজ, গাড়ি মর্গেজ, ইনস্টলমেণ্টের ফার্নিচার, ভাগের মা ভাগের বাবা, ভাগের ছেলেপুলে.....আঙুল নেড়ে নেড়ে বলতে বলতে থেমে গেলেন শোভন।

—কী হল! গাড়ি স্কিড করে গেল কেন কাকু? আগে বাড়ো, ভালোই বলছ। অতীশ এইবার সুযোগটা নিয়ে নিলেন, বললেন—কথাটা ভালো করে বলার ব্যাপার নয় ঝিলিক। কথাটা হচ্ছে, তুই এখন কী করছিস, ভবিষ্যতেই বা কী করবি? কলেজের চাকরিটা ছাড়লি কেন? বিয়ে-থা-ই বা করবি কবে? এ সব তো 'আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার' বলে ড্রয়ারে চাবি দিয়ে রেখেছিস। আজ শোভনকাকুরা আসতে যদি তুমি চাবি খুললে তো কথাগুলো হয়েই যাক না! আপত্তি আছে?

—না, আপত্তি নেই—ঝিলিক এবার গম্ভীর হয়ে বলল—আমার এক নম্বর কৈফিয়ত শুনে নাও বাবা-মা, কলেজের চাকরিতে আজকাল বড্ড বায়নাক্কা, কষ্ট করে এম. এ. পাশ করলুম আটান্ন পার্সেণ্ট মার্কস নিয়ে, তো বললে স্লেট পরীক্ষা দাও, তা যদি পাশ কবলুম তো বললে ভাইভা দাও, তা যদি দিলুম তো বললে এম. ফিল. করতে হবে পি এইচ ডি করতে হবে না হলে কদিন পরে আর ইনক্রিমেণ্ট হবে না। এখন স্টাডি লিভ পাবার জন্যে কলেজের টি আর-দের সঙ্গে কনস্ট্যাণ্ট যোগাযোগ রেখে যেতে হবে, তার ওপর দলাদলি, কে সি পি এম, কে ফরওয়ার্ড ব্লক, কে কংগ্রেস, কংগ্রেসের সঙ্গে আবার সি পি এম-এর গোপন আঁতাত। এ সব বুঝতেই তো আমার বছরখানেক ঘুরে গেল। একে আমার অত ঘাড় হেঁট করে পড়তে ভালই লাগে না, তার ওপর অত তেল খরচা, অত ক্লিকবাজি, আমার পোষালো না, আমি বিদ্রোহ করলুম। ধরি মাছ না ছুঁই পানি করে চালাতে পারতুম অনায়াসেই। কিন্তু সেটা ক্ষমতার অপচয় মনে হল, স্রেফ ছেড়ে দিয়ে চলে এলুম।

—তা হলে তো তুই হার স্বীকার করে নিলি—শোভন বললেন।

—আমার জীবনটা তো এখনও শেষ হয়ে যায়নি কাকু। আমি, সবাই যা করে সেই হেঁ-হেঁটো করলুম না, সিস্টেমটাও আমার পছন্দ হল না, এটা বিদ্রোহ। বিদ্রোহ ব্যাপারটা কিন্তু রোম্যাণ্টিক। টাকা-আনা-পাইয়ের হিসেব যারা করে তাদের দ্বারা হয় না।

সকলে একটু চুপচাপ। ঝিলিক বলল—আচ্ছা কাকু, কাকিমা আমি একাই কি প্রবলেম চাইল্ড? রিণ্টু? রিণ্টুকে নিয়ে তোমাদের কোনও সমস্যা নেই?

—তুমি প্রবলেম চাইল্ড কে বলেছে? শোভনা জয়া একসঙ্গে বললেন।

শোভন বললেন—কে বললে রিণ্টুকে নিয়ে সমস্যা নেই!

শোভনা-শোভনা পরস্পরের দিকে তাকালেন।

—রিণ্টু কি চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছে? ঝিলিক জিজ্ঞেস করল।

—বলিস কি? এই বাজারে ওই চাকরি ছাড়া? তুই মেয়ে বলে পেরেছিস।

—কিন্তু ও তো ভীষণ আনহ্যাপি ওখানে, বুঝতে পার না?

—সেটাই তো প্রবলেম, মুখটা ম্লান করে থাকে, খেতে শুতে দীর্ঘশ্বাস, রোগা হয়ে যাচ্ছে।

—তোমরা ঠিক জানো, চাকরিটাই ওর একমাত্র প্রবলেম?

—কেন? আর কোনও প্রবলেমের কথা তো আমরা জানি না।

—ঠিকই বুঝেছিলুম, তোমরা ওর কোনও খবরই রাখো না।

—কী করে রাখব! তোমাদের চাবি-দেওয়া ব্যক্তিগত ড্রয়ার আছে না? শোভনা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন।

—তা আর কী প্রবলেম ওর? শোভন জিজ্ঞেস করলেন।

—দীর্ঘশ্বাস ফেলা, ক্ষুধামান্দ্য—এ সব কিসের লক্ষণ কাকিমা, তোমাদের এক্সপিরিয়েন্স কী বলে?

—সে কি রে? ও কি প্রেমে পড়েছে? হুর রে, কী মজা! শোভনা প্রায় হাততালি দিয়ে ওঠেন আর কি ;—তা ভাগ্যবতীটি কে?

—তাকেই ভাগ্যবতী হতে হবে কেন, কাকিমা, রিণ্টুও তো ভাগ্যবান হতে পারে।

—রিণ্টু ভাগ্যবান হলে আমাদের চেয়ে বেশি খুশি আর কেউ হবে না। মেয়েটি কে? যে রিণ্টুকে ভাগ্যবান করেছে! আমরা চিনি?

—চেনো।

—তুই না কি রে? শোভন রই রই করে উঠলেন।

ঝিলিক আবার সেই চিড়িক মারা হাসি হেসে বলল—আমি কি পাত্রী হিসেবে খুব ভালো কাকু? একে তো খেয়ালি, তার ওপর ভীষণ গোঁয়াব। রিণ্টুর ছ ফুটের পাশে আমার পাঁচ ফুটই কি খুব মানানসই হবে?

শোভন বললেন—তুই কি সেই জন্যে মত দিচ্ছিস না? দূর পাগলি। তুই আমাদের চেনাজানা, তোর বাবা-মা আমাদের বেস্ট ফ্রেণ্ড। এর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে? আমাদের সময়েও ও-রকম লম্বু গুড়গুড়ে জুটি ছিল। ওতে কিছু এসে যায় না।

অতীশ এই সময়ে বললেন—শুধু একটা মই.....

জয়া চোখ পাকিয়ে তাকাতে তিনি চুপ করে গেলেন।

শোভন-শোভনা বললেন—রাজি হয়ে যা ঝিলিক। আমরা খুব খুশি হবো।

ঝিলিক বলল—ধৈর্য ধরো। ধৈর্য ধরো, মেয়েটা আমি নয়।

—তুই নয়? হতাশ গলা শোভনার।

তবে তাকেও তোমরা দেখেছ।

—দেখেছি? কে? কে? —শোভনা-জয়া একসঙ্গে হইহই করে উঠলেন।

—পটাশ।

—পটাশ? জয়া যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

শোভন বললেন—পটাশ না খটাশ? এ রকম আবার কারও নাম হয়? অ, তুই তখন ওপর থেকে বলছিলি বটে পটাশ রেকর্ড আনিস, না কী একটা।

শোভনা বললেন, ওই থ্রি কোয়ার্টার সুতো ঝোলা প্যান্ট আর ফতুয়া পরা মেয়েটা? চোখে বোধহয় সতেরো পাওয়ারের চশমা, দাঁত উঁচু ওকে আমি প্রথমটায় মেয়ে বলে বুঝতেই পারিনি। আমার রিন্টুর পাশে ওই পটাশ?

—প্রথমত কাকিমা, পটাশ নামটায় আপত্তি হলে ওর একটা পোশাকি নামও আছে। অনন্তযামিনী কৃষ্ণকামিনী সাবিত্রী কৌশল্যা আয়েঙ্গার। উচ্চারণ করতে অসুবিধে বলে আমরা পটাশ বলেই ডাকি। দ্বিতীয়ত কাকিমা, কে কার পাশে থাকবে সেটা তো আর আয়না ঠিক করে দেবে না। কনভেনশন্যাল, রক্ষণশীল বিয়ে রোম্যান্টিক মানুষেরা কখনওই করে না। মন যাকে চায় তাকেই.....

শোভন গম্ভীরভাবে বললেন—তা রিন্টুর মন যাকে চেয়েছে ওই পটাশ না পটাশিয়াম সায়নাইডটি কে? কী?

—ও হল গিয়ে গ্লোব-ট্রটার। পর্যটক। ওকে নিয়েই তো এখন ডকুমেন্টারি করছি আমরা। সেই জন্যেই ওর রেকর্ডস আনতে বলছিলুম। সাইকেলে ভারত ভ্রমণ দিয়ে আরম্ভ করেছিল। এখন তো আলাস্কা অবধি চলে গেছে।

—ভালো। খুব ভালো। পছন্দ-অপছন্দ তোমাদের খুব ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমরা কিছু বলতে চাই না। তা রিন্টুর মন খারাপ করার কারণ কী? আমরা ওর পথের কাঁটা হয়ে থাকতে চাই না। অনুমতি দিয়ে দিচ্ছি, যা খুশি তাই করুক।

—তোমরা অনুমতি দিলে কী হবে? পাত্রী স্বয়ং যে টালবাহানা করছে।

—মানে? পটাশের রিন্টুকে পছন্দ হচ্ছে না?—জয়া আকাশ থেকে পড়লেন।

—কেন?

—অবভিয়াসলি পটাশ আরও রোম্যান্টিক বলে। ওর দাবি রিন্টু ওই সরকারি চাকরিটা ছেড়ে দিক। ওরা দুজনে সারা পৃথিবী পর্যটন করে বেড়াবে। ট্রেনে, সাইকেলে, ট্রাকের মাথায়, হিচ হাইক আর কি, যখন যেমন জোটে।

—অন্নবস্ত্র? শোভনা হাঁ করে রয়েছেন। শোভন কোনওমতে জিজ্ঞেস করলেন।

—এ সব ব্যাপারে আজকাল কিছু স্পনসর-টর পাওয়া যাচ্ছে কাকু। তবে পটাশ পরোয়া করে না। ওর থিওরি হল দুটো শিক্ষিত বুদ্ধিমান ছেলেমেয়ে যাদের গোটা হাত-পা আছে তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব হওয়ার কথা নয়। দরকার হলে মাল বইবে, দরকার হলে হোটেলে এঁটো বাসন ধোবে। মোট কথা.....

অতীশ-শোভন প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলেন—বিন্টু একটা ইকনমিকসের এম এসসি, আই এ এস অফিসার... সে মাল বইবে? এঁটো বাসন ধোবে?

জয়া বললেন....পটাশের ইচ্ছে হয় সে বাসন ধুগে যাক। তাকে মানাবে এখন।

মজা পাওয়া গলায় ঝিলিক বলল—পটাশ কিন্তু বায়োকেমিস্ট্রির ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট মা, আর পটাশরা তিন পুরুষ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে আছে। ওর বাবা ডক্টর শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এখন এডুকেশনের ডিরেক্টর।

—চমৎকার, তা তাঁর মেয়ের এমন মতিগতি কেন? বাসনই যদি মাজবে তো বায়োকেমিস্ট্রি পড়ার দরকার কী ছিল?

—পটাশ বলে, জীবনটাকে ঠিকমতো দেখতে শুনতে হলে, বুঝতে হলে, ল্যাবরেটরির বাইরে আসতে হবে। সমস্ত কাজ, সমস্ত পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে।

—ভালো, তা ঘর-টর বাঁধা, ছেলে মেয়ে মানুষ করা এ সব করবে কবে? বুড়ো হয়ে গেলে?— শোভনার গলায় ঝাঁঝ।

—কাকিমা সে-গুড়ে বালি, পটাশ বলে, পৃথিবীতে যথেষ্ট শিশু আসছে, তাদের আদর হচ্ছে না, তারা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এই পরিস্থিতিতে ওদের দুজনের আর শিশু আনবার প্রশ্নই উঠছে না। আর ঘর বাঁধা? পটাশ পথকেই ঘর বলে মনে করে। বুড়ো বয়সের নাকি প্রশ্নই নেই। ওর ধারণা এইভাবে পৃথিবী দেখতে-দেখতে ওরা যৌবনেই গত হবে, বৃদ্ধ আর হতে হবে না।

—বাঃ, হতভম্ব চার মা-বাবার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল।

অতীশ বললেন—তা এই চিরপথিক চিরনবীন পটাশকেই আমাদের রিণ্টু বিয়ে করবে ঠিক করেছে? —অতীশের গলায় কি শ্লেষ?

ঝিলিক একটু চুপ করে রইল, তারপর মুখ তুলে আলতো করে বলল— সেখানেই তো আসল প্রবলেম।

চারজনেই হাঁ করে আছেন।

ঝিলিক বলল—কাকু, পটাশ বিয়ে করতেও চাইছে না।

—মানে?

—বলছে বিয়ে-টিয়ে ও সব পুরনো সমাজের পুরনো অভ্যেস। যতদিন পরস্পরের পরস্পরকে ভাল লাগে ততদিন একত্রে থাকলেই হল।

—অর্থাৎ?

—রিণ্টুর ভাল না লাগলে রিণ্টুর ফিরে আসার স্বাধীনতা আছে। পটাশের ভাল না লাগলে পটাশেরও। এই নিয়েই ওদের টানাটানি চলছে এখন। রিণ্টু ডিসিশন নিতে পারছে না। বেচারির অবস্থা খুব খারাপ কাকু। পটাশকে ছাড়া ওর জীবন অন্ধকার, পটাশেরও তাই....এ দিকে....

এই সময়ে ফোনটা ঝনঝন করে বেজে উঠল। অতীশ ধরবার জন্যে উঠছিলেন, ঝিলিক তড়াক করে লাফিয়ে উঠল, বলল, আমার একটা এস টি ডি আসার কথা আছে বাবা, আমি ধরছি।

ওঁরা চারজন বারান্দায় বসেছিলেন পরস্পরের দিকে মুখ করে। বারান্দার কোলে ঘর, ঘরটা ছায়া-ছায়া দেখাচ্ছে, ঝিলিকের বিস্কুট রঙের পোশাক ঘরের রঙের সঙ্গে প্রায় মিশে গেছে। ওর খোলা চুলের ঢাল দেখা যাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে নাকের ডগা। সবাই প্রায় একসঙ্গে ঘরের দিকে মুখ ফেরালেন, কেননা—মাউথপিসের মধ্যে ঝিলিক বলছে—আরেকটু চেঁচিয়ে বল রিণ্টু, ভালো করে শুনতে পাচ্ছি না, কেমন একটা ভোঁ ভোঁ

আওয়াজ হচ্ছে....হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে.....ডিসিশন নিয়েছিস! বাঃ, চমৎকার, হ্যাঁ ডিসিশনটাই আসল, তোর চোদ্দ আনা বুদ্ধিবৃত্তি-ম্যাচুওরিটি-জীবনবোধ ওই ডিসিশনের মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পাবে। কী বললি? গুড। ভেরি গুড, আই কনগ্রাচুলেট ইউ, ঘটনাচক্রে কাকু-কাকিমা আজ এখানে। তুই ওঁদের বল, নিজেই বল....হ্যাঁ ন্যাচার‍্যালি খুশি হবেন।

মাউথপিসে হাত চাপা দিয়ে ঝিলিক এদিকে চেয়ে বলল-- কে আসবে? কাকু না কাকিমা, রিণ্টু মালদা থেকে ফোন করছে, ডিসিশন নিয়েছে....

জড়বৎ বসে থাকেন শোভন-শোভনা। কী ডিসিশন রিণ্টুর, যাতে ঝিলিক তাকে কনগ্র্যাচুলেট করে? কী সেই ডিসিশন যা শুনলে তাঁরা নাকি ন্যাচার‍্যালি খুশি হবেন? বুদ্ধিবৃত্তি-ম্যাচুওরিটি-জীবনবোধ? কী জীবনবোধের বার্তা শোনাবে রিণ্টু, তাঁদের নয়নের মণি, একমাত্র আদরের সন্তান?

বাচ্চু কেন ফিরে এলো

সুস্মিতার স্বামী অলকেশ যখন স্কুটার অ্যাক্সিডেণ্টে মারা গেল, তখন সুস্মিতার বয়স চল্লিশও পার হয় নি। আর বাচ্চু একটা নেহাৎ বালক। অলকেশ পাঁচ মাসের কাছাকাছি সময় কোমায় পড়ে রইল জীবন্মৃত হয়ে। ডাক্তাররা বললেন ক্লিনিক্যাল ডেথ হয় নি। নাড়ি জানান দিচ্ছে, শারীরিক ক্রিয়াকর্ম হয়ে যাচ্ছে, শুধু জ্ঞান নেই। তাঁরা খুব সম্ভব জানতেন, এই জ্ঞান আর ফিরবে না। কিন্তু সুস্মিতা বা তার কোনও আত্মীয়-স্বজনকেই কথাটা বলা ভালো মনে করেন নি। পাঁচ মাস ধরে সুতরাং তিনটে প্রক্রিয়া চলল। প্রথম—সুস্মিতার প্রতিদিন নতুন আশা নিয়ে মিলিটারি হাসপাতালে প্রবেশ করা, আজ নিশ্চয়ই সে অলকেশের চৈতন্যলাভের কোনও না কোনও লক্ষণ দেখবে। দ্বিতীয়—আত্মীয়-স্বজনদের প্রতিদিন অলকেশের একটু একটু করে শীর্ণ-হয়ে-যাওয়া ছোট-হতে-থাকা অচৈতন্য শরীরটার দিকে তাকাতে তাকাতে তার মৃত্যু-কামনা করা। কারণ এই শরীরে যদি কোনদিন সাড় ফিরে আসেও, এ যে কোনদিন আর স্বাভাবিক হতে পারবে না, দুর্বহ এক বোঝা হয়ে থাকবে—এ কথা তাঁরা বুঝতে পারছিলেন এবং মৃত্যুশোক উত্তীর্ণ হয়ে ধীরে ধীরে যুক্তিপূর্ণ মনোভঙ্গিতে পৌঁছচ্ছিলেন। সুস্মিতার পক্ষে সেটা সম্ভব ছিল না। এবং তৃতীয়—বাচ্চুর হঠাৎ বড় হয়ে যাওয়া।

এই তৃতীয়টাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে অস্বাভাবিক। বাচ্চু প্রতিদিন হাসপাতালে বাবার শয্যার পাশে বসে নির্নিমেষে তার বাবার মুখের দিকে চেয়ে থাকত। ডাক্তাররা কী বলতেন, তার মা কী বলছে, কাকা-মামা-মাসী-পিসিরা কে কী বলছে, কীভাবে প্রতিক্রিয়া করছে সে কিছুই দেখত না। খালি নির্নিমেষে বাবার মুখ দেখত। মাঝে মাঝে বাবার মুখ-হাত-পা খিঁচিয়ে উঠছে, চোখের ভেতর তারা নড়ছে। অন্য কারো কথা, কারো আশ্বাস বা হতাশার কোনও মূল্যই তার কাছে আর নেই। সে নিজে নিজে বুঝতে চাইছে তার এই বাবা, যে মাত্র কদিন আগে কমাস আগেও অদ্ভুত জীবন্ত ছিল, ছোট মাসি-মেসোর জন্য দই আনতে গিয়ে যে বাবা লরির ধাক্কায় নর্দমায় পড়ে গিয়ে লোকবাহিত হয়ে ঘরে ফিরল কর্দমাক্ত এবং রক্তাক্ত হয়ে, সেই বাবার কথা না-বলা, না-হাসা এই নিশ্চুপ-পড়ে-থাকার মধ্যে কী রহস্য আছে। তার মনোযোগের সারাৎসার দিয়ে সম্পূর্ণভাবে বুঝে নিতে চাইছে।

অবশেষে বাবার হৃৎ-স্পন্দন থেমে গেলে তাঁর মুখাগ্নি করে বাচ্চু বাড়ি ফিরেই কাছা গলায় পড়তে বসল। তার বার্ষিক পরীক্ষা সামনে। সে আর সময় নষ্ট করতে পারে না। পাশের ঘরে যখন তার মাকে ঘিরে অন্যান্য মহিলারা কান্নায় ভেঙে পড়ছিলেন, সে হঠাৎই একবার উঠে গেল। দরজাটা খুলে বলল—'এতো শব্দ করলে আমি পড়বো কী করে?' তার গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যাতে উপস্থিত সবাই চুপ করে গেল। তার আচরণ সবার কাছেই খুব অস্বাভাবিক ঠেকল। সুস্মিতা পাঁচ মাস ধরে নিজের অজান্তেই স্বামীর মৃত্যুর জন্য হয়ত প্রস্তুত হয়ে ছিল, তাই তার নতুন করে ভাবনা হল আকস্মিক আঘাতে বাচ্চুর কিছু হয় নি তো? সে উঠে গিয়ে বাচ্চু যে ঘরে পড়ছিল, সেই ঘরে পাতা

তক্তাপোষের ওপর গিয়ে বসল, বাচ্চু বলল—'দরজাটা বন্ধ করে দাও মা। শোও। ঘুমিয়ে পড়ো।'

বাচ্চু সে বছর বার্ষিক পরীক্ষায় প্রতিটি বিষয়ে অদ্ভুত নম্বর পেয়ে ফার্স্ট হল। সে যখন পড়ে, এমন নিবিষ্ট হয়ে পড়ে যে ডাকলে শুনতে পায় না।

অলকেশের মৃত্যুর প্রথম ধাক্কাটা কেটে যাবার পর, তার আত্মীয়রা অর্থাৎ জ্যাঠা-কাকারা ক্রমে ক্রমে সুস্মিতার ওপর তাঁদের দাবি বাড়াতে লাগলেন। এরকম কথা শোনা যেতে লাগল, অলকেশ চিরকাল বাইরে বাইরে থেকেছে, বাড়ির জন্য কিছু করে নি, সুতরাং বাড়ির ওপর তার স্ত্রী-পুত্রের দায় বর্তায় না। বরং তাদের ভরণ-পোষণের জন্য খরচের টাকাটা তো বটেই, আরও কিছু সুস্মিতা দিক। নানা ছলছুতোয়, সুস্মিতা ও বাচ্চুকে দোতলায় যে ঘরে তারা কলকাতায় এলে থাকতে অভ্যস্ত ছিল, সেখান থেকে একতলার স্যাঁতসেঁতে ঘরে নির্বাসিত করা হল। এবং তার টাকাকড়ির হিসেব চাওয়া হতে লাগল। এই নিয়ে অশান্তি ও অপমান যেদিন চরমে পৌঁছলো, হঠাৎ দেখা গেল বাচ্চু তার সাইকেলের ক্যারিয়ারে তার চেয়ে বেশ বড় একটি বন্ধুকে নিয়ে আসছে। সে উঠোনের মধ্যে দাঁড়িয়ে বিনা ভূমিকায় বলল—'মা, তুমি রেডি হয়ে নাও। বাড়ি ঠিক করে এসেছি। মালপত্র নেবার জন্যে টেম্পো আসছে। এই খোকনদা সব ব্যবস্থা করবে, তুমি শুধু জামাকাপড়, বইপত্র গুছিয়ে নাও।'

সুস্মিতার দেওর বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠে চেঁচামেচি করে বলল —'মনে রেখো এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে আর কোনদিন ঢুকতে পারবে না—বাড়ির অংশ দাবি করতে এলে দেখিয়ে দেবো মজা।'

সুস্মিতা ইতস্তত করছিল। এতটুকু একটা ছেলের কথায় নিশ্চিন্ত না হোক নিশ্চিত আশ্রয় ছেড়ে যাওয়া! বাচ্চু তখন এগিয়ে এসে কঠিন হাতে তার হাত ধরল। বলল—'কই, রেডি হও!' সুস্মিতার মনে হল বাচ্চু তার হাত মুচড়ে দেবে তার কথা না শুনলে। বাচ্চুর তখন ঠিক চোদ্দ বছর বয়স।

তারা যেখানে এসে উঠল, সেটা মফঃস্বল। বাচ্চুর এক বন্ধুর মামারবাড়ির একতলা। নতুন বাড়ি। সবকিছুই আলাদা। সদর দরজা পর্যন্ত। বাচ্চু বলল—'আমরা দিল্লিতে, বরোদায়, কানসভালে ঠিক যেভাবে ছিলাম সেইভাবে বাড়িটাকে সাজাও মা।' সে শুধু বলেই ক্ষান্ত হল না। নিজেও হাত লাগাল। বন্ধু-বান্ধবের দল নিয়ে কদিনের মধ্যেই বাড়িটাকে ছিমছাম করে ফেলল। যেখানে ছবি থাকবার ছবি রইল, যেখানে ফুলদান গাছদান থাকবার ফুলদান গাছদান বসালো, টেবিলের ওপর ফটোফ্রেমে বাবা-মা-বাচ্চুর ছবি শোভা পেতে লাগল।

রাতে হা-ক্লান্ত হয়ে শুতে যাবার আগে বাচ্চু বলল—'মা, তোমার টাকাপয়সা কোথায় কী আছে, কত আছে, কীভাবে আছে একটু বোঝাও তো!'

যতক্ষণ না বুঝল সে কিছুতেই ছাড়ল না। তারপর হিসেব করতে বসল। করে দেখিয়ে দিল বাড়িভাড়া দিয়ে, সংসারখরচ করে, তার পড়াশোনার জন্য ব্যয় হয়েও তাদের ঠিক

কত থাকবে। সমস্ত করে-টরে সে মাকে বলল—'গোয়াবাগানের একতলার খাটালের গন্ধ-আসা মশা-অলা ঘরটার চেয়ে এখানেই তো আমরা ভালো থাকব। তা ছাড়া গালাগাল, খারাপ কথা, গোলমাল এসবের কোনটাই আমার ভালো লাগে না।'

সুস্মিতারা চলে আসায় গোয়াবাগানের বাড়িতে এবং পাড়ায় একটা প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। জনমত সুস্মিতাদেব পক্ষে।—'মা বেঁচে থাকতে বিধবা বউটাকে, নাতিটাকে বাড়িছাড়া করল গা, এমন ইতর চামারও তো দেখিনি!' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই প্রতিক্রিয়ার ধাক্কাতেই হোক, অনুশোচনাতেই হোক ধীরে ধীরে সুস্মিতার শ্বশুরবাড়ির কেউ-কেউ তার নতুন বাড়িতে আসতে লাগল, পুজো এবং জন্মদিনে বিশেষ করে বাচ্চুর জন্য উপহারাদি নিয়ে। সুস্মিতা বেশ পুলকিত। হাজার হলেও নিজের দেওর, জা, ননদ, শাশুড়ি। হয়ত মনে মনে শ্বশুরবাড়ির ন্যায্য ভাগ পাওয়ার আশাও তার মনে জেগে থাকবে। সে সুগন্ধি চা, জলখাবার ইত্যাদি তৈরি কবে তাঁদের আপ্যায়িত করে। এভাবে পুজো গেল, জন্মদিন এলো। তাঁরা আবার এসেছেন। হাতে বাচ্চুর জন্য শার্টপ্যান্টের প্যাকেট। বাচ্চু সেদিন বাড়ি ছিল। সে ঢুকে গত পুজোয় দেওয়া জামাকাপড়গুলো টেবিলের ওপর রাখল, শান্তভাবে বলল—'যেগুলো এনেছ সেগুলো এবং এগুলো নিয়ে যেও। চা-টা খাও, তারপর এগুলো নিয়ে চলে যেও। আর এসো না, আমার অসুবিধে হয়।' তার বয়স পনের পূর্ণ হয়েছে। তার ঠাকুমা, জ্যাঠা ও জেঠিমা দেখলেন তাঁদের সামনে যেন ছোট অলকেশ দাঁড়িয়ে রয়েছে। অবিকল!

অপমানের চেয়ে বেশি যেন আতঙ্ক নিয়ে ওঁরা চলে গেলেন। অলকেশই কি ছেলের মধ্যে দিয়ে এসে তাঁদের ভর্ৎসনা করে গেল? সুস্মিতা বাচ্চুকে বকতে ভয় পায়। বাচ্চু যেন তার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। সে কিন্তু-কিন্তু করে বলল—'বাচ্চু, তোর চেয়ে আমি তো কম ভুগি নি, আমিও জানি কে কী রকম, তবুও আপনজন, নিজে থেকে যখন আসছে আসুক না। ক্ষতি তো কিছু নেই!'

বাচ্চু সংক্ষেপে বলল—'আপনজন চিনতে শেখো।'

আস্তে আস্তে বাচ্চুর যেমন নিজস্ব বন্ধুর বৃত্ত গড়ে উঠেছিল, সুস্মিতারও তেমনি অনেক নতুন বন্ধু হল। প্রতিবেশিনী, বাচ্চুর বন্ধুদের মায়েরা। সুস্মিতা ভুলে যেতে থাকল তার নিঃসঙ্গতা, আত্মীয়ের অভাব। তার অনেক গুণ। সে ভালো গাইতে পারে, অভিনয় করতে পারে, রান্নাবান্নায় সে দ্রৌপদীবিশেষ। তাকে ঘিরে আপনা-আপনিই একটা সাংস্কৃতিক ক্লাব গড়ে উঠল। সুস্মিতা গান গাইছে, গান শেখাচ্ছে, রান্নার বই লিখছে। সরস্বতী-পূজো উপলক্ষ্যে ফাংশন করাচ্ছে। একে একে তিনটে কুকুর হয়েছে। সুস্মিতার ভাবনা-চিন্তা করবারই বা অবসর কই? সর্বক্ষণ সুস্মিতা! সুস্মিতাদি! সুস্মিতা মাসী!

বাচ্চু হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করল, সাংঘাতিক ভালো ভালো মার্কস পেয়ে। সে যাবদপুরে ইলেকট্রনিকস এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যাচ্ছে। কিন্তু থাকে শ্রীরামপুরে, যেতে হবে যাদবপুর। হোস্টেলেও আপাতত সীট পাওয়া যাচ্ছে না। কী হবে?

এই সময়ে সুস্মিতার এক জাঠতুত বোন, তার ছেলেবেলার সখী, বলল, আমি থাকতে

ভাবছিস কেন? হোস্টেলে সীট পেলেও বাচ্চুর সেখানে থাকার প্রশ্ন উঠছে না। আমি থাকি ম্যাণ্ডেভিল গার্ডনস-এ। সেখান থেকে যাদবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কতদূর? আমি থাকতে আমার বোনের ছেলে যাবে হোস্টেলে?'

বাচ্চুকে অগত্যা রাজি হতে হল। তার মাসিরা বিশাল ধনী। তাদের প্রাসাদোপম বাড়ি। মাসি মেসো, বিশেষ করে মেসো, বেশির ভাগই ব্যবসা উপলক্ষে লন্ডনে থাকেন। মাসির দুই ছেলে-মেয়ে বিরাট বাড়িতে একা। দুজনেই লেখাপড়ায় যথেষ্ট ভালো। বাচ্চুর আলাদা ঘর, সঙ্গে ডাবলু সি। মাইক্রোওয়েভ আভেনে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রান্না হয়ে যায়। সকালে, বিকেলে, দুপুরে, রাতে মাসির লোকজন বিশেষভাবে দেখাশোনা করে বাচ্চুকে। সকালে যে জামা কাপড় ছেড়ে সে কলেজে যায়, ফিরে এসে সেগুলো খুঁজে পায় না। বেশি খুঁজতে থাকলে মাসির লোক এসে বলে—'কাচা, আয়রণ করা সব ক্যাবিনেটে সাজানো আছে।' মাসি বলে—'যা ছাড়বি সঙ্গে সঙ্গে ওয়াশিং মেশিনে চলে যাবে। ভাবিস কেন? তিনটে ওয়াশিং মেশিন কাজ করছে। ছাড়া জিনিস ভদ্রলোকে পরে আর?'

সকালে ব্রেকফাস্ট এনে দেয় বেয়ারা। এত ব্রেকফাস্ট যে দুপুরে খাওয়ার জন্যে পেটে জায়গা থাকে না। এ বাড়িতে কেউ সেভাবে লাঞ্চ বোধহয় খায়ও না। শেষ দুপুরের দিকে খিদে পায়, তখন বাচ্চু কলেজ-ক্যানটিনে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারতে মারতে কিছু খেয়ে নেয়।

সন্ধেবেলায় তাড়াতাড়ি খাওয়া। টেবিলে এসে বসে বাচ্চু। মাসির মেয়ে তনিকা, সে বাচ্চুর সমবয়সী, এসে একটা দুটো জিনিস হাতে তুলে নেয়, কামড় দিতে দিতে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে থাকে। বাচ্চু ডাক দিয়ে বলে—'তনি, বসে খাও না। গল্প করব।' তার এখন আড্ডার মেজাজ। এই সময়েই তার মায়ের সঙ্গে গল্প জমত।

'সময় কোথায়?' তনিকা হেসে চলে যায়। তার নিজের ঘরে ক্যাসেট চালিয়ে এসেছে। কিম্বা ভিডিও। সে ঘরে ঢুকে প্রথমে পর্দাটা টেনে দেয়। তারপর দরজাটা বন্ধই করে দেয়।

ছেলেটি বাচ্চুর থেকে ছোট। সে খেতে খেতে বই পড়ে। বাচ্চু জিজ্ঞেস করে—'কী পড়ছো?'

মলাট উল্টে দেখায় রোহণ—কাফকা। প্রুস্ত।

বাচ্চু এসব লেখকের নামও শোনে নি। কিন্তু সে খুব কৌতূহলী, সাহিত্য-বিষয়েও। সে বলল—'আমাকে পড়তে দিও। আলোচনা করব।'

'কী দরকার।' ফিকে হেসে রোহণ বলে।

বেশির ভাগ দিনই সন্ধেবেলায় রোহণ বেরিয়ে যায় গাড়িতে। তনিকা ট্রামে-বাসে। কোথায় যাচ্ছে জিজ্ঞেস করলে হাসে—উত্তর দেয় না। বাচ্চুর জন্যও সকালে-বিকালে গাড়ি প্রস্তুত থাকে। মাসি বলে, 'খবর্দার; তনির মতো ট্রামে বাসে যাস না বাচ্চু! কত জার্ম, কত নোংরা, তনিটা পাগলি!' মাসি নিজেও সন্ধেবেলায় বাড়ি থাকে না। কিন্তু বাচ্চুর সন্ধেবেলাটাই বাড়ি থাকার সময়।

মাস তিনেকের মাথায় বাচ্চু ফিরে গেল। মাসি প্রথমটা বুঝতেই পারে নি। দুদিন তিনদিন পর ড্রাইভার বলল—'বাচ্চুবাবু তো গাড়িতে কলেজ যায় না। গাড়ি তো গ্যারেজে তুলে দিই।' বেয়ারা তখন বলল—'বাচ্চুবাবু তো ব্রেকফাস্ট খায় না, ট্রে নিয়ে ফিরে আসি।' মাসি তখন ঘরে ঢুকে দেখল নিভাঁজ শয্যা পড়ে আছে, ওয়ার্ডরোবের কপাট খুলে দেখল বাচ্চুর টি শার্ট, জীনস এসব ঝুলছে না, টেবিলের ওপর বাচ্চুর বইখাতা নেই। মাসি মেয়েকে জিজ্ঞেস করল—'তনি, বাচ্চু কোথায় গেল?'

—'বাচ্চু? হাউ ডু আই নো?'

মাসি ছেলেকে জিজ্ঞেস করল—'রোহণ, বাচ্চু কোথায়?'

—'বাচ্চুদাই জানে। আমি কারো পার্সন্যাল ব্যাপারে থাকি না মা।'

গাড়ি নিয়ে মাসি সোজা শ্রীরামপুরে চলে গেল। ভীষণ উৎকণ্ঠিত। পরের ছেলে! সুস্মিতা দরজা খুলে দিয়েই জড়সড় হয়ে গেল।

—কিরে সুস্মিতা, বাচ্চু এসেছে নাকি?'

—'হ্যাঁ রে। এই তো তিনদিন আগে, বিষ্যুৎবার। কলেজ থেকে চলে এলো সোজা। তোকে বলে আসে নি, না?'

সে কথার উত্তর না দিয়ে মাসি বলল—'এলো কেন? মায়ের জন্যে হঠাৎ মন-কেমন করে উঠল, না কী?'

সুস্মিতা হেসে ফেলল, বলল--'হবে হয়ত। তোকে বলে আসে নি, বোধহয় তুই আটকাবি বলে। কী পাজি দ্যাখ! তা ছাড়া তোকে পায়ও নি বোধহয় হাতের কাছে।'

এসব কথা হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর মতো করে উড়িয়ে দিয়ে মাসি বলল—'সুস্মিতা, ওর কিসের অসুবিধে? কোনও অনাদর করেছি! দ্যাখ, আমি নিজের হাতে না করলেও ওর সব কিছুর ওপর নজর রেখেছি....'

—'আরে দূর! তুই তো নজর রেখেছিসই। এই কমাসেই চেহারা পাল্টে দিয়েছিস।'

—'তবে? ওর অভিমানটা কিসের? ও ফিরে এলো কেন?'

—'অভিমান-টান নয়। ও বড় খেয়ালি। কিছু মনে করিস না। নে, এখন চা খা তো! বাবা-মরা ছেলে, মাফ কবে দিস ভাই।'

—'তা যেন হল। কিন্তু ও ফিরে এলো কেন?'

—'জানি না, বলছি না খেয়ালি!'

বাচ্চুর মাসি কোনওমতে চায়ে দুটো চুমুক দিয়ে তাড়াহুড়ো করে চলে গেল। তার ভেতরটা আসলে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে আছে। তার এমন আতিথ্য, এমন শৃঙ্খলা, হাতে-মুখে এমন সেবা, বাজারেব শ্রেষ্ঠ খাবার-দাবার! এর আগেও দু-তিনটি ছেলেমেয়ে যে তার বাড়িতে থেকে মানুষ হয় নি, তা নয়। কেউ তো এভাবে ফিরে যায় নি! বাচ্চু কেন ফিরে এলো? কোনও কিছুকে খুব গুরুত্ব দেবার অভ্যেস মাসির নেই। কিন্তু এ প্রশ্নটা তাকে ভাবাচ্ছে। বাচ্চু কেন.....।

সুস্মিতা বোনকে বলতে বাধ্য হল, সে জানে না। কিন্তু আসলে সে জানে। অর্থাৎ জানে না, বোঝে নি সঠিক। কিন্তু বাচ্চু তাকে বলেছে সে কেন ফিরে এসেছে।

শীতের কুয়াশা-ভরা রাত আটটা নাগাদ তার বড় কালো ব্যাগটা নিয়ে বাচ্চু ফিরে এলো। কমাসেই তার স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে। চোখমুখ জ্বলজ্বল করছে। দরজা খুলে সুস্মিতা অবাক। আহ্লাদে আটখানা। তারপরই খেয়াল হল, শনি-রবি তো নয়! বিষ্যুৎবার! তাছাড়া এই ব্যাগ নিয়েও সে আসে না। বাড়িতে তার একপ্রস্থ জামা-কাপড় থাকে। অসুবিধে হয় না। সে বলল—'কি রে, আজ এখন চলে এলি? —কাল কলেজ নেই?'

—'কেন থাকবে না?'

—'যাবি না?'

—'কেন যাব না?'

—'তা হলে আজ এলি?'

—'আমি চলে এলাম'—ব্যাগটা টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে বাচ্চু বলল।

'—'চলে এলাম মানে?'

—'চলে এলাম মানে চলে এলাম। আর যাব না।'

—'সে কী? কী হল? কী অসুবিধে....'

—'কিচ্ছু না।'

—'কেউ কিছু বলেছে?'

—'না তো!'

—'তা হলে? বাচ্চু, এক এক বাড়ির লাইফ-স্টাইল একেক রকম। তুই....মানে তোর কত অসুবিধে হবে বল তো? এখান থেকে কলেজ করতে হলে?'

বাচ্চু চুপচাপ নিজের ব্যাগের জিনিসপত্র যথাস্থানে রাখতে লাগল মন দিয়ে। তার মা তখনও দরজার কাছে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে।

গোছগাছ শেষ করে নিয়ে বাচ্চু হঠাৎ ফিরে দাঁড়াল। সে এগিয়ে এসে মায়ের কাঁধ-দুটো ধরল। এখন সে মায়ের থেকে পুরো এক হাত লম্বা। মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে সে বলল—'বলব। কিন্তু তুমি কি বুঝবে?'

—'বুঝি না বুঝি, বাচ্চু, তুই বল অন্তত। আমাকে তো কৈফিয়ত দিতে হবে!'

—'কৈফিয়ত? আমার কথা থেকে বোধহয় তুমি কোনও কৈফিয়ত তৈরি করতে পারবে না!'

—'তবু বল।'

—'মা, একটা মানুষ বেঁচে আছে, অথচ বেঁচে নেই, এমন অবস্থা দেখেছ? মনে পড়ে?'

সুস্মিতা শিউরে উঠল। তার চোখে এখন আর জল আসে না। শুধু একটা শুষ্ক দুঃখ আর ভয় বিকীর্ণ হতে থাকে। সেদিকে নিবিষ্ট হয়ে তাকিয়ে বাচ্চু বলল—'এই ভয়ংকর কোমা দেখে আমি জীবন শুরু করেছি মা। একটা মানুষ হাত-মুখ খিঁচোচ্ছে, তোমার দিকে চেয়ে আছে অথচ সে জানে না সে কী করছে। কোমা যখন একটা দুর্ঘটনার ফল হয়

তখন কারও কিছু করার থাকে না। ব্যাপারটা সইতেই হয়। কিন্তু কোনও কারণ ছাড়াই যখন মানুষ কোমার ভেতরে ঢুকে যেতে থাকে, খাচ্ছে-দাচ্ছে, মল-মূত্র ত্যাগ করছে, অথচ অচৈতন্য, হাত-পা খিঁচোচ্ছে ওই গোয়াবাগানের মতো, কিম্বা সাড়া দিতে পারছে না ঠিকঠাক, ধরো ম্যাণ্ডেভিলের মতো, ক্লিনিক্যালি অ্যালাইভ, বাট ডেড... ডেড ফর অল প্র্যাকটিক্যাল পার্পাসেস....তখন আমি সেই ভয়াবহ কোমা সইতে পারি না। এর জন্য যদি পৃথিবীর দূরতম বিন্দু থেকেও আমাকে কলেজ যাতায়াত করতে হয়, আমি রাজি আছি।'

বাচ্চু তাই ফিরে এসেছে।

নকশা

'শুনেছিস? অরি বিশ্বাস বেপাত্তা'—সুদেব সরকার বলল সমীরকে, 'এখনও পাবলিক জানে না।'

—'বলিস কি? এ তো অবিশ্বাস্য খবর? ফার্স্ট পেজের অ্যাঙ্কর-এ যাবে।'

—'হ্যাঁ। সে ডিটেলস বার করতে পারলে। খুঁজে আনতে পারলে তো আর দেখতে হচ্ছে না। এখন ব্যাপারটা খুন, না অ্যাবডাকশন, না স্বেচ্ছা-পলায়ন...সেটা সার্কামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স থেকে বার করতে হবে। একটু টিকটিকিগিরি আর কি।'

সমীর বলল, এই সেদিন নতুন ছবির মহরত হল অত ঘটা-পটা করে, অত খানা-পিনা নাচা-গানা। এত উল্লাসের কেন্দ্রীয় কারণই তো অরি বিশ্বাস।

—'আবার কি? কত দিন থেকে জাল পেতেছে বল তো। এতদিনে ধরা পড়ল। ধাড়ি কাতলা। আগের ছবিগুলোর দুটোই তো পাবলিক গপাগপ খেলো। প্রথমটা একটু বেশি নাটুকে হয়ে গেছিল, তা-ও।'

—'এবারেরটা জানিস তো? অরিজিৎ প্রতিভার বিভিন্ন দিকের দর্পণ বিশেষ।'

—'কী রকম?'

—'আরে আমি তো প্রেস-কার্ডে গিয়েছিলাম। পরিচালক সামন্তই বলল—এবাব উনি পঁচিশ বছরের সা-জোয়ান ছোকরা থেকে বাহাত্তুরে বুড়ো পর্যন্ত সাজছেন। লিডার। অরিজিতের অ্যাক্টিং, অরিজিতের মেকআপ-এর উপরই ছবিটা দাঁড়িয়ে আছে।'

সমীর বলল—'হতেই পারে। স্টেজেব উপর তো চাষাভুষো সাজলে মনে হয় এই বুঝি দেহাত থেকে ধরে নিয়ে এল। আবার মাঁতেল হয়ে নামলে মনে হয আরে, এই তো সেদিন ইনিই কফি-হাউসের লর্ডস-এ বসে যুক্তি-তক্কো-গপ্পো ফেঁদেছিলেন। আচ্ছা সুদেব ওঁর 'অম্বরীষ'-এর কী হবে? বা হচ্ছে?'

—'চলছে। একেবারে তো ছেড়ে দেননি। টিমটা গড়ে ছিলেন প্রাণ দিয়ে। কাজেই চলছে। ওঁর নামেই এখন পয়সাগুলো উঠে আসছে সব। তবে ওরা একটু মিইয়ে গেছে। আমার ভাইয়ের বন্ধু আছে তো ওখানে। বলছিল টিম-ওয়ার্ক খুব ভাল কথা। কিন্তু সেটা করাতে ব্যক্তিত্ব লাগে। জ্ঞান, ভালবাসা এবং ক্রোধও লাগে। সে সব অরিজিৎ বিশ্বাসেব মতো আর কারও নেই। সত্যি, ওই রকম চলা-বলা-গলা পাল্টাতে আর কাউকে দেখলাম না। এক কেয়া চক্রবর্তী পেরেছিল 'ভালোমানুষ'-এ।'

অরিজিৎ বিশ্বাসকে শেষ দেখা গিয়েছিল শর্মিলি সেনের গাড়িতে। শর্মিলি সেন মানে শ্যামলী তরফদার। প্রচারের প্রয়োজনে পাল্টে ফেলা হয়েছে নামটা। প্রাচীন শ্যামলী হয়েছে মডার্ণ শর্মিলি। তরফদারটা সেতারে ছাড়া চলে না এ বিষয়ে সবাই একমত। এবং পদবী খুঁজতে খুঁজতে স্বভাবতই সেন। সেন পদবীটা বাংলা-জয়ী। যেমন বল্লাল সেন, সুকুমার সেন, বনলতা সেন, সুচিত্রা সেন....। দুষ্টু লোকেরা বলে শর্মিলি নয়, এটুলি। অরি বিশ্বাসের লেটেস্ট। শর্মিলিও রয়েছে ছবিটায়। তারই সাদা অ্যামবাসেডার-এ অরিজিৎকে শেষ দেখা

গিয়েছিল। শর্মিলির শফার, ক্যামেরাম্যান ধীরু ব্যানার্জি এবং অরিজিতের নিজস্ব মেকআপম্যান শিবসাধন সেনাপতি ঠেসেঠুসে তাঁকে সাদা অ্যামবাসেডরটায় তুলেছিলেন। অরিজিৎ স্ববশে ছিলেন না।

চোদ্দ পনের লাখ খরচ হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। বাংলা ছবির পক্ষে যথেষ্ট। প্রচার দেওয়া হচ্ছে খুব। ডিস্ট্রিবিউটার মুখিয়ে আছে। সবারই ধারণা ছবি পড়তে পাবে না। এমত সময়ে অরিজিৎ সেটে এলেন না। প্রথমেই ফোন করা হল শর্মিলির ফ্ল্যাটে। হয়তো সেখানেই মশগুল হয়ে রয়েছে। আর্টিস্টরা যে যত প্রতিভাশীল হোক না কেন আসলে সব... সামন্ত একটা মধুর গালাগাল উচ্চারণ করল মনে মনে। কিন্তু না, শার্মিলি জানে না, ন, সেদিন ওঁকে ওঁর হোটেলের ঘরেই পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। না, উনি শর্মিলির ফ্ল্যাটে যাবার অবস্থায় ছিলেন না।

না, সাতাশে অক্টোবর থেকে অরি বিশ্বাসের চাবি ম্যানেজমেণ্ডের কাছে, ঝুলছে। আসেননি। না, একবারও না।

'অম্বরীষে'র অফিসে ফোন করা হল।

—'আপনারা জানেন না, আমরা জানব?' অভিমানী উত্তর।

—'সত্যি সত্যি জানেন না?'

—'মানে? আপনারা কি ভাবেন ওঁকে আমরা কিডন্যাপ করব?'

তবে 'অম্বরীষ' থেকে কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবের ঠিকানা মিলল। প্রায় সকলেই বললেন, অরি বিশ্বাসের কোনও সংবাদই তাঁরা রাখেন না। একজন রেগে মেগে বললেন,—'আপনারা, এই আপনারাই চাঁদির জুতো মেরে তাকে আমাদের কাছ থেকে ফুসলে নিয়ে গেছেন, আবার আমাদের কাছেই তার খোঁজে এসেছেন? পালিয়েছে? খুব ভাল কথা। এমনটাই চাইছিলুম। খোঁজ পেলেও বলব না।' পরবর্তী অভিযান আত্রেয়ী ভট্টাচার্যর আস্তানায়। আত্রেয়ী অরিজিতের ভূতপূর্ব স্ত্রী। অনেক চেষ্টা করে তাঁর ঠিকানা জোগাড় হয়েছে। আসলে ব্যাপারটা খুব যাকে বলে ডেলিকেট। আত্রেয়ী দেবীও এক সময়ে বহুদিন 'অম্বরীষ'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নাটকে অংশ নিতেন না। উনি ছিলেন শিল্পী। সেট তৈরি করা, আঁকা জোকার কাজ, পাবলিসিটির জন্যে লে-আউট তৈরি করা এইসবের দায়িত্বে ছিলেন। অরিজিতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিঁড়ে যাবার পর 'অম্বরীষ'কেও উনি ছেড়েছেন। 'অম্বরীষ'-এর ক্ষতির খাতায় উনি দু নম্বর। আজকাল এক ইনটিরিয়র ডেকোরেটর্স সংস্থায় কাজ করেন। ও:, তাঁর অফিসে ফোন করায়, অরিজিতের খবর জিজ্ঞেস করা হচ্ছে শুনে উনি দ্বিতীয় শব্দ উচ্চারণ না করে ফোন নামিয়ে রাখলেন। অগত্যা ওঁর বাড়ি। দু কামরার একটা ছোট্ট ফ্ল্যাট। উত্তর কলকাতার একটা সরু গলিতে। সামন্তকে উনি চিনতেন না বলেই বোধহয় দরজা খুলে দিয়েছিলেন। অরিজিতের প্রসঙ্গ তুলতেই বললেন—'আর কত সরবো?,

—মানে? আপনি কী বলছেৰ আমি ঠিক...'

—'বলছি, আর কত সরবো? এই দেখুন, আট বাই দশ দুখানা ঘর কুল্লে, রান্না আর খাওয়া এক জায়গাতেই সারি। বাথরুমটা রান্নার জায়গার একেবারে পাশেই। উত্তর

পশ্চিমের ফ্ল্যাট। শীতকালে কী ঠাণ্ডা ধারণা করতে পারবেন না। বাবা, মা, ভাই, বোন কেউ নেই। মানে, থেকেও নেই। আর কোথায়? আর কত সরবো?'

—'যদি একটা ধারণাও দিতে পারতেন। একটা আইডিয়া....উনি কোথায় যেতে পারেন'।

—'আইডিয়া? আমার মাথায় অত আইডিয়া আবার খেলে না, বুঝলেন? কী নাম আপনার? সামন্ত? আমি ওই ব্রথেল-ট্রথেল পর্যন্ত জানি। তারপর জাহান্নমের পথে যেতে ঠিক কতগুলো, কত রকম স্টপ আছে, থাকে, আমার জানা নেই। এবার আপনি আসুন। কই উঠুন? কুইক। আমার কাজ আছে।'

সামন্ত কপালের ঘাম মুছতে মুছতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। বাপরে। কী মহিলা। দিব্যি ঠাণ্ডা, শান্ত-শিষ্ট মনে হয় দেখলে। এ যেন কোল্ড ড্রিংক-এর বোতল। হাত বোলালে ঠাণ্ডা। ছিপি খুললেই ফোঁস্‌স্‌।

ট্রেনটা আরও স্পিড নিচ্ছে না কেন? কী হবে এতগুলো চোতা স্টেশনে থেমে? নিদারুণ অধৈর্যে, বিরক্তিতে ষষ্ঠতম সিগারেটটা শেষ না করেই বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেন অরিজিৎ বিশ্বাস। এক ব্যাটা ভিখিরি লোপপা ক্যাচের মতো সেটা লুফে নিল। এটাই একটা অকাট্য প্রমাণ যে যতটা স্পিডে স্টেশন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা ততটা স্পিড নিচ্ছে না গাড়িটা। প্লেনে যাওযার জায়গা নয়। গাড়িতে গণ্ডগোল। গ্যারাজে অতএব। একগাদা টাকা দিয়ে ঘটা করে বিদেশি গাড়ি কেনবার মজাটা এবার বোঝো হে বিশ্বেস। অতীন, সর্বেশ্বর, মণীশ সব্বাই বারণ করেছিল। হো-হো করে তাদের কথা উড়িয়ে দিয়েছিলে। দিয়েছিলে তো? ভেবেছিলে গ্রুপ থিয়েটার হল শো-বিজ-এ মিডল ক্লাস। একেবারে মিডল মিডল ক্লাস। বড় বড় বক্তিমে করো সুযোগ পাবে। ফটাফট হাততালি। হ্যাঁ, তা-ও। রিভিউ?—প্রচুর প্রচুর। কিন্তু লক্ষ্মী কখনও ঝেড়ে কাশবে না, দাদা! ঢাকের দায়ে মনসা বিককিরি। তা সেই গ্রুপ থিয়েটারের ওরা দেশি-বিদেশির তফাত আর কী বুঝবে?

যেমন চোতা ট্রেন, তার তেমনই চোতা ফার্স্ট ক্লাস। বাথরুমে বেসিনটা ফটাস করে খুলে এল। মানে কোনও শ্রীমান তাকে সরাবেন শিগগিরই। কাজ এগিয়ে রেখেছেন। সপ্তম সিগারেটটা ধরালেন অরিজিৎ। রাত বাড়ছে। রাত। আহা কত? রাত বড় ভাল মাল। ঝিকমিক ঝিকমিক আলো। চেনা মুখ অচেনা। অচেনা মুখ যেন বড় চেনা চেনা ঠেকে হে। খাও দাও বেপাত্তা হয়ে যাও। কে তোমায় চ্যাং-দোলা করে তুলে নিয়ে গেল, কার সঙ্গে কী বোঝাপড়া হল, কাকে কাকে চুমু খেলে, সব রঙিন বুদবুদের মতো ফেটে যায়, আবার গজায়, আবার ফাটে, আবার গজায়। আর সকাল? সকাল হল শালা ঘেয়ো কুকুরের বাচ্চা। ছাল চামড়া শুদ্ধু উঠে গেছে। ছ্যাঃ! খোয়ারি ভাঙার সকাল। অন্য সময়। অন্য সময়ে মেজাজে থাকলে তুমি সকাল, দুপুর-বিকেল কিছুর পরোয়া করো না অরি বিশ্বেস। কর না কি? নাঃ, করি না। কাজ কবি। কা-জ। এমন কাজ যে হোল ওয়ার্ল্ডের তাক লেগে যায়। এই পাঁচ ফুট সাড়ে এগারো ইঞ্চির খোলে ডিনামাইট ঠাসা আছে হে সামন্ত। পাল্লা দিতে চেষ্টা কর। পারবি না।

আরেকটু পরেই এরা ডিনার দেবে বলেছে। ইংলিশ ডিনার আবার। হাঃ হাঃ। পায়রার ঠ্যাং, বেমালুম পায়রার ঠ্যাং চালাবে মোরগার ঠ্যাং বলে। ঘোড়ার পেচ্ছাপের মতো চা খাইয়েছে কয়েকবার। এবারে পায়রার ঠ্যাং। রাসকেল সব, স্কাউড্রেল। গোটা রেলওয়েজ, রেলওয়ে'মিনিস্ট্রি। এদের চাকরিতে যে যেখানে আছে, সব, স-ব। পয়সা নেবে, গলায় গামছা দিয়ে, দেবার বেলায় লবডঙ্কা। এদিক থেকে হিন্দি ফিলমও সৎ। পাবলিক রেপ চায়, রেপ দেয়, মারদাঙ্গা চায়, মারদাঙ্গা দেয়। আধ ন্যাংটো মেয়েছেলে দেখতে চায়, তো তাই দেয়।

সুটকেসটা খুললেন অরিজিৎ। মাল বার করতে হবে। নইলে পায়রার ঠ্যাং গলা দিয়ে নামবে না। সামনে আবার তিনটি পুঙ্গব বসে। বহুক্ষণ থেকে গবাদি পশুর মতো চেয়ে আছে। হয় বাইরের দিকে, নয় তাঁর মুখের দিকে। চিনতে পেরে থাকবে। চেনো বাবা, চেনো। খালি ভাব জমাতে যেও না। আর 'চরণামেত্তো'ও আশা কোর না। যারা একা একা মাল এনজয় করতে পারে না, অরিজিৎ তাদের দলে নয়। তা কয়েক ঢোক খাবার পরে দেখলেন পুঙ্গবগুলি প্রকৃতি দেখছে। অদূর ভবিষ্যতে যখন গপ্পো ফাঁদবে তখন কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে যাবে—'জানিস ফটিক, অরিজিৎ বিশ্বাসের সঙ্গে সেবার ট্রাভল করছিলুম। কী সদাশয় ভদ্রলোক ঃ খুব গপ্পে। যা জমেছিল না। শেষ কালটা মানিক-অরিজিদ্দা, অরিজিদ্দা-মানিক'....ইত্যাদি ইত্যাদি।

ট্রেনটা হঠাৎ হেঁচকি তুলে থেমে গেল। এতক্ষণ বেশ 'আমি যাব না, তুমি যাবে না, তুমি যাবে না, আমি যাব না' করে যে করে হোক চলছিল। এখন যেন গোঁত্তা খেয়ে ঘুড়ি লাট খেয়ে পড়েছে। বোতলটা ঢুকিয়ে সুটকেসের ডালা বন্ধ করে দিলেন অরিজিৎ। বাইরে পৃথিবীর আদি রঙ, নিকষ কালো। বন-জঙ্গলের মতো মনে হচ্ছে জায়গাটা। উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। উল্টো দিকের সিট থেকে একটি যুবক চেঁচিয়ে উঠল—'স্যর, এখানে নামতে যাবেন না, অন্ধকার, অনেক নিচু, তাছাড়া ভীষণ ডাকাতি হয় এ লাইনে। দরজা একদম খুলবেন না, কাইন্ডলি।'

অপাঙ্গে একবার চেয়ে দেখলেন অরিজিৎ। ডাকাত। মানে দস্যু। মানে গুণ্ডা? অর্থাৎ মাফিয়া? সর্বনাশ। তিনি ফিরে এসে অষ্টম সিগারেটটা ধরালেন। হঠাৎ মনে হল পকেটে বিছে কামড়াচ্ছে। টেলিগ্রাম। টেলিগ্রাম। হোটেলের কাউন্টারে খোয়ারি ভাঙার সকালে আকাট টেলিগ্রাম একখানা। পাঁচ দিন না সাড়ে ছ দিন পার হয়ে গেছে। পোস্টাল সার্ভিস কী তোর বাপের। যে টেলিগ্রাম করলেই সঙ্গে সঙ্গে দিতে হবে। কী আছে ওতে জানেন অরিজিৎ, তবু আরেকবার খুলে পড়তে লাগলেন। তিনটে শব্দ। ব্যাস আর কিছু না। এখন তাহলে আমি কী করব। হাততালি কুড়োতে পারি, কনট্রাক্ট সই করতে পারি, মাল খেতে পারি। কিন্তু হনুমানের মতো লম্ফ তো দিতে পারি না। আর সব স্পোর্টস ছেড়ে এখন পশ্চিমবঙ্গে এই লম্ফ দেওয়ার খেলাটিই প্রমোট করা উচিত। ট্রেন ধরবে? পাথর পাতা স্ট্রান্ড রোড দিয়ে রে রে করে আসছ! কুছ পরোয়া নেই। গুনে গুনে দশ পা পিছিয়ে যাও তারপর রই রই করে স্পিড নিয়ে লাফ ঝাড়ো, এক লম্ফে হাওড়ার পুল, দুই লম্ফে

হাওড়ার নতুন অ্যানেক্স। হাজরা মোড় থেকে ঠনঠনে পর্যন্ত জলে ভাসছে? পাঁচিশ মিনিটের প্রবল বর্ষণে কলকাতার জনজীবন বিপর্যস্ত? আবারও ওই উল্লম্ফন ভরসা। লাফ দাও বঙ্গ সন্তান, লাফ দাও। লাফ দিতে দিতে শিরদাঁড়ার তলার হাড়টি বাড়তে পারে। কার্টিলেজ, শক্ত হাড় নয়। এর নাম অভিযোজন। সোজা বাংলায় অ্যাডাপ্টেশন। এয়ার পিলো মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়লেন অরিজিৎ।

—'আমি এবার যাই খোকা, আমার কেমন সব ত্যাগ হয়ে যাচ্ছে।'

—'সে কী? রাগ করেছ? এত অভিমান কবে না মায়ি। বিহার শরিফে ট্রাক নিয়ে গেছি। ন দিনের জায়গায় পনের দিন। এরকম একটু আধটু হয়েই থাকে মাগো। অপরাধই যদি হয়ে থাকে এবারের মতো মাফ করে দে মা। আর কখনও এমন হবে না।'

—'না রে, অভিমান-টান নয়। একটুও উদ্বেগ হয়নি আমার। সেটাই আশ্চর্য। জানিসই তো আগে তোর ফিবতে দেরি হলে কেমন মুখ শুকিয়ে আমসি করে থাকতুম। এখন, এবার এসব কিছু হল না খোকা। তুই সাবালক হয়ে গেছিস। নিজেব পথে চলবি।'

—'মা, মা, মা। তুমি বেঁচে আছ তো? কথা আছে। কথা ছিল। অনেক।'

—'মা তুমি চুপ করে থেকো না। একটু কথা বলো। একটু।'

—'স্যার, স্যার আপনার কি কোনও কষ্ট হচ্ছে?'

ধড়ফড় কবে উঠে বসলেন অবিজিৎ।

'ঘুমের মধ্যে খুব যন্ত্রণার শব্দ করছিলেন।'

—'ওহ সরি। সরি টু হ্যাভ ডিসটার্বড ইউ।'

অরিজিৎ মাথার এলোমেলো চুলের মধ্যে দিয়ে আঙুল চালালেন। ঢক ঢক করে জল খেলেন খানিকটা। নবম সিগারেটটা ধরালেন। ভোর হয়ে আসছে। ঘুম জড়ানো প্ল্যাটফর্ম সব পার হয়ে যাচ্ছে। আধো আধো গলায় 'চা-গ্রম।'

এই এদিকে দেখি, দু গ্লাস, হ্যাঁ। যাক পৌছানো গেল। তাহলে পৌছানো যায়।

ফাঁকা ফাঁকা জায়গাটা। যখন মাকে রাখতে এসেছিলেন, তখন আবও ফাঁকা ছিল। এখন অনেক বাড়ি ঘর। দোকান পাট। চায়ের স্টল। ধাবা। টেম্পো, অটো, সাইকেল রিকশা। কিন্তু বাগান-ঘেরা ছোট্ট বাড়িটিতে বসে মনে হল কিছু নেই। যা কিছু আপাত পরিচিত, জীবন-যাপনের যন্ত্রাংশ, কিছু নেই। মা-ও তো নেই। মা সেবা-ভবনে। অথচ এই ছোট বাড়িটাতে মা যেন আছে। সেই গর্ভধারিণী যিনি এক হাতে বড় করে তুলেছিলেন একটি শিশুকে, একটি বালককে। একটি কিশোরের, একটি যুবকের যিনি সব বুঝতেন। এক সময়ে তিনি মা-বাবা-দাদা-দিদি-বন্ধু-সবই ছিলেন। সেই মা-ই তো? না, মা তো নয। যেন জননী-জননী মনে হয়।

অল্পবয়সী ডাক্তারটি বললেন—'সঙ্কটটা কেটে গেছে। হার্ট ডাইলেটেড। এদিকে প্রেশার বড্ড ফ্লাকচুয়েট করছিল। ভাবিনি বাঁচাতে পারব।'

মা ক্ষীণকণ্ঠে বলে—'হ্যাঁ, ওকে ভাল করে বলো। নইলে ও ভাববে...'

ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে মার দিকে চেয়ে অরিজিৎ বললেন—'থামো তো তুমি....!'

মা বিছানা ছাড়ল। ধীরে ধীরে বাগানে বেড়াচ্ছে আজকাল। ভোরে একবার, সন্ধ্যায় একবার। সঙ্গে অরিজিৎ। —'মা তুমি বল পাচ্ছ তো শরীরে?'

—'পাচ্ছি। কিন্তু খোকা কত দীর্ঘদিন আমাকে দেখিস না। আমি থাকলেই বা কী? গেলেই বা কী! যুক্তি দিয়ে বোঝ। বোঝবার চেষ্টা কর।'

—'ঠিক আছে। যুক্তি দিয়েই বুঝি। মা, তুমি আছ, কোথাও আছ, এই জ্ঞানটা আমার বেঁচে থাকার পক্ষে, কাজ-কর্ম করার পক্ষে দরকার। তুমি দূরে থাকলেও আছ তো! ইচ্ছে করলেই দেখতে পাব। না হলে আমার সব গোলমাল হয়ে যায়।'

মা খুব মৃদু কণ্ঠে বলল—'আমি থাকলেও কি গোলমাল আটকাতে পারি খোকা?'

অরিজিৎ অনেকক্ষণ ধরে ভাবলেন, তারপর বললেন—'হয়তো পারো। ইচ্ছে করলে।' তাঁর মাথার মধ্যে একটা স্তব্ধতা, আশরীর কেমন একটা শৈথিল্য, আলস্য। প্রবল ঝঞ্ঝাবাত্যা থেকে কোনও গতিকে রক্ষা পেয়ে যদি তার নৌকা পায় সুবাতাস, শান্ত জল, সবুজ দ্বীপ, তাহলে নাবিক যেমন ডাঙা আর ছাড়তে চায় না, তেমনই।

হঠাৎ একদিন খেয়াল হল। জিজ্ঞেস করলেন—'মা, তাই তো! তোমার গুরু কই?'

মা হাসল, বলল—'কই? গুরু নেই তো!'

—'তবে? তোমার ঠাকুর? যার জন্য তোমার নাকি সব ত্যাগ হয়ে গেল?'

মা সন্তর্পণে ফুলের গাছগুলোতে হাত বোলাতে লাগল—'এখানে তোর ভাল লাগছে না?'

'ভাল লাগছে বৈকি! এত সুন্দর জায়গা! এমন নিঃশব্দ। আমার ভিতরটা জুড়িয়ে যাচ্ছে।'

মা নিচু হয়ে একটা গোলাপ গাছের ফুল সুদ্ধু ডাল সাবধানে তাব দিকে ফিরিয়ে বলল—'দ্যাখ।'

অদ্ভুত উজ্জ্বল মভ রঙের গোলাপ। আকারে প্রায় একটা মাঝারি চন্দ্রমল্লিকার মতো। মভ গোলাপ অরিজিৎ কখনও দেখেননি। শিশিরে ভেজা। অদ্ভুত কোমল, মসৃণ স্পর্শ।

—'আরও আছে' মা বলল।

গাছে গাছে যেন তারা ফুটে রয়েছে। সাদা তারা, নীল তারা, আলতা রঙের তারা। বিশাল সাদা ক্যাকটাসের ফুল ফুটেছে। তার বাইরেটা সাদা, ভিতরটা হলুদ।

একদিন আবিষ্কার করলেন খুব ভোরবেলায় মেয়েরা সব ঝুড়ি ঝুড়ি ফুল আনে। আর একটা বেদির উপর মা তাদের সঙ্গে মিশে ফুলের নকশা বানায়। ঘন ঠাসবুনুনি সব নকশা! গন্ধে-বর্ণে যেন নন্দন-কানন।

—'এই বেদিটাই তাহলে তোমার ঠাকুর!' মা কিছুই বলল না। সব উত্তরই যেন তাকে নিজেকে খুঁজে পেতে হবে। কিন্তু রোজই ভোরে এসে সে দেখতে থাকে শ্বেতজবা, মভ গোলাপ, কদম্ব, শিরিষ, কুমুদ, যুঁই, ফুলের পরে ফুল, ফুলের পাশে ফুল। অখণ্ড মনোযোগে নকশা তৈরি হচ্ছে।

মেয়েদের সে জিজ্ঞেস করে—'কী করিস তোরা? যে যার জীবনের নকশা খানা ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করছিস না কি?'

—'যা বলেন', মেয়েরা দুলে দুলে হাসে, তারপর আবার ফুলের মধ্যে ডুবে যায়। দেখতে দেখতে একদিন কেমন জেদ চেপে গেল। অরিজিৎ বললেন—'ঠিক আছে। আমিও সাজাব। অনেক নির্মাণ তো করলাম জীবনে, দেখি এটা কেমন পারি। দে আমাকে ফুল দে।'

মায়েব বাড়ির মেয়েগুলি হাসে—'নিজের ফুল আপনাকে নিজেকেই বেছে নিতে হবে, এটাই নিয়ম।'

অরিজিৎ হাত বাড়িয়ে তুলে নিলেন। বিচিত্র বর্ণেব সব বোগেনভিলিয়ার মতো পত্রালি।

মেয়েরা বলল—'বাঃ। আরক্ষা নিয়েছেন দাদা। ভালো। ভাগ্যবান আপনি।' তখন তিনি তুলে নিলেন লাল রঙের, সাদা রঙের, হলুদ রঙের গোলাপ। মেয়েরা যেন রুদ্ধশ্বাসে চেঁচিয়ে উঠল—'শরণাগতি। শরণাগতি। আপনি কিন্তু শরণ নিয়ে নিলেন দাদা মনে রাখবেন।'

—'কীসের শরণ? কার শরণ?' সব কিছু উড়িযে দেবার হাসি হাসতে হাসতে অরিজিৎ ডবল রজনীগন্ধার ছড়িতে হাত রাখলেন। মেযেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল — 'অ্যাসপিরেশন। অভীপ্সা বাছলেন দাদা।' অরিজিৎ তুলে নিলেন আকন্দ। ওরা উদ্বিগ্ন হযে বলল—'সাহস, সাহস! ঠিক আছে তবে সাজান এবার। বেদীর নৈর্ঋত কোণটুকু আপনার জন্যে ছেড়ে রাখলাম।'

সেই থেকে অরিজিৎ সাজান। কখনও অভীপ্সার গুচ্ছ মাঝখানে লম্বা ফুলদানে উল্লম্ব রেখায় বসিয়ে তার চারদিক ঘিরে শরণাগতির চক্র রচনা করেন। সাহসের রেখা, চক্রের অরের মতো চারদিক থেকে গিয়ে ছুঁয়ে থাকে শরণের গোলাপগুলোকে। আরক্ষার পত্রালি দিয়ে দুর্ভেদ্য বৃত্ত রচনা করেন তারপরে। কখনও রজনীগন্ধা দিয়েই শুরু করেন। তার কেন্দ্র নেই। সব সোপান। তাদের দুপাশ ঘিরে জমাট হয়ে থাকে রক্ত গোলাপ। তাবপরে আকন্দ, হলুদ গোলাপ। এইভাবে নানা নকশা বুনতে থাকেন অরিজিৎ। সাজাতে সাজাতে একদিন নিজেই বললেন, বাঃ। নানা রঙের বোগেনভিলিয়ার পাপড়ি পুরো নকশার উপর ছড়িয়ে দিতে থাকেন অরিজিৎ। পত্রং পুষ্পম। পত্রং পুষ্পম। কানে আসে বাড়ির দিক থেকে একটা তূরীয় উল্লাস, একটা কোলাহল যেন ভেসে আসছে। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ে।

উঠতে উঠতে অরিজিৎ একটা আলোর ঝলক দেখতে পেয়ে ভেবেছিলেন বিদ্যুৎ চমকালো। কিন্তু মুসাভার ঝাড়ের ওপার থেকে সুদেব সরকার উঠে দাঁড়াল। পাশে সমীর। সে-ই ফটোটা তুলেছিল।

—'কী দাদা চিনতে পারছেন?' অনেকগুলো দিনের অনভ্যাস, অরিজিৎ ভুলে গিয়েছিলেন। এখন সমস্ত ব্যাপারটা ফ্ল্যাশ-গানের ঝলকের মতোই ঝট করে বুঝে ফেললেন। সুদেব তো একজন সাংবাদিক খুব ভালো করেই ওকে চেনেন অরিজিৎ। ও-ই তাঁর সব কাজকর্মকে সবচেয়ে ভালো কভারেজ দ্যায়।

—'আরে চলো, চলো। বিষ্টি পড়ছে। খোলা আকাশের নিচে কথা হয়!'

—'কীভাবে যে আপনার ঠিকানা বার করেছি। চিন্তা করতে পারবেন না অরিজিৎদা।'

—'তাই না কি? কীভাবে করলে?' উৎসুক গলায় অরিজিৎ বললেন।

—'সে সব ট্রেড-সিক্রেট বলা হবে না।' সুদেব সমীরের দিকে চোখ রেখে হাসল। ঘরে পৌঁছে অরিজিৎ পা তুলে বসলেন তাঁর তক্তাপোষে। সুদেব বসল সামনের চেয়ারে। অরিজিৎ দেখলেন সুদেব টেপ-রেকর্ডারের সুইচটা অন করছে। চমৎকার ব্যাটারি-সেটটা ওর। ঘুরে ঘুরে ছবি নিতে থাকল সমীর। সুদেব ষড়যন্ত্রীর হাসি হাসছে —'হঠাৎ অজ্ঞাতবাসের কারণটা কী অরিজিৎদা?'

—'প্রয়োজন ছিল নিশ্চয়ই!' গলা গাঢ় করে বললেন অরিজিৎ।

—'প্রেশার না কি? খুব চিন্তা?'

—'হ্যাঁ। তবে আমার না। মায়ের। চিন্তা তাঁর জন্য?'

—'তা একটা খবর দিলেন না কেন?'

—'খবর? ...তাই তো!' ভীষণ রকমের অবাক হয়ে অরিজিৎ বললেন—'ভুলে গিয়েছিলাম... একেবারে ভুলে...'

—'আমাকেও ঠিক কথাটা বলবেন না দাদা! সাউজি আর সামন্তর সঙ্গে টার্মস নিয়ে গণ্ডগোল তো আপনার গোড়া থেকেই। আপনাকে দিয়েই লাভ তুলবে, অথচ আপনি যা চেয়েছেন তার অর্ধেকও দেবে না...'

—'তাই তো... তুমি জানলে কোথা থেকে?'

—'আরে দাদা, আমাদের সব জানতে হয়, আমরা অবিকল জাগ্রত ঠাকুরের মতো।'

— 'তা বটে। কিন্তু সে-জন্যে তো আমি চলে আসিনি সুদেব!'

—'জানি দাদা, শর্মিলি সেন... প্লিজ কিছু মনে করবেন না, ওকে এড়ানো ভগবানের বাবারই সাধ্য নেই, তো আপনি!'

—'শ-র্মি-লি সেন? ও হ্যাঁ। শর্মিলি! একটু নাছোড়বান্দা টাইপের বটে। কিন্তু ওকে এড়ানোর জন্যে আমি চলে আসতে যাব কেন? একেবারে পিওর অ্যান্ড সিম্পল কারণটা। মা মরণাপন্ন শুনে মাথার মধ্যে সব কেমন হয়ে গিয়েছিল।'

টেপ-রেকর্ডারের নব খটাশ করে বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল সুদেব। মুখে হতাশা।

—'ঠিক আছে দাদা, আজ বিশ্রাম করি।'

'এঁদের গেস্ট-হাউসটা ভা-রি সুন্দর। শান্ত। আরে আমাদের তো স্বস্তি-শান্তি দরকার! যে ভাবে বেঁচে থাকি ওকে কি আর বাঁচা বলে? বলে কোনওমতে টিকে থাকা। প্রচণ্ড ঝড় চারদিকে, এলোমেলো বাতাস, তার মধ্যে দৌড়তে হচ্ছে। এখন, পায়ের ব্যালান্স কে কতটা ঠিক রাখতে পারে। এই তো কথা?' দু হাত ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল সুদেব। গেস্ট-হাউজে ফিরতে ফিরতে সমীর বলল—'অরিজিৎদাকে কেমন নার্ভাস লাগছিল, খেয়াল করেছিলি?'

সুদেব আড়চোখে তাকিয়ে বলল—'উনি একজন নট, মনে রাখিস।'

—'তুই বলছিস, সবটাই অভিনয়?'

—'অফ কোর্স। মায়ের অসুখ! লাখ লাখ টাকার প্রজেক্ট, বন্ধু-বান্ধবী, এত্তো জানাশুনো কাউকে কোথাও কোনও খবর দেওয়া নেই। ইয়ার্কি নাকি?'

—'অন্য কিছু বলছিস?'

—'আই বেট।'

—'আগাথা ক্রিস্টির কেসটা মনে আছে? স্বামী আর বান্ধবীর বিশ্বাসঘাতকতার শকে স্মৃতিভ্রংশ হয়ে গিয়েছিল! শর্মিলিব সঙ্গে... সে রকম কিছু...'

—'শর্মিলি নয়। শর্মিলি নয়। যবনিকার অন্তবালে কেউ আছে...কেউ...উঃ' সুদেব নিজের বাঁ হাতের পাতার উপর ডান হাত দিয়ে ঘুঁষি মারল।

—'মায়ের অসুখ দিযে স্মৃতিভ্রংশও হয় না। স্টোরিও হয় না। ঠিকই।' তারের পাপোশে জুতোর কাদা তুলতে তুলতে সমীর মন্তব্য করল।

—'কাল আবার...'

—'উহুঁ। কাল নয়। দুটো দিন সময় দে। আমরাও চারদিকটা একটু দেখে নিই' কে জানে সেই শ্রীমতী এখানেই কি না!'

—'ইতিমধ্যে আর কেউ গন্ধে গন্ধে এসে পড়লে?'

—'সম্ভব নয়। তবু যদি আসে, আসবে! ঘাবড়াচ্ছিস কেন?'

—'ও কী তুললেন দাদা?' মায়েব বাড়ির মেয়েগুলি শিউবে উঠল।

মুঠো ভরা বড় বড় নীল অপরাজিতা নিয়ে অরিজিৎ বললেন—'কেন? কী হল?' তিনি তুললেন রক্তকরবী। মেয়েগুলি কাঁপছে। অরিজিৎ বললেন—'রোজ রোজ একই ফুল দিয়ে কত আর নকশা কবা যায়। আজ নতুন কিছু বানাবো। এ করবীকে তোরা কী বলিস?'

—'সংগ্রাম।'

—'আর এই নীল অপরাজিতা?'

মেয়েদের দলে কাজের ধুম পড়ে গেল। ভীষণ ব্যস্ত। কেউ দীপ সাজাচ্ছে, কেউ ধূপ জ্বালছে। কেউ রাশীকৃত পাতা ঝাঁট দিচ্ছে। কেউ ঝারিতে কবে জল আনছে। অরিজিৎ শেষ উত্তরটা পেলেন না।

নীল অপরাজিতা আর রক্তকরবী, ডগডগে গাঢ় সব রঙ। তবু বড় সুন্দর মানিয়েছে। মাঝখানে উঁচিয়ে আছে মুদিতকলি রজনীগন্ধা। গোলাপেব পাপড়ি দিয়ে বৃত্তের পরিধি শেষ করলেন অরিজিৎ।

...প্রচণ্ড ঝড় দিচ্ছে চারদিকে। তারই মধ্য দিয়ে দৌড়তে হচ্ছে। এখন পায়ের ব্যালান্স কে, কতটা ঠিক রাখতে পারে। ...কোন নাটকে ছিল সংলাপটা! কে কাকে বলেছিল? মাথার মধ্যে বোলতা ঘুরছে, ভোঁ ভোঁ। এলোমেলো বাতাস। প্রচণ্ড ঝড়। পা রাখা যাচ্ছে না। কিন্তু রাখতে হবে। কোথায়? কোথায় এমন পবিস্থিতি? বোলতাটা এখনও বেরোল না। আরও যেন ডেকে আনছে। বোলতার ঝাঁক এখন। আলগা হয়ে যাওযা মোটা তামার তারের ভ্যাঁ ভ্যাঁ শব্দ করে ঘুরপাক খাচ্ছে।

ডাক্তার বললেন—'এত জ্বর! সামলাতে পারছি না। অ্যান্টিবায়টিক দিই মা!'

—'দাও।'

জ্বর কমেছে। কিন্তু অরিজিৎ নিস্তেজ, নিথর, প্রেশার নেমে যাচ্ছে। আচ্ছন্ন ভাব।

ডাক্তার বললেন—'সেবা-ভবনে নিয়ে যাই মা?'

—'যাও।'

নৈর্ঋত কোণে কী রচনা করেছে অরিজিৎ! মা এসে দাঁড়ায়। নীল, নীল, ঘন নীল। কেন এত নীল? কেন খোকা? পাশে পাশে লালের বুনট। সংগ্রামী লাল। রজনীগন্ধাগুলি খুলে গেছে। আকাশের দিকে মুখ। মৃদু সুগন্ধে সবাইকে যেন হারিয়ে দিতে চায়। গোলাপের পাপড়িগুলো মাটি কামড়ে পড়ে থাকে। জমাট। মা দেখতে থাকে। দেখতে থাকে।

সুদেব, সমীর সেবা-ভবনে রোজ আসে, যায়। ক্যামেরা খাপে বন্ধ। টেপ-রেকর্ডার চুপ। পাঁচ দিনের দিন অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠল। ডাক্তার গম্ভীব। কোনও কথাই বলতে চান না। ছ-দিনের দিন সমীরকে চলে যেতেই হয়। মা বললেন—

—'সুদেব, তুমিও যাও। কাজের ক্ষতি হচ্ছে।'

—'আমরা ওদিকের একটা ব্যবস্থা করেই আবার... তাছাড়া বড় ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করি। এতবড় একটা প্রতিভা... এভাবে...।

—'না, আসতে হবে না। অন্য ব্যবস্থার দরকার হলে করা হবে। তেমন কিছু হলে তোমরাই আগে খবর পাবে। ঠিকানা, ফোন নম্বর সব রেখে যাও।' চমকে মুখ তুলে তাকায় সুদেব, তাকায় সমীর। মার মুখের একটি পেশীও কাঁপছে না। ভাবান্তর নেই।

নীল ফুলগুলি সব শুকিয়ে, হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে। করবীর লাল নিশান উড়ছে ঠিক। প্রস্ফুটিত রজনীগন্ধার দণ্ডগুলি ঊর্ধ্বমুখ, সমান সতেজ। গোলাপের পাপড়ি মাটি কামড়ে আছে।

ড্রিপের ছুঁচ যেখানটায় ফোটানো ছিল ইঙ্গিতে সেখানে আঙুল দেখিয়ে অরিজিৎ মাকে জিজ্ঞেস করল—'কী?'

মা হাত বুলিয়ে দেয়। আস্তে আস্তে সব তুলে নেওয়া হয়। নাড়ি স্বাভাবিক। প্রেশার স্বাভাবিক। বিছানায় আজ প্রথম উঠে বসেছে অরিজিৎ বিশ্বাস। হাতে ছোট কাচের গ্লাসে কমলালেবুর রস। মাথার দিকে মা, পায়ের কাছে মা। অরিজিৎ দেখতে পাচ্ছে খানিকটা। বুঝতে পারছে বাকিটা।

—'কী হয়েছিল বলো তো ডাক্তার?'

অপ্রতিভ মুখে ডাক্তার বলে—'যখন কিছুতেই কিছু ধরা যায় না, তখন সত্যি কথা বলতে কি আমাদের একটা স্টক ডায়াগনোসিস আছে।'

—'কী? কী সেটা?'

আমতা আমতা করে লজ্জিত ডাক্তার বলে—'ভাইরাস। কোনও অচেনা ভাইরাস।'

—'বাঃ, তাহলে বাঁচালে কেমন করে?'

—'আমি বাঁচাই নি তো? মেডিকাল টার্মসে বলতে গেলে... আসল কথা, আপনি নিজেই নিজেকে বাঁচিয়েছেন।

বেদির চারধারে মায়ের বাড়ির মেয়েগুলি অখণ্ড মনোযোগে ফুল সাজাচ্ছে। নানা রকম ফুল, নানা রকম নকশা। সাজাতে থাকে। সাজাতে থাকে।

মাহ্ ভাদর

শহরের অবিরাম ঘূর্ণমান কর্মচক্রের কেন্দ্রবিন্দু থেকে অনেক দূরে নতুন বাড়ি বানিয়েছেন মুখার্জি-দম্পতি। দূরে দূরে ছোট্ট ছোট্ট বাগানেব মধ্যে পুতুলের বাড়ির মতো বসানো বাসগৃহ। সুন্দর, সুন্দর ছাঁদ। লাল টালি, কাচ-ঢাকা বারান্দা, হাঁসের পালকেব মতো মসৃণ গা। বেশ লাগে দেখতে। কিন্তু নির্জন! বড্ড নির্জন। রাত আটটার পরই নিশুতি হয়ে যায় একেবারে। বাজার-হাটও একটু দূরে। কিন্তু ভোর-সকালে বহুবিধ গাছপালার সবুজ ছায়াপথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে যাও। প্রাতর্ভ্রমণও হবে, আবার বাজারও হবে! মন্দ কী! মুখার্জিসাহেব পরিতুষ্ট মুখে চারদিকে চেয়ে গিন্নিকে বললেন, 'কী গো? অসুবিধা হবে খুব?'

'হলেই বা করছি কী?' গৃহিণী ঈষৎ অভিমানের সুরে বললেন।

'কেন? তিন লিটারের ফ্রিজ কিনে দিয়েছি। সব স্টোর করো। ওষুধপাতি, পোস্টেজ—এসবও স্টকে থাকবে। টেকনলজির যুগ। ওয়াশিং মেশিন থেকে, ভ্যাকুয়াম-ক্লীনার থেকে কোনটা নেই? বই পড়ো, বাগান করো আব গান শোনো। টেলিভিশনে সারা গ্লোবের খবরাখবর নাও। যেটা যখন ভালো লাগে। আর সবচেয়ে বড় কথা নির্জনতা, খানদানি নির্জনতা একেবারে। উপভোগ করো। এনজয় করো সেটা।'

মুখার্জি-গিন্নি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বুড়ো বয়স এমনিতেই নির্জন। হাজার মানুষ আশ-পাশে ঘুরলেও মনে হয় কেউ নেই। যাদের সঙ্গে এক স্মৃতি ভাগ করে বাঁচা, তারা সব চলে গেছে। যারা আছে তারা অন্য প্রজাতির জীব যেন। নির্জনতা আর কাকে বলে? এই নিঃসঙ্গতা যেন পাষাণভার, বুকের ওপর ক্রমশই ভারী হয়ে চেপে বসছে। আর উনি এলেন এখন নির্জনতার ওপর লেকচার দিতে। দূর দূর!

তা ভোরবেলা সত্যি সত্যিই প্রাতর্ভ্রমণের নাম করে বাজার আর বাজারের নাম করে প্রাতর্ভ্রমণ সারেন মুখার্জি সাহেব। পরনে খাকি শর্টস, হাফহাতা মোটা সুতির ভেস্ট, পায়ে কেডস আর হাতে লাঠি। ঘুরতে ঘুরতে একসময়ে চুরুটটা ধরিয়ে নেন! ফিরে একপট চা নিয়ে দুজনে বসবেন, 'পাটশাক পেয়েছি আজ', কিম্বা 'একেবারে ফ্রেশ পটল, বুঝলে?' 'খয়রা মাছগুলো ঠিক খাবার আগে কড়-কড়ে করে ভাজবে! এসব জিনিস তুমি শহরে পাবে না। সেখানে তুঁতেয় ভেজানো পটল, শাকে ইনসেকটিসাইডের গন্ধ, বুঝলে?'

নিঃশব্দে চা ঢালতে ঢালতে স্বামীর যাবতীয় কথা এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে আর এক কান দিয়ে বার করে দ্যান মুখার্জি গিন্নি। তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, এখন পাটপাতা আর ফ্রেশ পটল নিয়ে আদিখ্যেতা ভালো লাগে না তাঁর। টাটকা খয়রা মাছ! হুঁ! মাছের জন্যে তো তিনি মরে যাচ্ছিলেন কি না!

চা খেয়ে বাগানে নেমে পড়েন সাহেব। খুরপি দিয়ে খোঁচাখুঁচি। এটা তুলে ফেলা, ওটা বসানো, ঝারি কিনেছেন একটা। গাছে জল দিতে দিতে মুখ থেকে হাসির ছটা বেরোতে থাকে একেবারে। গিন্নি এই সময়ে খুটুর খুটুর করে গৃহকর্ম আরম্ভ করেন। অল্পস্বল্প

ফার্নিচার। সব নরম কাপড় দিয়ে ঝকঝকে কবে মোছেন। কাচগুলো খবরের কাগজের টুকরো জলে ভিজিয়ে পরিষ্কার করেন। উমি আসে, সে বাসন ধুয়ে, ঘরদোর পরিষ্কার করতে থাকে, বলে, 'নতুন করে মোছামুছি আর কী কববো দিদিমা, সব তো পরিষ্কারই আছে গো। থাকতো একটা কচি-কাচা তো হণ্ডুল-মণ্ডুল করে দিত তোমার সব। তখন উমিব কাজ বাড়ত।' ন্যাতা টানে আর আপনমনে বকবক করে যায় উমি, সতৃষ্ণশ্রবণে শুনতে থাকেন মুখার্জি-গিন্নি। উমি কাজ সেরে চলে গেলেই একটু দূরে গুঁড়ি-মেরে-বসে থাকা নির্জনতাটা আবার হুড়ুম করে এসে পড়বে, গ্রাস করে নেবে এই ছোট্ট 'ফ্লাওয়ারি নুক'।

উমি বলে, 'এবার চানটা সেরে নাও গো দিদিমা. আমি কাপড়-চোপড়গুলো কেচে, মেলে দিয়ে যাই।'

নিতান্ত অনিচ্ছুকভাবে মুখার্জি-গিন্নি চানঘবে ঢুকে যান। তার রান্না সারতে আর কতটুকু সময় যাবে? দুই বুড়োবুড়িব বান্না। এটা বারণ, সেটা চলে না। পরিমাণও খুব কম। তবে মুখার্জিসাহেব শৌখিন খুব। নানান রকম খেতে ভালোবাসেন। তাই টুকটাক করে হালকা হালকা খাবার বানান গৃহিণী। পনীর অ্যাসপারাগাস, মটর ডালের বড়ি দিয়ে পাটপাতা; মৌরলা মাছের টক, বেগুন বাসন্তী। এইটুকু একমুঠো বানান। তাইতেই ঢের হয়ে যায়, ঢের। বিকেলে বাসন ধুতে এসে উমি বলে—'তোমাদের যেন পুতুলের ঘরকন্না, এইটুকুনি টুকুনি বাটিতে কী খাও গো দিদিমা?'

—'কেন ডাল?'

—'ঘন ক্ষীরের মতন করো বুঝি?'

—'দূর, পাতলা সুপের মতো ডাল চুমুক দিয়ে না খেলে খাওয়াই হয় না তোর দাদুসাহেবের।'

উমি, মুখার্জি সাহেব উঁচু দরের দামী মানুষ বুঝে শুধু দাদু বলে না, বলে দাদুসাহেব। আর মুখার্জি সাহেবে উমিকে বলেন শেঠ উমিচাঁদ। দিদিমার সঙ্গে কথাবার্তা জমলেই তিনি বলবেন এই যে শেঠ উমিচাঁদ। ষড়যন্ত্র কদ্দূর এগোলো?

বিকেলবেলা রোজই দুজনে হাঁটতে বেরোন। শীতকালে চারটে নাগাদ। গরমকালে আর একটু পরে। তখন সাহেবের পরনে তাঁতের সূক্ষ্ম ধুতি, ফিনফিনে পাঞ্জাবি, কাঁধে চাদর, হাতে রূপো বাঁধানো লাঠি। এটা গরমকালে। শীতে ঢোল্লা গরম কাপড়ের ট্রাউজার্স। গিন্নির বুনে দেওয়া কার্ডিগ্যান, মাফলার, মাথায় কান ঢাকা টুপি। মুখার্জি-গিন্নি কী শীত কী গ্রীষ্ম ধবধবে সাদা বাহারি পাড়ের টাঙ্গাইল শাড়ি। সাদা ব্লাউজ। শীতকালে উলের জামা, হাতা-ওলা সোয়েটাব আর তার ওপর গরম শাল।

বেরোবার সময়েই চা-টা খেয়ে নেন দুজনে। ফিরে এলে বড় দেরি হয়ে যায়; রাতে ঘুম হয় না। ফিরে দুজনের কারোই কোনও কাজ নেই। গোল বারান্দায় বসে গান শোনেন মুখার্জিসাহেব। পুরোনো দিনের গান—কানা কেষ্ট, ভীষ্মদেব, শচীন দেব বর্মণ এইসব। কিম্বা বাজনা শোনেন, মেনুহিনের ভায়োলিন, বিদেশী সব বাখ মোৎসার্ট

মেণ্ডেলসন-ফন্ন গুচ্ছের কী যেন আছে! একঘেঁয়ে ঘ্যানঘ্যান ঘ্যানঘ্যান করে বেজে যায়। সাহেবের মন রাখতে বেশ খানিকক্ষণ বসে থাকেন গৃহিণী, তারপর টুক করে উঠে পড়ে গুটিগুটি ঘরের ভেতরে চলে যান। একটু আয়নার সামনে দাঁড়ান। একটু এ ছবি দেখেন, একটু ও ছবি, পিকাসো না কী ছাইভস্ম। অসভ্য ছবি সব। কাঞ্চনজঙঘার লম্বা পোস্টার একখানা—বরফে বরফ। তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে বিছানার টান-চাদর আবারও টান টান করেন তারপর আঁচল থেকে চাবি নামিয়ে আলমারি খোলেন, লকার খোলেন। লকারের ভেতর সোনা-দানা নেই। হীরে-মুক্তো কিছু নেই! রয়েছে কয়েকটা ফটো অ্যালবাম। বাস। যে কোনও একটা নামিয়ে নেন। তারপর খাটের পাশের হেলানো চেয়ারে বসে অ্যালবামের পাতা খোলেন : বেরিয়ে পড়েন রায়বাহাদুর মাখনলাল মুখার্জি। তাঁর বাবা। ইয়া গোঁফ, সুট কোট হ্যাট, একেবারে পুরোদস্তুর সাহেব। রঙটি ছাড়া। তা রঙ তো আর ফটোগ্রাফে বোঝা যায় না! তাঁদের বিয়ের ছবি। বিয়ের পরেই তোলা। ইলাস্ট্রেটেড উইকলিতে দেওয়া হয়েছিল। মুখার্জিসাহেবের চেহারাটা তখন কত ভালো ছিল! স্বাস্থ্যবান, উজ্জ্বল যুবক। পাশে তিনি, খুব রোগা। গলার হাড় দেখা যাচ্ছে। চুড়িবালা হাতে ঢলঢল করছে। মাথায় ঘোমটা নেই। ঘোমটা খুলে দিয়েছিল ফটোগ্রাফার, 'আজকাল আর ফটোতে ঘোমটা চলছে না।' দেখে শাশুড়ির কী রাগ। 'যতই সাহেব-মেমসাহেব হও, নতুন বিয়ের কনে মাথায় ঘোমটা থাকবে না? এ ছবি দেখলে এ-বাড়ির গুরুজনরা সব বলবে কী?' আবার আলাদা করে ঘোমটা-দেওয়া ফটো তোলা হল। সেই ফটোই বাঁধানো তাঁদের টেবিলের ফটো-স্ট্যাণ্ডে থাকত। —হাজারিবাগে বাড়িসুদ্ধু সব যাওয়া হয়েছিল, রোজ পিকনিক! রোজ পিকনিক! সেখানে পঙ্কজ মল্লিকের সঙ্গে আলাপ! কত গান, কত গল্প! সেই সব ফটো। অনিরুদ্ধ ঠাকুরপোর ছবি। জ্বলজ্বলে চেহারা, হাসিটা কী! একেবারে জ্যান্ত। চোখের সামনে যেন ভাসছে! চীনের যুদ্ধে মারা গেল। অনেকক্ষণ ধরে ছবিটা খুলে বসে থাকেন মুখার্জি-গিন্নি।

—'আরে কোক খাবে তো ক্যানের কোক খাও', মুখের সামনে ক্যান খুলে ধরত।

—'আসল জিনিস। খেলেই তফাতটা ধরতে পারবে।' কত জিনিস আনতো, দু হাতে উপহার দিত, এনতার খরচ করত। পাতা ওলটালেন মুখার্জি-গিন্নি, একটি ঝুমুঝুমু চুল-অলা শিশু বেবি-ফ্রক পরা, নিদন্ত মুখে হাসছে। এ ছবি অনিরুদ্ধ ঠাকুরপোর তোলা। তলায় লেখা বুড়িমায়ি, পঁচিশে নভেম্বর, ঊনিশশ পঁয়তাল্লিশ।

খসখস শব্দ, চটি ঘষতে ঘসতে মুখার্জিসাহেব ঘরে ঢুকছেন। চকিতে গৃহিণী অ্যালবামটা বন্ধ করে দ্যান। ঘরে ঢুকে আড় চোখে অ্যালবামটা দেখেন সাহেব। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন—'ও সব তো পাস্ট, ইতিহাস নিয়ে কি আর বাঁচা যায় গিন্নি, বাঁচতে হয় বর্তমানে। প্রেজেন্ট কন্টিনুয়াস। এই মুহূর্তে কী হচ্ছে, আমি কী করছি, কেন করছি—এই।'

'বাঁচার দরকারটা কী'। মৃদু থমথমে স্বরে কথাগুলি বলে মুখার্জি-গিন্নি ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। হালকা কী একটা গন্ধ-অলা ট্যালকম পাউডার মাখেন, সেই গন্ধটা অতীতের সুখস্মৃতির মতো ঘরের হাওয়ায় ভেসে থাকে। নিশ্বাস ফেলে মুখার্জি সাহেব

অ্যালবামটা তুলে নেন! অন্যমনস্কভাবে যে কোনও একটা পাতা খুলে ফেলেন। অমনি বেরিয়ে পড়ে কালো গাউন পরা মাথায় ঝালরঅলা টুপি, হাতে গ্র্যাজুয়েশনের সার্টিফিকেটটা পাকানো, এক তরুণী। হাসছে। তলায় লেখা বুড়িমা ১৯৬৫। দেখতেই থাকেন, দেখতেই থাকেন। অবশেষে কাপড়ের খশখশ শব্দ পান পিঠে ঝনাৎ ক'রে চাবি ফেলার শব্দ। গিন্নি আসছেন। চট করে অ্যালবামটা বন্ধ করে বিছানার ওপব যেখানে ছিল, সেখানে রেখে দিয়ে, নিজের কামানো গাল পরীক্ষা করতে থাকেন মুখার্জিসাহেব। যেন ভীষণ চিন্তিত, কাল সকালে দাড়িটা কামাবেন, না কামাবেন না।

গৃহিণী ঢুকে কোনদিকে না তাকিয়ে ঝনাত কবে আলমারি খোলেন, কড়াক্ করে লকারের চাবি ঘোরান, অ্যালবামটা রেখে দ্যান। চাবি বন্ধ করেন পর পর; তারপর বলেন, 'এতো তো গান শোনো, গান শুনলে তো জানি মানুষেব মন-মর্জি নরম-সরম হয়। তা যদি না-ই হয় তো শোনা কেন?' তিনি যত দ্রুত সম্ভব ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান। মুখার্জিসাহেব জানালার বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। এতোক্ষণ, যে মনে হয় তাঁকে কেউ স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে গেছে।

সকালবেলায় বেরিয়ে একদফা আলাপ হয় স্থানীয় লোকজনদের সঙ্গে। তার মধ্যে সবজিঅলা তাজু, মুরগীঅলা কিষেন, মাংসকাটা আনোয়ার, ডিমঅলা ভুবন এরা আছেই।

'ও সাহেব, পরশু দিনকেই তো মুরগী নিলেন। আজ আমার কাছ থেকে একটু খাসির মাংস নিয়ে যান না।' অনুযোগে অনুরোধে মিশিয়ে আনোয়াব বলে।

'আরে বাবা, রেড মীট আমাদেব চলে না। মুরগী, তা-ও তোর দিদিমা খায় না। তবে নেবো, নেবো। বাড়িতে লোকজন এলে দেখবি নিয়ে যাব।'

'কবে তোমার বাড়ি লোক আসবে?' কাঁচা গলায় ডিমঅলা ভুবন বলে। বারো তের বছরের ছেলেটা। ভুবনের কাছ থেকে ডজনখানেক ডিম কিনে সবজিবাজাবের দিকে এবার এগোন মুখার্জিসাহেব। উদাস গলায় বলেন, 'আসবে, আসবে .।'

ছোট বাজার। যা এলো তা এলো। তার বাইরে আর কিছু নেই। তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। —'বেগুনগুলো কেমন চিকন দেখুন সাহেব' তাজু তার আজকের পসরা নিয়ে বডাই করে। মামুলি আলু পেঁয়াজ ছাড়া আজ তার কাছে ওই বেগুন।'

—'চিকন তো বলছিস খুব! কানা নয় তো! ভাবিসনি আমি দেখতে পাবো না।' ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেন মুখার্জিসাহেব। শাকে ভিটামিন, মিনার‍্যালস আছে। টাটকা শাক তিনি রোজ কিনবেন। বাঃ, আজ বড় বড় পালং পাতা রয়েছে। চট কবে থলি খুলে ধরেন তিনি। মাছ? মাছ বসেনি? ছোট ছোট পোনা, চারাও নয়, বড়ও নয়। মাছঅলা ভোম্বল বলে, 'একেবারে লাফাচ্ছে দাদুসাহেব, ঝালে খাবেন, ঝোলে খাবেন, ভাজা খাবেন, মুখ ছেড়ে যাবে, তাকত বাড়বে।

ছোট বাজারের ব্যাপারী। বড় বড় শহরে বাজারের বিক্রেতাদের ঘমণ্ড এদের নেই। যত না বিক্রিবাটা হয়, তার চেয়ে বেশি হয় 'গল্পসল্প, একটু ডাকাডাকি করে মানুষকে বুঝি আপন করে নেওয়া।

বাজারে আসেন আরও দু'পাঁচজন ভদ্রলোক। বিকাশ গাঙ্গুলি, অজয় মান্না, প্রীতম সিংহ, বীরেশ্বর মহাপাত্র। প্রায় সকলেই মুখার্জিসাহেবের থেকে ছোট। জিনিসপত্রের দর নিয়ে, শহরের ক্রমবর্ধমান দূষণ নিয়ে, সংস্কৃতির হাল নিয়ে আলোচনা হয়। তাঁর থেকে ছোট হলেও দেখা যায় এঁরা তাঁর সঙ্গে একমত হয়ে যাচ্ছেন। শহর থেকে দূরে হওয়া সত্ত্বেও এই জায়গায় বাস করতে এসেছেন দূষণমুক্ত হাওয়া, শব্দহীন দিনরাতের খোঁজে। বিকাশবাবু বলেন—'আমি তো প্রায় বার্ডওয়াচার হয়ে গেল্যম মুখার্জিদা। এতো রকমের যে পাখি আছে, তারা যে শুধু বইয়ের পাতায় থাকে না। বাস্তবেও নড়েচড়ে উড়ে ডেকে বেড়ায়, তা আমার জানা ছিল না।' অনেকেরই গাড়ি আছে। প্রীতম তো গাড়ি নিয়েই অফিস করে। ট্রাভল এজেন্সি আছে তার। শহরে চলে যায় হুশ করে। একটা পার্ট-টাইম ড্রাইভার পেলে মুখার্জিসাহেবও গাড়ি রাখতে পারেন। নইলে আজ কাল আর গাড়ি চালাতে ঠিক ভরসা পান না। তা প্রীতম বলে, 'গাড়ি রাখবেন কেন আঙ্কল, হররোজ তো দরকার হচ্ছে না। কোথাও যেতে হলে প্রীতম আছে। প্রীতমকে ডেকে নেবেন।'

তা এসব আলাপ মুখার্জিসাহেবের একার। আসল আলাপ-সালাপ হয় বিকেলবেলা। সস্ত্রীক বেড়াতে যাবার সময়ে। তখন মিসেস বিকাশ, মিসেস ও মিস মহাপাত্র, মিসেস মান্না তাঁর দুরন্ত নাতি এঁরাও বেরিয়ে পড়েন।

মিসেস বিকাশ একদিন বললেন—'ছেলেমেয়ে সব বিদেশে, বাইরে বুঝি, বউদি?'

মুখার্জি-গিন্নি কিছু উত্তর দেবার আগেই সাহেব বললেন—'না, নেই, আমাদের নেই অণিমা, দুর্ভাগ্য!

পরে বিকাশবাবু বাড়িতে এসে গৃহিণী অণিমাকে ভীষণ বকাঝকা করেন। শহর ছেড়ে এসেছ বলে কি সভ্যতা-ভব্যতার অভ্যেসগুলোও সেখানে রেখে এসেছো? সেই এক মেয়েলি কৌতূহল—'ছেলে পিলে কটি?' আমার দিদিমা-ঠাকুরমাকেও বলতে শুনেছি, মা মাসিদেরও বলতে শুনেছি, আর আমার ডবল এম.এ. গিন্নিকে বলতে শুনছি? ছিঃ!'

অণিমা ডবল এম-এ মানুষ, মোটেই বকাবকি মেনে নেন না! ঝাঁঝাল গলায় বলেন—'শহুরে সভ্যতার মুখোশ জীবনভর বয়ে বেড়াবে তো তুমিই বেড়াও। আমি মানুষ, মুখোশ নই, বুঝলে? মানুষই মানুষকে এসব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করাকরি করে, পরস্পরকে জানতে, মেয়েলি কৌতূহলেও নয়, আর কাউকে অপদস্থ করতেও নয়।' .

তা সে যাই হোক, বকুনিটা অণিমা গাঙ্গুলির ওপর দিয়ে গেলেও, দরকারি খবরটা সবারই জানা হয়ে গেল। মান্নাদের, মহাপাত্রদের, সিংদের, আরও আয়েঙ্গার, সেনগুপ্ত, রায়চৌধুরী যে যেখানে ছিল সববার। অরিন্দম মুখার্জি সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের বড় চাকুরে, রিটায়ার্ড হবার পরও প্রাইভেট একটা কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অনেকদিন, ধনশালী লোক, স্ত্রীটি সেকালের গ্র্যাজুয়েট হলেও অতি ভালোমানুষ। এঁদের নেই। নিঃসন্তান। অনিল সেনগুপ্ত বলেন—'এ নিয়ে তোমরা এতে খেদ করছো কেন আমার মাথায় আসছে না ভায়া, আমাদের অনেকেরই তো আছে। আমার তো শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে পাঁচটি। বড় বস্টনে, মেজ অস্ট্রেলিয়ায়, সেজ বোম্বাই, বড় মেয়ে ডেড অ্যান্ট গন, ছোটটি

কনেটিকাট তা হরে-দরে তো সেই একইতো হল, না কি? যাঁহা পাঁচ তাঁহা শূন্য। কেমন কি না?'

এই অনিল সেনগুপ্তর বাড়ি নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়েই সুরাহাটা হল। অনিলের স্ত্রী সাহানার ছায়ার মতো ঘোরে একটা রোমশ বেঁটে ভুটিয়া কুকুর পুটপুটি! কালো পুঁতির মতো চোখ। হালকা খয়েরি রঙের লোমের ফ্রোকটি পরে সে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়ায় আর ছোট্ট একটি নাতিপুতির মতো সাহানার আঁচল কামড়ে থাকে। লোকজন এলে কিছু দূরে চলে যায়। এবং থাবায় মুখ রেখে পিটপিট করে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে। একটুও হিংসে-বিদ্বেষের লক্ষণ নেই। অভ্যাগতরা যতক্ষণ থাকবেন সে এইরকম সভ্য-ভব্য হয়ে থাকতে থাকতে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়বে। এবং তাঁরা চলে গেলেই গোলাপি জিভ বার করে বিশাল হাই তুলে আবার সকর্মক হবে। সাহানাই পরামর্শটা দিলেন—'আচ্ছা দাদা আপনারা তো থাকেন একটেরে, একটা কুকুর পুষুন না! কুকুর যে কী ভালো সঙ্গী কুকুরের স্নেহমমতা বিশ্বস্ততা, এসব যে কী দুর্লভ গুণ, যারা কুকুর না রেখেছে বুঝতে পারবে না। আপনাদের কখনও কুকুর ছিল না?

মিসেস মুখার্জি বললেন, 'না সাহানা। কুকুরে আমার বরাবর কেমন ভয়, ঘেন্নাও বলতে পারো। কখনও পুষি নি।'

'মুখার্জিদা আপনি?'

'আরে আমার তো ভালো লাগে। কিন্তু এ সব ব্যাপারে গিন্নির ইচ্ছায় কর্ম। বুঝলে কি না?'

সাহানা বললেন, 'ও সব বললে শুনছি না, কুকুর আপনাদের একটা কিনিয়ে দেবোই। পবে আমাকে আশীর্বাদ করবেন।'

সেই হাজরা রোডে জহর দাসের বাড়িতে আসা। অনিল সেনগুপ্তর অ্যামবাসাডর চড়ে। বেল বাজাতেই ভেতর থেকে ভৌ ভৌ, ঘাউ, ঘাউ, কৌ কৌ—সারমেয়দের অর্কেস্ট্রা। দোতলার জানলায় জানলায় কৌতূহলী সারমেয়কুল ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। একজন আবার মুখ ঝুঁকিয়ে দিয়েছে, তার নোয়ানো বিঘৎ পরিমাণ ব্রাউন রঙের কান ঝুলছে। দেখেশুনে মিসেস মুখার্জি বললেন, 'বাপ রে!'

সাহানা বললেন,—'ভয় পাবেন না দিদি, ওরা তো সব ঘরে ঘরে বন্ধ। কত রকমের ব্রিড আছে, নিজে দেখে শুনে পছন্দ করে নিতে পারবেন।'

জহর দাশ এবং তার স্ত্রী পুতুল তখন সাদা সাদা এপ্রন পরে সদ্যোজাত কুকুর শাবকদের পরিচর্যা করছিল। সে এক এলাহি ব্যাপার। এক একটা বড় বড় লোহার ক্রিবে, মা কুকুর তার ছানাদের নিয়ে সগর্বে বসে আছে। চারদিকে এমন করে তাকাচ্ছে যেন অমন কাজটি ভূ-ভারতে আর কেউ কস্মিন কালে করেনি! ওঁদের দেখে জহর দাস শ্রীমতী পুতুলের হাতে সবকিছু ছেড়ে তাঁদের সঙ্গে চলে এলেন।

'কী রকম কুকুর চান? পেট টাইপ? না প্রহরী কুকুর? চোর ডাকাত তাড়াবে, বদলোক ঢুকতে দেবে না। কী রকম?'

দু তিন মাসের অ্যালসেশিয়ান বাচ্চা দেখালেন।

'এর আসল নাম জার্মান শেফার্ড ডগ, বুঝলেন? সবচেয়ে পপুলার এখন। ট্রেনিং দিন। দুর্দান্ত পুলিশ ডগ হয়ে দাঁড়াবে। ভালোবাসুন, খেলা করুন, সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরোন, একেবারে বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য বন্ধু।'

'বাচ্চাটাকে তো বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। বড় হলে কী রকম দাঁড়বে বলুন তো?'

একটা ঘরের দরজা খুললেন জহরবাবু, একটা উঁচু লম্বা ভারী কুকুর দৌড়াতে দৌড়তে এগিয়ে এলো। —কিচ্ছু করল না, খালি মুখ নিচু করে আগন্তুকদের শুঁকতে লাগল।

—'এই রকমটা দাঁড়াবে, এটাই বাবা বাচ্চাটার। সাতষট্টি আটষট্টি পাউণ্ডের মতো ওজন হবে।'

'ওরে বাবা' মুখার্জি-গিন্নি বলে উঠলেন,—'অ্যালসেশিয়ান আমি কোনদিনও দু-চোখে দেখতে পারি না। নেকড়ের মতো। কেমন হিংস্র দেখতে। তার ওপর অত ওজন, আমি সামলাতে পারব না বাপু।'

জহর দাশ হেসে বললেন, 'আপনি যদি বাচ্চা-কাচ্চার মতো নিয়ে, আদর করে আনন্দ পেতে চান আবার এ-ও চান বাড়িতে ইঁদুর আরশুলা বেড়াল না থাক, যদি চান চোর ডাকাত এলে লড়াই করতে না পারুক অন্তত পক্ষে ডেকে আপনাকে জাগিয়ে দেবে তাহলে আপনার জন্যে আইডিয়াল কুকুর হবে মাসিমা আইরিশ টেরিয়ার। সঠিক নামটা হবে গ্লেন অফ ইমান টেরিয়ার। খুব রেয়ার ডগ, মানে আমাদের এখানে। আমার কাছে দুটো বাচ্চা এসেছে, একটা রাজ্যপালের জন্যে তাঁর এডিকং নিয়ে গেছেন, আর একটা আছে আপনাকে দেখাচ্ছি।'

নীলচে ছাই-ছাই রঙের একটা ছোট্ট গোল্লামতন দেখালেন জহরবাবু। বললেন 'পেট ডগ, বিশেষ করে যেগুলো টয় টাইপ, সবই খুব লোমশ হয়। টিবেটান অ্যাপসো, কি টেরিয়ার, ওয়েস্ট হাইল্যাণ্ড টেরিয়ার, পিকীনিজ, পামিরেনিয়ান, স্পিৎজ্। লোম নিয়ে উত্তম-খুস্তম হয়ে যাবেন। এটারও লোম আছে, ন্যাড়া টাইপের কুকুর মোটেই নয়, অথচ ম্যানেজেব্‌ল্। ভীষণ মজাদার, কেজো কুকুর। এটাকে মানুষ করতে আপনার কোনও অসুবিধে হবে না। ভালোবেসে ফেলবেন। বড্ড ভালোবাসবেন। বিচ কিন্তু।'

—'বিচই ভালো' বলে বেতের টুকরি সুদ্ধু নরম স্পঞ্জের গদীতে উলের বলটি তুলে নিলেন মুখার্জি গিন্নি। সাহানা বললেন, 'আমাদের পুটপুটিটার সঙ্গে মিলবে ভালো। ওটাও বিচ। খেলবে এখন দুজনে খুব।' ছাপানো কুকুর-পালন-বিধি নিয়ে ফিরে এলেন মুখার্জি দম্পতি।

'ফ্লাওয়ারি নুক'-এর ফ্লাওয়ারগুলি আছে ঠিকই। কিন্তু 'নুক'টি এখন ঝুপলির হয়ে গেছে। ঝুপলি, সেই নীলচে ছাই রঙের গোল্লাটা পেট উল্টে বোতলের দুধ খায়। ছোট বাচ্চাদের মতো সামনের দুই থাবা দিয়ে বোতল আঁকড়েও ধরে কখনও কখনও। মোটা তুলোর বিছানায় বেতের দোলনায় শোয়ানো হয় তাকে। পিচ পিচ করে হিসি করে বড় কম্মো করে, সেখানকার তুলোটুকু ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। ঝুপলির উন্নতি হয়, ঝুপলি

নিজের কট থেকে ঝাঁপিয়ে নামে, লুটোপুটি খায়, খাটের পায়া কামড়ে ধরে, নিউ মার্কেট থেকে তার জন্যে টীদিং রিং আনা হয়। ডগ বিস্কিট আসে। খেলবার জন্যে বল আসে, ছোট বড়। খেলনা আসে. ঝুপলিকে কোলে নিয়ে মুখার্জি মা বসেন চোখ বুজিয়ে, মুখার্জি বাবা পা চেপে ধরেন। প্যাঁট করে ইনজেকশন ফোটানো হয়। পাউডার, সাবান, বুরুশ, চিরুনি দুতিন রকম। অ্যান্টিসেপটিক, বোরিক তুলো, পেরক্সাইড ভিনিগার। ক্রমশ নীলচে ছাই লোমে ছেয়ে যায় শরীর, মুখ। তার মধ্যে থেকে থ্যাবড়া কালো নাকটা বেরিয়ে থাকে। বোকার মতন কুতকুতে চোখ! বেঁটে লোমশ খাড়া ল্যাজ নড়ে। মুখার্জি সাহেব তাকে সপাটে ওপরে ছুঁড়ে দ্যান, লুফে নেন, আবার ছুঁড়ে দ্যান। রই রই করে ছুটে আসেন গিন্নি! 'কী করছো? কী করছো? তোমার বদভ্যেস কি কখনও যাবে না? অত উঁচু থেকে পড়ে গেলে মানুষ বাঁচে?'

—'প্রতিমাদেবী, এটা মানুষ বাচ্চা নয়,' ঝুপলিকে লুফে নিতে নিতে মুখার্জি সাহেব বলেন!

'আর মানুষ বাচ্চাদেরও এমনি করে লোফালুফি করতে হয়, নার্ভ স্ট্রং করবার জন্যে, কুকুরের তো কথায় নেই!'

—'সব সময়ে অত কুকুর-কুকুর করবে না তো! কুকুর বলে কি মানুষ নয়!' সযত্নে ঝুপলিকে কোলে তুলে প্রতিমাদেবী বেরিয়ে যান।

মুখার্জি সাহেব ভারি মজা পেয়ে হাসতে থাকেন 'কুকুর বলে কি মানুষ নয়?' সত্যিই তো কুকুর বলে কি এটা মানুষ নয় নাকি?

মাস তিনেকের বাচ্চা যখন, তখন থেকেই কুকুর-পালন বিধি দেখে দেখে ঝুপলির ট্রেনিং আরম্ভ হয়ে যায়। নরম সোয়েডের কলার তৈরি হয় তার জন্যে বিশেষ অর্ডার দিয়ে। তার সঙ্গে স্টীলের চেন। আনব্রেকেবল গোল ফুলকাটা বোলে ঝুপলি পরিজ খেল, চকচক করে জল খেল, এইবার মুখার্জি সাহেব ডাকবেন—'ঝুপলি কলার । ঝুপলি কলার।' কলার পরতে ঝুপলির ভীষণ আপত্তি। সে দূর থেকে বোকার মতো চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

প্রতিমা বলবেন 'পরে নাও ঝুপলি, ল-ক্ষ্মী মেয়ে, কী সোনা মেয়ে গো! ও তো গয়না! বাবা গয়না কিনে দিয়েছে! ঝুপলি আরও বোকাটে চোখ করে পিছু হটে। মুখার্জি সাহেব বলেন—'ওভাবে মানুষের মেয়েকে বলার মতো বললে হয় না আজ্ঞে! 'ও তো গয়না! বাবা গয়না কিনে দিয়েছে!' হুঃ, খুব বুঝল ও, গয়নার লোভে লসলস করছে কি না! কিছু শেখাতে হলে সোজাসুজি গম্ভীর, কঠিন গলায় নির্দেশ দিতে হবে, সম্ভব হলে মনো সিলেবল, যেমন সিট ডাউন—ডাই সিলেবলও চলতে পারে, কিন্তু ভেঙে ভেঙে উচ্চারণ করতে হবে। যেমন—'ঝুপলি', কলার প-রো', গম্ভীর কড়া গলায় বলে কলারটা সামনে ধরে নাচাতে লাগলেন মুখার্জি সাহেব, হঠাৎ এক পা দুপা করে এগিয়ে এসে ঝুপলি কলারের ফাঁসের মধ্যে মাথাটা গলিয়ে দিল। ইতি উতি তাকাচ্ছে। ঠিক করেছে কিনা বুঝতে পারছে না এখনও। মাথায় কিস্যু নেই।

তখন তাকে প্রচুর আদর করতে হয়, গলায় খুশি ঢেলে দিতে হয় বুঝলে? যাতে সে বোঝে এই রকম আচরণ করলেই সে ভালোবাসা পাবে, হাততালি পাবে। এই দেখো লেখা আছে—'ল্যাভিশ প্রেইজ অন হিম হোয়েন হি রেসপণ্ডস টু কমাণ্ড,' এসব ট্রেনিং-এর অঙ্গ। জহরের বইটা ভালো করে পড়ে দেখো না। তোমাকে তো তাই-ই করতে বললুম।'

'এইবার তোমার ওই লক্ষ্মী মেয়ে, সোনা মেয়েগুলো প্রাণভরে ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে পারো' বিজয়গর্বে স্ত্রীর দিকে চেয়ে মুখার্জি বলেন।

'আমার ভারি বয়ে গেছে।' গিন্নি উঠে যান।

'নাগ হয়েছে নাগ?' 'ছি! ছি! ছি! মানী মানতে শেখেনি, মানী মানতে শেখেনি' বলে মুখার্জি সাহেব তাঁর বয়স-টয়স ভুলে গিয়ে আঙুলে তুড়ি দিয়ে দিয়ে নাচেন, ঘুরে ঘুরে নাচেন। গিন্নিকে খেপাবার এই নতুন উপায় খুঁজে পেয়ে তিনি যারপরনাই আহ্লাদিত। তাঁর রকম দেখে ঝুপলি তার কচি গলায় ডাকে পৌ পৌ পৌ, গলার চেন ঝনঝনিয়ে সে-ও দু'একটা পাক খেয়ে নেয়। কিন্তু নাচে তার মুখার্জি-কর্তার মতো প্রতিভা নেই, দেখা যায়।

উর্মি এসে বলে—'ও দাদুসাহেব কী করছো গো? দিদিমা যে কাঁদতে নেগেছে।'

'অ্যাঁ?' সাহেবের নাচ থেমে যায়।

কুকুর বগলে তিনি তৎক্ষণাৎ দিদিমার উদ্দেশে রওনা হন।

খাবার টেবিল সামনে নিয়ে চোখে আঁচল দিয়ে দিদিমা বসে আছেন।

'কী হল? আরে বাবা, কুকুর যখন তোমার আদেশ ঠিকঠাক পালন করতে পারবে।'

'আমার পড়েও কাজ নেই, কিছু করেও কাজ নেই!' গিন্নি একই রকম থমথমে মুখে বসে থাকেন।

'তবে রইল তোমার ঝুপলির মর্নিং ওয়াক, সে মোটা হিপো হোক, তার গেঁটে বাত ধরুক, আমার কী, ঝুপলিকে গিন্নির কাছে টেবিলের ওপর বসিয়ে দিয়ে সাহেব চলে যান। আর কুকুরটাও এমনি পাজি যে পৌ পৌ করে দুবার ডেকে মায়ের কোলের ওপর লুটোপুটি খেয়েই লাফাতে লাফাতে ছোটে মুখার্জি সাহেবের পিছু পিছু, পেছনে চেন লুটোচ্ছে।

'কী বিচ্ছু দেখো দিদিমা,' উর্মি চেঁচায়, 'ওই যে জ্ঞানে দাদুসাহেব বেই বেই যাবে?'

'ওরা ওইরকমই। মায়ের থেকে আদর-যত্ন-সেবা সব আদায় করবে। আর হবার বেলায় হবে বাপ-সোহাগী ; গভীর খেদের সঙ্গে দিদিমা উচ্চারণ করেন।

উর্মি বালতিতে ন্যাতা ডুবিয়ে বলে—'তা যদি বলো দিদিমা, ব্যাটাছেলে হয়েও দাদুসাহেব ঝুপলির জন্যে কম করে না! দৌড়াদৌড়ি ছোটাছুটি, খেলা দেওয়া! মুখের গোড়ায় খাবারটি যেমন বোঝে, ঘুমের সময় কোলাটি যেমন বোঝে খেলাটিও তো তেমন ষোল আনার জায়গায় সতের আনা বোঝে কি না! একটা মানুষের বাচ্চার সঙ্গে তফাত কী?'

হঠাৎ বুকটা চেপে ধরেন মুখার্জি গিন্নি প্রাণপণে। বুকের মধ্যে যেন তীক্ষ্ণ লৌহশলাকা

ঢুকিয়ে দিয়েছে কেউ। না না, সত্যিই, মানুষের বাচ্চার সঙ্গে কোনও তফাতই নেই। কোনই তফাত নেই।

আনোয়ারের আজকাল মুখে খুশি ধরে না। মুখার্জি সাহেব নিয়মিত মাংস কিনছেন। হাড়-হাড় দেখে মাংস বেছে দেয় আনোয়ার। মেটুলি, কিডনি একেক দিন! মুরগীঅলা কিষেণের দিন খারাপ যাচ্ছে। তাকে মুখার্জিসাহেব ধৈর্য ধরে বোঝান—তাঁর নিজেব জন্যে আর কতটুকু লাগে। দিদিমা যে খায় না। আর ঝুপলি? কক্ষনো ওদের মুরগী দিতে নেই। সুরু সরু হাড় যদি একবার পেটের ভেতরে চলে যায় তো ইনটেসটিন ফুটো হয়ে যাবে একেবারে। তখন অক্কা। '—নলি নলি হাড় দিস, বেটি চিবোক, যত পারে চিবোক'—তিনি আনোয়ারকে নির্দেশ দ্যান। বেছে বেছে গাজর কেনেন, বাঁধাকপি কেনেন, পালং শাক, কলমি শাক। ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ যেন কম না হয়ে যায় ঝুপলির শরীরে।

ইতিমধ্যে মুখার্জি গিন্নিরও বিজয় গৌরবের কারণ ঘটে। তিনি প্রথম থেকেই ঝুপলির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা শুচিতা সম্পর্কে খুব সজাগ। প্রত্যেকবার খাবার পর তুলো জলে ভিজিয়ে মুখ মুছে দ্যান। ঝুপলির দাঁত মাজার দরকার নেই শুনে তিনি আকাশ থেকে পড়েছিলেন। মানতেও চান নি। কিন্তু তাঁর স্বামী যখন কিছুতেই দাঁত মাজাতে দিলেন না তখন তিনি জল আর পেরোক্সাইডে মিশিয়ে তাতে তুলো ভিজিয়ে রোজ রাতে একবার করে ঝুপলির দাঁত পরিষ্কার করে দিতে থাকলেন। ঝুপলি হেগো পেছনে থাকবে এ-ও তিনি কিছুতেই ববদাস্ত করতেন না। তুলো ভিজিয়ে তার শৌচকার্য সম্পন্ন করতে লাগলেন। মুখার্জি সাহেব যতই ব্যঙ্গের হাসি হাসুন আর খেপান, এ কাজগুলো তিনি করবেনই। উমি পর্যন্ত তাঁকে বোঝায় 'আচ্ছা দিদিমা, ধরো তুমি কোনদিন পারলে না, অদড় হলে তখন? কে ওকে ছুঁচিয়ে দেবে? কে দাঁত মাজাবে? ভগবান ওদের ওমনি করেই গড়েছেন, দাঁত মাজবার, ছোঁচাবার দরকার হয় নাকো।'

শুনে দাদুসাহেব বলেন '—উমিচাঁদ একটা মুখ্য মেয়ে যা এতো সহজে বুঝে গেল, তুমি ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশনের গ্র্যাজুয়েট হয়েও তা বুঝলে না গিন্নি ; তোমাকে আর উমিচাঁদকে দেখেই আমি খুব ভালো করে বুঝতে পারি—নলেজ ইজ ইনস্টিংটিভ, ইট কাণ্ট বি অ্যাকোয়ার্ড।'

তা সে যাই হোক তার মুখার্জি-মায়ের গর্বোল্লাসের উদ্রেক করে একদিন ঝুপলি ঝুম ঝুম করে বাগানে দৌড়ে গেল। ঝুপলি কোথায় গেল? ঝুপলি কোথায় গেল? দেখা গেল ঝুপলি বাগানের মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে সযত্নে তার বড়-বাইরে চাপা দিচ্ছে।

'দেখেছে? দেখেছো। কী রকম ট্রেনিং। কাজটা যে খারাপ, জিনিসটা যে নোংরা ও ঠি-ক বুঝতে পেরেছে।' মুখার্জি গিন্নি বলে ওঠেন।

রে রে করে ওঠেন মুখার্জি-কর্তা 'জিনিসটা নোংরা না হয় স্বীকার করছি প্রতিমা যদিও জিনিসটা আমরা প্রত্যেকে দেহের ভেতরে বইছি। কিন্তু কাজটা খারাপ, মানে? কাজটা তাহলে না করাই ভালো বলছ? ঠিক আছে উমিচাঁদ, তোকে ভার দিয়ে রাখলুম, পাহারা দিবি কাল থেকে তো দিদিমা যেন খারাপ কাজটা না করে।'

[illegible] বলেন, 'বুড়ো যে হয়েছ, সেটা অসভ্য কথা [illegible] বয়স তার তত অসভ্য-মুখ।'

[illegible] আবার বেশ একটু অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটে গেল। সাহানা সেনগুপ্তদের কুকুর পুটপুটি, আর প্রতিমা মুখার্জিদের ঝুপলি বিকেলের দিকে একই সঙ্গে বেড়াতে যায়। বেড়িয়ে টেড়িয়ে হয় মুখার্জিদের বাড়ির গোল পোর্টিকোতে, নয় সেনগুপ্তদের বাগানে দুই দম্পতি কুকুর নিয়ে বসে আড্ডা দ্যান। এ সময়টা কুকুরদের চেন, কলার সব খুলে নেওয়া হয়। কলারটা খুলে সযত্নে গলাটা ক্রিম দিয়ে ডলে ঝুপলিকে ছেড়ে দ্যান মুখার্জি সাহেব। দুটো কুকুরে মিলে কৌ কৌ পৌ পৌ করে, লুটোপুটি খায়, এ ওর পেছনে দৌড়য়। এক দিন দেখা গেল ঝুপলি তীরবেগে দৌড়চ্ছে। কী? না একটা ধেড়ে ইঁদুর। দেখাদেখি পুটপুটিও দৌড়লো। কিন্তু ঝুপলি একটা টেরিয়ার, তার ভেতরের জিন তাকে ইঁদুর ভোঁদড় শিকার করতে শিখিয়ে দ্যায়। অপব পক্ষে পুটপুটি একটা চূড়ান্ত অলস ও সুখী কুকুর—দিবারাত্র পাখার তলায় শুয়ে হ্যা হ্যা করে আব থাবা পেতে ঘুমোয়। সুতরাং অবিলম্বে ঝুপলি ইঁদুর ধরে। আছড়ে মেরে ফেলে। মুখার্জি সাহেব মন্তব্য করেন—'দ্যাখো সাহানা, পুটপুটির মা বিদ্যেয় ঝুপলির মাযের থেকে বড় হতে পারে, ঝুপলি কিন্তু পুটপুটিকে অনায়াসে হারিয়ে দিয়েছে।' ইতিমধ্যে ঝুপলি তার জীবনের প্রথম শিকাবটিকে পরম পরিতোষ সহকারে খেতে শুরু করেছে। এবং প্রতিমা চেঁচিয়ে উঠেছেন—'ম্যাগো, ঝুপলি, অ্যাই, ঝুপলি—তুই কি খেতে পাস না যে ওইসব নোংরা! ছি ছি ঝুপলি খায় না। না না।' ঝুপলি ভেবলে গিয়ে একবার মুখ তুলে মা বাবাব দিকে তাকাল, কেন যে মা তাকে বাহবা দেওযার পরই হঠাৎ এমন কঠোব হয়ে গেছে তা সে বুঝতে পারল না, এবং না পেরে ইঁদুরটিকে চেটেপুটে খেযে নিল। পুটপুটি তখন অনেক দূরে বসে পিট পিট করে দেখছে।

সাহানা বললেন, 'ঠিকই বলেছেন মুখার্জি-দা, কিন্তু কে যে বেশি খানদানী সেটাও স্পষ্ট বোঝা হয়ে গেল। একজন ইঁদুর খায়, আরেকজন ছুঁযেও দেখে না।' ঠাট্টার সুরেই বললেন সাহানা, কিন্তু পরে দুই দম্পতি যে যার বাড়িতে একা হলে এ নিযে বেশ মনোমালিন্য হল। প্রতিমা বললেন—আজে-বাজে জিনিস খাবার ঝোঁকটা ঝুপলি তার বাবা অর্থাৎ মুখার্জিসাহেবের থেকে পেয়েছে। তিনি যে অত শুদ্ধত:, বাছ-বিচার মেনে চলেন সে কি এমনি এমনি? আর সাহানা কোন্ মুখে খানদানেব কথা উচ্চারণ কবে? পুটপুটিকে ওরা দার্জিলিঙে এক ভুটিয়ার কাছ থেকে কিনেছিল। কুড়ি না পঁচিশটা টাকা দিয়ে। আর ঝুপলি? জহর দাশ তো বিগত তিন পুরুষের হিসেব দিল ঝুপলির। ঝুপলির ভাই তো রাজ্যপালের ঘরে মানুষ হচ্ছে। আইরিশ টেরিয়ার। পাওয়াই যায না এদেশে। তবে?'

ওদিকে সেনগুপ্তদের বাড়িতে সাহানা বললেন—'এম এ বি টি করা যে এতো দোষের সেটা এই প্রথম জানলুম!' অনিল সেনগুপ্ত বললেন 'আরে ছাড়ো তো তোমাদের মেয়েলি কুটকচালি!' সাহানা তখন রাগ কবে বললেন—'ঠেস দেওযা কথাটা কিন্তু কোনও মেয়ে বলেনি, একজন পুরুষই বলেছেন এবং তাঁর সত্তবের যথেষ্ট ওপরে বযস, পঁচাত্তর তো

হবেই। পেডিগ্রি-ডগ কিনে অহংকারে একেবারে মটমট করছেন। আরে বাবা পরামর্শটা কে দিল? কিনিয়েটা দিল কে?

ঝুপলি কিন্তু সেনগুপ্ত-পরিবারেরও খুব নেটিপেটি। প্রথম ইঁদুরটি মারার পর থেকে সে নিজেদের বাড়িতে তো বটেই সেনগুপ্তদের বাড়িতেও ইঁদুর মারতে যায়। যদিও আর খায় না। ইঁদুরের স্বাদ তার ভালো লাগেনি। একতলা বাংলো বাড়ি। ইঁদুর-ছুঁচোর উপদ্রব আছেই, উপদ্রব বাড়লে সাহানাই বলেন—'ঝুপলিকে ডাকো তো! ইনি তো একটি কম্মের ঢিপি।' এই নিন্দাবাদ শুনে পুটপুটি তার ক্লোকের মধ্যে আরও সেঁদিয়ে যায়। অন্তত সাহানাব তাই ধারণা। কিন্তু লজ্জা পেলে কী হবে। আরাম, ঘুম এ সমস্ত ছাড়বার কোনও লক্ষণই সে দেখায় না। সাহানা বলেন—'বেহায়া তো! অপমান হজম করবে, তবু গতর নাড়বে না।'

সেবার পুজোর বিজয়ার সময় ভারি মজাই হল। বিজয়া দশমীটাই একমাত্র উপলক্ষ্য যখন মুখার্জিদের বাড়িতে প্রচুব জনসমাগম হয়। সব বাড়িতেই হয়। মুখার্জিদের বাড়ি একটু বেশিই। একাদশী থেকে কালীপূজো পর্যন্ত চলে। তা, এইবকম্ একটা দল সেবার বোধহয় প্রথম আসছে, আশেপাশে জিজ্ঞেস করছে বাড়ির নম্বর বলে। এদিকে পরিকল্পিত পল্লী যেমন হয়, একই রকমের রাস্তা, বাড়িগুলিও মোটামুটি ধাঁচের। কিছুতেই ঠিকানা খুঁজে পাচ্ছে না দলটি, অবশেষে একটি বালক বলল—ও 'ঝুপলিদের বাড়ি? ওই তো ডানদিকে গিয়ে বাঁ দিকে ঘুরেই দুটো বাড়ি পরে।'

এঁরা মুখার্জিদের মাসিমা মেসোমশায় ডাকেন। বাড়ি খুঁজে আসা হল, খাওয়া দাওয়া আড্ডা সব হল, শেষে ইতস্তত করে বললেন—'মেসোমশাই কি কোনও বাচ্চা পোষ্য-টোষ্য নিয়েছেন না কি?'

'কেন বলো তো?'

'না। ওইদিকে একটি ছোট ছেলে বলল—কি না ঝুপলিদের বাড়ি।' ঝুপলি তখন গ্যাঁট হয়ে তার মায়ের কোলে বসে বসে কুৎকুৎ কবে অভ্যাগতদের দেখছে। এতো বোকার মতো যে দেখলেই হাসি পাবে।

মুখার্জি সাহেব তাকে দেখিয়ে হেসে বললেন—'পোষ্যই বটে। এই যে ইনিই সেই ঝুপলি ঠাকরুণ, যাঁর নাকি এই বাড়ি! সাধ করে নাম রেখেছিলুম 'ফ্লাওয়াবি নুক। ফ্লাওয়ার্সও মন্দ ফোটাই নি। তিন রঙের জিনিয়া, কলাবতী, রাজ্যের দোপাটি, জবা লাল, শাদা গোলাপ। কিন্তু হলে কী হবে বাড়ি এখন 'ঝুপলিজ নুক' হয়ে গেছে! একেই বলে ফোকটেল, বুঝলে হে প্রকাশ! আর একেই বলে কপাল!'

এইভাবেই চলছিল। চলছিল ভালোই। বছর বছর ঝুপলির জন্মদিনে পার্টি হয়। সবাই মিলে নানারকম মুখরোচক খাবার ধ্বংস করতে করতে আড্ডা জমে। কিন্তু একদিন প্রতিমা অত্যন্ত অসময়ে অস্বাভাবিক বেগে ছুটে গেলেন সাহানার বাড়ি। দুজনে মিলে ফিসফিস করে কী কথা হল। শেষে সাহানা বললেন, 'অত ভাবছেন কেন বলুন তো? ওরা জানোয়ার, নিজেদেরটা নিজেরা বুঝবে,.ওর জন্যে কি এখন আপনি স্যানিটারি ন্যাপকিনের খোঁজে যাবেন, না কি?'

—'কী লজ্জা, কী নোংরা! পাঁচজনের সামনে, ছি ছি!'

'পাঁচজন কোথায় পেলেন দিদি? বাড়িতে তো পুরুষ বলতে এক আপনার উনি। মুখার্জিদার সঙ্গে এতদিন ঘর করলেন সে কি লুকোচুরি খেলে?

'তোমার যেমন কথা!' প্রতিমা মুখার্জির ভাঁজ পড়া মুখ লাল হয়ে গেল।

'তবে? নিজেই তো দেখে-শুনে বিচ নিলেন? তখন ভাবেন নি যে ইয়ে হবে?'

না সত্যিই ভাবেন নি প্রতিমা। কেন নিয়েছিলেন? কেন স্ত্রী-জানোয়ারের প্রতি এই পক্ষপাতিত্ব? কেন? কেন? জহর দাশ যখন বলল—'বিচ কিন্তু।' তিনি তো আর পাঁচটা দেখতে চান নি, একেই তুলে নিয়েছিলেন। ঝুমুঝুমু চুল, পশমের গোল্লার মতো, যেন নীলচে ছাই রঙের ফারকোট পরে আছে। কাশ্মীর থেকে কিনেছিলেন এটা! ছোট্ট ফারকোট! সাদা জুতো বকলশ দেওয়া। বড় হয়েও, যখন বি. এ পাশ করে এম. এ পড়ছে সে তখনও অমনি ছোট্টখাট্টো, মিষ্টি, কোঁকড়া পিঠ-ছাপানো চুল! বুকের ভেতর থেকে ডাকটা পাথর ঠেলে বেরিয়ে পড়ছে বুড়ি, বুড়িমা! প্রতিমা প্রাণপণে চাপবার চেষ্টা করেন, মুখ চোখ সে চেষ্টায় একবার লাল তারপর ফ্যাকাশে হয়ে যায়, যেন পাথর গিলছেন। চোখে অন্ধকার। সাহানা বলেন—'কী হল দিদি! শরীরটা হঠাৎ খারাপ লাগছে না কী? আর শরীরের বা দোষ কী? যা গরমটা পড়েছে। কথায় বলে ভাদুরে গুমোট।' সাহানা ঠাণ্ডা জল আনেন ; কপালে বরফ বুলিয়ে দ্যান। সামলে উঠে আস্তে আস্তে বাড়ি ফিরে আসেন প্রতিমা।

'ঘেউ ঘেউ ঘেউ?' রাস্তায় কতকগুলো নেড়ি কুত্তা তাঁর পেছু নেয়! দূর! দূর! প্রতিমা কোনমতে বাড়ি ফিরে আসেন। বাড়ির গেটের কাছে এসে নেড়ি কুত্তাগুলো দ্বিগুণ জোরে ডাকতে থাকে 'ঘেউ ঘেউ ঘেউ।'

'আ-মর—মোলো যা'—উমি বাগান থেকে ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে মারে—'দূর দূর দূর' যায় না নেড়িগুলো। যদি বা অন্যগুলো যায় একটা কিছুতেই যায় না। গেরুয়া আর কালো মেশানো রঙ, বেশ হৃষ্টপুষ্ট। পাত কুড়নো খেয়েও। গেট টপকাবার চেষ্টা করে, ডাকতে থাকে ঘেউ ঘেউ ঘেউ। খাবার ঘরের কোণে কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়েছিল ঝুপলি। তার ছোট ছোট কানগুলো খাড়া হয়ে ওঠে, সে একবার সাড়া দেয়—কৌ।

—'ঘৌ ঘৌ ঘাউ!' ওদিক থেকে ভেসে আসে।

তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে ঝুপলি—কৌ, খৌ, ঘৌ, ঘৌ—সে তীরবেগে গেটের দিকে ছুটে যেতে থাকে। মুখার্জি সাহেবের সমস্ত শরীরের জোর লাগে তাকে কোলে তুলে নিয়ে আবার খাবার ঘরে আনতে, কলার এবং চেন বেঁধে আটকাতে। আটকাবার পরও ঝুপলি মেঝেতে গড়াগড়ি দেয়, আকুলি-বিকুলি করে এবং ডাকতে থাকে কৌ, কৌ, ভৌ। যদিও নেড়িটাকে ততক্ষণে নির্ভীক উমিচাঁদ তাড়াতে তাড়াতে পাড়া পার করে দিয়ে এসেছে।

মুখার্জি সাহেব জরুরি বৈঠকে বসেন সেনগুপ্তের সঙ্গে। সেনগুপ্ত বলেন—'আমার পুটপুটিটা যদি পুং হত তো কথাই ছিল না। দুটোতে কেমন চমৎকার মিলও। আহা জানোয়ারদের জগতে যদি হোমো থাকত দাদা।'

মুখার্জি চুরুটে টান দিয়ে বলে—'না অনিল, কথাটা তুমি লাইটলি নিও না।'

অনিল সেনগুপ্ত বলেন—'আচ্ছা রাত্তিরের দিকে সব চুপচাপ হয়ে গেলে একটা খুব গম্ভীর কুকুরের ডাক শুনি যেন। কোথায় বলুন তো? দাঁড়ান আমি খোঁজ নিই।'

দু চারদিন পরে খোঁজ-খবর করে এসে অনিল সেনগুপ্ত বলেন—'চলুন দাদা আপনার সমস্যার সমাধান বোধহয় হয়ে গেল। যশবন্ত কাপুর বলে এক পাঞ্জাবি থাকে ওদিকে। অ্যালসেশিয়ান। আপত্তি নেই তো?'

—'আরে বাবা জাতে খানদানি হলেই হল। অ্যালসেশিয়ানই হোক আর তোমার ডালমেশিয়ানই হোক।'

বিকেলের দিকেই ঘটকালি-অভিযান শুরু হল। প্রতিমা যেতে চান নি।

—'যত সব অনাছিষ্টি কাণ্ড!' সাহানা পুটপুটিকে নিয়ে হাওয়া খেতে বেরোবেন। অগত্যা অনিল সেনগুপ্ত একাই মুখার্জিদাকে সঙ্গ দেন। মুখার্জি সাহেবের পাশে পাশে হেঁটে চলে শেকল-বন্দী সদ্য রজঃস্বলা ঝুপলি।

যশবন্ত কাপুর সাদরে গেট খুলে দ্যান—'আই য়ে আই, য়ে মুখার্জিসাব, আই য়ে সেনগুপ্তা সাব, ইয়ে তো আপকীই কোঠি হ্যায়। বইঠিয়ে, আরাম কিজিয়ে।' লনের মাঝখানে বেতের চেয়ার টেবিল পাতা। কেতাদুরস্ত বেয়ারা এসে লস্যি দিয়ে যায়। বেয়ারাকে নির্দেশ দেন যশবন্ত কাপুর—রোভারকো ছোড় দো।' সবে দু-তিন চুমুক দেওয়া হয়েছে লস্যিতে, পশ্চাৎপটে মিসেস কাপুরকেও দেখা যাচ্ছে হাসতে হাসতে, বিপুল ফাঁদের সালোয়ার কুর্তা পরা সদালাপিনী বেরিয়ে আসছেন, এমন সময় শোনা গেল—'ঘাঁউ ঘাঁউ ঘাঁউ।' অর্থাৎ রোভারকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পরক্ষণেই সুপুষ্ট পেশীপ্রবাহে বিদ্যুৎ খেলিয়ে দৌড়তে দৌড়তে আসতে লাগল রোভার। রোভার তো রোভারই। বালি-বালি রঙের মাজা শরীরটি। দুই কানের মাঝখানটা কালো, নাক মুখও কালো। ঝকঝকে, বলিষ্ঠ, অভিজাত, মধ্যযুগের বীর যোদ্ধাদের মতো কুকুর রোভার। জামাই করতে হয় তো এইরকম। বাতাসে নাক তুলে যেন কি শুঁকল, তারপর ঝড়ের বেগে ঝুপলির দিকে দৌড়ে আসতে লাগল রোভার। এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখার্জি বাবার হাতের শেকল হ্যাঁচকা টানে খুলে টেবিলের ওপর লস্যির গেলাস উল্টিয়ে ঝুপলি তার লোম-টোম খাড়া করে দিল ভোঁ দৌড়। দৌড় দৌড় দৌড়। একেবারে এ গলি পেরিয়ে সে গলি পেরিয়ে সে বাড়ি টপকিয়ে সে ফ্লাওয়ারি নুক-এ হাজির। মুখার্জি মা-র কোলের ভেতরে ঢুকে তবে নিশ্চিন্ত।

লনে লস্যির প্লাবন বইছে, দুখানা গ্লাস ভেঙে চৌ-চির হয়ে গেছে। মুখার্জি সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষমা-প্রার্থনা করলেন বারবার।

'ইসমে আপকা ক্যা কসুর হ্যায় জী?' যশবন্ত কাপুর মজা পেয়ে হাসতে লাগলেন। গম্ভীর মুখে বাড়ি ফিরে এলেন মুখার্জি বাবা, সেনগুপ্ত-কাকা। বাড়ি ফিরতে সাহানা জিজ্ঞেস করলেন—'কী হল?'

সেনগুপ্ত বললেন—না ; রিস্তা নাকচ করে দিলে বেটি। বহোৎ নারাজ।'

'তাই-ই!' সাহানা হেসে গড়াগড়ি খেতে লাগলেন সব শুনে।

মুখার্জিদের পক্ষে কিন্তু ব্যাপারটা খুব হাসির রইল না। তাঁরা ঝুপলিকে সাধারণত ছেড়ে রাখতেই পছন্দ করেন। খুব ভালো মেজাজের কুকুর। কাউকে বিরক্ত করে না, কামড়ায় না। ঘরদোর নোংরা করে না, গেট বন্ধ আছে, তার চত্বরের মধ্যে যত খুশি ঘুরে বেড়াক না। চেন পরবে একমাত্র বেড়াতে যাবার সময়ে। ঝুপলি তার এ স্বাধীনতা উপভোগ করে, অপব্যবহার করে না কখনও। মুখার্জি সাব বিকেলবেলা তাকে বেড়াতে নিয়ে যাবার সময়ে ডাকাডাকি করেও পেলেন না। আশ্চর্য! ঝুপলি তো বাড়ির মধ্যে নেই। আতিপাতি খুঁজেও তাকে পাওয়া গেল না। এ বাড়ি ও বাড়ি খোঁজা শেষ করে, উদ্বেগে হতাশায় কালো হয়ে দুজনে বসে আছেন, এমন সময়ে দেখা গেল ঝুপলি ফিরছে। গেটের ফাঁক দিয়ে গলে এলো। আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো। বাবা কিছু বলছেন না, মা কিছু বলছে না। ঝুপলি ভেতরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পব দেখা গেল সে তার চেনটা মুখে করে আনছে। বাবার পায়ের কাছে চেনটা রেখে দিয়ে সে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইল। বোকা বোকা কুৎকুতে চোখদুটো বাবার চোখের দিকে চেয়ে স্থির। প্রতিমা ধীরে ধীরে উঠে ভেতরে চলে গেলেন। মুখার্জি-সাহেব আর্দ্র গলায় বললেন,—'ঝুপলি, ঝুপলি, নটি গার্ল তোমাকে চেন পরতে হবে না, এখন চেন পরালে তোমার মা ভীষণ কাঁদবে। কিন্তু আর কক্ষনো অমন একা একা বাইরে যাবে না। যাবে না তো?' ঝুপলি তার বেঁটে ল্যাজটা প্রাণপণে নাড়াতে লাগল। তারপর লাফিয়ে বাবার কোলে উঠল, কোলের মধ্যে যদ্দুর সম্ভব কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে বসে আদর খেতে লাগল।

জোর আলোচনা চলছে বাবা আর কাকার মধ্যে। অনিল সেনগুপ্ত বললেন—'জহর দাশকে কনট্যাক্ট করা ছাড়া তো আর উপায় দেখছি না। কেনেল ক্লাবের ব্যাপার-স্যাপার আমরা কিছুই জানি না! ওদের শুনেছি অনেকরকম নিয়মকানুন আছে। গিয়ে শুধু শুধু অপমান হবো কেন? তার চাইতে জহরকে কনট্যাক্ট করি। কিন্তু জহরের তো আবার ফোন নেই!'

তা মানুষটাকে দু দিন সময় দে! জহর থাকে, সে কি এখানে? অনিলের গাড়ি গেছে গারাজে, তারও তো সাতষট্টির কাছে বয়স হল। ওরকম গুড়মদুম করলে সে পারে? ঝুপলি দিব্যি সকালবেলা ব্রেকফাস্ট করলো, দুটোর সময়ে আটার রুটি, মাংস, অসময়ের গাজর দিব্যি শাটালো। তিনটে নাগাদ খুব সম্ভব, দূরে শোনা গেল সেই আওয়াজ ঘেউ ঘেউ, ঘৌ। ঘেউ ঘেউ ঘেউ!

অমনি ভৌ ভৌ! সাড়া দিয়েই ঝুপলি ছটফট করতে লাগল। মুখার্জি-সাহেব রকম দেখে তাকে বেঁধে রাখলেন। প্রতিমা আড়চোখে চেয়ে দেখলেন একবার, তারপর বললেন—'এ ভাবে শাস্তি দেওয়া কেন? কথায় বলে যার যেখানে মজে মন...।'

—'তাই বলে একটা পারিয়া ডগ? নেড়ি কুত্তা?' গর্জন করে উঠলেন মুখার্জি সাহেব। প্রতিমা কেঁপে উঠলেন।

ছোট্ট একটু দুপুর-ঘুমের অভ্যেস মুখার্জিসাহেবের। আর্ম চেয়ারে শুয়ে শুয়েই ঘুমোন। চটকাটা ভাঙলে মুখ-টুখ ধোবেন, চান করবেন, পোশাক-পরিচ্ছদ পরবেন তারপর দাঁতে

চুরুট কামড়ে চেন হাতে ঝুপলিকে নিয়ে বেরোবেন। বেরোতে গিয়ে দেখলেন, চেন ছেঁড়া পড়ে রয়েছে, ঝুপলি নেই।

বিকেল কাটল, সন্ধে হল, রাত হল, রাত গড়িয়ে ভোর হল ঝুপলি নেই। রাতে দুজনে ঘুমোতে পারেন নি, পোর্টিকোয় বসে কাটিয়ে দিয়েছেন। ভোরের দিকে চেয়ারে বসে বসেই ঢুলেছেন। পরদিন যখন দুপুর কেটে বিকেল হচ্ছে, আকাশে সাজো সাজো রব পড়ে গেছে, গুড় গুড় করে মেঘ ডাকছে ভরা বাদর শুরু হল বলে এমন সময় দেখা গেল ঝুপলি ফিরছে! খোলা গেট দিয়ে ঢুকে এলো, কুৎকুতে লোমে-ঢাকা চোখদুটো এদিক ওদিক ঘুরছে, সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে এবার।

মুখার্জি সাহেব গর্জন করে উঠলেন—'গেট আউট, গেট আউট আই সে।' ঝুপলি ভেবলে গিয়ে তাকালো। তিনি পথ আটকিয়ে দাঁড়ালেন। যেদিক দিয়েই ঝুপলি ঢুকতে যায় তাঁর কেডস্ পরা পা জোড়া সেখানেই গিয়ে দেয়ালের মতো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। প্রতিমা পেছন থেকে আর্ত গলায় বললেন—'কী করছো? কী করছো? এবার ছেড়ে দাও। অনেক শাস্তি হয়েছে, ওকে ঢুকতে দাও!'

মুখার্জি সাহেব তীক্ষ্ণ গলায় বললেন—'নো।'

গর্জমান আকাশের তলা দিয়ে মুখ নিচু করে ঝুপলি চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই আকাশে রোলার গড়িয়ে প্রচণ্ড জোরে বৃষ্টি নামল। জলের প্রবল ছাটে পোর্টিকো ভিজে যাচ্ছে, উঠে যেতে যেতে প্রতিমা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন—'দেখো তো কী করলে? এই বৃষ্টিতে কোথায় ভিজে জাব হবে এখন! নিউমোনিয়া না হলেই বাঁচি। মুখার্জি বললেন—'কিস্যু হবে না। কম চালাক নাকি? সেনগুপ্তদের বাড়ি সেঁদিয়েছে দেখবে। পুটপুটির সঙ্গে হয়তো খেলা জুড়ে দিয়েছে।'

—'তাই বলে এই ভীষণ বৃষ্টির মধ্যে এইভাবে বার করে দেবে?'

মুখার্জি-সাহেব দাঁতে চুরুট কামড়ে বললেন—'ওর একটু শিক্ষা হওয়া দরকার!'

—'ওই শিক্ষাই দাও জীবনভর, আর কিছু দিও না, কিছু দিতে শিখো না, প্রতিমা দ্রুতবেগে স্বামীর এলাকা থেকে দূরে শোবার ঘরের আশ্রয়ে চলে যেতে থাকলেন।

বৃষ্টি থামলে, চকচকে ভিজে রাস্তার ওপর টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে মুখার্জি সাহেব চললেন সেনগুপ্তর বাড়ি। বেল বাজছে। সাহানা খুললেন—'কী ব্যাপার দাদা? আপনি এতো রাতে?'

—ঝুপলি আসে নি?

—'কই না তো? বাড়িতে নেই?'

—'নাঃ।'

মহাপাত্রদের বাড়ি গেলেন মুখার্জি—'ঝুপলি : আমার টেরিয়ারটা! এসেছে?'

—'কই না।'

প্রীতমের বাড়ির বেল বাজালেন মুখার্জি। প্রীতম খুলে দিয়েছে—'ক্যা হুয়া আঙ্কল : কুছ গড়বড় তো নহী হুয়া!'

—'ঝুপলি ইজ মিসিং। একটু বকাঝকা করেছিলুম!'

—'ওহ হো' প্রীতম বোকার হাসি হাসল কীধর জায়েগী উও, পেট হাউজডগ, কোঠী গিয়ে দেখুন, এসে বসে আছে।'

কোঠীই চলে এলেন মুখার্জি। উমি খুলে দিল। —'ঝুপলি ফিরেছে রে?'

—'না তো দাদুসাহেব! এই দুর্যোগের রাতে কোথায় গেল বলো তো?'

বাইরের জুতো মোজা ছেড়ে শোবার ঘরে এসে থমকে গেলেন মুখার্জি। প্রতিমা একটা অ্যালবাম বুকে আঁকড়ে মড়ার মতো চোখ বুজিয়ে শুয়ে আছেন। ঠোঁট নড়ছে। বোধহয় জপ করছেন।

তার পর দিনও ঝুপলি এলো না। পর দিনও না। পর দিনও না। কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল লস্ট কলমে 'এ টুয়েলভ ইঞ্চ হাই ব্লুয়িশ গ্রে আইরিশ টেরিয়ার আনসারিং টু দা পেট নেম অফ ঝুপলি ইজ মিসিং সিন্‌স থার্ড সেপ্টেম্বর....এটসেটেরা এটসেটেরা।' একদিন দুদিন করে পুরো একমাস হয়ে যাবার পর অবশেষে মুখার্জি সাহেব বুঝতে পারলেন ঝুপলি আর আসবে না। এবং প্রিয় মানুষে আর প্রিয় কুকুরে কোনও কোনও ক্ষেত্রে কোনও তফাতই নেই। ঝুপলি তাঁর সমস্ত আদেশ বেদবাক্য বলে মানতে শিখেছিল। মনোসিলেবিক সব আদেশ। 'সিট ডাউন' তো 'সিট ডাউন', 'স্টে পুট' তো 'স্টে পুট', 'গেট আউট' তো 'গেট আউট'। সে এমনটাই বুঝেছে। তার বোকাটে কুতকুতে চোখ, ভোঁতা কালো নাক আর বেঁটে খাড়া লোমশ লেজ নিয়ে ঝুপলি এই নিরাত্মীয় পৃথিবীর বুকে হারিয়ে গেছে।

পোর্টিকোয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষাক্লান্ত মানুষটি শেষে একেবারে ভেঙে পড়েন। ভাঙা গলায় বলতে থাকেন—'আই ডিডনট্ মীন ইট বুড়ি, ওহ বুড়ি মা, আই নেভার মেণ্ট ইট। ইউ জাস্ট কাম ব্যাক অ্যাণ্ড সি....'

মেঘলা আকাশের তলা দিয়ে ফিরছেন সেনগুপ্ত দম্পতি। দুজনেরই মন খারাপ। সাহানা ভারী গলায় স্বামীকে জিজ্ঞেস করেন—'ঝুপলিকে আবার কবে থেকে বুড়ি মা বলে ডাকা ধরেছেন মুখার্জিদা?'

অনিল সেনগুপ্ত বিষণ্ণমুখে বলেন—'কী জানি!'

সমুদ্র

ছেলেবেলায় আমরা ছিলুম গরিব। কিন্তু একদম ছোটদের ঐশ্বর্য সম্পর্কে ধারণাটা বড়দের মতো নয় বোধহয়। তাই আমরা ভাইবোনেরা, অন্তত আমি আর বিনু জানতুম না যে, আমরা গরিব। বাবা গলা ছেড়ে হা হা করে হাসতেন। মা ছিলেন সন্ধ্যাপ্রদীপের শিখার মতো। আর, আমাদের বাড়ির যে অংশটা আমাদের ভাগে পড়েছিল সেখানে মাঠের মতো দালানের এক অংশ।

আর বিরাট উঁচু সিলিং-এর তিনখানা ঘর, আর জালি ঘেরা ব্যাডমিন্টন খেলা যায় এমন বারান্দা—এরকমটা আমাদের কোনও বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িতে আমরা দেখিনি। আসবাব ছিল কতকগুলো—আড়ে দীঘে মহাকায় এক আলমারি, ভীষণ ভারি একটা দেরাজ, পেতলের টপওয়ালা টেবিল আর পাঁচ ছ'খানা অদ্ভুত আকারের চেয়ার। পায়াগুলো তাদের গড়িয়ে আসা ঘন গুড়ের মতো। কালচে লাল মেহগনি পালিশ। সবার ওপরে, আমাদের সবচেয়ে প্রিয় ছিল দালানে আমার চেয়েও বড় মাপের একটা সাদা পাথরের পরীর মূর্তি। সে ডানা গুটিয়ে মুখ একটু নিচু করে নামছে। একটা পা মাটিতে, আর এক পা এখনও শূন্যে, শূন্যে-তোলা পায়ের আধখানা ভাঙা। একটা পা অমন ভাঙা বলেই যেন পরীটা ছিল আমাদের খুব কাছের মানুষের মতো, যার জন্যে মন খারাপ হতে পারে।

কতদিনকার জিনিস সব, হিসেব জানি না, কখনও এসবে পালিশ চড়েনি, ঘর-দোর কখনও রঙ হতে দেখিনি, কিন্তু সব কিছু ঝকঝক তকতক করত। বাবা মা আর দিদি মিলে ঝেড়ে ঝুড়ে সব কিছু এমনি রাখতেন। বাইরের থেকে বাড়িটাকে দেখিয়ে যদি বন্ধুদের বলতুম—'এই আমাদের বাড়ি', তাহলে তারা মূর্চ্ছা যাবার যোগাড় হত—'তোরা এই বাঘ বাড়িতে থাকিস ? তোদের বাবা রাজা না কি রে ?' একথা বাবা-মার সামনে বলার জো ছিল না। বললেই বাবার হাসি মুখ আঁধার হয়ে যেত, মায়ের মুখের চেনা আলোর শিখাটা দপ করে নিবে যেত আর পরে কোনও সময়ে দিদি কোনও একটা হাতের কাজ সারতে সারতে আনমনে ধমক লাগাত 'বলার আর কথা পাস না, না রে টুনি ? হুঁ, রাজা ? রাণী! রাজকন্যে হবার খুব শখ, না রে ? ভগবান জানেন, রাজকন্যে হবার শখ আমার মোটেই ছিল না। রাজকন্যেদের রাজ্যে দৈত্য এসে সব পাথর করে দিয়ে যায়। রাজকন্যেকে উঁচু জলটুঙ্গি ঘরে জন্মের মতো ঘুম পাড়িয়ে রেখে দেয়, সোনার কাঠি রূপোর কাঠি মাথায় পায়ে রেখে, জাগায় শুধু নিজের আকাট-বিকট মুখখানা দেখবার জন্যে। রাজকন্যে কি হতে আছে ? আমার ভাই বিনুকে চুপিচুপি জিজ্ঞেস করতুম—'হ্যাঁ রে বিনু, দিদি আমাকে বকল কেন রে ! বাবাকে রাজা বললে বাবা কেন রাগ করে রে ?' বিনু আমার থেকে বয়সে ছোট হলে কি হবে, বুদ্ধিতে ছিল অনেক পাকা, বলত—'তুই জানিস না টুনি ! আমাদের ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা এই এত বড় বাড়ি, বাগান, ঠাকুরদালান সব করে গেছিলেন। ঠাকুর্দার ঠাকুর্দাকে সবাই রাজা বলত।'

—'তো কি ? ভালো তো !'

—'দূর বোকা, ভালো কোথায় ! মদ খেত তো ঠাকুর্দাদের সব্বাই। কেউ কোনও কাজ করত না। খালি পায়রা ওড়াত আর বেড়ালের বিয়ে দিত আর সায়েবদের পা চাটত। তাই তো আমাদের আজকে এই দুরাবস্থা।'

বিনুটা সে সময়ে বাংলায় ভীষণ ভালো হবার চেষ্টা করছে। 'দুরাবস্থা' তো কোন্ ছার 'অকুতভোয়', 'অদূরদর্সিতা' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে ও ঘন ঘন স্কুলের মাস্টারমশাইদের মুর্ছার কারণ হচ্ছে। যাইহোক, বিনুর কথাবার্তা থেকে আমি বোকা মেয়ে খালি এইটুকু উদ্ধার করতে পারতুম, রাজা হওয়াটা খুব খারাপ, রাজারা খুব খারাপ লোক হয়, বোধহয় আমাদের পাড়ার হাতকাটা তেঁতুলদার চেয়েও খারাপ।

একমাত্র দুটো সময়ে আবছাভাবে বুঝতে পারতুম—আমরা গরিব, আমাদের যথেষ্ট পয়সা কড়ি নেই। পুজোর সময়ে আর বেড়াতে যাবার মরসুমে। পুজোর সময়ে আমাদের ঠাকুরদালানে ডাকের সাজ পরা দুর্গা প্রতিমা পুজো হত, সারা কলকাতার লোক ভেঙে পড়ত ঠাকুর দেখতে, কিন্তু আমাদের দুটোর বেশি তিনটে জামা হত না। মা সারা ভাদ্র-আশ্বিন, সেই পঞ্চমীর দিন পর্যন্ত হাত মেশিনে সেলাই করত। বাড়ির সবার সায়া, পাঞ্জাবি, ব্লাউজ, ফতুয়া, ফ্রক, জাঙিয়া, শার্ট, প্যান্ট। শুধু নিজেদের নয়, সেই রায়বাড়ির বাসিন্দা নানান রকমের কাকা-জ্যাঠাদের পরিবারের। এই ডাঁই জামা-কাপড়ের মধ্যে থেকে একটা অপূর্ব থাক-থাক দেওয়া সোনালি রঙের খড়মড়ে ফ্রক বার করে হয়ত আমাকে ডেকে বলত 'টুনি দ্যাখ দিকি নি পছন্দ হয় কিনা !' আমি দৌড়ে আসতুম, অমন জামা পছন্দ না হয়ে পারে ? বলতুম—'মা এটা অষ্টুমীর দিন পরব তো ? ষষ্ঠী, সপ্তমী, নবুমী, এগুলো ? মা আবার সেই ডাঁইয়ের মধ্যে হাত চালিয়ে একটা সাধারণ ছিটের সাদা-সিধে ফ্রক বার করে বলত—'এইটা ষষ্ঠীর দিন পরবি।'

—'আর' ?

—'আবার কি ? দেখছিস না কতজনের কত ফরমাশ, এই সব সেরে আর কখনও করতে পারি ? নড়া ব্যথা হয়ে গেল যে রে !'

এমনিতে খুব মাতৃভক্ত হলেও, আমি নড়া-ব্যথার কথায় ভুলতুম না। কেঁদে কেটে একসা করতুম। কারণ আমার চোখের সামনে তখন ভাসছে খুড়তুত দুটি বোন পুতুল-বীথির পাঁচ দুগুণে দশটা করে ফ্রক, কোনটা ফ্রিল দেওয়া, কোনটার কুকুরের কানের মতো কলার, কোনটাতে সিল্কের ওপর মিকি মাউস, এক একটায় একেক রকম চমক। তাদের পাশাপাশি আমি ওই সোনালি অর্গ্যাণ্ডির ফ্রক পরে রো—জ !

—'কেন তুমি এত জনের এত জামা করবে ? কেন খালি আমার বিনুর আর দিদির আর তোমার আর বাবার করবে না ! কেন ? কেন ? কেন ?' আমার সেই নেক-আঁকড়া কান্নার মধ্যে মা সেলাই-কলের ওপর গালে হাত দিয়ে চুপটি করে গম্ভীর মুখে বসে থাকত দিদি জোর করে আমাকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করত, আর ঠিক এমনই সময়টা বাবা এসে দাঁড়াতেন—'কী হল ? টুনি এতো কাঁদছে কেন ? ও কি, বুলা, টুনিকে ওমনি করে এক পা ধরে টানছিস কেন ?'

—'দ্যাখো না বাবা, টুনি মাকে কাজ কবতে দিচ্ছে না, পুজোব আর ঠিক পনের দিন বাকি ! এ সবই তো আমাদের শেষ করতে হবে, না কি ?'

দিদি মাকে সাহায্য করত। বোতাম বসানো, বোতাম-ঘর করা, হেম সেলাই করে দেওয়া, সিল্কের জিনিস তৈরি করার সময়ে টানটান কবে ধরে বসে থাকা, স—ব। বাবা সমস্ত শুনে গম্ভীব হয়ে যেতেন। পরদিন দুপুরবেলা গলদঘর্ম হয়ে কোথা থেকে ফিরে এসে ডাকতেন—'টুনি-ই, টুনটুনি-ই, টুন-টুনটুনি-ই !' আমি ছুটে যেতে হাতে একটা বাক্স ধবিয়ে দিয়ে বলতেন—'দ্যাখো তো টুনি, পছন্দ হয় কি না !' বাক্সব ভেতর থেকে বেবোতো সাদা-ধবধবে সুইস-সিল্কের লেস দেওয়া স্বর্গীয় ফ্রক, তার জায়গায় জায়গায় ছোট্ট ছোট্ট এমব্রয়ডারি ফুলের গোছা। ফ্রকটা তুলে নিয়ে তার ভেতরে নাক ডুবিয়ে আমি শুধু সেই গন্ধটুকু নিতুম প্রাণ ভরে, হারিয়ে যেতুম গন্ধটার ভেতর। আমি তখন একটা খুশির পুতুল, ডুবে যাচ্ছি সুখের সাগরে। আর ঠিক সেই সময়ে মা এসে দাঁড়াত—'এ কি গো ? এ ফ্রক কোত্থেকে আনলে ? এ যে অনে-ক দাম ! কোত্থেকে ?'

—'নিউ মার্কেট।'

—'ইস্‌স্‌স্‌ ! কত নিল ?'

—'সুন্দর কিনা সেটা বলো আগে ! অত দাম দাম করছ কেন ?'

—'সুন্দর তো বটেই ! দামটা কত সুন্দর সেটাও আমার জানা দরকার !'

—'পঁয়তাল্লিশ টাকা।'

—'কী বললে ? পঁয়তা-ল্লিশ টাকা ? এতে যে ওর তিনখানা ফ্রক হয়ে যেতো গো ! কোথা থেকে....'

—'আঃ, চুপ করো না এখন !'

'এর পরেও আছে জুতো, মোজা, রিবন, পুজোর কদিনের নানা বায়না....' মা কথা শেষ না করে চলে যেত।

রাত্তিরে দিদি গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলত—'টুনি, বাবার না একটা খুব দরকারি জিনিস কেনার ছিল, সেটা বাদ দিয়ে তোর অত দামি ফ্রকটা কিনে এনেছে। তুই কাল বাবাকে বলবি ফ্রকটা ফেরৎ দিতে, বলবি ওটা তোর পছন্দ নয়, হ্যাঁ ?'

—'কি করে মিছে কথা বলব ? আমার যে জামাটা খুব পছন্দ দিদি ? বাবা দরকাবি জিনিসটা অন্য টাকা দিয়ে কিনুক না !'

দিদি বলত—'বলবি সাদা জামা আমার পছন্দ না, তুই আর জামা নিবি না !' আমি তখন কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলতুম—'তোমরা সবাই বিচ্ছিরি। আমার জামাটা এত পছন্দ, তবু ওটা অপছন্দ বলতে বলছ! পুতুল, বীথি, ঝরি, দীপু, মঞ্জু সবাই একেক দিন একেকটা জামা পরবে। সব্বাই। খালি আমি....' কথা শেষ করতে পারতুম না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকতুম, কান্নার আওয়াজে মা ঘরে ঢুকে বলত—'বুলা। টুনি কাঁদছে কেন রে ? বকেছিস ?'

—'দ্যাখো না মা' আমি নাকে কান্না চড়াবার আগেই দিদির হাত কঠোরভাবে আমার

মুখ বন্ধ করে দিত, মা একটুখানি দাঁড়িয়ে থেকে বলত—'বুলা, ওকে বকিস না। ছেলেমানুষ....'

পুজোর কদিন ভারি মজা। বুড়ির মাথার পাকা চুল, হাওয়া মেঠাই, পাঞ্জা বরফ, লম্বা বেলুনের চ্যাঁ চোঁ, গ্যাস বেলুন। ঠাকুরদালানে ঝাড়বাতির নিচে ডাকের সাজ পরে ঠাকুর ঝলমল করছে। কোনও একজন কাকিমা ডেকে বলছে—'টুনি এই সিল্কের জামা তোকে কে দিল রে ?'

—'কে আবার দেবে ? আমার বাবা !' বাবার গর্বে ঝকমকে মুখ আমি দৌড়ে হারিয়ে যাচ্ছি বন্ধুদের ভিড়ে আমার ডাকের সাজে। সাদা ধবধবে সিল্ক, তাতে সরু লেসের পাড়, চকচকে সুন্দর লজেন্স-লজেন্স গন্ধঅলা এমব্রয়ডারির নানান রঙের ফুলের গোছা। 'টুনি—টুনি-ই', বীথি ডাকছে বুঝি। 'কি সুন্দর তোর এই জুতোটা !' 'আইরিন এর নাম। বাটার নতুন জুতো, বাবা কিনে দিয়েছে। আমার বাবা !' সগর্বে বলতে বলতে আমি দৌড়ে নামব, ঠাকুরদালানে চামড়ার জুতো পরে ওঠা বারণ। তার সামনের চত্বরে হাজার মুখের মেলা, তারই মধ্যে কোনও কোনও চোখ আমার ওপর, আমার ফ্রকের ওপর আটকে যাবে, কেউ হয়ত বলে উঠবে—'ফ্রকটা কী সুন্দর, দেখেছো ? মিনুকে এই রকম একটা....'

নতুন কস্তাপেড়ে শাড়ির আঁচল মাথায় দিয়ে, পায়ে-আলতা মা চলে যাচ্ছে ঠাকুরদালানের দিকে। হাতে পেতলের ভারী থালায় কত কি রহস্যময় পুজোর জিনিস। বাবা কোরা কাপড়ের খুঁট গায়ে জড়িয়ে ঠাকুরমশাইয়ের পেছনটিতে বসে, বিনুর হাত থেকে ফিরোজ রঙের গ্যাস বেলুনটা হুউশ্‌শ্‌ ! ধনেখালির হলুদ ডুরে শাড়ি পরে দিদি এসে দাঁড়াচ্ছে। আমার দিদি, আরও অনেক দিদি। খুড়তুত, জাঠতুত, পাড়াতুত। কেউ সিল্ক, কেই অর্গ্যাণ্ডি, কেউ বেনারসীই। মহা সমারোহে সন্ধিপুজো শুরু হয়ে গেল। সেই ধূমধামের সন্ধিপুজোব ধুনো-গুগ্‌গুলের চোখ-আঁধার করা আবছা পর্দার মধ্যে থেকে ঘোমটার ভেতর মায়ের ভক্তিনম্র, অনিন্দ্য মুখখানা মাঝে মাঝে দেখা দিয়েই হারিয়ে যাচ্ছে। কে যেন বলছে—'বুলার শাড়িটা বড্ড খেলো। পুজোর কাজে নষ্ট হয় যাবে বলে পরেছে না কি রে ? কে যেন তার জবাব দিচ্ছে—'দূর, কোথা থেকে দামি শাড়ি পাবে !' .....কথাগুলো তাদের পুরো অর্থ নিয়ে আমার ছোট্ট মাথায় ঢুকছে না, কিন্তু শরীরে কেমন একটা অসোয়াস্তি, রাগে দুঃখে আস্তে আস্তে কান গরম, মাথা ফাঁকা ! আমার দিদির শাড়িটা খেলো ! মানে বাজে ? কেন ? কত সুন্দর দেখাচ্ছে যে দিদিকে ! শাঁখের ফুঁ পাড়ছে দিদি সমানে, গালগুলো গোল টোপর হয়ে ফুলে উঠছে, কপাল, নাক, থুতনি সব দুগগা ঠাকুরের মতো লাল !' 'কোথায় চললি টুনি ?' কে যেন পেছন থেকে বলছে চেঁচিয়ে। ঢাক বাজছে ঢোল বাজছে তুমুল হুল্লোড়ে, কাঁসর বাজছে কাঁই না না কাঁই না না। আমি গরিব, আমরা গরিব, দিদির শাড়িটা খোলো, বিনুর হাফ-প্যাণ্ট ঝলঝলে, বাবার খালি গায়ে কোঁচার খুঁট, এই পুজো, এই হই-চই এসব পুতুল বীথিদের জন্যে, মঞ্জু-দীপুদের জন্যে, মাধুদি, নীল মাসি, নতুন কাকিমা, গীতালিদিদের জন্যে। আমি চলে যাচ্ছি সাদা সিল্কের ফ্রকের ঠাট্টা শুনতে শুনতে আমাদের উঁচু ঘরের অসীম নিঃশব্দ পরিসরের মধ্যে আমার কান্না লুকিয়ে ফেলতে।

পুজো ফুরিয়ে গেলে আবার সব ভুলে যাই। তখন দিদির অনেক যত্নে তুলে রাখা মলাট দেওয়া বই স্কুল ব্যাগ. টিফিন-কৌটোয় ঘুগনি, বাবার কাছে অঙ্ক-ইংরিজি, বিকেলবেলায় মণিমেলা, দিনগুলো সব একে অপরকে হারাবার জন্যে দুদ্দাড় ছুটত, আমিও তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতুম। আর সারাদিন ছোটার ক্লান্তিতে, আনন্দে রাতের কোলে, মায়ের কোলে, দিদির কোলে ঢলে পড়তুম অবাধ সুন্দর শীতল-বিস্ময়বর্ণের অথই দিঘিতে।

কিন্তু গরমের ছুটি, পুজোর ছুটি, বড়দিনের ছুটির সময়ে গরিব-বিছেটা আবার আমায় কটাস কটাস করে কামড়াত। পুজোর সময়ে না হয় সব শরিকে মিলে মল্লিকবাড়ির বিখ্যাত একশ বছুরে পুরোনো পুজো, কোথাও যাওয়া যাবে না। গরমের ছুটিতে না হয় বাবার আপিস, বড়সায়েব কিছুতেই ছুটি দিতে চায় না, কিন্তু বড়দিন ? তখন যে কলকাতায় ঝুড়ি-ঝুড়ি কমলালেবু, থইথই করছে আকাশ নীল। এখানে সেখানে চড়ুইভাতি ! স্কুলের বন্ধু মিতালি বলত—'তনিমা, তোরা শীতে কোথাও যাবি না ? আমরা এবার গিরিড়ি যাচ্ছি। উশ্রী জলপ্রপাত আছে, খু-উ-ব সুন্দর জায়গা !' কেয়া বলত—'আমরা যাচ্ছি হাজারিবাগ, জঙ্গল দেখব. বাগানে লুকোচুরি খেলব আর রোজ মুরগি, রোজ.....' শিপ্রা বলত—'দূর, হাজারিবাগ, গিরিডি ওসব তো হাতের কাছে, ট্রেনে চড়লি নেমে পড়লি। কোনও মজাই নেই। আমরা যাবে দু-রাত্তিরের পথ, দিল্লি ! লালকেল্লা দেখব, কুতুবমিনার দেখব, তাজমহল দেখব চাঁদের আলোয়, বাবা বলেছে।'

আমি অবাক হয়ে ভাবতুম কুতুবমিনার ! কুতুবুদ্দিন আইবক তৈরি করেছিলেন, ইলতুতমিস শেষ করেন সেই কুতুবমিনার ! লালকিল্লা ! যার ভেতরে ময়ূর সিংহাসন, দেওয়ান-ই খাস, দেওয়ান-ই-আম ! ওসব তো পুরনো-হয়ে যাওয়া ইতিহাস বইটার পাতায় থাকে ! দেখা যায় ! ওদের দেখা যায় ! আব তাজমহল ? 'কালের কপোল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল সেই তাজমহল ? সেইটা দেখবে শিপ্রা ? যে রোজ ইস্কুলে আমার পাশে গা ঘেঁষে বসে থাকে, আমার ঘুগনি খায়, আমাকে গোলাপ জাম খাওয়ায়, সেই শিপ্রা ?

'বাবা ! বাবা ! এবার বড়দিনের ছুটিতে আমরা কোথায় যাবো ?' বাবা অবাক হয়ে চেয়ে বলতেন—'অ বুলা ! দেখতো ছোট্ট টুনটুনি পাখিটা কী যেন কিচিরমিচির করছে!'

—'না বাবা, সত্যি বলো না, শিপ্রারা যাচ্ছে, মিতালিরা যাচ্ছে। সবাই যাচ্ছে যে !'

—'সবাই চলে যাচ্ছে ? তাহলে তো সারা কলকাতাটাই গড়ের মাঠের মতন ফাঁকা হয়ে যাবে রে ! শুদ্ধু আমরা কজন ? বেড়াব, খালি বেড়াব।'

—'হুঁউ—ঠাট্টা নয়, বলো না !'

দিদি হঠাৎ তার বাটনা-বাটা হলুদ হাত ছোট লাল গামছায় মুছতে মুছতে এসে দাঁড়িয়েছে।

—'বাবাকে বিরক্ত করছিস কেন রে টুনি। দেখছিস না হিসেবের কাজ করছে !'

বাবাকে, মাকে ভয় পেতুম না, কিন্তু দিদিকে বিলক্ষণ।

—'ও দিদি, বাবাকে বলো না বড়দিনের ছুটিতে আমাদের দিল্লী নিয়ে যাবে ! লালকেল্লা দেখব, তাজমহল.....বলো না!'

দিদি গম্ভীরভাবে বলত—'তোর কোন্ বন্ধু যাচ্ছে ?'

—'শিপ্রা তো ! শিপ্রা যাচ্ছে!'

—'তাই ওমনি তোকেও যেতে হবে ? লোকে যা যা করবে তোকেও ঠিক তাই তাই করত হবে ? বাঃ ! লোককে নকল করে যারা তাদের কী বলে জানিস ?'

ভয়ঙ্কর কিছু বলে নিশ্চয়ই। আমি আর কথা বাড়াতে সাহস পাই না। কিন্তু কান্না গিলে নিতে নিতে ভাবতে থাকি—দিল্লি যাওয়াটা তো খারাপ কাজ নয়। কোন মতেই নয়। তাহলে ? রাত্তিরে ঘুমের ঘোরে মায়ের গলা শুনি—'সত্যি, কাছাকাছি, খুব কাছাকাছি থেকেও যদি....' দিদির গলা।

—'তুমি চুপ করো তো মা ! এই করতেই বাবার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে ..... ছোটরা তো ওরকম অবুঝপনা করবেই.....!' আবার ঘুমিয়ে পড়ি। ছোট্ট একটা বিছে বুকের ভেতরে নিয়ে। বিছেটা কুটুস কুটুস কামড়াবে, গর্তের মধ্যে সেঁধোবে, আর ঘুমের মধ্যে কে যেন বলতে থাকবে তোদের টাকা-পয়সা নেই, তোরা কি করে.....তোর বাবার টাকা-পয়সা নেই, তোরা কি করে....। ট্রেনের চাকার ঘ্যানঘেনে আওয়াজের মতোই সারা রাত সেই শব্দগুচ্ছ আমার আধ-ঘুমন্ত অভিমানী মাথার মধ্যে গুমগুম কর বাজবে। আমি যাচ্ছি, আমি ট্রেনে চড়েছি ঠিকই। কিন্তু সে ট্রেন দিল্লি যায় না, হাজারিবাগ যায় না, উশ্রী যায় না, এক নিদারুণ দুঃখের দেশে, নেই-নেই গরিবের দেশে নিয়ে যায়। সেখানে বাবাদের টাকা থাকে না, দিদিদের শাড়ি খেলো হয়, খাটো শাড়ি সেমিজ পরে রাতুল-চরণে-আলতা মায়েরা অবিশ্রান্ত ঘুরে বেড়ায় কাজের পাকে।

সেবার কিন্তু বাড়িতে ভারি একটা আনন্দের ব্যাপার ঘটল। বিদেশি টিকিট মারা নীলচে নীলচে চিঠি আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝেই আসত। একদিন ওই রকম একটা চিঠি নিয়ে বাবা ঝলমলে মুখে দালানের শেষে রান্নাঘরের মুখে এসে দাঁড়ালেন—'ওগো শুনছো। ফুটকুন আসছে যে !'

মা তোলা উনুনে দুধ বসিয়েছিলেন, উঠে দাঁড়িয়ে আরও ঝলমলে মুখে বলল—'ফুটকুন ঠাকুরপো ? সত্যি !' —'হ্যাঁ গো ! সব্বাই। ফুটকুন। স্টেলা, ছেলে-মেয়ে।' মা ব্যস্ত হয়ে বলল, 'আমাদের এখানে ? সে কি গো ? মেমসায়েব....তার সাহেব মেম ছেলেমেয়ে.....কোথায় থাকবে ? কী খেতে দেবো !'

বাবা হাসিমুখে বললেন—তবে শোনো ফুটকুন কী লিখেছে, 'প্রিয় মেজদা, এবার দেশের এবং আমাদের বাড়ির সাবেকি পুজো দেখাতে ফ্যামিলি নিয়ে দেশে যাচ্ছি। তোমার কাছেই থাকব। অন্য কোথাও তো আমাদের জায়গা হবে না ! হলেও মেজবউদির মতো পরিষ্কার বাতিক আর কারো আছে বলে জানি না। আমাদের থাকা নিয়ে একদম উদ্বিগ্ন হবে না। আমি লাউশাকের চচ্চড়ি খাব মটর ডালের বড়া দিয়ে, লাউচিংড়ি, পটল ভাজা, মৌরলামাছের বাটি চচ্চড়ি....যদি সম্ভব হয়, আর এরা খায় আলুসেদ্ধ, বাঁধাকপি সেদ্ধ, বীন আধসেদ্ধ, কাঁচা টোম্যাটো, কাঁচা গাজর। শুধু জলটা একটু ফোটানোর ব্যবস্থা করবে। পুজোটা কাটিয়ে আমরা একটু বাইরে বেরোব। তারপর ফিরে আসব। তিন সপ্তাহের ছুটি। মেজবউদির চরণে আমার প্রণাম দিও। বুলা কত বড় হল ? তোমার ফুটকড়াই দুটোকে তো আমি দেখিইনি। ইতি তোমাদের ফুটকুন।'

দিদিও ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। হাসিমুখে বলল—'আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি বাবা, তুমি ভেবো না। সাহেব কাকা আর স্টেলা-কাকিমা থাকবে আমাদের ঘরে, তোমাদের ঘরে থাকবে লীলা আর সুভাষ, বৈঠকখানার তক্তপোশে বিনু আর তুমি, মেঝেতে বিছানা করে আমি, মা আর টুনি।'

বাবা বললেন—'দেখলে তো, হয়ে গেল ! বুলা না হলে কিছু হয় !' বলে বাবা মধুক্ষরা দৃষ্টিতে দিদির দিকে চাইলেন।

জন্মে থেকে, বোধহয় আঁতুড় ঘর থেকে শুনছি—সাহেবকাকা, সাহেবকাকা, ফুটকুন ফুটকুন ! এ বাড়ির এক ছেলে, আমাদের জাঠতুতু, না খুড়তুত, না কী কাকা, ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়ে নাকি আর ফেরেননি, ওখানেই মেম বিয়ে করে রযে গেছেন। তাঁর সাহেব ছেলে, মেম মেয়ে। তাঁর বাবা রেগেমেগে তাঁকে ত্যাজ্য করে দিয়েছেন। নিজের লোকেদের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, খালি মেজদা-মেদবউদি বলতে সাহেবকাকা অজ্ঞান। নিয়মিত চিঠি লিখে খোঁজখবর নেন, সে বোধহয় আজ সতের আঠার বছর হয়ে গেল। সেই সাহেবকাকা, মেমকাকি আসছেন।

আমার আর বিনুর তো বুক গুড়গুড় করতে লেগে গেল। বাবা কোথা থেকে টাকাকড়ি জোগাড় করে বাথরুমে একটা কমোড আর একটা ছোট্ট বেসিন বসালেন। আমি আর বিনু চুপিচুটি হেসে গড়াগড়ি খাই। সাহেব মেমরা উবু হয়ে ড্যাশ বসতে পারে না। চেয়ার চাই। তাকে বলে কমোড ! হিহি ! হিহি ! আমাদের হাসি আর ফুরোতেই চায় না। তবে হাসির মধ্যে মধ্যে একটু ভাবনাতেও পড়ে গেছি। সাহেব দাদা-দিদিদের সঙ্গে কথা বলব কি করে? দু ভাইবোনে মুখস্থ করতে থাকি—হোয়াট ইজ ইয়োর নেম ? মাই নেম ইজ মিস টানিমা মল্লিক, মাই নেম ইজ মাস্টার বিনায়ক মল্লিক। হোয়্যার ডু ইউ লিভ ? আই লিভ অ্যাট জোড়াব্যাগান ইন ক্যালকাটা। তাবপর বাসস্থানের প্রশ্নোত্তরটা দরকার লাগবে না বুঝে দুজনে আবার হাসতে থাকি। হুইচ ক্লাস ডু ইউ রীড ইন ? আই রীড ইন ক্লাস ফোর, আই রীড ইন ক্লাস থ্রি। বলতে বলতে বিনুটার ধৈর্য শেষ হয়ে যায়, সে হাত পা ছুঁড়ে বলে ওঠে হ্যাট, ম্যাট, ক্যাট, কুট, শুট, দ্যাট, র‍্যাট, ফাই, হাই, নাই, হাউ, কাউ, হাঁউ, মাউ, খাঁউ বলতে বলতে দু পাটি দাঁত বার করে, বগলে রবারের বল নিয়ে দে ছুট। বাবা একদিন শুনে ফেলে হেসে বাঁচেন না, বললেন—'তোদের অত ইংরেজি বলতে হবে না, তোরা বাংলাতেই কথা বলবি, হড়বড় না করে একটু স্পষ্ট করে, ধীরে ধীরে বলবি, তাহলেই বুঝতে পারবি। সাহেব নাম হয়ে গেলে কি হবে ! ফুটকুন কোনও দিন সাহেব ছিল না। হবেও না।'

চিকচিকে সিল্কের শাড়ি পরা, ঘাড়ের কাছে নুটু-নুটু খোঁপা বাঁধা স্টেলাকাকিমা চারদিকে তাকিয়ে বললেন—'এতো উঁচু গর, এর্কম আর্কিটেকচার, বিউটিফুল, স্ট্যাচুজ, এতো ক্যাস্‌ল-এ থাকে। তুমরা এ বাড়ি পাবলিক শো-এর জন্য ওপন করে ডাও না কেনো ? আমাদের ওখানে কোতো এর্কম বাড়ি ডিউক, ব্যারনরা পাবলিকের জন্যে ওপন কোরে দিচ্ছেন, তাইতে মেইনটেনান্সের খর্চা উঠে আসে।'

ফুটকুনকাকা চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললেন—'স্টেলা তুমি আর এখানে তোমাব ইংরিজি পাটোয়ারি বুদ্ধি নাই খেলালে। ইতিহাসের পাতা এখানে জীবন্ত হয়ে রয়েছে ডারলিং, মিউজিয়ম হয়ে নেই।'

স্টেলাকাকিমা বলেন—'পাটুয়ারি কী বললে ? কুনও গালি নোয় তো !'

বাবার দিকে তাকিয়ে একচোখ টিপে ফুটকুনকাকা বললেন—'কী যে বলো ! তোমাকে বাংলা গ্রামারটা এখনও শেখাতে পারলুম না। বারোয়ারি পুজো বলছিলুম না। আমাদেরটা যদিও মল্লিকবাড়ির পুজো, এখন বারোয়ারিই হয়ে গেছে। কতজন শরিক এখন মেজদা ?'

কথা ঘোরাতে পেরে ফুটকুনকাকা খুব খুশি। বাবা বললেন, 'সাঁইত্রিশ জন।'

লীলাদি বলল—টুনি ! হাউ কিউট : শী ইজ এ লিটল রেড রাউডিং হুড ? ওরা কেউ কিছুতেই সেদ্ধ খাবে না। সুভাষদা তার বাবার কথা শুনে বলল—'ড্যাড বোরাবোর একটু সেলফিশ থাকছে। আমরা সোব কাবো।' স্টেলাকাকিমা বললেন—'মেড্ডি, কালি জাল ডিও না।'

এইভাবেই বিশাল বাড়ির অলিগলি কানাচ-কানাচ লম্বা-চওড়া দালান, জমাদারের ঘোরানো সিঁড়ি, তিন চারটে ফুটবল খেলার মাঠের মতো ছাদ আর এ কোণে ও কোণে বিস্ময়বালক-বিস্ময়বালিকা এঞ্জেলের মূর্তি, দেওয়ালগিরি, প্রাচীন পট, ফটোগ্রাফ এবং সর্বোপরি দুর্গাপুজো দেখতে দেখতে আমাদের ফুটকুন কাকাদের পরিবারের সঙ্গে ভীষণ আলাপ হয়ে গেল। আমার দিদি বুলা, লীলাদির ভীষণ বন্ধু, সুভাষদার সঙ্গে বিনুর গলায় গলায় ভাব, দুজনে খালি ছাতে উঠে ঘুড়ি ওড়ায়, আর বেড়ায়। উত্তর কলকাতার সব প্রাচীন সরু গলি ঘুঁজি, সুভাষদার দেখা চাই। আর আমি স্টেলাকাকিমার আদুরে। তিনি খালি বলেন—মেড্ডি তুমার এই টুনি ডল আমি নিয়ে যাবো।

মা বলে—'যাও না নিয়ে। যা কিচিরমিচির করে !'

—'সত্যি কিন্তু। তোখোন আর নো করতে পারছে না।'

মা হাসত। আমি ভাবতুম ভালোই তো ! ফুটকুনকাকাদের কি সুন্দর বাগানঅলা বাড়ি। তার ওপর দিকটা কুটিরের মতো। কেমন চিমনি, ফায়ার প্লেস, কুকুর, পরিষ্কার রাস্তাঘাট। বাকিংহাম প্যালেস, টেমস নদী, টিউব ট্রেন। আমি যাবো, লীলাদির মতো টুকটুকে ফর্সা হয়ে যাবো, মেমসাহেব একেবারে, কত জামাকাপড়, কত বেড়ানো.....ভালোই হবে বেশ।

ফুটকুনকাকা বললেন—'পুজোর পর টিকিট কাটছি গোপালপুর অন সী। তোমরা সক্কলে আমাদের সঙ্গে চলো।' বাবা হাঁ হাঁ করে উঠলেন—'একাদশীর দিন থেকেই অফিস ফুটকুন, কোনও উপায় নেই।' মা হেসে বলল—'তবেই বোঝ, তোমার দাদাকে দেখাশোনা করবার একটা লোক চাই তো ! তুমি বরং বুলা, বিনুকে নিয়ে যাও।'

লীলাদি বলল—'বুলা, য়্যু মাস্ট টেক আ হলিডে।'

দিদি হেসে বলল—'পরের বার লীলা, পরের বার, ডোণ্ট মাইণ্ড।' আমি জানি দিদি যাবে না। দিদি ভীষণ ঘরকুনো। অবশেষে অনেক আলাপ-আলোচনার পর ঠিক হল আমি আর বিনু যাবো। মহানন্দে আমাদের বাক্স গুছানো হল। আমার আর বছরের সাদা সুইস

সিল্কের ফ্রক তো, এখনও তেমনি সুন্দর আছে। সোনালি অর্গাণ্ডির ফ্রকটাও। তারপর স্টেলাকাকিমা আমাদের জন্য কত রকমের জামা এনেছেন, তাদের বলে ড্রেস। বিনুকে আর চেনা যাচ্ছে না। আমিও যখন লম্বা স্ল্যাক্স পেন্টুল আর নকশা করা টপ পরে ছোট চুলে পনি টেল বেঁধে ফিটফাট হয়ে গেলুম, দিদি আদর করে বলল—'দ্যাখ তো টুনি, এবার তোকে কেমন ছবির বইয়ের খুকুর মতো দেখাচ্ছে !' আমি আব বিনু মহা গর্বে উৎফুল্ল হয়ে দু পকেটে হাত গুঁজে ট্যাকসিতে উঠে পড়লুম। ভীষণ তাড়া। ওদিক থেকে মিতালি ছুটতে ছুটতে আসে—'তনিমা, তনিমা কোথায় যাচ্ছিস রে ?'

—'সমুদ্র দেখতে, সুমদ্র। গোপালপুব অন সী।' আলো-আলো মুখে বলতে থাকি।

ট্রেন চলছে স্লুইশ্‌শ্ করে, শব্দ নেই। মোটা গদির মধ্যে ডুবে যাচ্ছি। কী সুন্দর ঠাণ্ডা। দু হাত জড়ো করে বুকের কাছে ধরেছি। লীলাদি অমনি গোলাপি রঙের তিনকোনা শাল আমার গায়ে জড়িয়ে দিল। তার কোনও ওজন নেই, অথচ কী সুন্দর গবম। কাচের বাইরে কিছু দেখা যায় না। খালি আমাদেরই ছবি। কামরার মধ্যে আলো, স্টেলাকাকিমার লালচে সাদা মুখ, লীলাদির লাল ব্লাউজ, কালো স্কার্ট, সুভাষদার সোনালি চশমা, বিনুর ফটফটানি। কামরা জুড়ে ওদের অবিশ্রান্ত উত্তেজিত ইংরেজি, যার একবর্ণ বুঝতে পারছি না। বাস্কেট থেমে নাম-না-জানা সুগন্ধের খাবার, স্পেনসেস নামের হোটেলের নাম লেখা বাক্স, তারপর একটা পুরো বাক্স জুড়ে দুলতে দুলতে ভুলতে ভুলতে ঘুম। ঢুলতে ঢুলতে কখন জাগি, কখন আবার ঘুমের মধ্যে গুলিয়ে যাই, নিজেই জানি না। এমন ঘুম কখনও ঘুমোইনি। এমন দোলা কখনও দুলিনি। এমন জাগাও কখনও জাগিনি। সিঁদুরের গোলার মতো সূর্য। মাঠের পরে মাঠ, ডোবা, খাল, বিল, নদী, নালা, ঢকাঢক ঢকাঢক, পুল, সূর্য, পানকৌড়ি, সাদা বক, কালো ফিঙে, সূর্য, মাঠগুলো দূবে সরে যায়, আবার কাছে চলে আসে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্য।

বিনু চলেছে, টুনি চলেছে, টুনি চলেছে, বিনু চলেছে। লীলাদি কোলে বইয়ের পাতায়. বিনুর হাতে লজেন্সছানা, মেমকাকিমা সাহেবকাকা, সুভাষদাদা খবর পড়ে, লাফিয়ে নামে লাফিয়ে ওঠে, টুনি চলেছে অনেক দূবে, বিনু চলেছে অনেক দূর, পুরনো শহর পুরনো বাড়ি, নোংরা গলি, ধ্যাত্তেরিকা, ঘ্যাঘর ঘ্যাঁঘর চরকা ঘ্যাঁঘর, ইদুজ্জোহা ইদ-উল-ফিতর, টুনি-বিনুর পেরথম টুর, দেখতে দেখাত বেরহামপোর।

হোটেলের গাড়ি এসেছে টুনিদের নিয়ে যেতে। মস্ত বড় ভ্যান গাড়ি যেতে যেতে অবশেষে তার চাকা বসে যায় বালিতে। টুনিতে বিনু চুপিচুপি বলাবলি করে—ঠিক যেমন ট্রেনের গদিতে ওরা ঢুকে যাচ্ছিল, তেমনি গাড়িটা বালির গদিতে ডুবে যাচ্ছে। বলতে বলতে ওরা হেসে ওঠে। ফুটকুনকাকু বলে—'হাসলি কেন রে টুনটুনিটা ?' কাকিমা বলেন—'ছুটোরা শুদুশুদু হাসে, কোনও কেনো নাই।' তারপর হঠাৎ দিগবলয়ে এক অবাক দৃশ্য, অবাক শব্দ। টুনি-বিনু বিস্ময়ে চুপ, একদম চুপ। সুভাষদা লাফিয়ে নামছে। হু হু করে ছুটে যাচ্ছে ক্যামেরা নিয়ে। কাকিমা দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন—'ওহ ইটস ওয়াণ্ডারফুল।' লীলাদি বলে—'ইটস বেটার দ্যান ব্রাইটন।' ফুটকুনকাকা টুনি-বিনুর দিকে তাকিয়ে এক চোখ টিপে বলে—'দেখতে হবে তো, কাদের দেশের সমুদ্দুর !'

সেই হোটেলটাও অবাক। অবাক তার ঘরদোর, বাথরুম, বিছানা, জানালা, বারান্দা, তার লাউঞ্জঘর, খানাপিনা, পামগাছের সারি। কিন্তু সবার থেকে আশ্চর্য ওই সমুদ্দুর। তার সামনেটা যেন গঙ্গাজলের সঙ্গে সাবানের ফেনা মেশানো, আরেকটু দূরে অদ্ভুত সবুজ, যেন তার তলায় আলো জ্বলছে, আর তারপর নীল, নীল, চিকচিক ময়ূরকণ্ঠী নীল। বালির পাড়ে কত বালিয়াড়ি। তার মাথায় বসে সবুজ নীল, নীল সবুজ। ডিঙি ভেসে যায়। ভেসে ফিরে আসে। দূরে ট্রলার। এখানে চান করো না, পাথর আছে। বিনু শুনছে না, সুভাষদার সঙ্গে কালো পাথরের ওপর বসে বসে হাসতে হাসতে ঢেউ খাচ্ছে। টুনির অত সাহস নেই, সে কাকুর ছোট প্যান্টের কিনারা ধরে জলে নামে। হুশ্ করে মাথার ওপর দিয়ে ঢেউ চলে যায়, উঠতে না উঠতে আবার ঢেউ। সারাদিন, সারা বিকেল। সেই বিশাল পারাবারের তীরে টুনিরা করে খেলা। অদ্ভুত খোলা পোশাক পরে, সাদা-হাত, সাদা-পা, লীলাদি, মেম-কাকিমা, বালির ওপর রোদ পোয়ায়, জলে নেমে যায়, ভালুকের মতো রোঁয়াওলা নরম তোয়ালে জড়িয়ে উঠে আসে, মাথায় কেমন চুল-ঢাকা টুপি।

খেলতে খেলতে কাছাকাছি হলে বিনু কুলকুল করে হাসে—'দ্যাখ টুনি আমরা কেমন বিলেতে এসেছি।' টুনি যদি বলে—'ভ্যাট্ !' বিনু তখন আঙুল তুলে দ্যাখায়—'ওই দেখ কত্ত মেম, কত্ত সায়েব।' সত্যি। বালুবেলায় স্টেলাকাকিমা লীলাদির মতোই আধশোয়া হয়ে থাকে কত মেম, চোখে সানগ্লাস, ঢেউয়ের মাথায় লাল-নীল ছোট প্যাণ্ট পরে নাগরদোলা খায় কত সাহেব ! টুনিরা কাঁটা চামচে খায়, কোলে ন্যাপকিন পেতে। ঠিক কেয়া ফুলের মতো ন্যাপকিন গেলাসে থাকে। গাল না ফুলিয়ে, শব্দ না করে খেতে শিখিয়েছে লীলাদি। বেয়ারারা সেলাম করে। তাদের মাথায় পেখমঅলা টুপি। কিন্তু যখন খুব বেশি বিলেত বিলেত লাগে তখন টুনি হাঁ করে ফুটকুনকাকার আর বিনুর তামাটে মুখের দিকে চেয়ে থাকে। রাত্তিরবেলায় লীলাদির পাশের খাটে শুয়ে সমুদ্রের গর্জন শোনে। কেমন অচেনা, অজানা, বিলেত-বিলেত। টুনি কি সত্যি-সত্যি তবে নিজের দেশ, নিজের শহর কলকাতা ছেড়ে বহুদূরে বিলেতে চলে এসেছে ? ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে যায়, জানলা দিয়ে থই থই জল দেখা যায়। হুশ্‌শ্‌শ্ করে বালির ওপরটা ফেনায় সাদা করে দিয়ে ফিরে যাচ্ছে। ব্যালকনিতে বসে লীলাদিদের হ্যাটম্যাটক্যাটের মধ্যে বসে বসে ব্রেকফাস্ট। কিছু-কিছু এখন বুঝতে পারা যায়।

ফুটকুনকাকা—'কী স্টেলা, লীলা, এখন কেমন লাগছে ?'

কাকিমা—'খুব ভালো। ফীলিং, অ্যাট হোম।'

কাকা—'তাহলে বলো জোড়াবাগান তোমাদের ভালো লাগেনি।'

কাকিমা—'জোরাবাগান ইজ অল রাইট। কিন্তু এখানে এসে শাড়ি খুলে ফেলতে পেরে, আর অত লোকের কিউরিয়সিটির বাইরে এসে আমার স্বস্তি হচ্ছে।'

লীলাদি—'আসলে ড্যাড, ভালো লেগেছে, কিন্তু বিদেশে অ্যাডভেঞ্চারের মতো।

ফুটকুনকাকা—'তাহলে বুঝে দ্যাখো, তোমাদের জন্যে সারা জীবন বিদেশে পড়ে থাকতে আমার কেমন লাগে ! আর এই এক সপ্তাহের কলকাতা-মল্লিকবাড়িই বা আমার কেমন লেগেছে!' ●

কাকিমা—'আয়্যাম রিয়ালি সরি ফর য়ু।'

সুভাষদা—'আমি ঠিক করেছি গ্র্যাজুয়েশনের পরে ইণ্ডিয়া টুর করব, ইয়োরোপ নয়। ওই সব সরু সরু গলি আর বড় বড় ছাদ আমায় দারুণ ফ্যাসিনেট করেছে। মানুষরাও। আঙ্কল, আণ্টির মতো মানুষ আমি দেখিনি। সাধারণ মানুষেরাও অদ্ভুত। কিছু কিছু লোক আছে জাস্ট একটা ল্যাকির মতো, কেউ কেউ আবার দেখবে যেন গড, কুকুর-বেড়াল কিংবা ইন্যানিমেট অবজেক্টের মতো মানুষও দেখেছি।'

ফুটকুনকাকা—'তোমরা বিনু-টুনির সঙ্গেও কথা বলো। ওরা লেফট-আউট ফীল করবে।'

লীলাদি—'ওঃ, তাও তো বটে। টুনি, এখানে তুমার কেমন লাগছে ?'

টুনি—'ভীষণ ভালো।'

—'বিনু তুমার ?'

বিনু—'আমি বড় হয়ে বিলেত যাবো। বিলেতটা তো এখানকার মতো ?'

সুভাষদা—'সোবটা আছে না বিনু। কিছু কিছু আছে।'

ফুটকুনকাকা (হেসে)—'ভালো, সুভাষ আসছে ইণ্ডিয়ায়, বিনু যাচ্ছে ইংল্যাণ্ডে। বেশ একটা ইয়ুথ এক্স্‌চেঞ্জ প্রোগ্রাম করা যায়। টুনি, লীলা, তোমরা কি করবে, বলো ? ওহ্ লীলা তো আবার..'

এবার ওরা চারজনেই কোন লুকোনো কারণে ভীষণ হাসতে থাকছে। বিনু কিছু না বুঝে হাসতে হাসতে ব্যালকনির রেলিং-এর দিকে ছুটে গেছে। টুনির হাতে মিল্‌ক শেক, গোঁফে ফেনা লেগে গেছে, ন্যাপকিন দিয়ে মুছিয়ে দিচ্ছে লীলাদি। গোপালপুরের এই বিলেত অবশেষে তার কাজুবাগান, বালিয়াড়ি, আরামের হোটেলবাড়ি এই সব নিয়ে দূরে সরে যাচ্ছে। দূরে সরে যাচ্ছে নীল সমুদ্দুরের ওপর কালো কালো কাস্তের মতো ডজনে ডজনে নৌকা, রাত্তিরে কালো জলের ওপর বাতিঘরের ঘুরে ঘুরে টর্চ ফেলা, ট্রলারের আলো, ঢেউয়ের মাথায় ফসফরাসের নাচ' পড়ে থাকছে অনেক পেছনে গোপালপোর অন সী, বেরহামপোর, নীল সমুদ্দুর, সবুজ সমুদ্দুর, টুনির চোখ গলছে চুপিচুপি। ফিরে চলেছে, ফিরে যেতেই হয়, নজর-মিনার থেকে হাওয়া-বেলুন ওড়ানো দেখা আর হবে না, আর হবে না ঢেউয়ের চূড়ায় পৃথিবীর রাণী হওয়া, জলকনো হওয়া, বিশাল সমুদ্দুর চলে যাচ্ছে, কাছে চলে আসছে পুরনো শহর, পুরনো বাড়ি, পুরনো জীবন। ছেঁড়া মলাট, ফাটা বেঞ্চ, কালির দাগ। খ্যাংরা ঝাঁটা, ঝুরো গোঁফ, টাকমাথা, টিউকলের ঘটাং ঘটাং, হ্যাঁচচো হাঁচি, ফিচকে হাসি। মোড়ে জটলা, বস্তি ঝগড়া, সরু গলি।

টুনি-বিনুকে নিয়ে বাঘবাড়ির চওড়া সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন ফুটকুনকাকা। ধরা গলায় বলছেন বাবার হাত ধরে—'আসছি মেজদা, আবার কবে দেখা হবে জানি না।'

লীলাদি বললে—'থ্যাংকস ফর দা ওয়াণ্ডারফুল এক্সপিরিয়েন্স জেটিমা, বুলা আই'ল মিস ইউ।'

কাকিমা বললেন—'মেডডি, আমাদের ওকানে চোলে আসুন একবার।'

সুভাষদা বলল—'বিনু-টুনি উই মাস্ট মীট সুন।'

নেমে যাচ্ছে সবাই। এবার ট্যাক্সি। তারপর এয়ারপোর্ট হোটেল। তারপর প্লেন।

এখানে এখন জালি-ঘেরা বারান্দায় নতুন শীতের উসুম-কুসুম সকাল। এখানে এখন মোটা মোটা কত কালের পুরনো কড়ি-বরগার নিচে নতুন টুনি নতুন বিনু। আর পুরনো মা, পুরনো দিদি, পুরনো বাবা। বিনুর হাতে ঝিনুক থলি, টুনির মাথায় বেতের টুপি। বাবার কাঁধে কোঁচার খুঁট, মা হাসছে, দিদি হাসছে চিকন হাসি। বাবা ডাকল—'বিনু ! বিনু।' হাতের থলি খলবলাচ্ছে বিনায়ক। বাবা ডাকছে—'টুনি-ই, টুনটুনটুনি-ই।' বাবার ছড়ানো দুই হাতের মাঝখান দিয়ে ঝপ্‌পাং করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে টুনি। বাবার খোলা বুকের সঙ্গে সেঁটে গেছে টুনির মাথা, টুনির কান। কান পেতে শুনছে পুরনো বুকের মধ্যে গুমগুম গাগুম গুম। অবিকল সেই গভীর ডাক। অথই সমুদ্রের। নীল সমুদ্র। সবুজ সমুদ্র। ভেতরের এক অপরূপ অন্ধ আলোড়ন ঢেউ হয়ে ছুটে আসছে। অবিশ্রান্ত, কোজাগর। ভেঙে পড়ছে। টুনির গালের বেলাভূমি তাই ফেনায় ফেনা।

নন্দিতা

'শুনছো ? শুনছো ? ওঠো না গো একবার !' মাঝরাত্তিরে নন্দিতার ঠেলাঠেলিতে ঘুমটা একেবারে কাচের বাসনের মতো খানখান হয়ে গেল।

'হলটা কী ?' ধড়ফড় করে উঠে বসল শুভেন্দু। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। জানালাগুলো বেশিরভাগই বন্ধ। তা সত্ত্বেও ধারাবর্ষণের তুমুল শব্দ কাচ কাঠ সমস্ত অনায়াসে ভেদ করে ফেলেছে।

ভোঁতা, ভারী শব্দ একটা। ভরা শ্রাবণের মধ্যরাত। জ্বালাময় মাঝ-বর্ষার দিনাবসান। ধরিত্রীরও। তার বুকে অবিরাম জীবনধারণের লড়াইয়ে ক্ষতবিক্ষত মানুষগুলিরও। অন্ততপক্ষে শুভেন্দুশেখর তো বটেই ! গতকাল সকালে ট্রেনেই ফিরেছে তিনদিনের ঝটিকা ট্যুর সেরে, তারপর গেছে অফিস। সেখানে ট্যুর-ক্লান্ত বলে কোন বিশেষ বিবেচনা স্বভাবতই মেলেনি। সন্ধেয় বাড়ি ফেলার লগ্ন থেকেই ঘুমটা আসছিল নেশার মতো। একটা চমৎকার আমেজ, তাকে আরও চমৎকাবভাবে জমিয়ে দিল বেশি-করে গাওয়া ঘি-ঢালা নাতিগাঢ় মুগের ডালের খিচুড়ি আর পাটিসাপটার মতো কি জানি কিসের পুর ভরা দুর্দান্ত ওমলেট। বর্ষারাতের সেই জমজমাট ঘুম এইভাবে কেউ ভাঙায় ? ঠেলে ঠেলে ! অল্প ঠেলায় হল না দেখে ধাঁই ধাঁই করে রামধাক্কা মেরে ?

'শুনতে পাচ্ছো না ?' নন্দিতা কাঁদে-কাঁদো গলায় বলল।

'কী শুনতে পাবো ?' ঘুমে ভারী, বিরক্ত গলায় শুভেন্দু বলল।

'কুকুরটা কী ভীষণ কাঁদছে !' অন্ধকারে মনে হল নন্দিতাও কাঁদছে। গলার স্বরটা যেন আধা-বিকৃত।

অবিরাম বর্ষণের ভারী আওয়াজ ভেদ করে এই সময়ে কোনও চতুষ্পদ প্রাণীর ডাক শুনতে পাওয়া গেল। করুণ সাইরেনের মতো ধাপে ধাপে সুরে চড়ল ডাকটা, তারপর আবার খাদে নেমে এলো। কেঁউ কেঁউ কেঁউ কেঁউ কেঁউ অতঃপব ভিন্ন রাগিণীতে শুরু হল আলাপ।

'ঘুমোতে না পারো, একটা কাম্পোজ খেয়ে শুয়ে পড়ো', শুভেন্দু আবার ঝুপ করে শুয়ে পড়ল।

'ঘুমোতে না পারার কথা হচ্ছে ন'—নন্দিতা আর্ত গলায় বলে উঠল—'কুকুরটা যে ভয়ানক কাঁদছে। ওকে এই দারুণ বৃষ্টির মধ্যে ছাদে বেঁধে রেখে দিয়েছে। তা ছাড়া....নন্দিতার কথা শেষ হল না শুভেন্দু প্রায় খেঁকিয়ে উঠল 'তো আমি কী করবো ?' কথাগুলো কেটে কেটে প্রত্যেকটাতে বেশ খানিকটা রাগ ভরে ভরে সে বলল। কদিন ধরে এ এক মহা উৎপাত শুরু হয়েছে। তাদের দোতলা বাড়ির পরেই একটা ছোট জমি ঘেরা পড়ে আছে। তারপর এক পুলিশ ইনসপেক্টরের বাড়ি। ভদ্রলোকের খুব জন্তু-জানোয়ারের শখ। খরগোশ, গিনিপিগ থেকে আরম্ভ করে ছাগল, গরু এমন কি বাঁদর পর্যন্ত পোষা হয়ে গেছে। তা পুষুন, কেউ আপত্তি করছে না। কিন্তু পোষা প্রাণীগুলোর কোনও যত্নই ওঁরা করেন না।

খরগোশ, গিনিপিগগুলোকে গুণ্ডাহুলো এসে এসে খতম করে গেল। ছাগলিটা যে কদিন দুধ দিল, দিল। তারপর ভদ্রলোক স্বহস্তে তাকে কেটে খেয়ে ফেললেন। গরুটা বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে দিবারাত্র হাম্বা হাম্বা করত, গলার দড়ি কখনো খোলা হত না, তার কী গতি হল তাদের কারুরই জানা নেই। আর বাঁদরটার লক্ষ্য ছিল এ পাড়ার যতেক গৃহস্থ বাড়ি। নিজের মালিকের কাছ থেকে যথেষ্ট খেতে পেত না কিনা কে জানে, কিন্তু পাড়ায় হেন বাড়ি নেই যেখান থেকে সে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ভোজ্য সংগ্রহ না করেছে। ক্লাইম্যাক্স হল শুভেন্দুর শার্ট পাঞ্জাবির বোতাম ভক্ষণ। কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না। পুলিশের দারোগা, ওরে বাবা, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। তবে ইদানীং ভদ্রলোক যা শুরু করেছেন সত্যিই সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। একটার পর একটা দারুণ সুন্দর, দামী কুকুর আনছেন আর অযত্ন-অবহেলা দিয়ে কয়েক মাসের মধ্যেই মেরে ফেলছেন ! শুভেন্দু অর অতশত জানবে কোত্থেকে, নন্দিতাই জানায়। জানালায় দাঁড়িয়ে প্রাণপণে ইশারা করে শুভেন্দুকে ডাকে—'দেখো দেখো দেখে যাও।' দারোগার বাড়ির উঠোনে একটা ছোট ডোল, তাতে গিন্নি এঁটো কাঁটা সব এনে ফেলে দিলেন, তারপরেই ডাক দিলেন 'আঃ আঃ টমি, আঃ আঃ।' আপাদমস্তক টান-টান চব্বিশ পঁচিশ ইঞ্চি উঁচু একটা গ্রেহাউণ্ড অপরূপ ভঙ্গিতে এগিয়ে এলো। ভদ্রমহিলা তাকে এঁটোকাঁটাগুলো খাওয়াবার জন্যে ক্রমাগত তাড়না করছেন, আর অভিজাত-বংশীয় গ্রে-হাউণ্ডটা ক্রমাগত তার লম্বা সরু চকচকে মুখটা ফিরিয়ে নিচ্ছে। গ্রে-হাউণ্ডটা বোধহয় মরে গেল তবু পাত-কুড়োনো মুখে দিল না, এবং কুকুরটা মরে গেল তবু তার মালিকরা তাকে তার যোগ্য খাদ্য দিলেন না ! একটা চমৎকার স্প্যানিয়েল গেল আপাদ-মস্তক ঘা হয়ে। চুলকোতে চুলকোতে কুকুরটা যেন ক্ষেপে যেত একেক সময়ে। সারা শরীর থেকে খাবলা খাবলা লোম উঠে, দগদগে ঘা নিয়ে প্রচণ্ড লাফিয়ে উঠে সামনের থাবায় মুখ দিয়ে শুয়ে পড়ল, উঠল না আর। কোথা থেকে ভদ্রলোক এতো সুন্দর সুন্দর প্রেডিগ্রি-ডগ জোগাড় করেন কে জানে ! পুলিশের লোক, কোথা থেকে আর ! মিনি-মাগনা পায় বলেই বোধহয় আরো এতো অচ্ছেদ্দা। কী জিনিস পেয়েছে জানেই না। লেটেস্ট হচ্ছে একটা ডালমেশিয়ান। অপরূপ কুকুর। নন্দিতা জানলার কাছ থেকে নড়েই না—'দ্যাখো দ্যাখো, কী সুন্দর ঘুরে বেড়াচ্ছে।' সাদার ওপর কালো কালো গোল গোল ছিট, আবার ভালো চামড়ার কলার, এবার বোধহয় দারোগার মক্কেল কলার সুদ্ধুই উপহার দিয়েছে। কুকুরটা খুব সম্ভব পূর্ণবয়স্ক। পোষ মানতে চাইছে না। পোষ মানাবার উপায় হিসেবে দারোগাবাবু থার্ড-ডিগ্রি প্রয়োগ করেছেন। 'টমি—কাম হিয়ার।' ভদ্রলোকের সব কুকুরই টমি। টমি আসছে না, লম্বা হিলহিলে চাবুকের বাতাস কাটার শব্দ সুইশ্‌শ্‌শ্‌। নন্দিতা কানে আঙুল চেপে বসে পড়ে। 'টমি-সিট ডাউন।' এবারও টমি আসছে না, আবারও চাবুক নামছে। এবার নন্দিতা জ্ঞানশূন্য হয়ে জানলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে—'অ মেসোমশাই, মেসোমশাই' তার তীক্ষ্ণ সরু গলাও ভদ্রলোকের মোটা কানে পৌঁছতে দেরি হচ্ছে ! অবশেষে অবাক হয়ে দারোগা মেসোমশাই মুখ তুলে তাকিয়েছেন। কস্মিনকালেও নন্দিতা তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মাসি-বোনঝি সম্পর্ক পাতায়নি। অতএব অবাক।

'মারবেন না, প্লীজ, অমন করে মারবেন না !' আকুলি-বিকুলি করতে থাকে নন্দিতার চোখের কোলে টলটলে জল। অতশত হয়ত দেখতে পাচ্ছেন না মেসো, কিন্তু কেমন হতবুদ্ধি হয়েই হাতের বেতটা ফেলে দিয়ে উঠে যাচ্ছেন। উঠোন ছেড়ে ভেতরে। ঘরের আশ্রয়ে।

সেই অবাধ্য ডালমেশিয়ানেরই এখন এই দুর্গতি হয়েছে। দোতলার ছাদে উপর্যুপরি বৃষ্টির তলায় আশ্রয়হীন। কোথাও ছুটে পালিয়ে যাবে তার উপায় নেই। বাঁধা। নন্দিতা অনেক কষ্টে চোখের জল চাপতে চাপতে বলল, 'তুমি তো কদিন ছিলে না, জানো না। রোদে জলে ওকে একভাবে বেঁধে রেখে দ্যায়। নিজেরা নিশ্চিন্তে খাচ্ছে, দাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে। আমরা ঘুমোতে পারছি না ! খাবার মুখে রুচছে না ! ওদের দেখো হেল-দোল নেই !' কেঁউ কেঁউ কেঁউ আবার বৃষ্টি ছাপিয়ে কুকুরের ডাক ভেসে এলো। নন্দিতা বলল, 'ওর নিশ্চয় অসুখ করেছে, খুব কষ্ট হচ্ছে, ওগো যাও না একবার প্লীজ।'

শুভেন্দু অবাক হয়ে বলল, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ? ওদের পাড়ায় সবাই ভয় পায়, এড়িয়ে চলে, আমি মাঝখান থেকে কুকুর ডাকছে বলে এই রাত্তিরে গিয়ে কমপ্লেন করবো ?'

'ওহ্, বুঝতে পারছো না, কুকুর ডাকছে বলে নয় !' নন্দিতার গলা যেন রুদ্ধ হয়ে যাবে 'কুকুরটা কষ্ট পাচ্ছে বলে ! বৃষ্টিতে ! রোগে ! ....' সে আর কিছু বলতে পারে না, ঝরঝর করে কাঁদতে থাকে।

শুভেন্দু বলে, 'একটা কুকুর কষ্ট পাচ্ছে বলে, এই দুর্যোগের রাত্তিরে তুমি আমাকে বাড়ি-ছাড়া করবে ? জানো কত জন্তু-জানোয়ার , জন্তু-জানোয়ার ছেড়ে কত মানুষ নিরাশ্রয় ঠিক এখন, এই মুহূর্তে। বৃষ্টিতে উড়ে গেছে, তার খড়ো চাল, জল জমে ভেসে গেছে গেরস্থালি...'

শুভেন্দুর কথা শেষ হল না, হঠাৎ নন্দিতা দড়াম করে এক লাফ দিল বিছানা থেকে মাটিতে। ছুটতে ছুটতে গিয়ে দরজার খিল নামাল। তারপর বাইরে বেরিয়ে গেল।

অগত্যা শুভেন্দুকেও উঠতেই হয়। খোঁজ কোথায় টর্চ, কোথায় বর্ষাতি, কোথায় ছাতা! নিচে নেমে সে অবাক হয়ে দেখল সদর দরজা খোলা। হু হু করে বৃষ্টির ছাট ঢুকছে। নন্দিতা এই রাত্তির দেড়টায় জলের মধ্যে একাই বেরিয়ে গেছে।'

কোনক্রমে বর্ষাতি টর্চ আর ছাতা সামলাতে সামলাতে প্রতিবেশীর বাড়ির দরজায় সে যখন পৌঁছল ততক্ষণে সে বাড়ির দরজাও খুলে গেছে। চৌকাঠের এপারে সোঁপাটে ভিজে নন্দিতা, ওপারে টর্চ হাতে লুঙ্গি-পরিহিত ভুঁড়িয়াল দারোগা, 'দোহাই আপনার কিছু করুন, কিছু করুন মেসোমশায়, কুকুরটা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে ওর, কিছু করুন !'

দারোগা বললেন, 'আপনি তো আচ্ছা জাঁহাবাজ মহিলা দেখছি। আমার স্ত্রী বলেন বটে জানলা থেকে যখন তখন স্পাইং করেন, আমার কুকুর আমি মারি কাটি আপনার কি ? ইয়ার্কি পেয়েছেন ?' শেষ কথাটা উনি শুভেন্দুর দিকে চেয়ে বললেন।

শুভেন্দুর ভেতরটা রাগে জ্বলে যাচ্ছে নন্দিতার ওপরও, দারোগার ওপরও। সে যথাসাধ্য মোলায়েম করে বলল, 'আসলে কি জানেন, আমার স্ত্রী কুকুর ভীষণ ভালোবাসে. একটু দেখুনই না ! এতো করে বলছে যখন !'

কড়া চোখে তার দিকে তাকিয়ে দারোগা হাঁক দিলেন—'হারু, হারু, ড্যাপলা ! ছাতা নিয়ে একবার ওপরে যা দিকিনি ; দ্যাখ তো টমিটা কেন এতো চেঁচাচ্ছে !' দুটো ছায়ামূর্তি ছাতা নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে দেখা গেল। দারোগা বললেন, 'দেখুন মশাই, এক পাড়াতে থাকি, বিপদে আপদে নিশ্চয় একে অপরের সহায়। কিন্তু পরের ব্যাপারে খামোখা এভাবে নাক গলালে মেয়েছেলে বলে মান রাখতে পারবো না। আসুন আপনারা ! আসুন এবার ....।' গলাটা শেষের দিকে আরও কড়া।

এই সময় একটি ছায়ামূর্তি টর্চের আলোর বৃত্তেব মধ্যে দৃশ্যমান হয়ে পরম সন্তোষের সঙ্গে বলল, 'বাবা, টমি আর চেঁচাচ্ছে না, কেমন দাপাচ্ছিল, কাটা পাঁঠাব মতো, এখন চুপ করে শুয়ে পড়েছে।'

নন্দিতা ফিসফিস করে বলল, 'মরে গেছে। সে স্খলিত পায়ে পিছন ফিরে বাড়ির দিকে চলতে লাগল। বৃষ্টিতে ভিজে শাড়ি পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। দড়াম করে আছাড় খেল একটা। শুভেন্দু তাকে তুলে ধরে, কোনমতে বাড়ি নিয়ে আসে, সেই রাতে গরম জল কবে ব্রাণ্ডি দিয়ে খাওয়ায়, পরদিন সকাল না হতেই টেটভ্যাকের খোঁজে ছোটে। হাঁটুর কাছে বেশ খানিকটা কেটে গেছে। দুটো স্টিচ। সে এক কাণ্ড !

নন্দিতা ডাকসাইটে কুকুর-প্রেমিক বলেই যে এমনটা ঘটল না তা কিন্তু নয়। নন্দিতা কুকুর দেখতে ভালোবাসে, পুষতে মোটেই নয়। সে কোনও জন্তু-জানোয়ার পাখি-টাখি পোষবার আদৌ পক্ষপাতী নয়। ওসব আবদার তার নেই। বলতে গেলে কোনও আবদারই তার নেই। আপন খেয়ালে বই-পত্তর, ক্যাসেট-ফিল্ম নিয়ে থাকে, ভালো ভালো রান্না করে, করে দু পক্ষের বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনকে খাওয়ায়। খুব মিশুক। যেখানে যায় হেসে, গল্প করে, মজা করে একগাদা বন্ধু বানিয়ে ফেলবে। এরকম একটা স্টিমার পার্টির জমায়েতে হাসি-খুশি উচ্ছল স্বভাবের প্রাণবন্ত মেয়েটিকে মাস্তুল ধরে পাক খেতে খেতে একটার পর একটা কবিতা আবৃত্তি করতে দেখেই একেবারে ঘাড়মোড় ভেঙে প্রেমে পড়ে গিয়েছিল শুভেন্দু। আর বিয়ের পর তো নন্দিতা একটা অভিজ্ঞতা ! এতো স্বতঃস্ফূর্ত তাব আবেগ! ভালোবাসা ও আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ এমন জমকালো ! এমন হৃদয়ের দুকূল ভাসিয়ে নেওয়া প্লাবনের মতো উত্তাল, যে শুভেন্দু মনে মনে গোপনে জানে এমনটা বোধহয় আর হয় না। এবং সে অতি ভাগ্যবান। বিশেষত সে বাপ-মা মরা, মামার বাড়িতে এবং পরে হোস্টেলে মানুষ। স্নেহ-ভালোবাসা-আদরের জন্য কতটা কাঙাল সে ছিল, বিয়ের পর নন্দিতার প্রবল স্রোতে ভেসে যেতে যেতে ভালো করেই বুঝতে পারে। ওই এক দোষ, একে কী বলবে শুভেন্দু বুঝতে পারে না। খামখেয়ালি ! না সেন্টিমেণ্টাল ! না ওই পরের ব্যাপারে নাক-গলানোর আদিখ্যেতা ! কী বলবে একে সে সত্যিই জানে না।

রোজই অফিস থেকে ফেরবার সময়ে এক বুক আনন্দ নিয়ে ফেরে শুভেন্দু। সে জানে যতই কলিগের সঙ্গে মনোমালিন্য হোক, ডিরেক্টর যতই বাঁকা চোখে তাকাক, গুচ্ছের নীরব অর্থহীন কাজের জন্যে তাকে যতই ছোটাছুটি করাক এরা, বাড়িতে তার জন্যে অসাধারণ কিছু অপেক্ষা করে আছে। দরজা খুললেই চমকে উঠবে হলুদ শাড়ি, শ্যাওলা সবুজ চুলের সেই মেয়ে কাজলবিহীন কাজলা চোখে এমন চাওয়া চাইবে, দাঁত ঝিকিয়ে এমন হাসি হাসবে যে সহস্র মানুষের সহস্র রকম দুর্ব্যবহার, হাজারখানা সমস্যার উদ্যত মুখ সব বাঁশির নাচনে সাপের ফণার মতো নুয়ে পড়বে। তারপর বেতের হালকা চেয়ারে মুখোমুখি বসে চা-খাওয়া, ঝুপঝুপ সন্ধে নামছে, আলো জ্বলছে। সারাদিনেব জমা কথা ফুটছে, টুকটাক দু একটা গানের কলি, একটা ধূপ জ্বেলে দেওয়া। ঘাড় ফিরিয়ে একটু ভ্রূভঙ্গি— শুনতে এইটুকু কিন্তু এরই মধ্যে যে কী অসামান্য রস ভরা থাকে তা শুভেন্দু ছাড়া কেউ কি জানবে ?

কিন্তু কোনও একদিন ওইরকম প্রত্যাশায় সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে যদি হাসির চমক না দেখে ? সারা শরীরে শোকের ছাপ, যেমন-তেমন মলিন শাড়ি, বিকীর্ণমূর্ধজা, মেঘে-ভরা আকাশের মতো বর্ষণোন্মুখ চোখ !

'কী হয়েছে নন্দিতা?'

'কিছু না। এসো।'

চা খাওয়া হয়, চায়ের সুগন্ধের সঙ্গে ফিলটার-সিগারেটের গন্ধ মিশতে থাকে। সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। যন্ত্রচালিত দুটো হাত ধূপ জ্বেলে দেয়। হাতের মধ্যে যেন কোনও আগ্রহ নেই। রাত্তির হয়, খাবার বাড়া হয়। কথা-বার্তা, হাসি-ঠাট্টা, চোখের-আঙুলের-ঠোঁটের আদর ছাড়া খাবার বিস্বাদ মনে হয়, কিন্তু বারবার জিজ্ঞেস করে করেও উত্তর পাওয়া যায় না।

'কী আবার হবে ? কিছু না।'

রাত্রে বোঝে নন্দিতা জেগে আছে। কিন্তু কোনও গভীর শোকে সে অনমনীয়, তাকে এখন ছোঁয়া যাবে না।

পরদিন খবর জানল রাস্তায় বেরিয়ে। দু তিন বাড়ি পরে থাকে অভিলাষদা, তার স্কুল-পড়ুয়া ন'দশ বছরের ছেলেটি মারা গেছে। একেবারে হঠাৎ। স্কুলই অসুস্থ হয়ে পড়ে, বাবাকে তার অফিসে খবর দেওয়া হয়েছিল, বাবা আসত আসতেই সব শেষ। কেন, কী বৃত্তান্ত ভালো বোঝাই যাচ্ছে না।

ক' দিন পরে শুভেন্দু বলে—'চলো নন্দিতা, উট্রাম ঘাট থেকে ঘুরে আসি।' উট্রাম ঘাটে যেতে, জেটির ওপর দাঁড়িয়ে আঁচল ওড়াতে, গোল রেস্তোরাঁয় খেতে নন্দিতা ভীষণ ভালোবাসে।

কিন্তু নন্দিতা শূন্য চোখে চেয়ে বলে—'কী লাভ ?'

'কিসের কী লাভ ?'

'এ ভাবে কোথাও বেড়াতে গিয়ে ? বা কিছু সে যাই হোক না কেন, করে ? কী

লাভ? টুবলুর মতো একটা কচি ছেলে যদি এভাবে বিনা বাক্যব্যয়ে...তো কী লাভ ? তুমিই বলো ?'

রাত্তিরে নন্দিতা গভীরে শোকে গুমরে গুমরে কাঁদতে থাকে, যেন তার নিজেরই সন্তান গেছে।

আস্তে আস্তে মেঘ কাটতে থাকে, নন্দিতা স্বাভাবিক হয়, যদিও বৎসহারা জননীর এক গভীর, গভীরতর অসুখ সে যেন তার জীবনযাপনের ভেতরে চিরকালই বহন করে যাবে বলে মনে হয়। সবচেয়ে ভয় এবং আশ্চর্যের কথা এরও বেশ কয়েক মাস পরে শুভেন্দুর মাসতুত বোনের বিয়েতে নেমন্তন্নে গিয়ে, খাওয়া-দাওয়া হবার আগেই সে শুভেন্দুর হাত ধরে এসে,—'চলো এক্ষুণি চলে যাবো।'

'কেন ? কী হল ?' সুন্দর সিল্কের শাড়ি পরা অলঙ্কৃত বউয়ের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে শুভেন্দু।

'শুনতে পাচ্ছো না সানাই বাজছে ?'

'বিয়ে বাড়িতে তো সানাই বাজবেই।'

'আমি সইতে পারি না যে ! টুবলু যেদিন চলে গেল, সেদিন সারা দিন সারা রাত দূর থেকে সানাইয়ের সুর ভেসে এসেছিল। আমার.....আমি সইতে পারি না।'

টুবলুর মৃত্যু খুবই মর্মান্তিক। একশবার। কিন্তু টুবলুদের সঙ্গে নন্দিতার কোনও যাওয়া আসাই ছিল না। টুবলুর সঙ্গে সে জীবনে দুবার কথা বলেছে কি না সন্দেহ।

অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে, নন্দিতাকে আগে থেকে কিচ্ছু না বলে বাড়ি পাল্টে ফেলার ব্যবস্থা করে শুভেন্দু। একটু শহরতলির দিকে। মস্তানি-ফস্তানি আছে নাকি একটু আধটু। কিন্তু চার ফ্ল্যাটের নতুন দোতলা বাড়ি। গেটে নন্দিতার পছন্দের মাধবীলতা থোকা থোকা দুলছে। নির্মল আকাশ দেখা যায়। রেললাইনের ধারে সাঁঝের বাজার বসে। সেখানে হরেক রকম টাটকা মাছ, সবজি পাওয়া যায়। একেবারে হাতের কাছে।

নন্দিতা প্রথমে গুঁই গাঁই করেছিল। তার আবার পুরনো বাড়ি, উঁচু উঁচু সীলিং, রাশি রাশি জানালা-দরজা, এ সব ভাল লাগে। সে ছাদে উঠে গনগনে রোদে কাপড় শুকোতে দেবে, আবার কালবৈশাখী এলে ঝড়ের হাওয়ায় উথালপাথাল হতে হতে কাপড় তুলে আনবে। দুমদাম দরজা জানলার আওয়াজ, ঘুলঘুলিতে চড়ুই পাখির বাসা, পাঁচিলের ফাটলে অশত্থগাছ এ সবই তার ভারি পছন্দের জিনিস। কিন্তু শুভেন্দুর এক গোঁ। সে এ বাড়ি ছাড়বেই। বউয়ের খামখেয়ালের জন্যে নতুন বাড়িতে থাকতে পাবে না নাকি সে তাই বলে? আচ্ছা বউ তো তার ! তখন নন্দিতা অগত্যা হেসে ফেলে। দৌড়োদৌড়ি করে সব গুছিয়ে তুলতে থাকে। কী ফেলে যাবে, কী নেবে, কী নতুন কিনবে তার হিসেব-নিকেশ করতে করতে একটা শালিখনী কি চড়ুইনীর মতোই মহা ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ওঠে। দেখতে দেখতে শুভেন্দুর বুকের ভেতরটা আনন্দে শিরশির করতে থাকে। 'নন্দিতা, আ-নন্দিতা অ-নন্দিতা' সে গলা ছেড়ে ডেকে ওঠে।

আগেকার পছন্দটাকে আঁকড়ে ধরে নতুনের সব কিছু বরবাদ করে দেবে এমন মেয়েই নয় নন্দিতা। নতুন বাড়িটা তার ভারি ভালো লেগে যায়। ফিকে লাইল্যাক রঙের দেয়ালে যামিনী রায়ের গণেশ-জননী টাঙাতে টাঙাতে সে দুদ্দাড় করে ছোটে প্লেনের আওয়াজ শুনে, জানলার গ্রিল ধরে চেয়ে দ্যাখে, বলে 'ভালোই হল বলো। আজকাল এয়ারপোর্টে ঢুকতে যা খরচ, এতো কাছ থেকে বেশ নিখরচায় প্লেন দেখা যাবে ! কী আওয়াজ ! যেন আমাদের বাড়িতেই নেমে পড়বে মনে হয় !' শুভেন্দু পায়ের ওপর পা তুলে মৃদু মৃদু হাসে। বিজয়ীর মতো। 'তুমি আর বড় বড় কথা বলো না ! আসতেই তো চাইছিলে না!'

'তা অবশ্য সত্যি গো !' নন্দিতা কাঁচুমাচু মুখে অকপটে স্বীকার করে, 'আগের বাড়িটা আমার ভীষণ মায়াবী বাড়ি ছিল গো ! পুরনো বলে আমি কেমন খারাপ বাসতে পারি না। অন্যে পছন্দ করছে না দেখলে আমার যেন আরও মায়া বসে যায় ! এ বাড়িটা একটু নিচুও। কিন্তু দেওয়ালগুলো ? সাটিনের মতো ! আর জানলা দিয়ে মাধবীলতার ভিউটা দা-রুণ।' অতএব সে খুব চটপট নতুন বাড়ি মনের মতো করে গুছিয়ে ফেলে। লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে, হেসে কুটোপাটি হয়ে, বরের গাল চটকে, কান কামড়ে খুব তাড়াতাড়ি বাকি তিন প্রতিবেশীর সঙ্গে আলাপ-টালাপও সেরে ফেলে। সন্ধেবেলায় উৎসাহের চোখে দু চার সিঁড়ি টপকে টপকে উঠতে উঠতে শুভেন্দু আহ্লাদে আটখানা হয়ে শোনে তার বাড়ির জানালা দিয়ে নির্ভুল ভাবে গান ভেসে আসছে—'পিয়া বিন রয়না নহী জায়।' সে বেল বাজিয়ে দরজা খুলতে না খুলতেই বলে ওঠে 'পিয়া বিন রয়না যাবার কোনও সম্ভাবনা আপাতত নেই। পিয়া হাজিব।'

কিন্তু সবচেয়ে বিপজ্জনক নন্দিতামিটা তার বউ এখানেই করে ফেলল। এগুলোকে আজকাল শুভেন্দু নন্দিতামি বলে, আর কোনও নাম বা সংজ্ঞা খুঁজে না পেয়ে। সন্ধের শোয়ে এসপ্লানেড পাড়ায় ছবি দেখতে গিয়েছিল। একেবারে খেয়ে বাড়ি ফিরছে। দুজনেরই খুব মেজাজ খুশ। সারা রাস্তা বাসে বসে বসে ফিলমটার পিণ্ডি চটকেছে দুজনে আর হেসে খুন হয়েছে। তাদের বাড়ি যেতে হলে একটা পাক খাওয়া গলি পড়ে। গলিটা এড়িয়েও যাওয়া যায়, তবে তাতে ভীষণ ঘুর হয়ে যায়। গলিপথে কিছুটা এগোবার পর একটা চাপা বচসার আওয়াজ শুনতে পেলো ওরা, তারপরেই সামনে যেখানে মোড়, গলিটা দু-ভাগ হয়ে ডাইনে বাঁয়ে চলে গেছে সেইখানে টিমটিমে আলোয় একটা জটলা, কয়েকটা তীক্ষ্ণ গালাগাল তারপর একটা ছোরা ঝলসাতে দেখল ওরা। শুভেন্দু কিছু বুঝে ওঠার আগেই জ্যা-মুক্ত তীর কিংবা বলা উচিত বুলেটের মতো বেগে নন্দিতা তার পাশ থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। শুভেন্দু দেখতে পেল উদ্যত ছোরা হাতে এক বিশাল চেহারার ঝাঁকড়া চুলো মস্তান, তার পেছনে আরও কিছু দলা পাকানো লোক, অপর দিকে মাথা নিচু করে এক হাত ওপরে তুলে আঘাত এড়াবার ভঙ্গিতে এক ছোকরা। উভয়ের মাঝখানে লাল শাড়ি পরা নন্দিতা একটা ছোট্ট হাইফেনের মতো, কিংবা ছোট্ট একটা ফুলকির মতো। 'না, না খবরদার না' সে চিৎকার করে বলছে, 'খবরদার মারতে পাবেন না।' নিমেষের মধ্যে ছোকরা ডান দিকের গলি দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে বেরিয়ে গেল, মস্তানের চোখে আগুন,

ছোরা নেমে আসছে। ব্যাস শুভেন্দু আর কিছু দেখেনি, জানে না। তার সামনে নিকষ আঁধার। যখন আবার দেখল, দেখতে পেল গলির মোড় শূন্য, সে বসে পড়েছে, নন্দিতা বলছে, 'কী হল তোমার ? ওঠো ! শিগ্‌গির বাড়ি চলো !' শুভেন্দু অবাক হয়ে দেখল তার বউ অক্ষত আছে।

কোনক্রমে বাড়ি ফিরে, দরজায় ভেতর থেকে একটা তালা লাগাল শুভেন্দু। ভারী একটা কৌচ এনে দরজায় ঠেস দিয়ে রাখল। নন্দিতা বলল, 'কী করছো ?'

শুভেন্দু গম্ভীর ভাবে বলল, 'এতে কিসুই হবে না। দু চারখানা লাথিতেই ভেঙে পড়বে। তবু ডুবন্ত মানুষ তো কুটোগাছটাও আঁকড়ে ধরে !'

'তার মানে ? কে লাথি মারবে ?'

'কেন ? ওই যাদের নোংরা কাজিয়ার মধ্যে তুমি তোমার নির্বোধ নাকটি গলিয়েছিলে? খুব ভাগ্য ভালো যে তোমাকেই খুন করেনি বা ....'

নন্দিতা বলল—'তাই বলে, আমার চোখের সামনে মানুষ মানুষকে খুন করবে আর আমি কিছু বলব না তা তো হয় না, হতে পারে না !'

'আর যদি আক্রোশে তোমাকেই খুন করত !'

'খুন হয়ে যেতাম, কেউ না বাঁচালে।'

'আর যদি রেপ করত ?'

'রেপই হয়ে যেতাম। নিজেকে রক্ষা করতে না পারলে বা কেউ না রক্ষা করলে ! তবে এসব ভাবিনি তখন, দেখেছিলাম দুটো মানুষ, একজনের হাতের ছুরি অন্যজনের ওপরে নেমে আসছে, মাঝখানে দু আড়াই ফুটের মতো ফাঁকা জায়গা, ওইটুকু ছাড়া আর কিচ্ছু দেখিনি, কিচ্ছু ভাবিওনি।'

কী ভয়ানক ! কী ভয়ঙ্কর ভয়ানক ! এ মেয়েটা ভাবে না পর্যন্ত ! শুভেন্দু ভাবল, এবং ভাবতেই থাকল, ভাবতেই থাকল। অফিস যাবার সময়ে বেরোতে ভাবে, বাড়ি ফেরবার সময়ে ফিরতে ভাবে। গলিতে কদাচ নয়। তথাপি ভয়। আর কিছু না হোক বাড়ি গিয়ে কী দেখবে এই ভেবে ভয়। যার জন্য এতো ভয় ভাবনা সেই নন্দিতা কিন্তু একদম স্বাভাবিক। দোকান-বাজার যাচ্ছে, দরজা হাট করে খোলা রেখে বাসনওয়ালীর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে, হাসি গান গল্প। দিব্যি আছে।

কদিন পরে শ্যামবাজারের মোড় থেকে বাসে উঠছে, হঠাৎ কাঁধের ওপর একটা ভারী হাত পড়ল। একেবারে চমকে উঠেছে শুভেন্দু।

'কী রে শুভ ?'

মুখ ফিরিয়ে চেয়ে শুভেন্দু খুশিতে ফেটে পড়ল, 'আরে রমেন না ?'

'চিনতে পেরেছিস তাহলে !'

ভিড়ের মধ্যে থেকে সন্তর্পণে তাকে বার করে আনতে আনতে রমেন বলল।

'তোকে কখন থেকে ডাকছি, গাড়ির মধ্যে থেকে শুনতেই পাচ্ছিস না। অনেকক্ষণ থেকে তোকে ফলো করতে করতে আসছি। চল্ ওই দিকে গাড়িটা পার্ক করেছি। শুভেন্দু একমুখ হেসে বলল—'কবে ফিরলি ?'

'বছর খানেক। যতীন্দ্র মোহন অ্যাভেনিউয়ের মুখে চেম্বার করেছি। আয় না, দেখে যাবি ! আমি অবশ্য এখন চেম্বার বন্ধ করে বেরোচ্ছি।'

শুভেন্দু বলল, 'ঠিকানাটা দে, অন্য একদিন যাবো। আজ না। বউ বাড়িতে একা রয়েছে। জায়গাটা ভালো না।'

'বিয়ে করেছিস ? কবে ?' রমেন উৎসাহিত হয়ে উঠল।

'বছর তিনেক হল।'

'তো চল্, তোর বউ দেখে আসি। নেমন্তন্নটা তো একেবারেই মিস করে গেছি দেখছি।'

'যাবি ? খুব ভালো হয় তাহলে।'

রমেন তার ক্রিম রঙের মারুতি ভ্যানের দরজা সরিয়ে দিল। তারপর বলল—

'আমি পিঠে হাত রাখতে ও রকম ঘাবড়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেলি কেন রে ?'

'ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিলুম বুঝি ?'

'হ্যাঁ, একেবারে চমকে উঠলি !'

'আর বলিস না, এই বউটা আমার মাথা খারাপ করে ছাড়বে।'

'কী ব্যাপার ?'

গাড়িতে যেতে যেতে শুভেন্দু তখন ব্যাপারটা বলল ! শুনে রমেন হাসতে লাগল।

অন্যদিনে শুভেন্দুর ফিরতে ফিরতে সন্ধে হয়ে যায়। আজ রমেনের গাড়িতে অনেক তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। দরজা খুলে দিল বাসনমাজার মেয়েটি। 'কে রে ?' নন্দিতার গলা শোনা গেল। মেয়েটি চেঁচিয়ে বললে—'দাদাবাবু।'

'ওমা, তুমি এতো সকালে :' বলতে বলতে শোঁ-ও-ও করে নন্দিতা এসে হাজির হল। পরনে চুড়িদার-কুর্তা, ওড়নাটা কষে কোমরের সঙ্গে বাঁধা। আঁটসাঁট করে একটা বিনুনি বেঁধেছে। পায়ে রোলার স্কেট। এ বাড়িতে কোথাও চৌকাঠ নেই, রোলার স্কেট পায়ে চড়িয়ে নন্দিতা ঘর থেকে ঘরান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

একবারে শোঁ করে পেছনে গড়িয়ে আরেকবার দ্বিগুণ শোঁ করে সামনে গড়িয়ে এসে নন্দিতা রাজকীয় সালাম জানাল রোলার স্কেটের ওপর থেকে 'আইয়ে জনাব।' পরক্ষণেই পিছনে অপরিচিত মুখ দেখে ভড়কে গিয়ে পড়তে পড়তে টাল সামলে নিতে নিতে তার পশ্চাদপসারণ। একেবারে রান্নাঘরের মধ্যে। 'ক্‌কী কাণ্ড!' একটু পরে খালি পায়ে ওড়না দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকে সে বলল। মুখে লাজুক-লাজুক হাসি।

রমেন বলল, 'কেন, বেশ তো ছিলেন, বাহনের ওপর থেকে নেমে এলেন কেন ?'

নন্দিতা মুখ ঢেকে হেসে উঠল।

শুভেন্দু বলল, 'এই হল আমাদের রমেন। রমেন দা গ্রেট।'

'বাস ? ওইটুকুতেই ইনট্রোডাকশন হয়ে গেল ?' রমেন বলল।

'এর চেয়ে এক পয়সাও বেশি বলতে হবে না, বুঝলেন ?' নন্দিতার হাসি-হাসি মুখ, 'আপনি প্রায়ই আমাদের দুজনের মাঝখানে বসে থাকেন, তা জানেন ?'

'সুদুর লণ্ডনে বাস করে আপনাদের মাঝখানে....আমি কি ভূত-টুত নাকি ?'

'আরে, ও বলতে চাইছে তোকে নিয়ে আমাদের মধ্যে গল্প-সল্প হয়। এই আর কি !'

'তাই নাকি, বাঃ।' রমেন খুব খুশি হল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নন্দিতা দশভুজা হয়ে উঠল। প্রথমেই একদফা চা-বিস্কুট দিয়ে গেল। চা-টা শেষ হতে না হতেই কিসের বড়া গরম গরম ভেজে এনেছে, তার সঙ্গে আবার চা। তারপরে ছানার পুডিং হাজির করল, সেটা শেষ হলে বলল—'মুখটা মিষ্টিয়ে গেল না কি? কুচো নিমকি খাবেন ?' রমেন বলল, 'তাই বলি শুভটা রোগা-প্যাংলা ছিল বরাবর, এমন গায়ে-গতরে হয়ে উঠল কী করে ? এই-ই তার সিক্রেট ?'

নন্দিতা বলল—'ওসব বললে শুনছি না, আপনি আজ খেয়ে যাচ্ছেন।'

রমেনের সমস্ত আপত্তি হাওয়ায় উড়িয়ে দিলে নন্দিতা। তারপর সে এই সদর দরজা খুলে ছুটে যাচ্ছে সম্ভবত বাজারে, এই আবার প্রতিবেশীর ফ্ল্যাটে, রান্নাঘরে যাচ্ছে একবার, পরক্ষণেই সে এসে বসছে, গল্পে যোগ দিচ্ছে। এমনি করে রাত নটা নাগাদ সে গা ফা ধুয়ে একটা জমকালো পোশাকি শাড়ি পরে, কপালে টিপ, পুরো চুল খোলা খেতে ডাকল ওদের। হাত বাড়িয়ে বিরিয়ানি দিচ্ছে ওদের প্লেটে, তখনই শুভেন্দু এবং রমেনও লক্ষ্য করল জিনিসটা। ডান হাতের তলার দিকে আড়াআড়ি একটা চওড়া লালচে দাগ।

—'ওটা কী ? কী হয়েছে ?' শুভেন্দু শিউরে উঠে জিজ্ঞেস করলো।

হাত উল্টে নন্দিতা দাগটা দেখলে, একটু অবাক হয়ে বলল, 'তাই জ্বালা-জ্বালা করছিল। ও কিছু না।'

কিছুতেই সে আর কিছু বলল না।

'দারুণ খেলাম' রমেন হাত ধুতে ধুতে বলল।

'আবার যাতে আসেন তাই চেষ্টা-চরিত্র করে ভালো খাওয়ালাম।' নন্দিতার জবাব, 'বিরিয়ানি রাঁধলাম, জামদানি পরলাম আপনার অনারে, আর এই নিন।' সে মুঠোভর্তি কাঁটালি-চাঁপা ফুল রমেনের দুহাতে উপুড় করে দিল। ফুলগুলো নিয়ে যাবার জন্যে একটা পলিথিনের প্যাকেটও এনে দিল রাবার ব্যাণ্ড শুদ্ধু।

রমেন বলল, 'রোলার স্কেট না পরেই তো আপনি হানড্রেড মাইল স্পীডে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন দেখলুম। ওটার দরকার হয়েছিল কেন ?'

নন্দিতা চারদিকে কেমন বিহ্বল চোখে চেয়ে মৃদু হাসল, বলল—'কেন জানেন না ? শোনেন নি, সেই

"জলের কলে টিপ্ টিপ্
টিপ্ টিপ্
আমরা বলেছিলাম যাবো
সমুদ্রে।
নদী বলেছিল যাবে
সমুদ্রে।

আমরা বলেছিলাম যাবো
সমুদ্রে।
আমরা যাবো।"

বলতে বলতে মুখটা উলসে উঠল তার।

নিচে গিয়ে গাড়িতে উঠতে উঠতে রমেন বলল—'দারুণ কাটল রে সন্ধেটা। চলি। আবার দেখা হবে। তারপর স্টিয়ারিঙে হাত রেখে হেসে বলল—'তোর বউটা একটা পাগলি।'

কী বলতে চাইল রমেন ? শুভেন্দু ওপরে উঠতে উঠতে ভাবতে লাগল। তারপর থেকে প্রতি দিনই কাজের ফাঁকে ফাঁকে মাথার মধ্যে কথাটা তাকে আঘাত করে যায়— 'পাগলি, তোর বউ একটা পাগলি !' কেন এ কথা বলল রমেন ? পাগলি কথাটা লোকে আদর করে বলে আপনজনকে। 'দূর পাগলি !' আবার বিরক্ত হয়ে বলে 'কী পাগলামি করছো ?' কিন্তু 'তোর বউটা একটা পাগলি !' কী প্রকৃত মানে এই কথার ? শুভেন্দু তার বউ নিয়ে গর্বিত। তিন ঘণ্টার মধ্যে লাফঝাঁপ কবে বানিয়ে দিল, বিরিয়ানি, ফিশ তনদুর, ফ্রায়েড চিকেন। নিজেই বাজার গেল, এ বাড়ি ও বাড়ি থেকে কী মাল মশলা সংগ্রহ করল কে জানে, কিন্তু বানিয়ে তো দিল ! অরেঞ্জ-চকলেট রঙের ওই শাড়িটা পরে কপালে লম্বা টিপ, আধ কোঁকড়া চুল খুলে যখন খাবার টেবিলে পরিবেশন করছিল? সম্রাজ্ঞীর মতো! ম্যাজিশিয়ানের মতো যখন হাতেব মুঠো থেকে কাঁটালি চাঁপাগুলো বার করল ? কিংবা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা ঠিক কথা বলার মতো করে বলে উঠে একটা চমৎকার ছোট গল্পের মতো শেষ করল শুভেন্দুর বাড়িতে রমেনের প্রথম আসার দিনটা !

অথচ প্রতিক্রিয়ায় 'তোর বউটা একটা পাগলি !' এ কথা কেন বললি রমেন ? ভেবে বললি ? হঠাৎ বিদ্যুচ্চমকেব মতো শুভেন্দুর মনে পড়ে যায় নন্দিতার ডান হাতের সেই চওড়া কালশিটের দাগ, কদিন আগে যা লাল ছিল. মনে পড়ে যায় বৃষ্টির রাতে ছুটে যাওয়া, 'কুকুরটা কী ভয়ানক কাঁদছে গো !' মনে পড়ে যায় মস্তানের উদ্যত ছুরির তলায় লাল শাড়ি পরা স্ফুলিঙ্গের মতো নন্দিতাকে, শানাই ভালো লাগে না যার, শানাই শুনলে যে বিষাদের অতলান্তে তলিয়ে যায় সেই নন্দিতাকে। শুভেন্দু আর দেরি করে না।

অফিসে আজ খুবই দেবি হয়ে গেছে। তবু সে শ্যামবাজারের মোড় থেকে চট করে বাস ধরে না। চলে যায় যতীন্দ্রমোহন অ্যাভেনিউ। ডক্টর রমেন বাগচির চেম্বারে।

নিজের নাম পাঠিয়ে দিয়ে ওয়েটিং রুমে বসে শুভেন্দু। চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটি লাল-চোখ তরুণকে নিয়ে বসে আছেন। ছেলেটি যেন ঘুমঘোরে রয়েছে। ঘোর ভাঙলেই সে ভয়ঙ্কর কিছু একটা কর ফেলবে। আরও দুজন সঙ্গী রয়েছেন ভদ্রলোকের। বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মাঝে মাঝে এসে চুপি চুপি কথা বলে যাচ্ছেন। শুভেন্দুর পাশেই বসে আরেক জন, শুভেন্দুর থেকে বড় হলেও যুবকই। তাঁর সাথে একটি খুব সুন্দরী বউ। এতো সুন্দর, কিন্তু যেন বিষাদপ্রতিমা। দেখলে মনে হয়

নৈরাশ্যের সিন্ধু থেকে উঠে এলো বুঝি। শুভেন্দুর বাঁ পাশে একটি অল্পবয়সী ছেলে। চোখে চশমা। ধারালো মুখ। সে শুভেন্দুর সঙ্গে যেচে আলাপ করল।—'কিছু মনে করবেন না দাদা, আপনি কার জন্য এসেছেন?'

শুভেন্দু কী বলবে ভেবে পেল না। সে কি সত্যি-সত্যিই নন্দিতার জন্যে এসেছে ? নন্দিতা কি ....

'এসেছি এক নিকট আত্মীয়ার ব্যাপারে', ধরি-মাছ না ছুঁই পানি করে বলল শুভেন্দু।

'আপনি ?'

'আমার নিজেরই জন্যে।' ছেলটি খুব সুন্দর হেসে বলল, 'অনেকের ধারণা সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে খালি মনোরোগীরাই আসে। ধারণাটা ঠিক নয়। অনেক রকম ডিজঅর্ডার আছে জানেন তো ? আমার কথাই ধরুন না কেন। দু বার ডাবলু বি সি এস দিয়েছি। র‍্যাঙ্ক ভালো আসেনি তাই আবার দিচ্ছি। এবার বুঝলেন ....হয় এসপার নয় ওসপার ! তো যা-ই পড়তে যাই মনের মধ্যে ঝমঝম করে কবিতা বাজে, এখান থেকে এক লাইন ওখান থেকে এক লাইন, ধরু 'দাওয়ায় বসে জটলা করে পূর্বপুরুষেরা' কি তোমায় 'আজি রেখে এলেম ঈশ্বরের হাতে' কি 'অবর্তমান তোমার হাসি ঝাউয়ের ফাঁকে/আমায় গভীর রাত্রে ডাকে ও নিরুপম, ও নিরুপম ও নিরুপম' বলতে বলতে ছেলেটি উত্তেজিত হয়ে উঠল। সটান উঠে দাঁড়িয়ে ভাবগম্ভীর গলায় আবৃত্তি করতে শুরু করে দিল যেন এটা মঞ্চ :

—মন্দ ভালো নেইকো কিছুই, আকাশ মাথায়
বাউল-বাউলী দাঁড়িয়ে থাকায়,
নিম ঘোড়ানিম আকাশ ফুঁড়ে কৃষ্ণ-কিরিচ ফাঁসিয়ে রাখায়,
থই থই থই সমুদ্র জল তাথৈ তাথায়,
ওপর নিচে ডাইনে বামে আমার থেকেই আমায় ভাগায়....আমায়
ভাগায়....আমায় ভাগায়....

শুভেন্দু আশেপাশে তাকাল। সবাই ভয়ের চোখে ছেলেটির দিকে তাকাচ্ছে। সুন্দরী মেয়েটির চোখ ভর্তি জল। লালচোখ ছেলেটি লম্বা সীটের ওপর শুয়ে পড়ছে। রমেনের অ্যাসিস্ট্যান্ট মেয়েটি এসে ডাকল, 'কৌস্তুভ সেনগুপ্ত !' কবি ছেলেটি তাড়াতাড়ি চেম্বারে ঢুকে গেল। শুভেন্দুর হঠাৎ ভয় করতে লাগল। ভীষণ ভয়। এ সব যেন তার চেনা। এ লাল চোখ সে দেখেছে 'খবর্দার মারতে পারবেন না' বলে যখন ঝলসে উঠেছিল। ওই বিষাদ-প্রতিমা নয়ন-ভরা জল, দিনে রাতে দেখতে দেখতে এক সময় সে মরিয়া হয়ে গিয়েছিল। আর এই রকম মিঠে হাসি, চোখ দুটো হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়া, এই রকম.....ঠিক এই রকম.....ঠিক ! ভয়ে অধীর হয়ে উঠল সে। উঃ ! কখন তাকে ডাকবে রমেন ?

অ্যাসিস্ট্যান্ট মেয়েটি একটা ছোট্ট নোট পেপারে লেখা একটা চিঠি এনে দিল।

'শুভ, একটু বোস ভাই। পেসেণ্টদের ছেড়ে দিয়েই তোর সঙ্গে বেরোব।'

রমেন, রমেন তুই জানিস না, শুভ তোর সঙ্গে মজা মারতে, ইয়ার্কি দিতে আসে নি। তার বাড়িতে ভীষণ বিপদ। খুব বিপন্ন একজনের জন্যেই আজ সে তোর কাছে ছুটে এসেছে।

ঠিক এক ঘণ্টা বারো মিনিটের মাথায় শেষ রোগীটি বেরিয়ে গেল, শুভেন্দুর ডাক পড়ল।

'কী ব্যাপার বল ? চা খাবি তো ? না কফি, মায়া একটু কফি বানাও ভাই !'

অ্যাসিস্ট্যান্ট মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রমেন বলল।

'আরে দূর তোর কফি' শুভেন্দু বলল, 'আমি ভীষণ সমস্যায় পড়ে এসেছি।'

'তোর আবার কী সমস্যা ? ফাস্ট ক্লাস আছিস !' রমেন পাত্তাই দিল না।

শুভেন্দু বলল, 'তোকে পষ্টাপষ্টি জিজ্ঞেস করছি রমেন, নন্দিতা আমার বউ কী অস্বাভাবিক, মানে অ্যাবনর্ম্যাল ?'

রমেন ঝুঁকে বসে আশ্চর্য হয়ে বলল—'সে কী? একথা কেন বলছিস ?'

শুভেন্দু বলল—'সেদিন ওর ডান হাতে একটা লাল দাগ দেখেছিলি, মনে আছে ? সেটা কী জানিস ? স্কেলের বাড়ি। আমাদের নিচের ফ্ল্যাটের ভদ্রমহিলা মেরেছেন।'

'বলিস কী রে ? এফ. আই. আর. কর, এফ. আই. আর. কর। ডেঞ্জারাস মহিলা তো !'

'আরে, আগে সবাই তো শোন !'

'বল, আ'য়্যাম অল ইয়ার্স।'

'নিচের ফ্ল্যাটের ভদ্রমহিলার একটি হাবাগোবা ছেলে আছে। বছর-বছর ক্লাসে ফেল করে। তা করবে না তো কী ? ইডিয়ট তো ! পেনসিল পেন খাতা-বই এ সবেরও শ্রাদ্ধ করে ছেলেটা।'

'করবেই ! তা কী সেন্স আছে !'

'সেটাই ! তো ভদ্রমহিলা ছেলেটাকে এরকম কিছু ঘটলেই আচ্ছা করে পেটান। তুই যেদিন গেলি সেদিন সকালে নাকি নন্দিতার ভাষায় অমানুষিক পেটাচ্ছিলেন। ছেলেটার চিৎকার শুনতে পেয়ে ও ছুটে যায়, দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রহারে বাধা দেবার চেষ্টা করে, স্কেলের বাড়িটা ছেলেব ওপরই নামছিল, নন্দিতার হাতের ওপর পড়ে।'

'তাই বল !' স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে রমেন বলল।

শুভেন্দু বলল, ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা আমার কাছে গম্ভীর মুখে নালিশ করে গেলেন, আমার স্ত্রী ওঁদের পারিবারিক ব্যাপারে নাক গলাচ্ছে বলে। যখন নালিশ জানাচ্ছিলেন, তখন নন্দিতা বাজার গেছিল। ফিরে এসেছে, ওঁরা দেখতে পাননি। নন্দিতা চোখ গরম করে বলল, 'আপনারা যদি টুটুকে পেটানো বন্ধ না করেন আমি পুলিশে খবর দেবো, হাতে হাতকড়া পরিয়ে ছাড়ব, জেনে রাখবেন।' সে কী চেহারা রে, যেন বাঘিনী !

রমেন হাসতে হাসতে বলল—'তো কী ! ভালোই করেছে তো ! সন্তানের দ্বারা বাবা-মাকে ডিভোর্স করার আইনটা পাশ হয়ে গেলে ভালোই হয়।'

শুভেন্দু বলল, 'আরে শোন', সে পূর্বাপর আজ অবধি যা ঘটে গেছে সবগুলো বলে গেল, তারপর অভিযোগের স্বরে বলল, 'তুইও তো প্রথম আলাপেই আমার বউটাকে পাগলি বললি। বলিস নি !'

—'বলেছিলুম বুঝি !' রমেন হাসতে লাগল। তারপব হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, 'তা তোর কী বলার আছে বল !'

'বলবার আর কী আছে ? আমি তোব কাছে থেকে প্রফেশন্যাল ওপিনিয়ন চাইছি। অ্যাডভাইসও।'

রমেন হাতের আঙুলগুলো মন্দিরের মতো চুড়ো করতে করতে বলল, 'দ্যাখ, শুভ, আমাদের শাস্ত্রে বলে সেণ্ট পার্সেণ্ট নর্ম্যাল লোক খুব কম। আসল হল ব্যালান্স। মানে ভারসাম্য। এই ভারসাম্যটা যদি এদিক ওদিক হেলে একটু কম বেশি হযে যায় তো....মানে বুঝেছিস ? এক চুলের তফাত !'

আতঙ্কিত চোখে তার দিকে চেয়ে শুভেন্দু বলল—'তা হলে ?'

'ধুর—ঘাবড়াচ্ছিস কেন ?' হালকা গলায় হেসে উঠল রমেন 'ঘাবডাবার আছেটা কী? মেডিক্যাল সায়েন্স যে এত উন্নতি করল, প্রযুক্তি বিজ্ঞান যে আজ কোন চুড়োয় উঠে গেছে, এ সব কি ঘাবড়াবার জন্যে ? ম্যান ইজ অলমোস্ট গড নাউ। সামান্য....খুব সামান্য একটু মেডিকেট করলেই নন্দিতা ঠিক হয়ে যাবে। আমি তোকে বেস্ট ওষুধ দিচ্ছি আমার স্যাম্পল থেকে।' সে খসখস করে একটা প্রেসক্রিপশন লিখল, তারপর ড্রয়ার খুলে বেছে বেছে কয়েক পাতা ওষুধ বার করে দিল। দু রকম ওষুধ। খাওয়াবার নিয়মটা বলে দিল। তাপর বলল, 'তিন বছর বিয়ে হয়েছে বললি, না ? এবার একটা বাচ্চা বানিয়ে ফ্যাল। দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে।'

অবাক চোখে চেয়ে নন্দিতা বলল—'ওষুধ ? ওষুধ খাবো কেন ?'

'আরে খাওই না ! আমি তো তোমার স্বামী, না শত্রু ? বিষ ফিষ দেবো ?'

'না, তা নয়। তবে কনট্রাসেপটিভ পিল ফিল আমি আর খাচ্ছি না।'

সে তো নয়ই। এবার মেটার্নিটি হোম, কাঁথা, ভ্যাকসিনেশন, ওঁয়া ওঁয়া শুরু হয়ে যাবে, আমার দুঃখের দিন এলো বলে।'

নন্দিতা হেসে ফেলে—'বাঃ বাঃ, কী হিংসুক !'

'এবার লক্ষ্মী মেয়ের মতো ওষুধটা খেয়ে নাও দিকি !'

'কিসের ওষুধ বলবে তো ?'

'নার্ভের, বাবা নার্ভের, নার্ভ শান্ত রাখবে। মন ঠাণ্ডা থাকবে, হবু জননীর আদর্শ মানসিক অবস্থার সূচনা হবে।'

'সত্যি ? কই দাও !' অনাবিল বিশ্বাসে নন্দিতা হাত বাড়ায়। সকালে, বিকালে, রাত্রে। সকালে, বিকালে, রাত্রে। সকালে, বিকালে, রাত্রে।

তৃতীয় দিন অফিস থেকে ফোন করল রমেনকে।

'কেমন আছে রে, নন্দিতা ?'

'প্যার্ফেক্ট। থ্যাংকিউ থ্যাংকিউ ভেবি মাচ।'

'নিজেকেই থ্যাংকসটা দে। তোর ডায়গনোসিস, আমার প্রেসক্রিপশন, রমেন বলে, 'ঠিক আছে, চালিয়ে যা এখন কিছু দিন।'

সন্ধেবেলায় অফিস থেকে ফিরলে দরজা খুলে দেয় পরিষ্কার ফিটফাট নন্দিতা।

দুজনে চা আর ডালমুট নিয়ে গল্প করে।

'জানো আজকে নন্দিনীকে খুব দিয়েছি।'

'তাই ?'

'সোজা বললুম—আপনি ভদ্রভাবে কথা বলতে জানেন না, আগে শিখুন, তারপরে বলবেন।'

'ওমা !'

'একেবারে চুপসে গেল, জানো ?' প্রোমশনের চিঠি আমার হাতে। কী বলবে আর !'

'ঠিকই।'

'এবার বোসকেও ধরব। যদিও রদ্দি মার্কা টুর সব আমাকেই করতে হবে। বললেই বলবে ঠেসে টি এ বিল দেবেন কম্প্যানিকে। ভালোই তো !' যেন আমি ফল্‌স্‌ টি. এ বিলের এক্সপার্ট। আমার ফ্যামিলি লাইফ বলে, প্রাইভেট লাইফ বলে কিছু থাকতে নেই। সব অপমানের শোধ এবার তুলব।'

'দাঁড়াও, প্রেশারের তিনটে হুইশ্‌ল্‌ হয়ে গেল,' নন্দিতা চলে যায়। অনেকক্ষণ আসে না আর।

সান্ধ্য চান সারতে সারতে শুভেন্দুর হঠাৎ মনে হয় নন্দিতা তো কই 'নন্দিনীকে খুব দেওয়া'র প্রসঙ্গে উত্তেজিত হয়ে উঠল না ! বলল না তো—'আহা ওরকম রূঢ় ভাবে বললে কেন ?' জিজ্ঞেসও তো করল না কিসের প্রোমোশন ! কেন প্রোমোশন !

কাজের মেয়েটি চলে গেলেই গোটা ফ্ল্যাটটাতে তারা একা। সেই সময়ে নন্দিতা কোন কোন দিন এসে তার কোলের ওপর ঝুপ করে বসে পড়ে, গলা ধরে দোল খায়। বলে—'জানো, তোমার ঘামে একটা কাটা ফলের মতো গন্ধ বেরোয়। প্লীজ আরেকটু পরে চান কোরো।' কাঁধের ওপর মুখ রাখে নন্দিতা। 'দেখো, ভিড় বাসে মেয়েদের সীটের সামনে দাঁড়ালেও, কখনও কোনও মেয়ে তোমার দিকে নাক কুঁচকে তাকাবে না। মেয়েদের আসলে নাকটাই খুব, বোধহয় সব চেয়ে জোরালো। বুঝলে ?' তারপর শুভেন্দুর নাকে নিজের নাকটা ঠেকিয়ে বলে—'তাই বলে যেন তুমি আবার বাসের মেয়েদের কাছে এটা পরীক্ষা করতে যেও না। খবর্দার।' চোখ পাকিয়ে তর্জনী তোলে নন্দিতা।

তা সেসব তো কই কিছুই হয় না ! স্নাত শুভেন্দু পত্র-পত্রিকা নিয়ে স্পোর্টস চ্যানেল খুলে বসে থাকে। সাহেবরা অক্লান্ত গল্‌ফ খেলে যায়। গল্‌ফ খেলে যায়। সামনে দিয়ে নানান কাজে যাতায়াত করে নন্দিতা। কখনও কুশনের ওয়াড় পাল্টাচ্ছে, কখনও টেবিল মুছছে। টি ভি-র গায়ে চুম্বন লাগানো ছোট্ট মূর্তিটা ওপরের দিকে ছিল, নিচে সরিয়ে দিল। হেঁকে বলল একবার—'গান শুনবে ? চালাব কিছু ?' কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে নটার সময়ে টেবিলে ধোঁয়া ওঠা গরম খাবার। তারপর একটু টি.ভি. দেখা। নিশ্চিড় ঘুম। রাতে কোনও

দিন হয়ত 'বলো হরি, হরিবোল' যায়। বাড়ি কেঁপে ওঠে হরিধ্বনির চোটে। শুভেন্দু জেগে যায়। এই বুঝি নন্দিতা ঝপাং করে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নাঃ। নন্দিতা নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। কোন দিন মাঝ রাত্তিরে রেললাইনের ধারে দু দলের বোমাবাজির শব্দে রাত যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। নন্দিতা কাছে এসে কাতর গলায় বলে না—'ইস্‌স্‌স্‌-দেশটা দিন দিন কী হয়ে যাচ্ছে, কতগুলো টাটকা তাজা ছেলে এভাবে হারিয়ে যাচ্ছে।' নন্দিতার স্নায়ু খুব শক্ত শান্ত হয় গেছে। সে নিবিড় ঘুম ঘুমোচ্ছে।

এমন কি, অফিস যাওয়ার সময়ে খেতে বসে অনেক সময়ে শুভেন্দু টুটুর তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনতে পায়। ডাক্তার বলে দিয়েছে ওর মস্তিষ্ক অপরিণত, ও পারবে না। তবু ওর মা ওকে ঠেঙাচ্ছে। শুভেন্দু উৎকর্ণ হয়ে থাকে। টুটুর জন্যে ততটা নয় যতটা নন্দিতার জন্যে। তার ভাব লক্ষ্য করে নন্দিতা নিঃশব্দে পাতে আর একটু ভাত তুলে দেয়, বলে, 'খেয়ে নাও। শুনে কী করবে ? করতে তো পারবে না কিছু। ওদের ছেলে ওরা বুঝবে!'

কাছেই কারো বাড়ি বিয়ে, সকাল থেকে সানাই বাজছে, ভয়ে ভয়ে অফিস যায় অফিস থেক ফেরে শুভেন্দু। চোখের সামনে সেই সুন্দরী মেয়েটির ছবি ভাসছে। বিষাদ প্রতিমা, নয়ন ভরা জল। ভয়ে ভয়ে দরজায় বেল দেয়। সর্বনাশ, কেদারা ধরেছে এবার ! কেদারা! কেদারা সইতে পারে না নন্দিতা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, বলে, 'টুবুল, আমার টুবুল চলে গেল, উঃ, ওকে তোমরা নিয়ে যেও না নিয়ে যেও না ! ফিরিয়ে দাও।' দরজা খুলে যায়। নন্দিতা। শুভেন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলে, 'কী হল তোমার ? শরীর খারাপ করছে ? ভেতরে এসো। যা গুমোট চলছে।'

শরবৎ এনে দেয়। ভিজে গামছা দিয়ে কপাল, ঘাড়, হাত পা সব মুছিয়ে দ্যায়।

ফ্যানটা পুরোদমে চালিয়ে দিয়ে সামনে বসে থাকে। 'কী গো ? ঠিক আছো তো? না ডাক্তার বলবো !'

ওদিকে মন প্রাণ নিঙড়িয়ে কেদারর সুর ওঠে নামে। নন্দিতা যেন বধির হয়ে গেছে।

রমেন ফোন ধরেছে—'হালো, হালো, শুভ ? বউ ঠিক আছে তো ?'—'একদম ঠিক ভাই, একদম।'

'তো এইবার একটা....বুঝলি তো ? শুধুই দুজন করিব কুজন আর নয়....'

'হ্যাঁ হ্যাঁ সে ঠিক আছে, বুঝেছি, বুঝেছি।'

চাঁদনি রাত। শ্রাবণের চাঁদ। যদি দেখা গেল না তো গেলই না। কিন্তু যদি দেখা গেল তো সে তার রূপোলি মদ দিয়ে তোমাকে মাতাল করে দেবে একেবারে। তখনই বোঝা যাবে এ চাঁদ নীল আর্মস্ট্রং-এর নয়, এ চাঁদ সুকান্ত ভট্টাচার্যেরও নয়। এ সেই আদি অকৃত্রিম কবি-মহাকবিদের রাকা শশী। চাঁদনি। হেনার উগ্র সুবাস সঙ্গে নিয়ে সেই চাঁদনি ঘরের মধ্যে ঢুকছ। একটা ফিকে রঙের ফ্রিল দেওয়া দেওয়া রাত জামা, যেন ওই চাঁদেরই ফেনা ! নন্দিতা ঘুমোচ্ছে মাতোয়ালা শুভেন্দু মৃদু মথিত মন্দ্র স্বরে ডাকছে—'নন্দিতা, নন্দিতা, কই এসো !' নন্দিতা কি জাগবে না ? এমন ডাকেও জাগবে না ? আবার ডাকে শুভেন্দু, আবার, আবার।

নন্দিতা জাগছে। খুলে গেছে তাব চোখের পাপড়ি।

নন্দিতা আসছে। কিন্তু ও কী ?

আসছে আহত জন্তুর মতো। গুঁড়ি মেরে। নিজেকে টেনে টেনে।

শিঙালের রাত-চেরা আকাঙ্ক্ষার ডাকে হরিণীর ঠ্যাঙের তুরুকে নয়। এবং সে আসায় কণ্টকিত হয়ে উঠছে না তো কই আশরীর হরিংঘাসের রোম ! নিবে গেল বুঝি পৃথিবীর কোটরের সৃজনী আগুন। বাঁধের মধ্যে ঘুমিয়ে গেছে দুর্দান্ত নদী। না চাইতেই দু কূল ভরে আর দেবে না। দেবে না আব প্রেমের উপচিতি দিয়ে আত্মপরভোলা সবেদন শুশ্রূষা। তার পুরুষর বুকের তলায় নন্দিতা যান্ত্রিক, উদাস, অসাড় হয়ে থাকে। অবিকল এই পৃথিবীর মতো।

দৌড়

রবি যেদিন প্রথম এসে বলল—'মা আমার সেলস ট্রেনীর চাকরিটা হয়ে গেল। ভাগ্যিস মোটরবাইকটা কিনেছিলুম !' ঠিক সেই দিনই রাত্তিরবেলায় শুতে গিয়ে আমার হঠাৎ মনে হল আমি রাতটাকে একটা মানুষের মতো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। বেশ নীল রঙের কেষ্টঠাকুরের মতো, যদিও তাঁর হাত পা চোখ মুখ ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোথায় কেউ জিজ্ঞেস করলে আমি বলতে পারব না। কালচে নীল রঙ, চাঁদ ওঠেনি। আকাশময় তাই তারার ঝকমকানি। কেষ্টঠাকুরটি রাজকুমার হলেও তো গোপরাজকুমার ! তারাগুলো কি আর চিরকিশোর সেই মূর্তির অলঙ্কারের মণি-মাণিক্য হবে ? এত কথা আমার মনে এল। কেননা আমি আজকাল কিছু বললেই আমার তিন ছেলে-মেয়ে বলে ওঠে—'কেন ? কেন ? কেন ?' এই কেনর জবাব দেবার ক্ষমতা সব সময়ে আমার থাকে না। তাই মনে কোনও কথা উঠলেই তার কার্য-কারণটা ভেবে রাখবার চেষ্টা করি। কেন যে কেষ্টঠাকুরের কথা মন এল ! কী জবাব এর ? ভেবে ভেবে জবাব বার করি—আসলে এই সব পুরাণ কথা দেবদেবী আমাদের মধ্যে এমন ভাবে ঢুকে বসে আছে যে আর অন্যভাবে আমরা ভাবতে পারি না। হ্যাঁ, কী বলছিলুম ? রাতটাকে আমি একটা বিরাট পুরুষের মতো দেখতে পেলুম ! বিরাট, অসীম শক্তিধর, কিন্তু কিশোর। কালপুরুষটা জ্বলজ্বল করছে। কালচে নীলার মতো মখমল আকাশে। অন্ধকারের কেমন একটা অদ্ভুত গন্ধ আছে, টের পেলুম। তোমরা বলবে রাতে কতরকম ফুল ফোটে তারই গন্ধ পেয়েছো। হবেও বা। কিন্তু রাতের কয়েকটা ফুলের গন্ধ তো আমি চিনি ! এ সেরকম না। এ যেন কিরকম একটা রহস্যময়, বিশাল, অজানার গন্ধ। গন্ধটা বাইরে থেকে আমার ভেতরে ঢুকে গেল, আচ্ছন্ন করে দিল আমাকে। যেন আমি আর আমি নেই, আমার ভেতরে যেন আর কেউ এসে আস্তে আস্তে বসছে। অনেকক্ষণ আমাদের বাড়ির একফালি ছাতে পায়চারি করতে করতে সেই রাত-কিশোর, সেই অজানার গন্ধ, সেই নিজের ভেতরে অন্য কারুর পা টিপে-টিপে প্রবেশ সব বোঝবার চেষ্টা করতে লাগলুম। উপভোগও করতে লাগলুম। তারপর যখন মনে হল এইভাবে আমি একেবারে হারিয়ে যাচ্ছি, তখন হঠাৎ যেন খেলা ভেঙে দিয়ে হেরো খেলুড়ির মতো দুড়দাড় করে নিচে নেমে এলুম। দুড়দাড় করে বললুম বটে কিন্তু সেটা আমার ভেতরের তাড়ার কথা ভেবে। আসলে আমার পায়ের শব্দ হয় না। শব্দ না করে কীভাবে চলতে হয়, নিঃশব্দে কীভাবে হাসতে হয়, বা খুব বেশি হাসি পেলে আঁচল দিয়ে তাকে আড়াল করতে হয়, কীভাবে না চেঁচিয়ে কথা বলতে হয় এ আমার হিতৈষিণীরা কতদিন ধরে শিখিয়েছিলেন।

নিচে নেমে দেখি ওরা তিনজনে মিলে খুব গল্প আরম্ভ করে দিয়েছে। ওদের খেয়াল নেই ঘড়ির কাঁটা এগারটার দিকে যাচ্ছে। খুব তর্ক-বিতর্ক হচ্ছে। যদিও তার মধ্যে রাগারাগি নেই, কিন্তু বেশ তীব্রতা আছে। রবি, বিলু আর রিণি।

বললুম—'কি রে, খাবি না ?'

—'এই তো তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলুম। তাড়াতাড়ি তোমার খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকোও তো ! আজ একটা দারুণ লেট নাইট ফিল্ম আছে।'

—আমার গলায় উদ্বিগ্ন প্রতিবাদ উঠে এল, ভেতরে যেটা খুব উদ্বিগ্ন, বাইরে অবশ্য সেটা খুব নরমভাবে বেরোয়। ছবিটা আমি জানি, বড্ড বেশি এ-মার্কা। তিন ভাইবোনের একসঙ্গে বসে দেখবার নয়। থাকতে পারলুম না, বলে ফেললুম—'ওই ছবিটা আর না-ই দেখলি !'

ওরা তিনজনে হেসে উঠল সমস্বরে। রবি, বিলু আর রিণি। আমার তিন ছেলেমেয়ে। বড় রবি বাইশ। মেজ বিলু কুড়ি। আর ছোট রিণি সতের। রবি, নতুন-চাকরি-পাওয়া রবি বললে—'মা, তুমি এখনও ছেলেমানুষ আছ ! খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ো।' শোনো কথা, আমি রবির প্রায় ডবল বয়সী, আমি হলুম গিয়ে ছেলেমানুষ, আমাকে অ্যাডাল্ট ছবির আওতা থেকে বেরিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে হবে। আর ওঁরা তিনজন পূর্ণবয়স্ক বাইশ, কুড়ি, সতের নিশ্চিন্তে রাত দেড়টা কি দুটো পর্যন্ত ছবিতে নর-নারীর জীবনের যতেক গোপনতার উদ্‌ঘাটন দেখবেন বসে বসে। খাবার জন্যে যে ছোট্ট জায়গাটা রান্নাঘরের সামনে রয়েছে সেইখানেই ছোট্ট টিভিটা বসানো আছে। আমি ওদের রুটি আর ডিমের ঝোল বেড়ে দিয়ে নিজের খাবারটা নিয়ে টিভির দিকে পেছন ফিরে বসলুম। খেতে খেতেই বোধহয় ছবিটা আরম্ভ হবে। গোড়াতেই একটা বেডরুম সিন দিয়ে আরম্ভ। যাই হোক, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খেয়ে নিয়ে ছেলেমানুষ আমি ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লুম। জানি না কখন রিণি এসে আমার পাশে শোবে। হয় ফিল্ম শেষ হলে, নয় তার আগেই, ওর যদি ভাল না লাগে।

শুয়ে শুয়ে আমার ঘোর আসতে লাগল, আর ঘোরের মধ্যে আমি রবির গলা শুনতে পেতে লাগলুম,—সামান্য একটু হাসি মেশানো গলা 'মা তুমি এখনও ছেলেমানুষ আছ।' মা এখনও তুমি ছেলেমানুষ..ছেলেমানুষ কথাটা আমাকে ধাক্কা দিতে লাগল। আমি কখনও ছেলেমানুষ ছিলুম, যে ছেলেমানুষ থাকবো ! হঠাৎ মনে পড়ে গেল মামার বাড়ি গিয়ে খাটের তলায় শুয়ে 'ক্রৌঞ্চ-মিথুন' বলে একটা বই পড়ে আমার কী বমি পেয়েছিল, তারপর আমার মাসতুত বোন যে নিয়মিত নিষিদ্ধ বইয়ের সরবরাহ করে যেত, সে আমার অবস্থা দেখে বেরসিক বলে বই দেওয়া বন্ধ করল। আমিও বেঁচে গেলুম। কিন্তু আরও একটা ভীষণ মজার ঘটনা ঘটেছিল। আমার এক স্কুল-টিচার দিদি আমাদের ভালো ভালো গল্প, উপন্যাস, রম্য রচনা পড়ে শোনাত। কিন্তু যতবড় উপন্যাসই হোক আমাদের হাতে কখনও ছাড়ত না। আমি আর আমার একে বোন মিলে শেষকালে ঠিক করলুম দিদির অনুপস্থিতিতে বই খুলে দেখতে হবে—কেন ! তক্কে তক্কে রয়েছি। দিদি স্কুলে চলে গেছে। দুপুর বেলা দিদির আলমারির চাবি যোগাড় করে বার করলুম সেই বই—'ঝিন্দের বন্দী'। পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছি, অবশেষে আমার বোন বলে উঠল—'পেয়েছি।' গৌরীশংকর আর কস্তুরীর প্রেমের দৃশ্য। একটুখানি। সেইটুকু দিদি সাবধানে বাদ দিয়ে গেছে। তখন

আমাদের চোদ্দ পনর বছর বয়স। দুজনে হেসে কুটিকুটি। এইভাবে 'ইছামতী'র নিস্তারিণীর অবৈধ প্রেমকাহিনী এবং 'ভবানী তখন তিলুকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন' গোছের একটা লাইনও খুঁজে বার করেছিলুম। আর হেসে কুটোপাটি হয়েছিলুম।

একদিন আমার মেজছেলে বিলু এসে বলল—'মা হাজার পাঁচেক টাকা পাবো ?'

—'কেন রে ?'

—'আমরা কয়েক বন্ধু, তুমি তাদের চেনো। অলক, সামন্ত, টুটুল আর রুমি, ছবি করব ঠিক করেছি।'

—'ছবি করবি ? ছবি ?'

—'মানে ফিল্ম, ডকুমেণ্টারি করে সেল করব।'

—'সে কি রে ? কোনদিন এসব বিষয়ে কিছু জানলি না, হঠাৎ ফিল্ম অমনি করলেই হল ? তাও আবার পাঁচ হাজার টাকা! পাঁচ হাজারে ফিল্ম হয় নাকি ?'

—'ওহ, মা, য়ু নো নাথিং। আমার বইয়ের র‍্যাকে যে ম্যাগাজিন আর বইগুলো আছে একটু উল্টে পাল্টে দেখো? টুটুল আর রুমির পুনের ট্রেনিং আছে। অলক রবীন্দ্র ভারতীর ফুল কোর্স করেছে। সামন্তর অনেক টাকা। আমার ইম্যাজিনেশন। তাছাড়া যে যেরকম পারি টাকা দেবো। আমি তো জানি তুমি পাঁচ হাজারের বেশি চাইলে হার্ট ফেল করবে তাই....'

—'তো কিসের ওপর ছবি করবি !'

—'শের।'

—'সে কি রে ? চিড়িয়াখানার বাইরে কোনদিন বাঘা সিঙ্গি দেখেছিস ? বাঘের ওপর ছবি করবি কি রে ? মাথা খারাপ। ও সব মতলব ছাড়ো বিলু।'

বিলু বলল—'উঃ, মা, তুমি একটা ইমপসিব্‌ল্‌, শের মানে উর্দু কবিতা, আজকাল হায়েষ্ট ফ্যাশন, অর্ডার অব দ্য ডে। সেই কবিতার ওপর করব ! হয়েছে তো ? দাও এবার টাকাটা দাও। তুমি বড্ড ব্যাকডেটেড মা !'

পাঁচ হাজার টাকা ওকে দিলুম। টাকাটা জলে দিচ্ছি ভেবেই দিলুম। কিন্তু মাস ছয়েক পরে ও টাকাটা আমাকে ফেরৎ দিল। ভীষণ ব্যস্ত গলায় বলল—'এবার মা কেরলের দিকে যাব, ট্যুরিজমের একটা কাজ পেয়েছি। ট্যুরিজমের একটা কাজ যদি ভালো করে করতে পারি তো একেবারে চেইন ! পর পর পর পর পেয়ে যাব ! এইবার প্রফিট আসতে শুরু করবে !'

'ছেলেটা আমার বি.এস-সি পাশ করে বসেছিল। এম. এস-সি তে চান্স পায়নি বলে কয়েক মাস খুব গোমসা মুখে ঘোরাফেরা করত। আমি মনে মনে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। তারপর কবে যে কি সব যে ট্রেনিং ফেনিং নিল, বন্ধুদের সঙ্গে মিলে পরামর্শ করতে আরম্ভ করল খেয়ালই করিনি। আমি বললুম—'হ্যাঁ রে পরের বছর এম.এস-সি'র জন্যে চেষ্টা করবি তো ?'

বিলু বলল—'ওহ্ মা, কারেন্ট ইয়ারের ছেলেরাই চান্স পাচ্ছে না। তার আগের বছর!

ও সব ছাড়ো তো! তুমি না বড্ড ব্যাকডেটেড। এম.এস-সি পড়ে কী হয়? কিস্যু হয় না।'

সুটকেস গুছিয়ে, রুকস্যাক ঘাড়ে নিয়ে পরদিনই দেখি বেরিয়ে যাচ্ছে—মা কবে আসব বলতে পারছি না !

বললুম—'সে কি রে ? এই কোত্থেকে এতদিন পর ঘুরে এলি। এক্ষুণি আবার চলে যাচ্ছিস ? কদিন একটু জিরিয়ে গেলে পারতিস।'

'বিলু টান-টান হয়ে উঠে দাঁড়াল জুতোর ফিতে বেঁধে। তারপর বলল—'পান চিবোতে চিবোতে পকেটে টিফিনকৌটো নিয়ে ধীরে-সুস্থে আপিস যাবার দিন চলে গেছে মাম্মি। য়ু আর হোপলেসলি ব্যাকডেটেড।' গটগট করে বিলু চলে গেল।

কথাটা ওর মুখে কয়েকবারই শুনলুম—ব্যাকডেটেড, ব্যাকডেটেড। টু ব্যাকডেটেড। হোপলেসলি ব্যাকডেটেড।

একটা লম্বা বারান্দা আমাদের চলে গেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে। বড্ড সরু। কাপড় শুকোতে দেবার জন্যে ব্যবহৃত হয়। আর রাজ্যের পায়রা ওপর থেকে বকম বকম করে বারান্দাটা নোংরা করে। ঝুলঝাড়া দিয়ে তাড়াবার চেষ্টা করলেও যায় না। তখনকার মতো চলে গেলেও আবার রাতে ফিরে এসে বক বকুম, বকুম, কুম, বকুম কুম, করতে থাকে। সকালবেলায় বারান্দাটার আগাপাশতলা আমায় ধুতে হয়। পায়রাগুলো ফিরে আসলে আমার ভাল লাগে। কি রকম ঘুমপাড়ানিয়া, সুখজাগানিয়া পায়রার ডাক। বাকুম, কুম, কুম বাকুম, বাকুম। যেন ডাকটা মুখ ফুটে বেরোয় না। গলার কাছেই আটকে থাকে। আমার ভাল লাগে। আমাদের বাড়িতে অমনি পায়রা ভিড় করে থাকবার জায়গা ছিল। দুপুরে সারা দুপুর ঝটপট ঝটপট, বাকুম, বাকুম, রাত্তিরেও ঝটপটাপট মাঝে মাঝে, আর কুম কুম কুম। যদি ছেলেমেয়েরা জিজ্ঞেস করে—পায়রার ডাক তোমার ভাল লাগে কেন ? ওরা ফিরে এলে খুশি হও কেন ? কেন ? কেন ? তা হলে কি বলব ? জবাবটা ভেবে রাখতে গিয়ে এইসব কথা আমার মনে এসে যায়। ওরা স্মৃতিজাগানিয়া পায়রা। সুখস্মৃতি। যখন মা বাবা, ভাই বোন। যখন স্কুল, গান, মুগ্ধ দিদিমণি, যখন দিদিমা, আদর, পান মুখে দিয়ে ধীরে সুস্থে অফিস যাওয়া—টিফিনে আজ লুচি, আলুর দম, তোদের চিংড়িমাছ দিয়ে পেয়াজকলির চচ্চড়ি আছে। কি আনবো অফিস-ফেরতা ? কি আবার আনবে, ফলফুলুরি যদি কিছু সুবিধের মধ্যে পাও। পেয়ারা পাতায় নুন তেল দিয়ে দাঁত মাজ, ঝকঝক হবে। হাসলে দাঁত ঝিকঝিকিয়ে উঠবে, রেলগাড়ি চলে গেল—ঝিক ঝিক ঝিক ঝিক ঝিক ঝিক ঝিক কু.....উ.....উ। তাই আমি পায়রাদের ফিরে আসা পছন্দ করি। আমার তো ভবিষ্যৎ নেই। আছে শুধু রোমন্থনের অতীত। আর বর্তমান। বর্তমান ! বারান্দায় দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকালে আকাশটাকে, শহরের রাস্তাঘাট, বাড়ি-টাড়ি কেমন কাটা-ছেঁড়া লাগে। যেন অপারেশনের রুগী। কাটা ছেঁড়া হয়েছে, সেলাই এখনও হয়নি। কোনদিন হবে কি না জানিও না। আমাদের গলিটা আঠার ফুট মতন। মাঝে মাঝে হাঁড়ল গর্ত। দু-তিনটে বাড়ি বাদ দিয়ে এক এক জায়গায় আবর্জনার স্তূপ জমে আছে—তরকারির খোসা, মাছের আঁশ,

ছেঁড়া কাগজ, ন্যাতা কাঁ্যাতা, আরও সব জঘন্য নোংরা, অদূরে মানে বড় রাস্তার ওপর বেশ কয়েকটা লম্বা বাড়ি উঠেছে। ছ তলা, আট তলা। ফলে আরও দূরেব দিকে তাকিয়ে যে বড় রাস্তায় গাড়ির চলা, মানুষজনের অবিরাম চলাফেরা, দোকানের আলো এ সব দেখতে পাব তার জো নেই। ঝকঝকে বাড়িগুলো। পিনু মানে পিনাকী, আমার মামাতো দেওর, ওদের বাড়িটা আর দেখা যায় না। আমার এক ননদ কাছেই থাকেন, ওঁদের উঠোনে লম্বা তারে ধুতি শাড়ি শুকনো তা-ও আর দেখা যায় না। উঁচু, ঝকমকে বাড়িগুলো পাশে যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে চাইছে, মিয়োনো, দোতলা-তেতলাগুলো। শ্যাওলা ধরা, গাছ-গজানো, জানলার পাল্লাগুলো খাপছাড়াভাবে রং করা। ও মা ! একটা ছ' তলা তো রুবিদের বাড়ির ওপরই উঠেছে মনে হচ্ছে, তা হলে রুবিরা কোথায় গেল ? যাঃ, আজকাল কেউ কারও খেয়াল রাখে না। কবে যে রুবিদের ওপর অমনি তেধেড়েঙ্গে একটা বাড়ি উঠল আমি জানিই না। খুব ব্যস্ত হয়ে ডাকি 'রিণি রিণি', রিণি ঘরের ভেতব কি ম্যাগাজিন পড়ছিল, উঠে এসে বলল—'কি মা ? কী হয়েছে ?'

—'রুবিরা কোথায় গেল ? রুবিদের বাড়ির ওপর...?'

—'কী আশ্চর্য ! রুবিরা ওখানেই আছে। ওর ভেতরেই ওদের ফ্ল্যাট দিয়েছে। বড় রাস্তার দিকে মুখ করে ওদের ফ্ল্যাটটা তো তাই দেখতে পাও না।'

—'এত ভাববার কী আছে ! তুমি না ...'

'আমি একটা বিশেষণের জন্যে অপেক্ষা করি। কিন্তু রিণি তার কথা শেষ করে না।' না বলে একটা টান দিয়েই অসমাপ্ত ম্যাগাজিনের কোলে ফিরে যায়। নাঃ। আমার সামনে লম্বা লম্বা বাড়ি। দৃষ্টি রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে তাকিয়েও কোনও লাভ নেই। আশপাশে হাঁড়ল গর্ত।

আবর্জনা, মোটরবাইকের গরগর, রুকস্যাক, চকচকে ম্যাগাজিনের মধ্যে রক্তের ফোয়ারা নগ্নপ্রায় নারী, ভিখারী শিশুর পাঁজরের ছবি। তাহলে আমি পায়রাদের দিকে ফিরব না কেন? বাক বাকুম, বাকুম, কুম, কুম—উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রার পিঠে চড়ে আমি সূর্যের উজ্জ্বল রৌদ্রে কেন নিচু আকাশ দিয়ে ছেৎলাপড়া, বেমানান রঙের বাড়ি আর বহুতলের অ্যানটেনাসঙ্কুল জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে উড়ে যাবো না চঞ্চল পাখনায় যেখানে মুগ্ধ দিদিমণি, সব পেয়েছির আসর, ডালে সম্বরার গন্ধ আর কু ঝিক ঝিক, ঝিক ঝিক, ঝিক...। শুধু যদি ওরা বারান্দাটা এমন করে নোংরা না করত ।

রিণি বলল, 'মা তুমি চাটা খুব ভাল করো। কিন্তু কফিটা ঠিক এসপ্রেসো হয় না। তুমি সরো। আমি করে নিচ্ছি।'

ডিমগুলো ও আগেই ভেজে নিয়েছে। কী সুন্দর টোপর হয়ে ফুলছিল ওমলেটগুলো। বেকিং পাউডার দিল। ডালের কাঁটা দিয়ে খুব করে ফেঁটালো, ভেতরে পেঁয়াজকুচি, চীজের টুকরো আর টোম্যাটো কুচি দিয়ে কী সুন্দর ভাঁজ করে ফেলল। নন-স্টিক প্যানে কী চটপট হয়ে গেল। একটু হলদেটে সাদা। যেন কাঁটালি চাঁপার রঙ। প্যানটা রবি প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই কিনে এনেছে। কী রকম দৃষ্টি দেখ। জামা না, শাড়ি না, একটা নন-স্টিক

প্যান। কী সুবিধেই যে আমার হয়েছে ! আমার ছেলে, তালে-গোলে যে বড় হয়ে উঠেছে সে এইরকম বিবেচক হবে আমি ধারণাই করতে পারিনি !

আমি সরে এলুম। দেখলুম রিণি প্রত্যেকটা কাপে কফি চিনি সঙ্গে সামান্য দুধ-মেশানো জল দিয়ে প্রাণপণে ফেটাচ্ছে, কেমন সুন্দর ওপর থেকে গরম দুধ-জল ঢালছে চামচ নাড়তে, নাড়তে, আর আধ ইঞ্চি করে ফেনা উঠেছে কাপের ওপর। ঠিক দোকানের মতো। কাপ-প্লেটগুলোও খুব সুন্দর, পাতলা, বিলু যাবার সময়ে কিনে দিয়ে গেছে। মিষ্টি না, শাল দোশালা না, একটা চমৎকার টিসেট। রিণি ট্রে বয়ে নিজেই নিয়ে গেল, আজ ওর ক'জন বন্ধু এসেছে। তারা ঝুপঝাপ মাসি-মাসি করে আমায় পেন্নাম ঠুকলো, একজন খুব বাবার সঙ্গে বিদেশে ঘোরে সে গালে চকাস করে চুমু খেল। তারপর ওরা গল্পে মেতে গেল। পিরভা করণ, ইকোলজি, অলটারনেটিভ এনার্জি, সুষীম চৌধুরীর ডাঁট ভাঙতে হবে, উইকলিটা দারুণ, ইস্‌স্‌ শেরগিলের লাইফ...। 'এই সমস্ত ছেঁড়া-ছেঁড়া কথা আমার কানে এল। কিচ্ছুই বুঝতে পারলুম না। কিন্তু রিণিটা আগে রান্নাঘরের ধার মাড়াত না। আজকাল এত ভাল পারছে ও এসব ! আজ ওর খন্তি ধরা, প্যান ওল্টানো, ওমলেট ভাঁজ করবার কায়দা, কফির জল একবার নামানো একবার বসানোর ধরন, গ্যাসের নবটা চট কর সিম করে দেওয়া, আবার বাড়িয়ে দেওয়া—এ সব দেখে আমি তাজ্জব বনে গেলুম। যে রিনিটা....। আজ এত ভাল পারছে ! আশ্চর্য ! কোনও আলাদীনের দৈত্যকে তো আমি পুরনো পিদিম ঘষে ডাকিনি ! বলিনি ওদের স্বাবলম্বী করে দাও। ওদের বিবেচক, বুঝদার করে দাও ! বলিনি তো আমি আর পারছি না। জীবনের এতগুলো বছর কোথা দিয়ে কেটে গেল বুঝতে পারিনি, হে দৈত্য আমায় মুক্তি দাও। 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর হল্লার রাজার মত আমার ছুটি-ছুটি-ছুটি....ছুটি করে বাড়িময়, ছাতময়, রাস্তাময়, ময়দানময়, পৃথিবীময় এলোপাথাড়ি ছুটে বেড়াতে ইচ্ছে করল।

এতক্ষণ রিণির বন্ধুরা এসে বসে আছে। রিণিকে সাহায্য করতে হবে বলে গা ধুতে যেতে পারিনি। এবার গেলুম। বাথরুমে দাড়ি কামানোর সুবিধের জন্যে রবি একটা বড় আয়না লাগিয়েছে। তাইতে আমার বুক পর্যন্ত পুরোটা দেখা যায়। মুখখানা ভাল করে দেখলুম। অন্য দিনও দেখি। চুল বাঁধতে দেখি, দাঁত মাজতে দেখি, মুখে সাবান দিয়ে সাবান ধুয়ে দেখি। রোজকার অভ্যেসের দেখা। কিন্তু আজকের দেখাটা অন্যরকম। দেখতুম একজন প্রাপ্তবয়স্ক তিন ছেলেমেয়ের প্রৌঢ়া বিধবা মাকে। আজ দেখলুম তেতাল্লিশ বছরের একজন মানুষকে, যে প্রকৃতির কোন রহস্যময় খেলায় বা নিয়মে মানুষ মেয়ে। এবং আবারও জীবনের কোনও অমোঘ চাঞ্চল্যকর নিয়মে বা খেলায় যে একই সঙ্গে ছেলেমানুষ এবং ব্যাকডেটেড। দেখলুম আমার আধা-ফর্সা রঙে একটা কালচে ছোপ পড়েছে। শীতকালে যেমন সমস্ত গাছপালার ওপর পড়ে, চুলগুলো আমার এখনও, অনেক অযত্নেও অনেক, অনেক। পাকা-টাকা দেখতে পেলুম না। আমার যে বয়স তার থেকে মাত্র আর চার বছর বেশি বয়সে ঠাকুমা আপাদমস্তক বুড়ি হয়ে মারা গিয়েছিল। গরমের ছুটির দুপুরে তাঁর পাকা চুল তোলার কথা আমার খুব মনে পড়ে। আমার চিবুকের ডানদিকে একটা তিল।

তারপর দেখলুম একটু দেরি হয়ে গেলেই বড্ড চেনা মুখের সঙ্গে দেখা হয়ে যাচ্ছে। মাসি, কাকি, চিনুদি, আরে ! কখনও তো দেখিনি ! দ্যাটস ভেরি গুড ! ইত্যাদি ইত্যাদি। তাছাড়া আমার পায়ের পেশীগুলো বেশ টাইট হয়ে গেছে। আমার এখন দৌড়তে ইচ্ছে করে। টেনে দৌড়। কিন্তু ওই ভাইপো-ভাইঝি, ভাগ্নে,-ভাগ্নি, বোনপো-বোনঝি, ছোটভাই ছোটবোনদের সামনে দৌড়তে আমার কেমন যেন কেমন-কেমন লাগে। এদের মধ্যে কেউ একজন রবি-রিনিকে বলে দিয়ে এলেই হল তোদের মা'র মাথাটা দেখা। গোলমালের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। তাই একদিন সবচেয়ে ভোরবেলার বাসে চড়ে আমি প্যাঁ প্যাঁ করে ভিক্টোরিয়ায় পৌঁছে যাই। সে-ও এক রকম দৌড়। খালি রাস্তা পেয়ে বাস-ব্যাটা বোঁ, বন বন করে ছোটে, আমার কানের পাশের চুলগুলো শাঁ শাঁ করে পেছনে উড়তে থাকে, মুখের ওপর দুরন্ত দস্যি হাওয়ার ঝাপট, মাঝে মাঝে অতর্কিত ব্রেক কষার জন্যে একটু সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ি। ভোরের বাস, যাত্রী বিশেষ নেই। কণ্ডাক্টর এগিয়ে এসে বলে 'দিদি লাগল না তো ! এই ডেরাইভার, শালা রঘুনাথ, থোড়া দেখকে চালা না বাবা, দিদির যে লাগল।'

ভিক্টোরিয়ায় ভারি অদ্ভুত দৃশ্য। ঠিক হিপোপটেমাসের মতো একটি দুটি মাংসপিণ্ড, স্পোর্টস গেঞ্জি আর শর্টস পরে, ম্যামথের শুঁড়ের মতো থাই নাচিয়ে নাচিয়ে দৌড়চ্ছেন। ছোটার তালে তালে থাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জায়গায় অতিরিক্ত মেদ চর্বিগুলোও কত্থক নাচছে, দুনি তালে। বেশ কিছু মহিলাকেও দেখলুম একদম সীলমাছের মতো, কি সিন্ধু ঘোটকের মতো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে দৌড়চ্ছেন আর দরবিগলিত ঘর্মধারা মুছে যাচ্ছেন। এঁদের কাছে আমি শিশু। হিমালয়ের পাশে নেংটি ইঁদুরের ছানা। সুতরাং এক নং পুকুর অর্থাৎ, ক্যাথিড্রাল রোডের দিকের পুকুরটার পাশ দিয়ে মোটা মুটি বেড় দিয়ে দৌড়তে থাকি, এক পাক দৌড়ে অশ্বারোহী মূর্তির তলায় বসি, আবার দৌড়ই। আমার পাশ দিয়ে নতুন ওঠা ঘাস আর জলের গন্ধ বয়ে হাওয়া শনশন করে আমার পাশে পাশে দৌড়য়। বলে চিনু, চিনু, আর একটু জোরে, আর একটু....তোমার উড়ন তুলোর গুছিগুলো পেয়ে গেলেও যেতে পারো। আর যদি আরও জোর পারো, তাহলে একেবারে চাঁদের মা বুড়ির দেশে তোমায় পৌঁছে দিয়ে আমি সত্যি সত্যি হাওয়া হয়ে যাব। তারপর দুই ডুবে তুমি কী নেবে না নেবে সে তোমার ব্যাপার ! তুলোর পেটরা চাও না অলঙ্কারের প্যাঁটরা চাও না রাজকুমারের প্যাঁটরা চাও সে তোমার ব্যাপার। আমি দৌড়তে দৌড়তে বলি, আগে তো ছোটার জন্যে ছুটি, তারপর হাওয়া তোমার সঙ্গে আমার প্রতিযোগিতাহীন প্রতিযোগিতা, কেননা তোমাকে তো আমি সত্যি সত্যি হারাতে পারব না। তবে তুমি যদি একটু ভালবেসে আমার সহ-দৌড়বাজ হও তো চাঁদের মা বুড়ির তুষারশীতল, মন-প্রাণ-ঠাণ্ডা করা শান্তির দেশে একমাত্র জীবিত মানুষ হয়ে উজ্জীবিত কিশোরী হয়ে আমি প্রবেশ করলেও করতে পারি বটে। তারপর বর, প্যাঁটরা ও সব আমার ব্যাপার। একটা মুশকিল হতে লাগল, অন্য যাঁরা দৌড়তে আসেন—বেশিরভাগই গাড়ি চড়ে। কাজেই অদ্ভুত বেশে বাড়ি ফিরে যাওয়ার তাঁদের কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু ফেরবার সময়ে ট্র্যাকসুট পরে আমার ট্রামে-

বাসে একটু অসুবিধে হয়। আর একটা মুশকিল আমার মোটা বেণীটা, ছোটবার সময়ে শপাং শপাং করে আমার পিঠে চাবুক মারে। ভেবে-চিন্তে চুলটা কেটে অর্ধেক করে ফেললুম। পেছনে শক্ত করে একটা ঝুঁটি বেঁধে নিই। একজন বয়স্ক মহিলা আসেন মুর অ্যাভেন্যু থেকে। অশ্বারোহীর তলায় বসে তাঁর সঙ্গে ভাঙা হিন্দি আর ভাঙা ইংরেজিতে ভাব জমিয়ে ফেললুম। ফেরবার সময়ে তিনিই আমায় আমার গলির মোড়ে ছেড়ে যান। ভদ্রমহিলার মহা চিন্তা। ডাক্তার দু-স্লাইসের বেশি রুটি দিচ্ছে না। ক্লিয়ার চিকেন স্যুপ। দু টুকরো চিকেন, কচি মাছ পঞ্চাশ গ্রাম, বাঁধাকপি আর জল খেতে বলেছে। খিদে পেলেই জল। নো চকলেট, নো আইসক্রিম, নো ফ্রুটস বাট কিউকামবার, অ্যাণ্ড টী উইদাউট মিল্ক অ্যাণ্ড শুগার। আই অ্যাম সো ফণ্ড অফ পোট্যাটোজ—ইনি এনি ফর্ম। হী ডাজন্‌ট লেট মী হ্যাভ ইভন এ হ্যাণ্ডফুল অফ গ্রেপস। হাউ মেনি টাইমস ক্যান ওয়ান হ্যাভ গ্রেপফ্রুট জুস ? ভদ্রমহিলা ককাতে থাকেন। সবেতেই নাকি প্রচুর প্রচুর ক্যালোরি। তাঁর ব্লাড শুগার তিনশ পঁয়ত্রিশ। হার্টে মেদের চাপ পড়ছে। ডাক্তার বলেছে ইদার য়ু ফলো দিস রেজিমেন অর য়ু ডাই। ভদ্রমহিলা আমার পরামর্শ চান কোনটা গ্রহণ করবেন। আমি দ্বিতীয়টা অপছন্দ করি না। কিন্তু সে কথা তো তাঁকে বলা যায় না। তাঁকে প্রাণপণে বোঝাতে থাকি শাক খান, শাকে মিনার‍্যালস আর ভিটামিন আছে। তিনি নিশ্চয় রোগা হবেন। ব্লাড শুগার কমবে, প্রেশার কমবে। একটু-আধটু আলুভাজা, আম, আঙুর, এইসব তাঁর প্রিয় জিনিস খেতে পারবেন। তবে হ্যাঁ বুঝেসুঝে।

আর একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। কোন বড় কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর। আমাকে বললেন আই টেক ইন্‌স্‌পিরেশন ফ্রম ইউ। তুমিও নিশ্চয়ই একদিন আমারই মত ছিলে—ডাক্তারের পরামর্শ মতো খেয়ে আর ছুটে ছুটে এখন এত সুন্দর স্লিম হয়ে গেছ। ইয়োর স্কিন ইজ গ্লোয়িং। য়ু আর লুকিং লাইক আ বাডিং অ্যাথলিট।

আমি ভদ্রলোকের ভুল ভাঙিয়ে দিই না। আমি যে কোনদিনই তাঁর মত কুমড়োপটাশ ছিলুম না, শুধু ছিলুম কিছুটা আকারহীন, থপথপে থলথলে, সেটা তাঁর কাছে ভাঙি না। চুপ করে হেসে যাই। তিনি অবশ্য দূরের দিকে দুঃখিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন—'বাট ইউ আর ইয়াং। লেট টোয়েনটিজ কি আর্লি থার্টিজ-এ যা পারা যায়, তা কি আর ফিফটিজ-এ হয় ?' আমি চমকে উঠলুম। গ্লোয়িং স্কিন, বাডিং অ্যাথলিট, লেট টোয়েনটিজ, এসব আমায় চমকে দিল। কিন্তু এখনও আমায় আরও দৌড়তে হবে।

আলমারির গায়ে লম্বা আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি। শায়া, ব্লাউস, ধনেখালি সরু পাড় শাড়ি, না কুঁচিয়ে পরা, তা সত্ত্বেও আকার বোঝা যাচ্ছে। মুখের চামড়া টান টান হয়ে আছে, যেন পাতলা করে কিছু ক্রিম মেখেছি। চুলগুলো, দাঁত সব ঝকঝকে করছে। চলতে ফিরতে পারি যেন হাওয়ায় ভেসে, বাঁক নিতে উঠতে বসতে কোনও কষ্ট নেই। একদিন দরজায় বেল শুনে তুরতুর করে নেমে দরজা খুলতে যাচ্ছি দেখে, রিণি মন্তব্য করল—'মা তোমার কী হল ? হুমড়ি খেয়ে পড়ে এবার একটা কাণ্ড করবে দেখছি ?' আমি তাড়াতাড়ি সামলে নিই।

এরপর আমি যোগ আর সাঁতারে ভর্তি হই। সেই সঙ্গে লাইব্রেরিতে। সাঁতার আমি চিৎ উপুড় সব জানি। ওসব আমায় শেখাতে হবে না। যোগও আমার অল্পবয়সে অভ্যেস ছিল। সাধা গলায় গান তুলে নেবার মতো, এতেও কোনও অসুবিধে হয় না। শুধু দৌড়টা সম্পূর্ণ করবার জন্যে এসব করি।

তারপর একদিন দোকানে গিয়ে দরকার মতো কিছু কেনাকাটা করি। সুটকেস গুছিয়ে নিই। হাতব্যাগ গুছিয়ে নিই। রাত্তিরবেলায় ছেলে-মেয়েকে খেতে দিয়ে, নিজে খেতে খেতে বলি,—'রবি চেকবইটা রাখ। হঠাৎ যদি দরকার হয় তুলবি। রিনি, দুজনের মত একটু রান্না করে নিতে পারবি না ? রবিও সাহায্য করবে।' ওরা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকায় হলে—'কেন ? কী ব্যাপার ? তুমি কোথাও যাচ্ছ ?'

—হ্যাঁ, কাল ভোরের ট্রেনেই।

—সে কি ? কে সঙ্গে যাবে ? এক একা কোথায়...কেন ! নিরুদ্দেশ হচ্ছো নাকি? কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হবে ? টিভি-তে ছবি ? কী করেছি আমরা ?

আমি হেসে বললুম—'এতগুলো প্রশ্নের জবাব কি করে দিই বল তো ? আমার সঙ্গে কাউকে যেতে হবে না। আমি একাই পারবো। না, নিরুদ্দেশ হচ্ছি না। বড় জোর মাস ছয়েক। নিয়মিত চিঠি দিয়ে যাব। ভাবিস না। না তোরা কিছু করিসনি। আবার করেছিসও। ভাল করেছিস। কোথায় যাচ্ছি ?'

—'বলব না।'

—'এত রহস্য কেন ? মা তুমি কি চুপিচুপি কাউকে খুনটুন করে পালাচ্ছো ?' রিনি বলল।

—'মা, ডোণ্ট মাইণ্ড, ইলোপ-টিলোপ করছ না কি কোনও মামু কাকুর সঙ্গে ?'

—রবি বলল।

আমি বললুম—'যতই কেন আমায় ক্ষেপাও আর তাতাও, আর একটা কথাও আমার মুখ দিয়ে বার করতে পারবে না। এইটুকু শুধু বলছি ভাবনার কিছু নেই। মাস ছয়েকের মধ্যে ফিরে আসব। চিঠি পাবে। তোমাদের যদি কিছু বিপদ-আপদ হয়, বাংলা কাগজে বিজ্ঞাপন দেবে। না হলে আমি সময় হলেই ফিরে আসব।'

লেকের কিছু কিছু গাছ চিনতুম। কিন্তু ভিক্টোরিয়ার বাগানে প্রায় কোন গাছই চিনতুম না—সর্বজয়া বা ক্যানার ঝাড় ছাড়া। গাছ প্রদীপের মতো দুধারে লালচে শক্ত শক্ত পাতা মেলে দাঁড়িয়ে থাকত ও কী গাছ ? জানা ছিল না। গাছটা দেখলেই আমাব মনের মধ্যে শত শিখায় প্রদীপ জ্বলে উঠত। গুঁড়ি গুঁড়ি পাতায় কুয়াশার মতো ওটাই বা কী গাছ ? যেন রহস্যের ঘোরটোপ পরে আমায় ডেকেই যাচ্ছে। ডেকেই যাচ্ছে। ডাকও নয় হাতছানি। কিন্তু এখানকার সব গাছপালা আমি মোটামুটি চিনি। সকলেই চেনে। কোথায় এসেছি? বলব না। এমন কি কোন ইস্টিশান থেকে কোন ট্রেন ধরে এসেছি সে সবও বলব না। তোমরা ভীষণ চালাক, ধরে ফেলবে। অজ্ঞাতবাসের সময়ে পাণ্ডবেরা কী করেছিলেন ? নিজেদের পুঁরনো পরিচয় মুছে ফেলে অন্য মানষ হয়ে গেছিলেন না ? কাউকে ঘুণাক্ষরেও

জানতে দিয়েছিলেন নিজেদের গতিবিধি ? নিজেদের পরিচয় ? ভীম নিরুপায় হয়ে প্রায় ধরা দিয়ে ফেলেছিলেন আর কি ! যাই হোক কোনও সূত্র আমি কাউকে দেব না। শুধু এইটুকু বলি যে কুঝিকঝিক করে যাওয়া হল না। ভোঁ করে দেবদত্ত কী পাঞ্চজন্যের পিলে চমকানো আওয়াজে চড়ে গিয়েছিলুম।

২

কত কত দিন হয়ে গেছে, তবু আমি এ জায়গায় অন্ধিসন্ধি চিনি। গলির মুখে জোড়া নিমগাছ। পাশ দিয়ে সরু একটা নোংরা গলি বেরিয়ে গেছে। গলির মুখে একটা টিউবওয়েল হয়েছে দেখছি। ডান দিকে অশথ গাছের তলায় গোল একটা পাথব তার ওপর কিছু ফুল বেলপাতা। একটু সাদা সাদা কস গড়াচ্ছে। অর্থাৎ দুধও ঢেলেছে কেউ। যতদিন যাচ্ছে মানুষের দেবতায় ভক্তি ততই বেড়ে যাচ্ছে। জীবনটা বড্ড অনিশ্চিত হয়ে গেছে তো ! ওই তো ইস্টিশানের রেলিং-এর ধার ঘেঁষে মস্ত বড় শিরীষ গাছ। ইসস্ ঠিক তেমনি আছে। হাতির শুঁড়ের মতো কালো নল বেঁকে আছে, ওইখান থেকে এক্সপ্রেস, মেল ট্রেনরা জল নেয়। মাথায় করে ছোট ছোট ঝুড়িতে কয়লা বয়ে ডোঁয়া পিঁপড়ের মত ভঙ্গি তে চলে যাচ্ছে এক সারি কয়লাকুড়ানি। শিরীষ গাছটার পেছন থেকে রিক্সা স্ট্যাণ্ড আরম্ভ হয়েছে। একটা রিক্সাতে উঠে বসে গন্তব্য বলে দিলুম। অমনি হাওয়ায় উড়তে লাগল খোকাটা। আমার বিলুর বয়সী হবে হয়ত। —'এখখুনি পৌঁছে দিচ্ছি ছোড়দি।'

নির্দিষ্ট বাড়িটার কাছে এসে আমি অবাক। পলেস্তারা খসে গেছে। যেখান সেখান থেকে গাছ বেরিয়েছে। দরজা জানলায় রঙ নেই। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। তবু কড়া নাড়লুম। বেশ কিছুক্ষণ নাড়ার পর এক দশাসই চেহারার মহিলা এসে দরজা খুলে দিলেন। খুলেই বললেন—'আমাদের কিছু কেনার নেই, সাবান, পাউডার, ধূপ, সিঁদুর কিছু না। আপনি আসতে পারেন।' দরজা বন্ধ করে দিচ্ছিলেন। আমি বললুম—'এটা ব্রজনাথ সিংঘির বাড়ি না ?'

ভদ্রমহিলা একটু থতিয়ে গেলেন। বললেন—'হ্যাঁ, তো কি ?'

—'আসলে আমি একটা ঘর ভাড়া খুঁজছিলুম। শুনলুন ব্রজনাথ সিংঘির বাড়ি অঢেল জায়গা। আমার একটু স্থান হতে পারে।'

—'তুমি ক্যা ?'

—'আমার নাম চিন্ময়ী চক্রবর্তী। আমি কলকাতায় চাকরি করি। তা ওখানে কোনও হোস্টেলে জায়গা পেলুম না। তাই এই মফস্বল টাউনে এসেছি। একটু থাকবাব জায়গা, আব খাবার ব্যবস্থা যদি হয়। মাসে এক হাজার টাকা করে দেবো।'

—'কি বলল্যা ? হাজার ?' মহিলার মুখ হাঁ হয়ে গেল। বুঝলুম এখনও এই টাউনে টাকার দাম বেশিই আছে। আমি তাড়াতাড়ি বললুম—'আমি কলকাতায় খুঁজছি। পেলেই চলে যাব। মাস ছয়েকের মধ্যেই একটা পাওয়ার কথা আছে।'

—'না না সে কথা বলছি না। বলছি আমাদের ঘর দুয়োর তোমার পছন্দ হবে কেন গো মেয়ে, আমাদের খাওয়া-দাওয়া....'

'আমি বললুম—'এখনও তো দেখিইনি, একটু যদি দেখান।'

—'তুমি কী কর, মেয়ে ?'

চিন্ময়ী চক্রবর্তীর পরনে গোলাপি রঙের সালোয়ার আর সাদার ওপর গোলাপি বুটির কামিজ। একটা সাদা ওড়না বাঁ কাধ থেকে ভাঁজ করা অবস্থায় ঝুলছে। চুলগুলো মাথায় ঝুড়ির মত হয়ে আছে, কপালে ছোট্ট একটা গোলাপি টিপ। নখ সুন্দর করে কাটা। পায়ে কালো স্যাণ্ডাল।

আপাদ মস্তক দেখে নিয়ে প্রশ্নটা করলেন মহিলা। চিন্ময়ী বলল—আমি জার্নালিজম করি। মানে সাংবাদিকতা।'

ভদ্রমহিলা হাঁ করে রইলেন।

বললুম—'খবরের কাগজে লিখি। খবরের কাগজের কাজ করি।'

—'ওরে বাবা, ও পুটু, ধানু, জংলু খবরের কাগজের লোক এয়েছে রে।'

মুহূর্তের মধ্যে বাড়ির ভেতর থেকে এক দঙ্গল ছেলে বার হয়ে এল, এবং একটি মেয়ে। রোগা, পাকানো চেহারা, উল্টোপাল্টা জামাকাপড় পরা, কিন্তু চোখগুলো জ্বলছে, মুখগুলোও বেশ উজ্জ্বল।

—'কী চান। কী চান ?'—একজন বলল।

আরেক জন বলল—'তুই সর বে, কে আমি দেখছি, কোন সালী, কোন বাঞ্চোৎ।

চিন্ময়ী হাত তুলে থামাতে ইঙ্গিত করল ওদের। তারপরে বলল, ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি। পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকবার জন্য এসেছিলুম। এ বাড়িতে অনেক জায়গা আছে, কে একজন মহিলা ভাল রান্না করতে পারেন শুনে। তা আপনাদের এত আপত্তি থাকলে আমি চলে যাচ্ছি।'

পেছন ফিরতে ফিরতে চিন্ময়ী বুঝতে পারল মহিলা ছেলে-মেয়েগুলোকে চুপি চুপি কিছু বলছে। মেয়েটিও কোমরে হাত দিয়ে ডাকল 'এই যে শুনছেন ?'

ফিরে দাঁড়িয়ে চিন্ময়ী বলল, 'কী ?'

—'খাওয়া থাকার জন্যে দিমাকে আপনি হাজার টাকা দেবেন বলেচেন ?'

—'বলেছি।'

—'তো থেকে যান !'

—'এখানে আমার পোষাবে না মনে হচ্ছে'—চিন্ময়ী আবার ফিরে দাঁড়াল।

—কেন ? তিন-চারটে মিশ্রিত গলায় শোনা গেল।

চিন্ময়ী বলল—'এই রকম বে-টে, শালী-টালি, মারমুখো ভাব এসব আমার চলবে না। কে জানে ভেতরে কিসেব আড্ডা। মস্তানি-টস্তানি ; ড্রাগ-ট্রাগ ; সাট্টা-ফাট্টা। থাক আমি অন্য কোথাও খুঁজে নিচ্ছি। অনন্ত ঠাকুরমশায়ের বাড়িটাও তো আছে ?'

ছেলে-মেয়েগুলো সব পেছন থেকে এক দৌড়ে সামনে এসে চিন্ময়ীর পথ রোধ করে দাঁড়াল। —'অনন্ত ঠাকুরের ছেলের বউ মরে গেছে। ছেলে হাত পুড়িয়ে খায়। বাড়িতে তিনটে খোকা-খুকু সব সময়ে খাই-খাই করচে। তোমাকে আস্ত গিলে খেয়ে নেবে।' একজন বলল।

—আর একজন বলল—'হুঃ ড্রাগ ! ফ্যান ভাত জুটলে বেঁচে যাই, শাক সেদ্ধ আর আলুসেদ্ধর সঙ্গে, আবার ড্রাগ ! আর সাট্টা-ফাট্টা রিকশঅলারা খেলে—আমাদের রেস্ত কোথায় ?'

চিন্ময়ীর রিকশাঅলাটা তখনও বোধহয় মজা দেখতে দাঁড়িয়েছিল। মেয়েটা কোমরে হাত দিয়ে তার দিকে এগিয়ে গেল, 'এই মদ্না, তুই সাক্ষী দে না আমরা সাট্টা খেলি না তোরা খেলিস!'—উত্তরে মদনা এবার সাইকেলে প্রাণপণে প্যাডল করতে করতে বেরিয়ে গেল।

—'দেখলেন তো !' মেয়েটা তেমনি কোমরে হাত দিয়ে বিজয়িনীর ভঙ্গিতে বলল।

চিন্ময়ী বলল—'ওই সব শালী-টালি চলবে না আমার।'

—'সরি ম্যাডাম'—একটা ছেলে এগিয়ে এসে বলল—'ও সব আমাদের নিজেদের মধ্যে আদরের ডাক। আর বাইরের পার্টিকে ভড়কাতে খুব কাজে লাগে।'

—'ভড়কাতে হয় কেন ? —চিন্ময়ী একটু কঠোর গলায় বলল।

—'ভড়কাতে...মানে...হয়...এই আরকি !' ছেলেটা স্পষ্ট করে কিছুই বলে উঠতে পারল না। তখন মহিলা এগিয়ে এসে বললেন—'ও হতভাগারা বলতে পারবে নে। আমি বলচি। সিঙ্গি মশাইয়ের ছেলে আমাদের এই বাড়ি দেখাশোনার ভার দিয়ে চলে গেল। বিদেশ থেকে মাসে মাসে ট্যাকা পাঠায়। এই পুটুটা আমার বোনঝির মেয়ে, পটলটা ভাইপোর ছেলে। ওদের কেউ নেই তাই ঠাঁই দিয়েছি। সে কতা তো আর বাবু জানে না। আর এই সব বাকিগুলো, সব হাড়-হাভাতের দল। ছোটলোকের বাচ্চা, সর্বক্ষণ এখানে পড়ে আচে। সোনার নাতি-নাতনি আমার সঙ্গেদোষে বজ্জাত হয়ে যাচ্চে মা। তুমি এখানে থাকো। বিনিবামনীর রান্নার সুখ্যাত শুনে যখন এয়েচ !'

'ছোটলোকের বাচ্চা' পর্যন্ত শুনেই বাকি ছেলেগুলো মুখ আহত অভিমানে অস্বাভাবিক গম্ভীর করে চলে যাচ্ছিল। যেতে যেতে একজন বলল—'চোর বাটপাড় থেকে বাঁচাতে হলে বোলো দিমা, খুব বাঁচাব।'

চিন্ময়ী চেঁচিয়ে ডাকল—'এই ছেলেরা শুনে যাও।' ওরা দাঁড়িয়ে গেল, কিন্তু কাছে এল না।

চিন্ময়ী বলল—'আমি এ বাড়িতে থাকলে তোমাদের আপত্তি আছে ? আমার যখন-তখন কাজ, বেরিয়ে যাই। জিনিসপত্র থাকবে। তোমরা একটু পাহারা না দিলে...। আমাকে অবশ্য কেউ কাবু করতে পারবে না। আমি কারাটে কুংফু সব জানি...।' বলে সে ডান পাটা সোজা উঁচুর দিকে ধাঁই করে ছুঁড়ল।

—'স-ব ?' পুটু এগিয়ে এল—'আমায় শিখিয়ে দেবেন !'

—'শেখা কি অত সহজ ? শরীরটা আগে দুরন্ত করতে হবে পিটে পিটে !'

সঙ্গে সঙ্গে বলা নেও কওয়া নেই পুটু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সটান পেছন দিকে হেলে চাকা হয়ে গেল। তারপর আবার অবলীলায় উঠে পড়ে হাত দুটো নামিয়ে হাতে ভর দিয়ে পা দুটো ওপর দিকে তুলে পীকক হয়ে গেল, তার ফ্রকের ঘের তলার দিকে ঝুলে

পড়েছে, লাল সালুর ঝালর দেওয়া ইজের বেরিয়ে পড়েছে, সে দু-হাতে হন হন করে চলতে লাগল। ওদিকে পটলা পাক খেয়ে গোরুর গাড়ির চাকা হয়ে অন্তত বিশগজ চলে গেছে। তারপর আবার চক্রাকারে ফিরে সে বলল—'মাসকুলগুলো দেখুন ।' হাত ভাঁজ করে সে তার বাইসেপস ট্রাইসেপস দেখাতে লাগল, দু'জনেই বলল—'এতে হবে না ?'

'হবে, হবে'—হেসে ফেলল চিন্ময়ী, 'তবে সব কি আর শেখাতে পারব ? কয়েকটা মোক্ষম প্যাঁচ শিখিয়ে দিতে পারি। কি হল ? ধানু জংলু তোমরা বললে না তো কিছু?'

—'পটলার দিমার ট্যাঁক ভারী হবে, তো আমাদের ছোটলোকের বাচ্চাদের কী বলবার আচে? এই সময়ে দিমা এগিয়ে এসে বললেন—'আর ঢঙে কাজ নেই। অনেক ঢঙ দেখিয়েচ। বিকেলে মুড়ি ভেজে রাকবো, তেলেভাজাগুলো নিয়েসো দয়া করে। আপনি আসুন মা।'

ভেতরে ঢুকেই চিন্ময়ী একটা শক খেল। উল্লাসের শক, আবার আঘাত পাবার শক। চেনার ধাক্কা, চেনাকেও না চেনার ধাক্কা। সেই চতুষ্কোণ উঠোন। চারপাশে উঁচু দাওয়া। দাওয়ার ওপর সারি সারি লম্বা চওড়া দরজা। ওই তো রান্নাঘর। তার পাশেই খাবার ঘর, তারপর খানিকটা ফাঁক, চওড়া সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে। তার পাশে জ্যাঠামশাইয়ের চেম্বার-ঘর, তারপর এজমালি বৈঠকখানা। দাওয়ার উত্তর দিকে একটা দরজা। দুপাশে দুটো কলঘর। তার পাশে বামুনঠাকুর আর টেকন চাকরের আস্তানা। শুদ্দুরের সঙ্গে থাকতে হচ্চে বলে নীলকণ্ঠর বড্ড আফশোস ছিল। মাঝখানের দরজা দিয়ে ওপারে গেলেই, আর একটা মহল। ঠিক এই রকম ক্যারামবোর্ডের মতো আর একটা উঠোন। সিংঘিবাবুদের। মেজদা বলত, 'সিঙ্গিমশাই, সিঙ্গিমশাই মাংস যদি চা-ও।' অমনি জেঠিমা বেরিয়ে এসে বলতেন, 'কী হচ্ছে ভুতু, উনি তো আমাদের কোনও ক্ষতি করেননি ! গুরুজনদের নামে ছড়া-কাটা আমি পছন্দ করি না।' মেজদা হেসে বলত—'বা রে, অমনি গোঁপ আর এমনি ঘ্যাঁক করে আওয়াজ করলে যদি আমার ছড়া মনে আসে ! ছড়া তো ভাল জিনিস। ছড়া থেকে পদ্য, পদ্য থেকে কবিতা আর কবিতা থেকে রবীন্দ্রনাথ !' জেঠিমা হাতের খুন্তিটা নীরবে নেড়ে, চোখ পাকিয়ে একটা রাগত ভঙ্গি করে রান্নাঘরে ঢুকে যেতেন। কচুর শাক রান্না হচ্ছে, কষতে কষতে জান বেরিয়ে যাবে তবে সেই অমৃতময় স্বাদ বাব হবে।

সিংঘিবাবুদের উঠোনটার চারপাশে চারটে নর্দমার গর্ত ছিল। ছোড়দি বলত—'দ্যাখ এটা হল দৈত্যদের ক্যারমবোর্ড।' চিনু বা ছোটরা জিজ্ঞেস করত—'দৈত্যরা কখন খেলে ছোড়দি !' ছোড়দি বলত—'অবশ্যই রাতে, সব্বাই, বিশ্বসংসারের স-ব ঘুমিয়ে পড়লে !' চিনু বলত, 'ঘুঁটি কই ? দৈত্যদের ?' ছোড়দি পাল্টা প্রশ্ন করত 'বল দিকিনি, পারিস কি না !' অনেক ভেবে, নিজের কল্পনাকে অনেক দূর টেনে-হিঁচড়েও দৈত্যদের ঘুঁটির খবর চিনু বার করতে পারত না। তখন ছোড়দি রহস্যময় হেসে বলত, 'আরে বোকা, আমরা, আমরা সবাই। সিংঘি জ্যাঠার ছেলেমেয়েরা কালো ঘুঁটি, আমরা সাদা ঘুঁটি। আর চিনু তুই রেড। তোকে নিয়ে যে কী লড়ালড়ি হয় তা যদি জানতিস !' চিনু ভয়ে কাঁটা হয়ে যেত, দৈত্যদের ঘুঁটি হওয়াই যথেষ্ট ভয়াবহ। তার ওপর রেড, যার ওপর দু-দলেরই ঝোঁক।

সারা রাত তাকে নিয়ে লড়ালড়ি হয় ? সে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করত—'স্ট্রাইকার কই, ছোড়দি।' ছোড়দি তখন এমন সোডার বোতল খোলার মতো হেসে উঠত, যে উত্তরটা বোঝাই যেত না। অবশেষে তার চোখের জলে নাকের জলে অবস্থা থেকে অনেক কষ্টে বার হত স্ট্রাইকার হলেন সিংঘিমশাই আর আমাদর জ্যাঠামশাই।

—'আমরা কেউ বুঝতে পারি না তো !' চিনুর বোন মিনুব প্রশ্ন।

—'বুঝতেই যদি পারবি তো আর দৈত্যদের কাণ্ডকারখানা বলেছে কেন। ঘুমের মধ্যে আমরা সব গুটিয়ে গোল হয়ে চাকতি মতো ঘুঁটি হয়ে যাই। তবে চিনু একটু একটু বুঝতে পারে।'

—'কই পারি না তো ?'

'ঘুমের মধ্যে চেঁচাস না ?'

সত্যি ঘুমের মধ্যে চেঁচিয়ে-ওঠা, বিড়বিড় করে কথা বলা এইসব চিনুর অনেকদিন পর্যন্ত অভ্যেস ছিল। মা তার জন্যে একটা নোয়া পরিয়েছিলেন। জ্যাঠামশাই ওষুধ দিতেন। অব্যর্থ প্রমাণ। ঠিক ডমরুধরের কোমরে কুমীরের দাঁত পরিয়া থাকার মতো অব্যর্থ।

আপাতত সিংঘিবাবুদের সেই ক্যারমবোর্ড দেখা যাচ্ছে না। চক্কোত্তিদের অংশেরটা দেখা যাচ্ছে। ঝোপ, ঝাড়, শ্যাওলা, পেছল, কতদিনের আবর্জনা, সব সব। যাচ্ছেতাই। এইখানে তারা ব্যাডমিণ্টন খেলত। শাটল্‌ককটা একদিন মাছের ঝোলের মধ্যে পড়ে গেছিল সেই থেকে রোববার সকালে ব্যাডমিণ্টন বন্ধ। বড়দা দুদিকে দুটো দুশ ওয়াটের বালব লাগিয়ে দিয়েছিল। বিকেল থেকে সন্ধে, অনেক সময়ে রাত্রে, রান্না হয়ে যাবার পর রান্নাঘরে শেকল তুলে খেলা হত।

তার মুখ কুঁচকে উঠেছে দেখে দিমা ভয়ে ভয়ে বললেন—'কী মা, পছন্দ হচ্ছে না?'

—'এত নোংরা ! পরিষ্কার করা যায় না!'

—'কেন যাবে না !' পটলা এগিয়ে এল। —'দুদিন সময় দিন, একেবারে মোজাম্বিক করে দোব।'

—'দিও। এখানে তো ব্যাডমিণ্টন খেলা যায। তা দিমা আপনি কোথায় থাকেন ?'

—'আমি মা পটলা আব পুঁটুকে নিয়ে ওই ও-ই ঘবটায় থাকি।'

জ্যাঠামশায়ের চেম্বারটি এখন তাহলে দিমার দখলে। বাশভারি জ্যাঠামশাই, দজ্জাল দিমা।

—'ওপরের ঘরগুলো কী হয় ?'

—'তালা দেওয়া আছে মা। ব্যাভার করার হুকুম নেই।'

—'আমার তো দোতলার দক্ষিণ-পূবের ঘরটা ছাড়া হবে না।'

—'তালা তোড় দেগা'—জংলু বলল।

দিমা বলল—'তার দরকার হবে না। চাবির থলো আমার কাছে নুকোনো আছে, এই জংলু খবদ্দার কথাটা পাঁচ কান করিসনি। ওতে সব ফার্নিচার রয়েচে কি ন ! তা তুমি যদি ছ'মাসের জন্যে থাকো, তার মধ্য কি আর সিংঘিবাবুর ছেলে দিল্লি থেকে আসবে ? আসবে নে কো !'

—তবে আমি ওপরেই থাকব। ফার্ণিচার না হলে আমার চলবে কেন ? বলতে বলতে চিন্ময়ী ওপরে উঠতে লাগল। সিঁড়িময় ধুলো, বেড়ালের কম্মো, ইঁদুরের নাদি। চিন্ময়ী চক্কোত্তির পেছন পেছন উঠতে থাকে ছেলেমেয়ের দল এবং দিমা। চিন্ময়ী লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে, আর 'ইস কী করে রেখেছে ?' বলছে মাঝে মাঝেই। পটলাও লাফাতে লাফাতে চলেছে আর বলছে, 'স-ব মোজাম্বিক করে দেবো।'

পূব দক্ষিণের ঘরটাতে বেশ হাওয়া আসে, ফ্যানও ঝুলছে একটা সিলিং থেকে। আলোও জ্বলে একটা। সিঙ্গল বেড খাট, ভাল বিছানা, মোটা—রঙচটা সতরঞ্চি দিয়ে ঢাক., একদিকে একটা আলমারি। চাবি দেওযা, দেয়ালে র‍্যাক কয়েকটা। একটা আয়না ধূলিধূসরিত, একটা টেবিল, দুটো গদীমোড়া চেয়ার। একটা কোল পেতে-বসা ভালুকের মতো কৌচ।

দিমা বললেন—'পাশেই কলঘর আছে মা।'

চিনু জানে। এটা আসলে জ্যাঠামশায়ের ঘর। তাদের ভাইবোনেদের অসম্ভব লোভ ছিল এই ঘরটার ওপর। জ্যাঠামশাই যখন নিচের চেম্বারে রুগী দেখতে ব্যস্ত সেই সময়ে চিনুরা ক' ভাইবোন হুড়মুড় করে ঘবটাতে ঢুকে, কেউ খানিকটা জানলা ধরে বাঁদরের মতো ঝুলে নিত, কেউ বাথরুমে গিয়ে খামোকা বেসিনে মুখ ধুয়ে নিত। কেউ আবার কাচের আলমারিতে বইয়ের সারির দিকে অভিনিবেশ সহকারে দেখত কিছুক্ষণ। কেউ চট করে টেবিলের ওপর-রাখা মেমসাহেব-নাচা ঘড়িটাতে অ্যালার্মের দম নিয়ে দিত, অমনি মেমসাহেবটা নাচতে আরম্ভ করত টুং টাং বাজনার সঙ্গে সঙ্গে। এসব জিনিস জ্যাঠামশায়ের রুগীদের উপহার। তা ঠিক সেই সময়ে টেকন চাকর কাঁধে লাল গামছা নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে এসে ঘরে ঢুকত—'কী করুচি ? অ মা, এ মিনিদিদি, অ চিনিদিদি, নুটুদাদা, যাও, যাও বলুচি।'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ তোমাকে বেলুচিস্তানে পাঠিয়ে দিয়ে যাব' বলতে বলতে তিন ভাই বোন দৌড় দৌড়।

ঘরটার মাঝখানে ধুলোর মধ্যে চটিশুদ্ধ পায়েব ছাপ ফেলে চিনু দাঁড়িয়ে রইল। সেই ঘর, যার জন্যে ছোটবেলা থেকে আকণ্ঠ লোভ। সেইখানে অবশেষে চিনু থাকতে পাবে। ঘবটা আর ঠিক সেই ঘব নেই। নেই সেই মেমসাহেব পুতুলঅলা ঘড়ি। সেই হাফ-সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপর ঝকঝকে কাচের নিচে নানা দেশের সুন্দর সুন্দর ছবি। কাঁচের আলমারিতে পরপর সাজানো বাঁধানো বই। দেয়ালে বাবা-জ্যাঠামশায়ের বাবা-মার যুগল তৈলচিত্র। ছোট্ট ঠাকুমা নাকে নোলক, বেনারসী সামলাতে পারছেন না, এক পা তুলে দাঁড়িয়ে আছেন। গুঁফো ঠাকুর্দা টোপর হাতে চেয়ারে বসে। গোঁফের ফাঁকে সামান্য হাসি। নিশ্চয়ই নতুন-বউ প্রাপ্তির। কিছু নেই। সবই বদলে গেছে। তবু সবই আছে। স-ব এনে ফেলতে চিনুর অসুবিধে হবে না। অসুবিধে হলে সে এতো করে এত দূর দৌড়ে আসবে কেন ? সে টেবিলের ওপর নিজের হালকা সুটকেসটা নামিয়ে রাখল, তারপর বলল—'দিমা, এই আমার জিনিস রইল, কলকাতায় যাচ্ছি। ফিরতে হয়ত বিকেল

হবে, তার মধ্যে এইসব গুছনো ফিটফাট চাই। এই নিন আপাতত একশো টাকা। আজকে মুরগী হবে, রাত্তিরে। এরা সবাই খাবে। আর আমাকে তুমি বললেই হবে। এই ছেলেমেয়েরা তোমরা আমাকে চিনুদি বলবে। তরতর করে সে নেমে গেল। দু-তিন কদমে রাস্তায়। তারপর চলতি একটা রিকশায় চলে ইস্টিশান।

কোথায় গেলাম ? বলব না। আচ্ছা আচ্ছা বলব। সারা দুপুর একটা চমৎকার লাইব্রেরিতে কাটিয়ে, শেষ দুপুরে একটা কোর্স নিচ্ছি, তার ক্লাস করলুম। মাঝখানে একটা মাদ্রাজি রেস্তোরাঁয় একটা মহাকায় মশলা ধোসা আর কফি খেয়ে দুপুরের ভোজন সারলুম, বিকেলের দিকে এক গ্লাস ফলের রস খেয়ে কাজুবাদাম কিনে ট্রেনে উঠলুম। রিকশাতে উঠে সিংঘিবাবুর বাড়ি আসতে আসতেই দূর থেকে দেখলুম দোতলার পূব-দক্ষিণের ঘরে খুব ঝকঝকে আলো জ্বলছে। খুশি-খুশি মনে কড়া নাড়তেই পুরো বাহিনীসহ দিমা দরজা খুলে দিলেন। ঢুকতেই উঠোনটা দেখলুম আধা সাফ হয়েছে, কিন্তু দাওয়া, সিঁড়ি, ওপরের চকমিলানো বারান্দা, এবং সর্বোপরি আমার থাকবার ঘরটি ঝকঝক করছে।

পুঁটু বলল—'এত দেরি কেন ?'

পটলা বলল—'আমাদের মুড়ি-তেলেভাজা খাওয়া হয়ে গেল। তেলেভাজা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।'

চিনু বলল—'আমার শুধু চা হলেই চলবে। গা ধুয়ে নিই।'

রাত্তিরবেলা খাবার সময়ে হল মুশকিল। দিমা বললেন—'আমি বামুনের মেয়ে মা, মুরগী ছুঁই না, তাই পাঁঠার মাংস করেছি।'

চিনু বল—'বেশ তো।' কিন্তু প্রথম গ্রাস মুখে দিয়েই সে হড়হড় করে বমি করে ফেলল। বমি সামলাতে চলে গেল উঠোনে। মুখে-চোখে জল দিল, তবু বমি ভাব যায় না।'

দিমা বললেন—'কি রে ধানু বোকা পাঁঠা আনলি না কি ?'

ধানু বলল—'ইস্‌স্‌, দিলেই হল। ধানুকে ফজল বোকা পাঁঠা দেবে ! ঘাড়ে ক'টা মাথা! তাছাড়া খেতে তো ফাস্টো কেলাস হয়েচে।'

দিমা অপ্রস্তুত গলায় বললেন—'ওমা, মেয়ে বোধহয় পাঁঠা খেতে পারে না গো, তাই মুরগীর কতা বলেছিল।'

ততক্ষণে চিনু নিজেকে সামলে নিয়েছে। আসলে বারো বছর সে মাংস খায়নি। এরকমটা যে হতে পারে তা তার মনে আসেনি। ছেলেমেয়েদের তো প্রায়ই রান্না করে দিয়েছে, এরকম গা-বমি তো করেনি ! সে বললে—'রান্না খুব ভালো হয়েছে দিমা। আমার শরীরটাই কেমন খারাপ খারাপ লাগছে।'

—তা হলে কি খাবে মা ?'

—'কিছু না খাওয়াই তো ভাল, বমি যখন হয়ে গেল। আপনারা কি রান্না করেছেন?'

—'আমি বেগুন পুড়িয়ে নিয়েছি মা। আর এখো গুড় আচে। খাবে ?'

—'না, না। গা-বমি করছে তো।'

—'রাত-উপুসী থাকবে মা ?'

চিনু মনে মনে ভাবল একটা হরলিক্‌স্-টিক্‌স্ কিনে রাখা দরকার।

যেদিন সত্যি-সত্যি উঠোনখানা মোজাম্বিক হয়ে গেল, এবং ওপর থেকে চিনুদিদি ব্যাডমিণ্টনের নেট, শাটল কক আর র‍্যাকেট নিয়ে নেমে এল, সেদিন পটলা ধানু জংলু পুটুর মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। একবার এ চাকা হয়ে যাচ্ছে, একবার ও। জংলু বলল—'জাল খাটাবার খুঁটি কোথায় পোঁতা হবে দিদি ?'

চিনু বলল—'দেখ ভাল করে। মাঝখান বরাবর দু'পাশে গর্ত পেয়ে যাবি।'

—'সত্যি তো ! কী করে তুমি জানলে দিদি ?'

—'আমি কিছু কিছু ম্যাজিক জানি।'

—'ম্যাজিক ? আমায় শেকাবে ?'—কোমরে হাত দিয়ে পুটু এগিয়ে এল।

—'কত কি তুই শিখবি? কারাটে কুংফু। ম্যাজিক। আপাতত ব্যাডমিণ্টনটাই শেখ।'

তারপর কিছুদিনের মধ্যেই দুর্দান্ত খেলা আরম্ভ হয়ে গেল।

মিক্সড ডাবল্‌স্। এদিকে চিনু আর ছোড়দা। ওদিকে মিনু আর মেজদা।

ছোড়দা বলল—'তোর ব্যাকহ্যাণ্ডটা ভাল। ফোরহ্যাণ্ড হোপলেস। নইলে মিনুর ওই সোজা শটটা তুলতে পারলি না ? একটু ছুটে সামনে এগিয়ে গেলেই....'

মেজদা অর্থাৎ ভুতু স্ম্যাশের পর স্ম্যাশ করে যাচ্ছে। মিনু টুকটুক করে ড্রপ শট। মেজদা আর মিনুর জুটি জিতে গেল। চারপাশে দাওয়ার ওপর ভিড় করে দাঁড়িয়েছে বড়দা, ছোড়দি, সিঙ্গিমশাইয়ের বাড়ির ছেলেমেয়েরা। সবাই মিলে হল্লা করছে। এদের গেমটা হয়ে গেলেই আরও চারজন নামবে। কোনও দলকেই বেশি চান্স দেওয়া হবে না। নইলে অতজন খেলা শেষ করবে কী করে ? দিমার রান্নাঘরের শেকল তোলা। পিঁড়ির ওপর পা ছড়িয়ে বসে দিমা খেলা দেখছে, আর মাঝে মাঝে হাই তুলতে তুলতে টুসকি দিচ্ছে। চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসে জ্যাঠামশাই দু'দণ্ড জিরিয়ে খেলা দেখে গেলেন। মন্তব্য করলেন—'তোমাদের ঠিক ব্যালান্সড টিম হয়নি ভুতু। চিনুটাব তাকত নেই, দম নেই। ব্যাডমিণ্টন দমের খেলা। মেয়েটা খেতে পারে না। রাতে বিড়বিড় করে।'

—'কিরমি আছে, কিরমি আছে। তাই মেয়েটা বাড়তে পারছে না।' মা মাথায় ঘোমটাটা তুলতে তুলতে বলল—'ওষুধ দিন না বটঠাকুর।'

—'ওষুধ তো দিচ্ছি। মেয়েটাকে একটু তেতো খাওয়াতে পারছো না ?'

—'কী করব ? ওয়াক তুলে ফেলে যে ! আর জানেন তো, শুধু হাতে গুড়ের নাগরি থেকে মুঠা মুঠো গুড় তুলে চেটে চেটে খায়।'

—'খাবেই ! কৃমি ওকে ঘাড় ধরে খাওয়াবে বউমা। ওর দোষ কি ?'

গো-হারান হেরে চিনুদি দাওয়ায় উঠতে উঠতে বলল—'হ্যাঁ, আমি সারাদিন কোথায় না কোথায় ঘুরে ঘুরে সাংবাদিকতা করে বেড়াই, আর তোরা খেলে খেলে সে সময়ে হাত দুরস্ত করে ফেলিস।' 'হেরো ! হেরো ! হেরো !' জংলু আর পুটু দুয়ো দিতে থাকে। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে চিনু বলে—'এটা কিন্তু নিয়ম নয়। নিয়ম হল খেলার শেষে হেরো পার্টি আর জেতা পার্টি হ্যাণ্ডশেক করবে, এই এমনি করে'—এগিয়ে গিয়ে সে দেখিয়ে

দিল। তারপর বলল—'খেলা মানে আনন্দ, খেলা মানে ব্যায়াম, খেলায় হার-জিত আছেই। হেরে গেলেই হারা নয়, আবার জিতে গেলেই জেতা নয়।'

সারা সন্ধে একেক দিন গল্প হয়। গঙ্গায় বাইচ খেলার গল্প বলে ওরা. চিনু বলে ক্যাসিয়াস ক্লের মহম্মদ আলি হওয়ার গল্প, মারাদোনার ভাঙা পা নিয়ে মরণপণ খেলার গল্প, ফ্যারাডের বিজলি-বাতি আবিষ্কারের গল্প, বিদ্যাসাগরের দুধ খাওয়া ছাড়ার গল্প. খবরের কাগজের হকার এডিসনের ল্যাবোরেটরি তৈরি করার গল্প। শুনতে শুনতে খাওয়ার কথা মনে থাকে না। শুধু ওরা নয়। আরও জুটেছে ন্যাংলা, পচা, খেঁদি, কেষ্টা, ঝুমু, বালিশ। ভীষণ গাবদা গোবদা বলে ওর নাম বালিশ। দিমা এসে বলে—'আজ কিন্তুক শুদ্ধু ছোলার ডাল, রুটি আর দুধ। এতগুলি রাবণের গুষ্টিকে খাওয়াতে হলে মা আমার দ্বারা এর চে বেশি হবে নে।'

চিনু বলে—'ডালে কুচি কুচি করে নারকেল দিয়েছো তো ? ও দিমা !'

জ্যাঠাইমা বলে—'ওঃ মেয়ের যেমন তেমন হলে চলবে না, সব যার যেটি তার সেটি চাই। শ্বশুরবাড়ি গিয়ে যখন কুমড়োর ঘ্যাঁট খেতে হবে, তখন ?'

চিনু বলে—'ঘ্যাঁট কেন ? কুমড়ো দিয়ে, আলু দিয়ে, পটল দিয়ে, ছোলা দিয়ে কুমড়োর ছক্কা আর লুচি। নীলকণ্ঠ ঠাকুর করবে, তোমরা হাত দেবে না।'

বটুয়া থেকে পান বার করে মুখে পুরতে পুরতে নীলকণ্ঠ মহাগর্বের হাসি হাসছে।

দিমা বলল—'ভাল হয়েচে তালে ? আমি বলি কি জানি শহরের ফ্যাশনেল মেয়ে...'

—'বাঃ, আমি তো তোমার রান্নার কথা শুনেই আরও—দিমা কচুর শাক খাওয়াবে ?'

—'কচুর শাক ? তার জন্যে এত আহিংকে ? ওমা, আমি কোতায় যাব গো ! এই জংলু, তুলে আনিস তো কাল। নারকেলের তো অভাব নেই মা ! তা নিরিমিষ্যি খাবে, না ইলিশমাছের মুড়ো দিয়ে ?'

—'নিরিমিষ্যি, নিরমিষ্যি !' চিনু চেঁচিয়ে বলে ওঠে।

ধানু গম্ভীর ভাবে বলে—'ইলিশমাছ আলাদা হবে, একেবারে ঘাট থেকে নিয়ে আসব।'

পুঁটু বলে—'মুড়োটা আর ন্যাজাটা দিয়ে অম্বল কোরো দিমা। ন্যাজার লালগুলো সব আমার ! মা করত !'

—'ইস্‌স্‌, আগেই অম্বল চাই ? মেয়ের রকম দেখো ! টক আর মিষ্টি পেলে আর কিছু চাই না !'

মিনু আড়চোখে চাইল—'দিদি, আর ঝাল ?'

দুজনে মিলে ছুটির দুপুরবেলা তেঁতুল, লঙ্কা আর গুড় দিয়ে আচ্ছা করে জরিয়ে আঙুল চেটে চেটে খাওয়া আর হুস হাস। নাকের জলে, চোখেরজলে। উঃ কি ঝাল দিয়েছিস রে দিদি ! ঝাল না হলে জমে! মেজদা নামতে নামতে বলছে—'হ্যাঁ, নামবে যখন তখন টের পাবি কিরম জমে ! পুরো ইনটেসটিন জ্বলিয়ে দিয়ে নামবে। তখন বলিস হে তেঁতুলের দেবতা, হে লঙ্কার দেবতা, আর করব না, আর করব না।'

মস্ত বড় কলেজের ঘাসে-ছাওয়া মাঠে নীল জিনস আর আলগা শার্টপরা একটি মেয়ে বসে। মাথায় ঝুঁটি। ওর কি কোনও বন্ধু নেই ? ফাইল খুলে একমনে পড়ছে ? না পড়ার ভান করছে ? পাশ দিয়ে একদল ছেলেমেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

—'ওঃ পি. কে. সি. আজ যা পড়ালেন না, দুর্দান্ত !'

—'আরে কীটসের ওপরেই তো ওঁর থিসিস। অক্সফোর্ডের। চালাকি নয়।'

—'হ্যাঁরে নীতা, ফ্যানি ব্রন আর কীটস-কে নিয়ে লেটেস্ট বইটার কী যেন নাম বলছিলেন পি. কে. সি. ?'

—'আমি খেয়াল করিনি !'

—'কী খেয়াল করিস তোরা? পি. কে. সি.-র ডোরাকাটা শার্ট, আর গ্যাবার্ডিনের পেণ্টুল ?'

—'ভালো হবে না ঋত্বিক। টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি শেষ হতে চলল এখন কীট্স নিয়ে আর কে মাথা ঘামায় রে ! যত্ত সব !'

—'তো কী নিয়ে মাথা ঘামাবি ! অ্যালেন গিনসবার্গ ! লোকটা শেমলেসলি গে জানিস তো ? ওই জন্যে অস্কার ওয়াইল্ড বেচারির জেল হয়ে গেল আর এখন সব যে যত পার্ভার্টেড, তার তত নামডাক !'

—'মেয়েদের মধ্যেও তো আছে, পুরনোকালে স্যাফো, ইদানীং-এর মধ্যে মার্টিনা। কী রকম ডাঁটে থাকে।'

দলটা পাশ দিয়ে চলে গেল। একবারটি আড়চোখে তাকিয়ে দেখল জীনস-পরা মেয়েটি। দলেব মধ্যে কোনটা কোনটা মেয়ের কথা, কোনটা ছেলের কথা বোঝবার জো নেই ! জ্যাঠামশাই বলছেন—'না। কিছুতেই না। কো-এডুকেশনে দিলে মেয়ে বখে যাবে। নমুও তো মেয়ে-কলেজেই পড়েছে, ওর শিক্ষা-দীক্ষা কিছু কম হয়েছে ? বাবা বলছেন—মেয়েটা অত ভাল রেজাল্ট করল দাদা, অত শখ...আর দেখুন, বাবা গলা খাটো করে বললেন—এখানেও তো এত্ ছেলের সঙ্গে মিশেছে, সিঙ্গিবাবুর সুকৃতির সঙ্গে তো হলায় গলায়। গণ্ডগোল হলে তো এখানেও হতে পারে !'

—'তা অবশ্য।' জ্যাঠামশাইয়ের চিন্তিত গলা। বাইরে আড়িপাতা দলের ফিসফিসে হাসি।

য়ুনিভার্সিটির ক্লাস নতুন আরম্ভ হয়েছে। ব্লু জীনস, আলগা শার্ট, মাথায় ঝুঁটি ঢুকে পড়েছে। নোটস নিচ্ছে। ভীষণ মনোযোগ দিয়ে। 'তুমি কোন কলেজ থেকে এসেছ ভাই!' পাশের মেয়ে জিজ্ঞেস করছে।—'শ্রীরামপুর কলেজ।'

—'সে কী ? আমিও তো শ্রীরামপুর কলেজ থেকেই এসেছি ! তোমায় চিনি না তো!'

সেরেছে ! আরে আমি তোমাদের থেকে অনেক সিনিয়র। মাঝখানে নানা কারণে পড়া বন্ধ হয়ে গেল।

'তাই বলো !'

—'য়ু দেয়ার, হুইচ ইজ দা শর্টেস্ট ট্রাজেডি অফ শেক্সপীয়র ?'

ব্লু জীন্স্ উঠে দাঁড়াচ্ছে।—'ইজ ইট ম্যাকবেথ সার ?'

বহু আষাঢ়ের ওপার থেকে উত্তরটা ভেসে আসছে। মেঘের আড়ালে আবছা হয়ে। 'সো য়ু হ্যাভ ডাউটস ! সীট ডাউন অ্যাণ্ড ডোণ্ট টক।'

পাশের মেয়েটি বললে—'সরি। ভাই, আমার জন্যে তুমি বকুনি খেলে।'

আজকের মত লাইব্রেরির কাজ সারা। ধোঁয়া কাটাতে কাটাতে গোলাপি বুটির সা৲ কামিজ, খোলা চুল, ঢুকে যাচ্ছে। একটাও পুরো খালি টেবিল নেই। একটাতে একটা ..এ ছেলে বসে সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে। সামনে আধ-খাওয়া কফির কাপ।

গোলাপি কামিজ বলল, এক্সকিউজ মি প্লিজ, আপনি কি কারও জন্যে অপেক্ষা করছেন?'

'ওহ নো, নট অ্যাট অল। আই ক্যান ওনলি ওয়েট ফর গোদো, হু আই নো উইল নেভার অ্যারাইভ !

'বসবার জায়গা পাচ্ছি না। বসতে পারি ?' ভড়কানো প্রশ্ন।

'নো অবজেকশন।'

কফির অর্ডার। পকোড়া। ছোট ছোট কামড়। অল্প স্বল্প চুমুক। কোলের ওপর একা পত্রিকা নিয়ে অভিনিবেশ সহকারে পড়া। পত্রিকা ছাড়া গতি নেই।

'ডোণ্ট মাইণ্ড, আপনি কি রিসার্চ স্কলার ?' ছেলেটির প্রশ্ন।

'খানিকটা।'

'খানিকটা মানে !'

রহস্যময় অথবা বোকা-চালাকির হাসি—'আপনি ?'

'আমি কেউ না। কিছু না। জাস্ট একটা ভয়েড।'

'সে কী ? আপনি ভূত নাকি ?'

'ভূতই বটে !' ছেলেটির মুখে আত্মবিদ্রূপের হাসি—'গোস্ট অফ দিস কনজিউমারিস্ট সোসাইটি, গোস্ট অফ দিস ওয়ার্ল্ড ব্লাইণ্ডেড বাই দা ড্যাজলিং র‍্যাভেজেস অফ সায়েন্স। গোস্ট অফ দিস মকারি অফ এ সিভিলাইজেশন !

'রাগী যুবকরা তাহলে এখনও আছে', গোলাপি সালোয়ার আত্মগত বলল।

'কিছু বললেন ? ছেলেটি বলল, তারপর চোখ ঘুরিয়ে বলল—'এই তো দেখছেন টেবিলে টেবিলে গণ্ডা গণ্ডা যুবক-যুবতী বসে আছে। আড্ডা দিচ্ছে। জাস্ট আড্ডা। স্প্লেনডিড আনকনসার্ন ! ডু দে থিংক হোয়ার দিস মকারি অফ ডেমোক্র্যাসি ইজ হেডিং টোয়ার্ডস? ডাজ ওয়ান থিংক ?'

'আপনি কি বিপ্লবী ?'

'বিপ্লবী ? হাসালেন ! অল দা রেভোলিউশনস অফ দিস ওয়ার্ল্ড হ্যাভ এডেড দা ওয়ার্স্ট টাইপ অফ অটোক্র্যাটস। ফ্রম রোবস্ পীয়ের টু স্ট্যালিন অ্যাণ্ড চাওসেসকু। দা ভেরি কনসেপ্ট অফ রেভল্যুশন হ্যাজ বীন গিলোটিণ্ড।'

'আপনি তাহলে কে ? কী ? গোলাপি সালোয়ার ভয়ে ভয়ে বলল।

'কেন কবে, কোথায় গুলো জিজ্ঞেস করলেন না ?'

'ভয় করল। একটা দুটোর উত্তর দিলেই বর্তে যাব।'

তখন ছেলেটি সিগারেট ফেলে দিয়ে দম ছেড়ে হো হো হা হা করে হাসল।

তারপর বলল, আমার নাম শ্রীমান সুশান্ত তালুকদার, এই হল কে। আমি একজন ফ্রি-লান্স জার্নালিস্ট—এই হল কী। এম.এসসি ইন ইকনমিক্স, লো সেকেণ্ড ক্লাস, 'গরিবি

হঠাও'-এর ওপর একটা বিস্ফোরক প্রবন্ধ লিখেছিলুম বলে খুব সম্ভব। পছন্দসই চাকরি পাইনি—এই হল কেন। উনিশ শ ঊনষাট, বারোই জুলাই এই হল কবে। আর কোথায় হল—হট্টমন্দির।

'ফ্রি লান্স জার্নালিস্ট, ফ্রি লান্সটা কী?'

'আপনি কোন যুগে বাস করেন? নাকি মঙ্গলগ্রহ থেকে আসছেন? এখন তো ফ্রি লান্সেরই যুগ। সব কিছু নিজস্ব উদ্যোগ। গমেন্ট আমাদের স্বাবলম্বী হতে বলছে না?'

'আপনি নিজে নিজেই খবর যোগাড় করে বেড়ান? লেখেন? ছাপায়?

'হ্যাঁ, আমি নিজে নিজেই খবর বা স্টোরি যোগাড় করে বেড়াই। লিখি, ফটো তুলি। কখনও ছাপে, কখনও ছাপে না।'

'তাতে আপনার চলে? কিছু মনে করবেন না!'

' ওই জন্যেই তো বললুম হট্টমন্দিরে থাকি। একটা অবসলিট মেসে। ম্যানেজারবাবুর আমার ওপর বড্ড মায়া। একটি বিবাহযোগ্য কন্যা আছে। বড্ড দজ্জাল! কাউকে গছাতে পারছেন না। চিতাবাঘ যেমন ঝোপের পেছনে গুঁড়ি মেরে থাকে, শিকার কখন পাল্লার মধ্যে এসে যাবে তার অপেক্ষায়, তিনিও তেমনি বসে আছেন।'

চিনুর ভীষণ হাসি পেয়ে যাচ্ছিল। সে কফির কাপ মুখে তুলে বিষম খেল।

'আপনার পরিচয় কিন্তু আমি এখনও পেলুম না'—যুবক বলল।

'আমি সত্যিই মঙ্গলগ্রহের লোক আপনাদের গ্রহে বেড়াতে এসেছি। নাম চিন্ময়ী চক্রবর্তী। আমিও ফ্রি-লান্স জার্নালিস্ট।

সুশান্ত তালুকদারের মুখ গোল-হাঁ হয়ে গেল—'তাহলে ফ্রি-লান্স জার্নালিস্ট মানে জিজ্ঞেস করছিলেন কেন?'

'আসলে হতে চাই। এখনও হইনি। আপনি যদি একটু অন্ধি-সন্ধিগুলো বাৎলে দ্যান।'

'নিজে পায় না শুতে আবার শংকরাকে ডাক। সুশান্ত ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'আমার নাম সুশান্ত হলেও আমি কিন্তু আসলে খুব অশান্ত। টের পেয়েছেন আশা করি।'

'মোক্ষম! তবে পথগুলো আপনি বেশি রাগ না করে বাৎলে দেবেন তা-ও বুঝতে পেরেছি।'

আবার সিগারেট নামিয়ে হো হো হা হা।

এমন সময়ে ডান চোখের পাশ দিয়ে গোলাপি সালোয়ার একটি ভীষণ চেনা মেয়ে মুখ দেখে প্রায় টেবিল উল্টে উঠে পড়ল। বলল—'আমি চললুম। টাকা রাখলুম, বিলটা প্লিজ মিটিয়ে দেবেন। চেনা মুখ আপাতত ডান দিকের শাখায় চলে গেছে। চিনু হুড়মুড় করে নিচে নেমে আবার হ্যারিসন রোডের দিকে হুড়মুড় করে ছুটল। রিনি কি দেখতে পেয়েছে? হঠাৎ দেখতে পেলে পরিষ্কার চিনতে পারবে না। কিন্তু সন্দেহ হবে। বাস স্টপে ভীষণ ভিড়। উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছে, পেছন থেকে আচমকা প্রশ্ন হল—'বৎসে, তুমি কি বাড়ি হইতে পলায়ন করিয়াছ?' চমকে পেছন ফিরে চিনু দেখল সুশান্ত। সুশান্ত বলল, 'না কি কোনও ভদ্র যুবককে সদ্য-সদ্য ল্যাং মারিয়াছ।'

এক সপ্তাহ পরে সুশান্ত তালুদার ও মৃণ্ময়ী চক্রবর্তী দুজনে মিলে একজন নাম করা অর্থনীতিবিদ-এর সাক্ষাৎকার নিতে গেল। অর্থনীতি সম্পর্কিত প্রশ্নগুলো সুশান্তর, জীবন জগৎ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত প্রশ্নগুলো চিণ্ময়ীর। সাক্ষাৎকারটি একটি বিখ্যাত বাংলা দৈনিকের রবিবাসরীয় সংখ্যায় বেরোল। দক্ষিণাটা অর্ধেক করে চিণ্ময়ীকে দিতে গেলে চিণ্ময়ী বলল, 'আমার ভাগটা এবারের মতো তোমায় দিয়ে দিলুম, সুশান্ত, গুরুদক্ষিণা।'

'ঘুষ নয় তো।' সুশান্ত অশান্ত চোখে চেয়ে বলল।

'ঘুষ কী? ওঃ চিনুদি, য়ু আর সামথিং আই মাস্ট অ্যাডমিট' সুশান্ত বলল।

এইভাবেই চলছিল। কিন্তু একদিন সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরতে, দিমা নিঃশব্দে দরজা খুলে দিয়ে বললে—

'ওমা আমি কোতায় যাব গো মেয়ে! দিল্লি থেকে সুকর্কিতিবাবু এয়েচে গো! আমার ওপর কী চোটপাট! আমাকে বোধহয় ছাইড়ে দেবে গো মা! শোনো টাকাকড়ির কতা আমি কিছু বলিনি, শুধু বলেছি ভদ্দর লোকের মেয়ে বড় আতান্তরে পড়েছিল....।' দিমার সহজে চোখে জল আসে না, কিন্তু এখন কাঁদো-কাঁদো অবস্থা। চিনু বলল—'পথ ছাড়ো দিমা। আমি দেখছি।'

'ওমা কী সব্বনেশে মেয়ে গো, সে যে একেবারে রেগে বাঘ হয়ে আছে।'

'সিঙ্গি হয়ে আছে বল?' পটলা আর পুটু ফিকফিক করে হেসে ফেলল।

'তোদের আর কি নংকাপোড়া। হেসে দিলেই হল। দিমা আছে, দিমা ঠিক খাওয়াবে। পরাবে। ভিক্ষে করে হোক, সিক্ষে করে হোক।'

চিনু বললে—'দিমা, আমার জন্যেই তো তোমাদের এই অবস্থা। আমি খবরের কাগজের লোক। কাউকে ভয় পাই না। আমি বোঝাপড়া করে নিচ্ছি। কোনও ভয় নেই।'

আজকে তার পরনে হালকা বেগনি প্রিন্টের একটা শাড়ি। হাতে মস্ত বড় ব্যাগ। প্র্যাকটিস করবার জন্যে একটা ক্যামেরা তাতে, ভরে দিয়েছে সুশান্ত। দিমার যা গতর তাকে সহজে ঠেলা যায় না, তবু একরকম ঠেলে ঠুলেই ওপরে উঠল চিনু। চটির বেশ শব্দ করে জানান দিয়ে ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। ভালুক কৌচের কোলে বসে জনৈক ভদ্রলোক খুব মনোযোগ সহকারে চিনুর রেখে যাওয়া একটা ম্যাগাজিন পড়ছেন। চটির শব্দে মাথা তুলে তাকিয়েই তিনি চিত্রার্পিত হয়ে গেলেন।

'এ কি? চিনু না! তুই কোত্থেকে?'

'আমি না হলে তোমার মতো সিঙ্গি মশাইয়ের ঘরে হুজ্জোতি করে ঢোকবার সাহস কার হবে বলো? তার ওপর দিমার মতো ওই রকম জাঁদরেল পাহারা।....তা মাথাটা কী করেছো!'

বেলের মতো মাথাটাকে হাত বুলিয়ে সুকৃতি সিংহ বললেন, 'কী জানিস! টাক হলে টাকা হয় ছোট্ট থেকে শুনে আসছি। তাই চেষ্টা চরিত্তির করে টাকটা করেই ফেললুম।'

'তাহলে আগে যা ছিল তার চেয়েও এখন আরও অনেক টাকা হয়েছে?'

'হয়েছে। বোনগুলো সব বাইরে পড়ল। দুটো দাদা বিদেশে পটাপট শেষ হয়ে গেল। বাবা কাকা সব্বারই সব তো এখন আমার!'

'তবে!'

'তবে কী?'

'তবে, সিংঘিবাড়ির এমনি দশা কেন যে আমি কোনকালের ভাড়াটের মেয়ে আমাকে দুযুগ পরে এসে মোজাম্বিক করাতে হবে?

'মোজাম্বিক? কী বকছিস?'

'নিচের উঠোন, ঘরদোর, দালান-বারান্দা, সিঁড়ি কলঘর সব দেখা হয়েছে? মোজাম্বিক হয়নি? পটলা আমাকে আশ্বাস দিয়েছিল দুদিন সময় দিলেই সব মোজাম্বিক করে দেবে। তা দিয়েছে। রোজ পালিশ করছে। এই রকম লাল-সবুজ পেটেন্ট স্টোনের মেঝে ইদানীংয়ের মধ্যে দেখেছ? পটলা, পুঁটু, জংলু, ধান দিমা এরা কবেছে...।

ও হো হো হো সুকৃতি বুঝতে পারার হাসি হাসতে লাগলেন, 'তা পটলা, পুঁটু, এরা কারা?'

'এরা কারা? জ্যাক অ্যাণ্ড জিল ওয়েণ্ট আপ দা হিল, জানো তো?'

'তা তো জানি কিন্তু....'

এরা সেই জ্যাক অ্যাণ্ড জিল। জ্যাকেরা পড়ছে। ডাউন দা হিল। মাথাগুলো বিগড়ে যাচ্ছে, আর জিলরাও পেছন পেছন হুড়মুড় করে পড়ছে তো পড়ছেই।

'তুই তো হলে এখনও ধাঁধা ভালোবাসিস? ঠিক সেই আগেকার মতো?'

সামনের আয়নায় এতক্ষণে দুজনের ছায়া পড়েছে। হঠাৎ সুকৃতি ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আরে চিনু, তোকে আমি উনিশ বছর বয়সের পর থেকে দেখিইনি! তোকে আমি কি করে এত দিন পরে চিনতে পারলুম বল তো? তুই তো খুব বেশি বদলাসনি। খালি কেমন ডাগর-ডোগর গেছো-টাইপের হয়ে উঠেছিস। কিন্তু আমি তো দেখছি বুড়ো হয়ে গেছি। মাথায় বেল, উদরে ডাব, মুখ ময় থলে? তুই আমার চেয়ে ক' বছরের ছোট ছিলি? কাকাবাবু এখান থেকে আসানসোল বদলি হয়ে গেলেন, তার পরেই শুনলুম কাকিমা নাকি? তোর আর মিনুর নাকি এক লগ্নে, তোর নাকি তিনটে...ভুতুর কাছ থেকে শুনছিলুম...।

—'সব নাকিগুলোই ঠিক শুনেছো। আবার যা নিজের চোখে দেখছ তা-ও ঠিক। আমি ভূত নই।'

—'তবে কি তুই ভবিষ্যৎ?'

চিনুর চোখে এবার স্বপ্ন চিকচিক করছে। সে বলল—'বলছো? সত্যি বলছো? থ্যাংক ইউ। কিন্তু তোমার ইতিবৃত্ত আমি কিছুই জানি না সুকুদা।'

—'সে তো অনেক কথা! ভুতু তোকে কিছু বলেনি?'

—'ভুতু কোত্থেকে বলবে? সে তো জার্মানিতে ইণ্ডিয়ার ভূত!'

সুকৃতি মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন—'আমিও তো ওয়েস্ট জার্মানিতেই ছিলুম। সেখান থেকে সিভিল এঞ্জিনিয়ারিং-এর ইয়াবড় ডিগ্রি নিয়ে সুইডেন গেলুম। আমার চে' একহাত লম্বা সুইডিশ মেমসাহেব বিয়ে করলুম। তারপর একদিন ঝগড়ার মুখে সে আমার সেই

কোঁকড়ানো কালো চুলগুলো ধরে আচ্ছা করে ঝাঁকিয়ে বললে—'হোয়াই কান্ট য়ু বি ব্লণ্ড! ব্লণ্ড! ব্লণ্ড!' বলে আমায় ছেড়ে চলে গেল। ব্লণ্ডের খোঁজে। এখানে কিছুদিন হল ফিরে এসে দিল্লিতে নিজের ফার্ম খুলে বসেছি। তখন চুলগুলো সবে উঠতে শুরু করেছে। আবার একটা বিয়ে করেছিলুম পাঞ্জাবি। তো সেটাও টিকল না। সেও একদিন ঝগড়ার মুখে বললে—হোয়াই আর য়ু সো শর্ট! শর্ট! শর্ট! সে-ও টলের খোঁজে চলে গেল। তার পরেই টাক। আর ছপ্পড় ফুঁড়ে টাকা!'

—'কী গুলতাপ্পিই দিতে পারো, বাব্বা! তা এখানে কি করতে হানা দিয়েছো!'

—'ভাবছি এই হানাবাড়িটা বিক্কিরি...'

—'খর্বদার!' চিনু বসে ছিল। সটান উঠে দাঁড়াল,—'খবর্দার, এই বাড়ি বিক্রি করতে পারবে না। এ বাড়ি আমি অধিগ্রহণ কবব, এ আমার মিউজিয়াম, এইখানে আমার ছোটবেলা, এইখানে আমার কৈশোর, এইখানে আমরা দুটো বিশাল উজ্জ্বল সুখী পরিবার, এইখানে আমরা প্রতাপ-শৈবালিনী, এখানে এসে আমি সব ফিরে পেয়েছি। এই বাড়ি, আমি যা বলবো তাই করতে হবে। পটলা ধানুদের ওপর আমি একটা স্টোরি করছি, যদি এতটুকু বেচাল দেখি, তো তোমাকে ভিলেন বানিয়ে দেব। পেছনে ল্যাজ, উল্টোবাগে পা।'

—'আর বেচাল না দেখলে?'

—'সাণ্টাক্রুজ, ফারের পোশাক, রুপোর টুপি।'

—'তো তুই এ বাড়িটা নিয়ে কী করবি?'

—'দিমার তত্ত্বাবধানে এদের গড়ে তুলব। মারাদোনা, গাভাসকর, কাপ্রিয়াতি, স্টেফি গ্রাফ, ব্রুস লি...'

—'বলে যা, বলে যা থামলি কেন? স্বপ্নে পোলাও খেলে ঘি বেশি করে ঢালতে হয়।'

—'আমি একা ঢালছি না আজ্ঞে। তোমাকেও ঢালতে হবে। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ছোটাছুটি...'

—'তো বদলে আমি কী পাব?'

—'লবডঙ্কা। তবে তেমন লেগে থাকতে পারলে নোবেল প্রাইজ ফর পীসটা পেতে পার। প্রচারে আমি আর সুশান্ত তালুকদার সাহায্য করব।'

—'তথাস্তু। তা শৈবালিনী কি চন্দ্রশেখরের কাছে ফিরে যাবে?'

—'চন্দ্রশেখর নেই।'

—'তাহলে কি প্রতাপের কাছে থেকে যাবে?'

—'প্রতাপও নেই।'

—'ওই বেটা সুশান্ত তালুকদার লরেন্স ফস্টর ও-ই তবে এখন প্রতাপ হয়ে গেছে?'

—'লরেন্স ফস্টরও নেই।'

সুকৃতি খুব দুঃখিতভাবে মাথার টাকটায় আস্তে আস্তে হাত বুলোতে লাগলেন। যেন টাকটাই যত অনর্থের মূল।

৩

বিলু খুব উত্তেজিতভাবে পায়চারি করতে করতে বলল—'মা-ও বলল, তোরাও অমনি যেতে দিলি? হোপলেস! প্যাক অব ফুলস্! একটা মধ্যবয়সী মহিলা, জীবনে কোনদিন নিজের চৌহদ্দির মধ্যে থেকে বেরিয়েছে কি না সন্দেহ! মাসে একটা দুটো করে চিঠি পাস—'ভালো আছি, কিছু হলে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিস্!' বাস! ছি! ছি! ছি! চিঠিগুলোর পোস্টগুলোর পোস্ট অফিসের ছাপগুলোও তো দেখবি!'

—'দেখেছি। দেখেছি।' রবি বলল—'তুই দ্যাখ, এক একটা এক এক জায়গা থেকে পোস্ট করা। শ্যামবাজার, কলেজ স্ট্রিট, পার্কসার্কাস, গড়েহাট। দ্যাখ, আমিও তো মোটরবাইক নিয়ে সারা কলকাতা দাপিয়ে বেড়াচ্ছি। দুটো চোখ সব সময়ে খোলা রাখি। কোথাও ভদ্রমহিলার টিকিটিও দেখতে পাই না। অথচ চিঠি আসছে সব কলকাতারই ভিন্ন ভিন্ন পোষ্ট অফিস থেকে!'

—স্ট্রেঞ্জ! মানে মা ভদ্রমহিলা স্রেফ ইচ্ছে করে লুকিয়ে আছে, বলছিস! আমি যখন ছিলুম না তখন মাকে কে কী বলেছিস! নিশ্চয়ই মনে খুব কষ্ট পেয়েছে। কিছু একটা করেছিস!' বিলুর উত্তেজিত পায়চারি আরও তেজোদৃপ্ত হয়ে ওঠে। 'শী ইজ এ কোয়ায়েট টাইপ, কিন্তু ভীষণ অভিমানী!'

—'অন গড্ ছোড়দা। আমরা কেউ কিছু বলিনি। কিচ্ছু করিনি!'

—'তোদের কিছু না করাটাই একটা করা। তোরা মার দিকে কোনদিন চেয়ে দেখেছিস! সেই কোন ছোটবেলায় বাবা মারা গেল। জ্যাঠা-কাকারা নিজেদেরটা গুছিয়ে দূর করে দিল। মুখ বুজে এতগুলো বছর একটা বাচ্চা মেয়ে, উঃ, আমি ভাবতে পারছি না। কোনদিন আমরা চেয়ে দেখেছি মা কী খায়? কী পরে! কী করে সময় কাটায়? নিজেদের বন্ধু-বান্ধব নিয়েই মত্ত। এখন কী হবে?'

হঠাৎ রিণি ভীষণ কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল—'দাদা, ছোড়দা, মা সেই রসময়ীর রসিকতার মতো করেনি তো। কাউকে দিয়ে আগে লেখা চিঠিগুলো পোষ্ট করাচ্ছে। মা হয়তো আর...

বিলু বলল—'স্টপ ইট রিণি, স্টপ ইট আই সে। ঠিক আছে ছ'মাসের জায়গায় আট মাস পার হয়ে গেছে। বিজ্ঞাপন দেওয়া যাক।'

রবি বিষণ্ণ মুখে বলল—'ড্রাফ্‌টটা তুই-ই কর বিলু। আমার মাথাটা কেমন...!'

বিলু বলল, 'রিণি তুই কর।'

একটু পরে রিণি কাঁপা কাঁপা হাতে তার খসড়টা এগিয়ে দিল। বিলু পড়ল—'মা, তোমার এ কেমন রসিকতা! তোমার ছ'মাসের মেয়াদ অনেকদিন পেরিয়ে গেছে। আমরা তিনজনে খুব চিন্তিত। ফিরে এসো।' পড়ে বিলু বলল—'ওয়ার্থলেস। কেউ যদি একটা কাজ ঠিক করতে পারিস। অভিমানে একটা মানুষ বাড়ি ছেড়ে গেল, তাকে অ্যাকিউজ

করছিস! রসিকতা? খুব ফিরে আসবে!' তারপর সে নিজেই খসখস করে লিখল, লিখে পড়ে শোনাল—মা, তোমার বিলু কেরালা থেকে জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে ফিরে এসেছে। লাং ক্যান্সার। মৃত্যুশয্যায়। শেষ দেখা যদি দেখতে চাও তো, অবিলম্বে ফিরে এসো।'

এমন সময়ে হাতে সুটকেস, পিঠে রুকস্যাক, সাদার ওপর নীল ছাপ শাড়ি পরে, মাথায় ঝুঁটি বেঁধে রবি-বিলু-রিণির মা চিণ্ময়ী চক্রবর্তী সিঁড়ি দিয়ে টকাটক উঠে এলেন।

বললেন—'কার লাংস ক্যান্সার? কে মৃত্যুশয্যায়? নিচের দরজা খোলা কেন? বাড়িতে কি চুরি ডাকাতি হয়ে গেছে?' জিনিসপত্তর সব ঠিকঠাক আছে তো? আমার ননষ্টিক প্যান? বোন চায়নার টিসেট? না চুরি ডাকাতি হয়ে গেছে?' তিনজনেই সমস্বরে বলে উঠল—'মা!'

চিন্ময়ী বললেন—'দ্যাখো বাপু, আমার হাতে বেশি সময় নেই। চান করে, রিণি যদি কিছু রেঁধে-টেধে থাকে তো খেয়ে, নইলে না খেয়ে বেরিয়ে যাব। একজন ভীষণ খিটখিটে সাহিত্যিকের সাক্ষাৎকার নিতে যাব। তারপর পার্কস্ট্রিটে যাব ফটোগুলো নিতে। আমাতে আর সুশান্ততে মিলে 'আর্চিন্‌স্ অর ফলিং আর্কএঞ্জেল্‌স্!' বলে একটা স্টোরি করেছি। এ-ক্লাস ম্যাগাজিনে বেরোচ্ছে—পিক্‌স্ মৃণ্ময়ী চক্রবর্তী। দেরি হতে পারে, ভেবো না।'

'মা'—রবি ভয়ে ভয়ে বলল—'সুশান্ত কে?'

চিন্ময়ী হেসে বললেন—'সে এক ভীষণ অশান্ত তালুকদার। আমরা দুজন ফ্রিলান্স জার্নালিজ্‌ম্ করছি। আসবে এখন চোখে ঘোরাতে ঘোরাতে, দেখিস!'

বিলু বলল—'তুমি সাহিত্যিকের সাক্ষাৎকার নিতে যাবে? স্টোরি করছ? ফ্রিলান্স? আর্চিন্স অর..কি ব্যাপার বল তো?'

রিণি বলল—'জানি তোমার আজকাল একটু একা একা লাগত। তাই বলে এই বয়সে...' বলে রিণি হঠাৎ গোঁত্তা খেয়ে খেয়ে থেমে গেল। সে ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে বলল—'মা মা, হোয়াট হ্যাভ ইউ ডান টু ইয়োরসেলফ্! হাউ ডু য়ু ম্যানেজ টু লুক সো ইয়াং...'

বিলু আর রবি পর পর বলল—'কোথায় গেছিলে? এতদিন কোথায় ছিলে?'

চিণ্ময়ী হেসে বললেন—'টাইম মেশিন পড়েছিস? এইচ. জি. ওয়েলসের? সেই টাইম মেশিনে চড়ে ছিলুম। তারপর দীর্ঘযাত্রা।

পেছনে, অনেক পেছনে।
আবার সামনে, অনেক সামনে।
যাতে তোদের পেতে গিয়ে জীবনের যে সময়টা শূন্য হয়েছিল
সেটা ঠিকঠাক ভরাট করে
আবার তোদের সঙ্গে সমানতালে
দৌড়তে পারি।

স্বীকারোক্তি

পাঁচজনেই কৃতবিদ্য। পাঁচজনেই কৃতী। পাঁচজনেই সম্পন্ন। পাঁচজনেই সুপ্রতিষ্ঠিত। পাঁচজনেই উচ্চশিক্ষিত। পাঁচজনেই সুদর্শনা। পাঁচজনেই বুদ্ধিমতী। পাঁচজনেই সপ্রতিভ এবং রুচিশীলা এবং সুগৃহিণী।

অতএব রাজযোটক। শুধু পতি-পত্নীতে নয়। পাঁচ পুরুষে, পাঁচ মহিলায়। পাঁচ জোড়ে। ছেলেমেয়েগুলি কারও কৈশোর-উত্তীর্ণ, কারও এখনও কিশোর, কারও যুবক। কিন্তু সকলেই যথাযথ বেড়ে উঠেছে, উঠছে। স্বাস্থ্য ভাল, পড়াশোনায় অবহেলা নেই, মা-বাবার সঙ্গে সহৃদয় যোগাযোগ আছে। কেউ এঞ্জিনিয়ারিং-এ, কেউ ডাক্তারিতে, কেউ ফিল্ম ইনস্টিট্যুটে, কেউ গবেষণা করছে, কেউ কমার্শিয়াল আর্ট, কেউ ম্যানেজমেন্ট। কাউকে নিয়ে দুর্ভাবনা নেই। সুতরাং বিত্তের সঙ্গে স্বস্তি। স্বস্তির সঙ্গে শান্তি। শান্তি থেকে আনন্দ। এবং আনন্দ থেকে আত্মপ্রকাশের বহুবিধ নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবন। যাকে বলা হয় 'ফাইন-এক্সেস।' এই 'গোলেমালে গো-লে-মা-লে'র তৃতীয় পৃথিবীর সমস্যা-শহরে ব্যাপারটা অকল্পনীয়। প্রায়। তাই নয়? সমস্ত ডেটাগুলো কম্পুটারে ভরে দিলে, মুহূর্তের মধ্যে আউটপুট বেরিয়ে আসবে, নহে। নহে। নহে। সম্ভব নয়। তবু হয়েছে। যন্ত্র সব জানে না। হয়, হয়ে থাকে, নানা অসম্ভব, ইতিবাচক অসম্ভব এবং নেতিবাচক। হয়। যন্ত্র জানতি পারে না। এইবারে যাঁরা এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন, বা বলা ভাল, যাঁদের জীবনে এটা সম্ভব হয়েছে, আপাত-অবাস্তব এই বাস্তব জগতেই যাঁদের অবস্থান, বিচরণ, জীবন-উদ্‌যাপন, তাঁদের সঙ্গে একে একে পরিচয় করিয়ে দিই। একনম্বর মহীতোষ মজুমদার, বিচারপতি কলিকাতা হাইকোর্ট। দু'নম্বর অসীমাংশু গুপ্ত। পি-এইচ ডি, ডি এস সি, প্রজেক্ট ডিরেক্টর একটি নামকরা রিসার্চ সংস্থার, তিন নম্বর অমিতব্রত বসুমল্লিক—চিফ অ্যাডভাইজার মেহরা গ্রুপ অফ হসপিট্যাল্‌স্‌। চার নম্বর সীতাপতি সেনগুপ্ত—এম আর সি পি, এফ আর সি এস (লন্ডন)। পাঁচ নম্বর হিরন্ময় চট্টোপাধ্যায়, ডি লিট—একটি ইউনিভার্সিটির প্রোফেসর, হেড অব দা ডিপার্টমেন্ট, প্রায়ই ভিজিটিং প্রোফেসর হয়ে সমুদ্র পারের দেশগুলিতে যান। এর এবং দুই নং অর্থাৎ অসীমাংশু গুপ্তর পেপার স্বদেশ-বিদেশের বহু নাম করা জার্নালে বার হয়। এঁরা পাঁচজনেই এক স্কুলে পড়েছেন। শ্যামপুকুর স্ট্রিটের ওপর অবস্থিত শৈলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয়ে। এঁরা যখন পড়েছেন তখন এর নাম ছিল সরস্বতী ইনস্টিট্যুশন। এই স্কুল থেকে প্রতি বছর সে সময়ে স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষায় দশ জনের মধ্যে একজন কি দুজন, বিশ জনের মধ্যেও জনা কয়েক থাকতই। এই স্কুলের অঙ্কশিক্ষক, ইংরেজির শিক্ষক স্বয়ং হেডমাস্টার মশাই, ইতিহাস ও ভূগোলের শিক্ষকের কথা এঁরা কোনওদিন ভুলতে পারবেন না। নকশাল আন্দোলনের সময়ে উত্তর কলকাতার বহু রত্নগর্ভা স্কুলের মতো এটিও জীবন্মৃত হয়ে পড়ে। এবং এই স্কুলের ছাত্রবৎসল, দোর্দণ্ডপ্রতাপ, জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত হেডমাস্টার মশাই দীর্ঘ চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছরের কর্মজীবনে বহু কৃতী ছাত্র তৈরি করার শেষ পুরস্কার স্বরূপ বৃদ্ধ মস্তকে ছাত্রদের লাঠির

প্রহার খেয়ে খুব সম্ভব পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হন। তবে সে অন্য ইতিহাস। তার অনেক আগেই প্রথম কুড়ি-পাঁচিশ জনের মধ্যে স্থান পেয়ে সদ্য প্রবর্তিত স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা পাশ করে বেরিয়ে এসেছেন এই পঞ্চনায়ক—মহীতোষ মজুমদার—দীর্ঘকায়, শ্যামবর্ণ, দোহারা, সামান্য পেছনে দিকে হটে-যাওয়া কাঁচা-পাকা কুঞ্চিত কেশ, অসীমাংশু গুপ্ত—বেঁটেখাটো, ফর্সা, পুলিশের মতো গোঁফ, গাট্টাগোট্টা, অতিরিক্ত মস্তিষ্ক চালনার ফলেই হয়তো মাথায় আয়না সদৃশ টাক। অমিতব্রত— মাঝারি দৈর্ঘ্য, স্বাস্থ্যবান, মনের ভাবের সঙ্গে মুখের রঙ বদলায়। কখনও কালো, কখনও ফর্সা, কখনও উজ্জ্বল শ্যাম। সীতাপতি—অতি সুপুরুষ, মাথার চুলগুলি প্রায় সাদা, ছ'ফুট লম্বা, মেদবর্জিত শরীর, আঙুলগুলি সুন্দরী মেয়েদের আঙুলের মতো লম্বা, ক্রমশ সরু হয়ে এসেছে, স্পর্শকাতর। এই আঙুল দিয়ে তিনি অত্যন্ত জটিল সব শল্য চিকিৎসা করেন। কখনও নিজে গাড়ি চালান না, বা আঙুলের অন্য কোনও অপব্যবহার করেন না। তাঁর মুখ পরিষ্কার কামানো। এবং হিরন্ময়—লম্বা, সাদা-কালো পর্যাপ্ত কেশ, আধা ফর্সা। সরু সোনালি ফ্রেমের ব্রাউন ডাঁটির চশমা ছাড়া তিনি পরেন না। বউবাজারের একটি নির্ভরযোগ্য দোকান তাঁকে এই পুরনো-স্টাইলের চশমা নিয়মিত সরবরাহ করে।

যদি ধৈর্য্যচ্যুতি না ঘটে, তাহলে পঞ্চ নায়িকার সঙ্গেও একবার দেখা করে আসা যাক। ঈষিতা মজুমদার, লম্বা, অতিশয় ফর্সা, চ্যাপ্টা চেহারা এবং চ্যাপ্টা মুখ। চোখের ঠিক তলায় চোয়াল সামান্য উঁচু, চোখা নাক, চোখ ছোট ছোট ঈষৎ খয়েরি, প্রতিমার মতো বাঁকা। চুলও ঈষৎ তাম্রাভ। ব্যক্তিত্বই এঁর চেহারার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। ইনি শুধুমাত্র গ্র্যাজুয়েট, কিন্তু দেখলে মনে হয়, প্রোফেসর কিংবা এগজিকিউটিভ অফিসার, কিম্বা আই.এ.এস। সুপ্রিয়া গুপ্ত, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, তন্বী, চুল ছাঁটা, লম্বাটে ছাঁদের চেহারা যে জন্য স্বামীর থেকে লম্বা না হলেও, তাঁকে স্বামীর থেকে অস্বস্তিকর রকম লম্বা দেখায়। তাই তিনি ফ্ল্যাট চটি ছাড়া পরেন না, এবং সুযোগ পেলেই স্বামীর পাশে গিয়ে দাঁড়ান চাক্ষুষ প্রমাণ করে দেখাতে যে সত্যি-সত্যি অসীমাংশু তাঁর থেকে বেঁটে নয়। ইনিও এম.এস.সি, অসীমাংশুর সঙ্গে রিসার্চ-প্রেম। কিছুদিন একটি কলেজে পড়িয়েছেন, কিন্তু অসীমাংশুর বাইরে যাওয়ার সময়ে সর্বদা ছুটি পেতেন না বলে পড়ানো ছেড়ে দেন। মীনাক্ষী বসুমল্লিক, ছোটখাটো চেহারা, খুব চটপটে, শ্যামাঙ্গী, এঁদের মধ্যে সবচেয়ে স্মার্ট, মাথার চুল বয়-কাট, এই সব কারণে এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও তাঁকে সর্বকনিষ্ঠ দেখায়। ইনিও সাধারণ গ্র্যাজুয়েট। কিন্তু পার্সোনাল গ্রুমিং, ইকেবানা, ফ্রেঞ্চ ইত্যাদি বহু রকমের কোর্স করেছেন। ইনি এবং ডাক্তার সেনগুপ্তর স্ত্রী দুজনে মিলে একটি বুটিক চালান। ডক্টর সীতাপতি সেনগুপ্তর স্ত্রীর নাম অতি অদ্ভুত, কিন্তু সত্যিই—সীতা। ইনিও খুব সুন্দরী। ইনি গুজরী। এঁর চেহারার একমাত্র ত্রুটি এঁর ঘাড় নেই। সুন্দর ফর্সা, দিব্যি গোল মুখখানি কাঁধের ওপর সোজাসুজি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। লম্বার থেকে চওড়ার দিকেই এঁর প্রবণতা বেশি। কিন্তু নিজেকে সংযমে রেখেছেন। ইনি শিক্ষায় ডাক্তার। কিন্তু ডাক্তারি করেন না। বুটিক চালান। হিরন্ময়ের স্ত্রীর নাম কমলা আয়ার চট্টোপাধ্যায়। ইনি কৃষ্ণা।

বোঝাই যাচ্ছে দক্ষিণী, কৃষ্ণা কিন্তু রীতিমতো সুন্দরী। স্বল্পভাষী, গম্ভীর, সুদূর। চিরকাল বাংলায় কলকাতায় মানুষ, বাঙালিই প্রায় হয়ে গেছেন, তবে অন্য গুর্জরীদের মতোই ইনিও কোনওক্রমেই মাছ-খাওয়া রপ্ত করতে পারেন নি। অন্যান্য বাঙালি, সাহেবি, চিনা সব-ই খেতে পারেন। খালি মাছের গন্ধ সহ্য করতে পারেন না। মাংস বিশেষত চিকেন কিন্তু খান। পর্ক-বেকন ইত্যাদিও তৃপ্তি সহকারেই খেয়ে থাকেন। খালি মাছ বাদ। পাঁচজনের মধ্যে একমাত্র ইনিই চাকরি করেন। ইনিও বিশ্ববিদ্যালয়ে রিডার। স্বামীর বিশ্ববিদ্যালয়ের নন, অন্যত্র। কিন্তু বিষয় একই। প্রত্যেকটি স্বামীই অত্যন্ত ব্যস্ত। মাঝে মাঝে এটা ওটা উপলক্ষে দেখা হয়। তবে স্ত্রীরা পরস্পরের খুব ঘনিষ্ঠ। কীভাবে কে জানে এই অদ্ভুতও এঁদের ক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে। স্ত্রীদের দেখাশোনা প্রায়ই হয়। কিন্তু স্বামীরাও কম ঘনিষ্ঠ নন। তাঁদের স্কুলের ঝালমুড়ি-ফুচকা-কানমলা-নিল ডাউনের ভাব এখন চিজ-স্যান্ডউইচ-হুইস্কি-রিভলভিং চেয়ার-লাল-নীল টেলিফোনের যুগেও একেবারে অবিকৃত আছে। অন্য সময়ে দেখা হোক না হোক, এঁরা প্রত্যেক বছর পরিকল্পনা করে সকলে একত্র হন। কখনও কলকাতার কাছাকাছি কোথাও। কখনও নিজেদের মধ্যেই কারও বাড়িতে। ওঁরা এটাকে আদর করে বলেন 'মোলাকাত'। আসলে এটা ওঁদের বাৎসরিক পুনর্মিলন উৎসব বা রি-ইউনিয়ন। বাংলা 'পুনঃ' এবং ইংরেজি 'রি' উপসর্গ দুটি বন্ধুদের পছন্দ নয়। তাঁবা বলেন পুনঃ কেন পুনঃ পুনঃ এবং রি কেন আমরা রি-রি-রি ইউনাইটেড হচ্ছি, হচ্ছি না কি? তবে এটা একটা বিশেষ মিলন, স্পেশ্যাল ইউনিয়ন। ছেলেমেয়েরা যখন ছোট ছিল তখন এতে তারাও যোগ দিত। বেশ একটা পিকনিকের মতো হত ব্যাপারটা। কিন্তু এখন তাদের মধ্যে অনেকেই বড় এবং ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, নিজেদের একটা জগৎ তৈরি করে নিয়েছে। মা-বাবাদের হুই-হল্লার মধ্যে আসতে চায় না। কাজেই ইদানীং, দু চার বছর ছেলেমেয়েদের বাদ দিয়েই এঁদের বার্ষিক মোলাকাত হচ্ছে।

এ বছরটা ওঁদের, অর্থাৎ স্বামীদের খুব বন্ধ্যা গেছে। মহীতোষ ছিলেন ব্যারিস্টার, সম্প্রতি জজ হওয়ার পর থেকে তাঁর দুঃখের দিন শুরু হয়েছে। তাঁকে সরকার এ কমিশন ও কমিশনে জুড়ে দিতে থাকছে। তার ফলে এত উল্টোপাল্টা পার্টির উৎপাত শুরু হয়েছে যে আজকাল ঘুমের মধ্যে তাঁকে বোবায় ধরতে শুরু করেছে। অসীমাংশুর সম্প্রতি একটি ল্যাবরেটরি-কমপ্লেক্স পুড়ে গেছে তাঁর এক ছাত্রীর ক্ষমার অযোগ্য অসাবধানতায়। ম্যানেজমেন্ট থেকে তাঁকে চাপ দিচ্ছে ছাত্রীটিকে অর্থাৎ রিসার্চ স্কলারটিকে বরখাস্ত করতে, এদিকে রিসার্চ স্কলাররা ইউনিয়ন করে তাঁকে শাসাচ্ছে এ রকম কিছু করলে তারা ইনস্টিট্যুটের কাজ-কর্ম বন্ধ করে দেবে। অমিতব্রতর সমস্যাটা অন্য ধরনের। মেহরা গ্রুপের হাসপাতালে যারা আসে তারা ধনী বা উচ্চ মধ্যবিত্ত। পান থেকে চুন খসলেই ডজনে ডজনে অভিযোগ-পত্র এসে যায়, তাতে ওকালতি শাসানিও থাকে। তাই যখন তখন তাঁকে মিটিং-এ বসতে হয়। রবিবারে হয়তো একটা নিশ্চিন্ত বিশ্রামের দিন ঠিক করেছেন। আর পনেরো মিনিট পরেই মীনাক্ষী ক্যানটনিজ লাঞ্চ সার্ভ করবে জানিয়ে দিয়েছে। ফোন এল, জুনিয়র মেহরা ফোন করছেন। 'মিঃ বাসু মালিক, ইউ মাস্ট রিচ দা ইনস্টিটুট

উইদিন অ্যান আওয়ার। সাম ফ্রেশ প্রবলেম হ্যাজ ক্রপড আপ। ওহ্ ইয়েস,... দ্য কনফারেন্স রুম...।' অমিত্রব্রতর মুখটা প্রথমে লাল, তারপরেই ফ্যাকাশে হয়ে যায়। প্রথম রঙটা রাগের কারণ, দ্বিতীয় রঙটা 'প্রবলেম'-এর কারণে। সারা বছর এই চলেছে। সীতাপতির তো কথাই নেই। তিনি সম্প্রতি চন্দননগরেও তাঁর নার্সিংহোমের একটি শাখা খুলেছেন। তাঁর সময় বলে কিছু নেই। যখন সময় থাকে, অর্থাৎ নিজের স্বাস্থ্যের জন্য আবশ্যক যে সময়টুকু তিনি বার করতে পারছেন সে সময়ে তিনি একটি দোলনা-চেয়ারে বসে দুলতে দুলতে মিউজিক শোনেন। বাখ কিংবা মোৎজার্ট। দেবুসি কিংবা বিলায়েত। তাঁরা সাদা মসৃণ ক্রমশ সরু হয়ে যাওয়া আঙুলগুলো কোলের ওপর আলতোভাবে ফেলা থাকে। হাতের কাছে থাকে কোনও সুগন্ধি মিশ্রিত দুধের পেয়ালা, শুনতে শুনতে তিনি দুধ খান। হিরণ্ময়ের ব্যস্ততাটা যতটা শারীরিক, তার চেয়ে অনেক বেশি মানসিক। তাঁদের ইউনির্ভাসিটিতে এখন প্রোফেসর শ্রেণীর মাস্টাবমশাইদের পর্যায়ক্রমে বিভাগীয় প্রধান হবার নীতি চালু হয়েছে। আপাতত তিনিই প্রধান, কিন্তু তাঁর ওপরে দু'জন সিনিয়র রয়েছেন, এঁদের মধ্যে একজন আবার তাঁর মাস্টারমশাই। এঁরা দুজন বড়ই অসহযোগিতা করছেন। প্রতিদিন এই চাপা বিদ্বেষ ও অসহযোগিতার আবহাওয়ায় কাজ করতে তাঁকে প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে।

এই সমস্ত নানা কারণে পাঁচ বন্ধু সারা বছর পরস্পরের সঙ্গে মিলতে পারেননি। কমলাকে কিছুদিন সেনগুপ্তর নার্সিং হোমে থাকতে হয়েছিল। সেই সূত্রে সীতাপতির সঙ্গে হিরণ্ময়ের সামান্য দেখাশোনা হয়েছে। কিন্তু বাকিদের পরস্পরের সঙ্গে সামান্য একটু ফোনাফুনি ছাড়া দেখা হয়ইনি বলতে গেলে। এবার জমায়েতের স্থান স্থির হয়েছে কলকাতার কাছেই গঙ্গার ধারে একটি চমৎকার বাংলোয়। বাংলোটি সীতাপতির এক চন্দননগরী রোগীর। খুব জটিল একটি শিরদাঁড়ার টিউমারের অপারেশন করে এঁকে বাঁচিয়েছেন সীতাপতি। ভদ্রলোক অতি-অল্পসংখ্যক ধনী এবং ব্যবসাদার বাঙালিদের অন্যতম। কৃতজ্ঞতায় কী করবেন ভেবে পান না। এই বাংলোটি তাঁর অনেক স্থাবর সম্পত্তির অন্যতম। একেবারে আগাগোড়া ঝকঝকে তকতকে, কেয়ারটেকার এবং ফার্নিচারসমেত। এই বাংলোটিই এবারের জমায়েতের স্থান।

বাংলোটির মজা হচ্ছে 'হুবহু' অক্ষরের মতো এর গড়ন। অর্থাৎ সামনে পেছনে একরকম গড়ন। সামনেও পর্চের ওপর লাল টুকটুকে টালির ঢালু ছাত, তার ওপর মাধবীলতা। চার পাঁচ ভাঁজ মেহগনির দরজার ভেতর দিয়ে ঢুকলে অস্বচ্ছ কাচের ওই রকমই এক সেট দরজা চোখে পড়বে। তারপর প্রশস্ত বসবার ঘর। পেছন দিকটাও ঠিক একরকম। শুধু সামনে সিঁড়ি দিয়ে লনের মধ্যবর্তী সুরকির রাস্তায় নেমে যাওয়া যায়, পেছনের দরজার সিঁড়ি দিয়ে নেমে সামান্য এগিয়ে গেলেই গঙ্গা। বাঁধানো ঘাট। দুধারেও বাঁধানো পাড়ের ওপর পাঁচিল। পাঁচিলের জায়গায় জায়গায় কিছুটা অংশে চৌকোনা গর্ত, তার ভেতরে মাটি ফেলে নানারকম মরশুমি ফুলের সজ্জা। দুটো হল ঘিরে দুটো তিনটে শোবার ঘর, খাবার ঘর। টেবল টেনিস বোর্ড রয়েছে পেছনের হল ঘরে। তবে অন্যান্য

বসবার এবং আরাম করবার মতো আসবাবেরও অভাব নেই। ঘুরে ফিরে সমস্তটা দেখে সকলেই ভীষণ খুশি হলেন। সময়টা শীতের শেষ। চারদিক থেকে হু হু করে হাওয়া আসছে। কিন্তু ধনী এবং উচ্চবিত্তরা সাধারণত এত প্রোটিন, ফ্যাট, এবং শরীর গরম করবার তরল বস্তু খেয়ে থাকেন যে তাঁদের সহজে শীত করে না। সকাল নটার মধ্যেই সকলে যে যার গাড়িতে পৌঁছে গেলেন।

ঈষিতা বললেন—'তুমি যে কেন ছাই ব্যারিস্টারি ছেড়ে জজ সাহেব হতে গেলে। তোমারও তা হলে এরকম ক্লায়েন্ট থাকত।'

মহীতোষ বললেন—'কেন তোমার কি তাতে হিংসে হচ্ছে? ও সীতু, সীতু তোর বউঠানের হিংসে হচ্ছে রে, তোর ক্লায়েন্ট সম্পদ দেখে!'

সীতাপতি হেসে বললেন—'বৌঠানদের হিংসে-ফিংসে হয় না মহী! বৌঠান মানেই এক একটি প্রচ্ছন্ন প্রেমিকা। রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন।'

মহীতোষ বললেন—'ওঃ ওঃ, বুকটা ফেটে যাচ্ছে রে, সীতু, লাইফটা আমার আজ থেকে হেল হয়ে গেল। সন্দেহে সন্দেহে খাক হয়ে যাব।'

সীতা বললেন—'আমার ওবস্থাটাই বা কী সুবিধার হোবে বলুন মহীদা।'

মীনাক্ষী এই সময়ে ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন—'তোমরা কি লনেই ব্রেকফাস্ট করবে? তাই যদি স্থির করে থাকো মনে রেখো, একমাত্র ছায়া-অলা জায়গা রয়েছে ওই পরশ গাছটার তলায়। কিন্তু ওপর থেকে পাখি-টাখি কিছু কম্মো করে দিতে পারে।'

হিরন্ময় মিটমিট হেসে বললেন—'ইন দ্যাট কেস বউদি একটা বাটি আনবেন, বাটি চাপা দিয়ে দেব।'

অমিতব্রত বললেন—'হিরু একটা গল্পের গন্ধ পাচ্ছি যেন?'

হিরন্ময় বললেন—'গল্পটা বালজাকের। এক বেচারি মেয়ের নতুন বিয়ের পর তার স্বামীর তার কিছুই পছন্দ হয় না। রান্না-বান্না, ঘর-গেরস্থালি কিচ্ছু না। সে মেয়েটির বাপের বাড়িব লোককে বলে—কী গছিয়ে দিয়েছো আমাকে? কিস্যু জানে না। কিস্যু পারে না। এদিকে মেয়েটি কাঁচুমাচু মুখে বলছে—সব সময়ে গরম, সুস্বাদু খাবার দিচ্ছি, জামাকাপড় পরিষ্কার রাখছি, ঘর দোর ঝকঝকে তকতকে। তবু ওর কিছুতেই মন পাই না। তখন বাপের বাড়ির লোকেরা বলল—'ঠিক আছে ও একদিন আমাদের সবাইকে নেমন্তন্ন করে বেশ কয়েক পদের ভোজ খাওয়াক। তাহলেই বোঝা যাবে।' নির্দিষ্ট দিনে স্বামীদেবতা ঠিক করলেন বাগানে খাওয়া-দাওয়া হবে। তা তা-ই সই। মেয়েটি টেবিল সুন্দর করে সাজিয়ে খাবার-দাবার সব গুছিয়ে রাখল। নানারকম ভাল ভাল পদ। দেখলেই জিভে জল এসে যায়। সব যখন শেষ, তখন ওপরের গাছ থেকে পাখি কম্মো করল। অতিথিরা এসে বসে আছে। মেয়েটি কী করে? তখন সেই নোংরা জায়গাটার ওপর সে একটা ফুলশুদ্ধু ফুলদানি রেখে জায়গাটা চাপা দিল। এদিকে মেয়েটির স্বামীর সঙ্গে সব অতিথিরা খেতে এসেছেন। অতিথিরা বলতে লাগলেন—'বাঃ এই তো কী সুন্দর টেবিল সাজানো হয়েছে। চমৎকার সব খাবার। গন্ধ বেরোচ্ছে সুন্দর। এতগুলো পদ। আর তুমি কী চাও হে?'

স্বামীর তখন খুব রাগ হয়ে যাচ্ছে, সে রেগে মেগে বলল—'শিট!' তার স্ত্রী তখন চটপট ফুলদানটা সরিয়ে বলল—'এই তো, বিষ্ঠাও মজুত!'

গল্প শুনে সকলেই হো-হো, হো-হো, হি-হি করে হাসতে লাগলেন। সীতাপতি বললেন—'মেয়েদের সামনে, মানে বউদের সমানে গল্পটা বলে তুই ভাল করলি না হিরু! হেনস্‌ফোর্থ আমাদের খাবার টেবিল কীভাবে সাজানো হবে কে জানে!'

আর এক দফা হাসি উঠল।

ততক্ষণে মীনাক্ষীর নির্দেশে লনের ওপরেই ব্রেকফাস্টের বন্দোবস্ত হল। ব্রেকফাস্টের পর গল্পগুজবের সময় পাওয়া যাবে অনেকটা। পাঁচ দম্পতি নানা রকম দলে ভাগ হয়ে কখনও এদিকের লনে কখনও পেছনের গঙ্গার ধারের জমিতে ঘাটটাতে বেড়িয়ে বেড়িয়ে নানা রকম গল্পসল্প করতে লাগলেন। তারপরে কেমন করে কে জানে পাঁচটি স্বামী ও স্ত্রী আলাদা হয়ে পড়ল। দেখা গেল পাঁচ পুরুষ সামনে হলে বসে কে সিগারেট, কে সিগার, কে পাইপ মুখে দিয়ে গল্প করতে বসে গেছেন। আজকে এঁদের অন্য মেজাজ। সীতাপতি হঠাৎ বললেন—'টমোরি হোস্টেলটা উঠে গেল রে!' তাঁর গলার স্বরে হতাশার মেজাজ। দীর্ঘশ্বাস।

মহীতোষ বলল—'তাতে তোর কী? তোর নার্সিং হোমগুলো তো আর উঠে যায়নি!'

সীতাপতি বলল—'তুই বুঝবি না, অসীম বুঝবে, অমুও বুঝবে। আমারা দুটো বছর কাটিয়েছি ওই হোস্টেলে। জীবনের অসীম মূল্যবান দুটো বছর। অমু তোর মনে আছে একটি গ্রাম থেকে আসা ছেলেকে নিয়ে আমরা কী রকম মজা করতুম!'

হিরন্ময় বলল—'তোরা এই তিনটে রাম গরুড়ের অবতার মজা করতিস? কী রকম? কী রকম?' অমিতব্রত বলল—'আরে ছেলেটাকে আমরা কী বলেছিলাম জানিস? খবরদার ভাই সেকেন্ড ক্লাস ট্র্যামে উঠো না। সেকেন্ড ক্লাস ট্র্যাম থামে না!'

'বড় বড় চোখে চেয়ে ছেলেটা বলল—"আরে, ভাগ্যিস বললে, আমি তো খরচ বাঁচাতে সেকেন্ড ক্লাসেই চড়ব ঠিক করেছিলুম।"

'ছেলেটার নির্ঘাত মাথার ছিট ছিল। বাবা গ্রামের বেশ মালদার পার্টি; বুঝলি। মহা কিপ্পুস।'

হাসতে হাসতে অসীমাংশু বললেন—'আর সেই জুলি-বৃত্তান্ত?'

সীতাপতি বলল—'ওঃ, জুলি বলে একটা মেয়ে পড়ত আমাদের সঙ্গে। দেখতে বেশ সুন্দর। তা ওই ছেলেটাকে আমরা সবাই মিলে গ্যাস দিতে লাগলুম—"জুলি তোমার প্রেমে পড়েছে।" তারপর সে ছেলেটার যদি অবস্থা দেখতিস, নাম ছিল বোধহয় কালীপদ। ছেলেটার কেমন ধারণা হয়েছিল জুলি ক্রিশ্চান। ওই নামটার জন্যেই বোধহয়। আর স্কার্ট টার্ট পরত। লিপস্টিক-টিক মাখত। শেষে একদিন কেলেঙ্কারি কাণ্ড। জুলিকে গিয়ে বলেছে—"জুলি দেবী আপনি আমায় ভালবাসেন, আমিও আপনাকে গভীরভাবে ভালবাসি। কিন্তু আপনি যে খৃষ্টান! আমরা চাটুজ্যে বামুন। বাবা শুনতে পেলে খড়ম পেটা করবে যে।" বলে হাউ মাউ করে কান্না!'

হিরন্ময় হাসতে হাসতে বলল—'তারপর? জুলির কী রি-অ্যাকশন?'

—'জুলি? সে তো তক্ষুনি প্রিন্সিপালের কাছে যেতে চায়। প্রিন্সিপাল ছিলেন টেলর, অনেকে বলত টেরর। অনেক কষ্টে কালীর মাথা খারাপ টারাপ বলে জুলিকে আমরা থামাই!'

—'তোরা মহা বিচ্ছু ছিলি তো? সীতু তুইও এর মধ্যে ছিলি?' মহীতোষ বলল।

—'আরে ও-ই তো পাণ্ডা!' অমিতব্রত বলল।

অসীমাংশু বলল—'সেই কালীপদ চাটুজ্জের লেটেস্ট খবর জানিস?'

—'কী? কী?'

অসীমাংশু সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বলল—'কর্নেল ইউনিভার্সিটিতে ভিজিটিং প্রোফেসর হয়ে গেছি, দেখি ফিলসফির চেয়ার পেয়েছে। এবং ক্রিশ্চান তো ক্রিশ্চান একেবারে খাস মার্কিন মেমসায়েব বিয়ে করেছে।'

—'বলিস কী?' হিরন্ময় বলল।

—'লাইফ ইজ লাইক দ্যাট'—অসীমাংশু বলল, 'আরও শুনবি টমোরির ব্রাইটেস্ট বয়, যে সেবার ম্যাথামেটিকসে ঈশান স্কলার হল, সীতু ডু ইউ নো হোয়াট হ্যাজ হ্যাপন্‌ড টু হিম!

—'কী? রাইটার্সের কেরানি?'

—'আজ্ঞে না। প্রোফেসর ছিল। এক্সট্রীমিস্ট পলিটিক্‌স... জেল, ডেড।'

হিরন্ময় বলল—'তুই কি প্রমথেশের কথা বলছিস?'

—'হ্যাঁ।'

সবাই কিছুক্ষণ চুপ। জীবনে সার্থকতা আর ব্যর্থতার মানেই বা কী? তার মূল্যায়নও কীভাবে সম্ভব। সবাইকার মনেই এই প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছে।

মহীতোষ বলল—'তোরা সব চুপ মেরে গেলি যে! আরে বাবা, নিজেরাই তো বলছিস লাইফ ইজ লাইক দ্যাট! টেক ইট ইজি, টেক ইট ইজি।'

হিরন্ময় একটু বিষণ্ণ হেসে বলল—'তুই কতজনকে কত রকমের শাস্তি দিচ্ছিস মহী। তুই হয়তো কঠিন হয়ে যেতে পেরেছিস। কিন্তু এরা মানে অসীম আর অমু আমাকে ডক্টর প্রমথেশ সাহার মুখটা মনে পড়িয়ে দিল। কী আপনভোলা, ইনট্রোভার্ট ছিল, টিপিকাল ম্যাথমেটিশিয়ানদের মতো। ছাত্রদের মধ্যে প্রচণ্ড সুনাম, যখন তখন মফঃস্বলের কলেজে বদলি করে দিত। হেলদোল নেই। ভাল ছাত্র সেখানে পেত না। কুছ পরোয়া নেই। বলত—'আরে বাবা অঙ্ক হচ্ছে রীজনের জিনিস। মাথার মধ্যে রীজনটুকু থাকলেই হল। তার পরেরটুকু টিচারের কাজ। সেই লোক, ওইরকম ডেডিকেটেড টু ম্যাথমেটিকস, রেভোলুশন করতে নেমে পড়বে, আমার আজও বিশ্বাস হয় না। আমার এখনও মনে হয় হি ওয়জ ফ্রেমড।'

মহীতোষ বলল—'ফ্রেমড? কেন? কার স্বার্থ?'

—'আরে বাবা। যে মাস্টার কলকাতার বেস্ট কলেজেও তার কাছ থেকে জিনিস

নেবার মতো ছাত্র চট করে পেত না, তাকে মফঃস্বলে রাখবারই বা মানে কী? যেই প্রেসিডেন্সিতে এল, প্রোফেসর পোস্ট পেয়ে গেল, হঠাৎ সে প্রচ্ছন্ন বিপ্লবী হয়ে গেল! কোনও বিচার না। কিচ্ছু না। সোজা জেল! তারপরেই ডেড?'

—'তোদের শিক্ষা-জগৎ এমনি নোংরা?' মহীতোষ বলল।

—'সবাইকার সব জগৎ-ই এখন নোংবা, করাপ্ট, মহী তুইও তার থেকে বাদ যাস না, আমরা কেউই যাই না। সবাই সিসটেমের দোহাই দিই। কিন্তু সিসটেমের ছোটখাটো অংশ হিসেবেও আমাদেব যেটুকু কববাব তা আমরা করি না', অসীমাংশু বলল।

অমিতব্রত হঠাৎ কী রকম—রোমন্থনের গলায় বলে উঠল—ওহ মহী সেই সরস্বতী ইনস্টিটুশনের দিনগুলোর কথা মনে কর। কতদিন আগে। কত দূরে। অসীমকে বাংলার মাস্টারমশাই কী নামে ডাকতেন মনে আছে!' মহী বলল—'মনে আবাব থাকবে না? সরস্বতীর বরপুত্র। সংক্ষেপে সরস্বতী। যে প্রশ্নের জবাব কেউ দিতে পারবে না, সে প্রশ্ন অমনি রি-বাউণ্ড হয়ে সরস্বতীর বরপুত্রর কাছে চলে যাবে। কী রে অসীম, এমন কোনও প্রশ্ন আছে যেটার উত্তর দিতে পাবিসনি?

—অবিমৃশ্যকারী বানানটা ভুল লিখেছিলাম, এইট থেকে নাইনে উঠতে। সরোজশোভনবাবু মাথা নাড়তে-নাড়তে বলেছিলেন, নাঃ, বাংলায় লেটারটা তোর হল না।'

—'হয়েছিল?'

—'নাঃ, চ্যালেঞ্জটা নিয়েছিলুম, তা-ও হয়নি!'

মহীতোষ বলল—'আমি কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে সাকসেসফুল হতে পেরেছিলাম। তোদের মনে আছে ক্লাস নাইনে হেড স্যাব আমার এসে'র খাতাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেছিলেন—"আই ডিডন'ট এক্সপেক্ট দিস ফ্রম ইউ।" এসেটা আমি চোদ্দবার লিখেছিলুম। ফোর্টিন টাইমস। আনটিল হি ওয়াজ স্যাটিসফায়েড। লেটারটা আমি পেয়েছিলুম। আই জাস্ট মেড ইট।'

অমিতব্রত বলল—'পণ্ডিতমশাই আমাকে কী বলে ডাকতেন তোদের মনে আছে?'

হিবন্ময় বলল—'অফ কোর্স। অহিতব্রত। সত্যি তুই ক্লাসে কী কাণ্ডটাই করতিস। ব্যাগ বদলাবদলি করে রাখা। এর তার টিফিন খেয়ে খালি টিফিন কৌটোয় ঢিল পুরে রাখা, পকেটের মধ্যে আবশোলা ভরে দেওয়া। কী করে করতিস রে ওগুলো? আবার বেশিব ভাগই ওই দোর্দণ্ডপ্রতাপ পণ্ডিতমশায়ের ক্লাসে।'

অমিতব্রত বলল—'আরে আমি তো পণ্ডিতমশায়ের পড়া কিস্যু শুনতুম না। আর তোরা অখণ্ড মনোযোগ শুনতিস। বেশির ভাগই। তাইতেই আমার সুবিধা হয়ে যেত। তবে শুধু এই জন্যেই পণ্ডিতমশাই আমার নাম বদল করেননি। মনে আছে সেই উপসর্গের ছড়াটা?'

মহীতোষ বলল—'ওই ইয়েস। প্রপরাপসমন্বব নির্দুর ভিব্যধি...'

অমিতব্রত বলল—'হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি ইচ্ছে করে প্রপরাপসমন্বব বলে তোতলাতে থাকতুম নি... নি... নি, মনে পড়ছে?

মহীতোষ হেসে বলল—'দারুণ অ্যাকটিং করতিস তো? আমরা ভাবতুম বুঝি সত্যিই তোর মনে নেই।'

অমিতব্রত বলল, 'বাস তাইতেই খেপে গিয়ে পণ্ডিতমশাই বললেন—'দেবভাষাকে যে এমন তাচ্ছিল্য করে তার ব্রত অমিত হবে না ভস্ম হবে। যেমনি অহিত করে বেড়াচ্ছিস এমনিই সারাজীবন করে বেড়াবি।'

হিরন্ময় বলল—'আহা পণ্ডিতমশাই যদি দেখতেন তুই এখন হসপিটাল পরিচালনা করছিস, তাহলে নামটা আবাব পাল্টে দিতেন, নিশ্চয় আদর করে ডাকতেন হিতব্রত।'

—'হিরুকে পণ্ডিতমশাই খুব ভালোবাসতেন। সবাই-ই ভালোবাসতেন। পড়াশোনায় আমরা সবাই মোটামুটি ভাল ছিলুম। কিন্তু হিরুর ওপর যেন পক্ষপাতটা একটু বেশি হয়ে যেত, কেন রে হিরু?' মহী বলল।

হিরন্ময় বলল—'অন্যদের কথা বলতে পারব না তবে পণ্ডিতমশায়ের কথাটা ভাল মনে আছে। একদিন ক্লাসে টাস্‌ক দিয়েছেন। টাস্‌ক শেষ করে চুপিচুপি একটা বই খুলে বসেছি। এদিকে পণ্ডিতমশাই তো সারা ক্লাস টহল দিতে আরম্ভ করেছেন। কখন আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাবপরেই হুংকার—'তাই বলি এ বৎসের এত মনোযোগ কেন? গল্পগ্রন্থ পড়া হচ্ছে? টাস্‌ক কী হল? ভাষান্তর করতে দিয়েছিলাম কী হল? আমি বললুম, 'হয়ে গেছে সার', বলে খাতাটা এগিযে দিলুম। তখন বললেন—'দেখি গল্পগ্রন্থটি কী? নিশ্চয় 'দস্যু মোহন'।

সীতাপতি বলল—'হ্যাঁ হ্যাঁ ওই সিরিজের বইগুলো পকেটেব মধ্যে দিব্যি ঢুকে যেত। অনেকেই ক্যারি করত। পণ্ডিতমশাই হাড়ে-চটা ছিলেন ওই সিরিজের ওপর। বলতেন, 'একে অশ্লীল, তায় ভাষার উপর সামান্যতম দখলও নাই। এগুলি পড়লে তোরা গুষ্টির পিণ্ডি শিখবি। যা শিখেছিস তা-ও ভুলে যাবি।"—তা তারপর?'

হিরন্ময় বলল—'তারপর আর কী? দেখলেন গীতা মানে শ্রীমদ্ভগবদগীতা দ্বিতীয় অধ্যায় খুলে বসে আছি। বললেন—"গীতা পড়ছিস তুই? গীতা পড়ছিস? বৎস?"

বললাম—'হ্যাঁ সার বাড়িতে পড়ছিলাম, এতো ভাল লাগছিল তাই ছাড়তে পারছিলাম না। স্কুলে নিয়ে এলাম। অবসর সময়ে পড়ব বলে। পণ্ডিতমশাই বললেন—"বাষট্টি তেষট্টি শ্লোক পর্যন্ত তোর পড়া হয়ে গেছে? বুঝতে পারছিস?"

'ধ্যায়তো বিষয়ান পুংসঃ সঙ্গস্তেযুপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ
ক্রোধোহভিজায়তে।
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশ বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।

বুঝলি? সম্মোহ মানেও কার্যাকার্য বিষয়ে বিভ্রম বুদ্ধিনাশ অর্থও তাই। দুটির পার্থক্য অনুধাবন করতে পেরেছিস?'

অমিত বলল—'হ্যাঁ হ্যাঁ। তারপর শংকর, তিলক, পাতঞ্জল যোগসূত্র কত কী বলতে আরম্ভ করলেন, সে এক বিরাট লেকচার। আর আমরা তোকে অভিশাপ দিতে লাগলুম।'

সীতাপতি বলল—'না, না, পুরোটা অভিশাপ মোটেই দিইনি। আমাদের ট্রানস্লেশন আর শেষ করতে হল না। এইটে লাভের দিক ছিল।'

মহী হঠাৎ চিন্তাকুল স্বরে বলল—'হিরু, তোর মনে আছে "সম্মোহ" আর "বুদ্ধিনাশ" এর কী পার্থক্য পণ্ডিতমশাই করেছিলেন?'

হিরু বলল—'মনে আছে। সম্মোহের অর্থ করেছিলেন কোনও বিষয়ে অত্যধিক ঝোঁক, আর বুদ্ধিনাশ মানে নিশ্চয়াত্মিকা মনোবৃত্তি, অর্থাৎ কোনও ঘটনা ঘটলে তাতে ঠিক কীভাবে রি-অ্যাক্ট করতে হবে, এই জ্ঞান লোপ পাওয়া।'

মহীতোষ বলল—'ঠিক বুঝলুম না।'

—'ধর তোর খুব রাগ হল কারও ওপর, তাকে তোর খুন করতে ইচ্ছে হল, এই যে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য ঝোঁক এটাকেই উনি সম্মোহ বলেছিলেন। রাগের বশে খুন করবার ঝোঁক চাপল অমনি তোর কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেল, মহাজনরা এ বিষয়ে কে কী বলেছেন সব ভুলে গেলি, স্মৃতিবিভ্রম হল, তারপর বুদ্ধি যে তোকে কার্য অকার্য বিষয়ে জ্ঞান দেয় সেইটি লোপ পেল এইটা হল বুদ্ধিনাশ। খুনটা করে ফেললি। তারপর ফাঁসি অর্থাৎ প্রণশ্যতি।'

অমিত বলল—'হিরু আর মহী তোরা দুজনে মিলে তো দেখছি পণ্ডিতমশায়ের টোলে গীতার ক্লাস আরম্ভ করে দিলি রে।'

মহীতোষ বলল—'উই হ্যাভ রিচ্‌ড দ্যাট স্টেজ অমু, অস্বীকার করবার চেষ্টা করে তো লাভ নেই।'

মহীতোষের মেজাজ পাল্টে যাচ্ছে দেখে সীতাপতি তাড়াতাড়ি বলল—'তা হিরু, এই-ই তোর ট্রেড সিক্রেট! এই করেই তুই পণ্ডিতমশায়ের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলি? পুরো ধাপ্পাবাজি?'

হিরন্ময় হেসে বলল—'পুরোটা ধাপ্পা বলা কি ঠিক হবে? গীতাটা ক্লাসে নিয়ে গিয়ে খুলে বসাটা ধাপ্পা হতে পারে, কিন্তু তোরা তো জানিস আমাদের বাড়িতে সংস্কৃতর চর্চা ছিল, জ্যাঠামশাই সংস্কৃতের পণ্ডিত ছিলেন, বাবার অন্য পেশা হলেও সংস্কৃত কাব্য-শাস্ত্র এসবের ডিগ্রি বা উপাধি ছিল, দুজনের মধ্যে অনবরত এসব বিষয়ে আলোচনা তর্কাতর্কি হত, তার থেকেই অনেকটা তোতা পাখির মতো শেখা ছিল আমার। কাজ-চলা গোছের আর কি! কিন্তু সীতু তুইও তো মাস্টারমশাইদের খুব প্রিয়পাত্র ছিলি। তোর ট্রেড সিক্রেটটা কী? চেহারা? এখন অবশ্য তুই খুব সুপুরুষ হয়েছিস তখন কিন্তু স্কুলে নাটক হলেই তোকে মেয়ে সাজতে হত। প্রথম ক্লাসে এসেই পণ্ডিতমশাই বলেছিলেন—'কী বৎস ত্বকটি তো খুবই মসৃণ দেখছি, তুবরক হলেও হতে পারো, দেখো আবার ফলম ফলে ফলানি নয় তো? ফল বলতে উনি কী মিন করতে চেয়েছিলেন বুঝেছিস তো?'

সীতাপতি বলল—'কেন বুঝব না? মাকাল ফল।'

—'আর তুবরকটা কী?'—অমিত বলল।

—'তুঘলকের ভাই-টাই না কি?' চারবন্ধুই হেসে উঠল। মহীতোষ বলল—'আরে তুবরক মানে মাকুন্দ।'

সীতাপতি করুণ মুখ করে গালে হাত বুলিয়ে বলল—'পণ্ডিতমশায়ের ভবিষ্যদ্বাণী পার্শিয়ালি ফলে গেছে মনে হচ্ছে। কত কামিয়ে কামিয়ে যে সামান্য একটু দাড়ি গোঁফ বার করতে পেরেছি, তা যদি জানতিস। স্কুল ফাইনাল হয়ে গেল, তখনও গোঁফ গজাচ্ছে না দেখে, রোজ ক্ষুর টানতে শুরু করলুম। না হলে কলেজেও সীতা-সাবিত্রী নামটা চালু হয়ে যেত।'

—'তা সে যাই হোক, তুমি মাস্টারমশাইদের ব্লু-আইড-বয় হয়েছিলে কোন ধাপ্পা দিয়ে হে?' অমিত বলল।

মিটিমিটি হেসে সীতাপতি বলল—'তার সঙ্গে আমার পড়াশোনা বা স্কুল-সহবতেব কোনও সম্পর্ক নেই।'

—'তবে?'—অসীমাংশু বলল।

—আমার বাবা নাম করা কবিরাজ ছিলেন, মনে আছে? মাস্টারমশাইদের কারও অসুখ করলেই আমাকে এসে ধরতেন চুপিচুপি। আমিও তাঁদের বাবার কাছে নিয়ে যেতুম। দক্ষিণা দিতে গেলে, বাবা হাতজোড় করে জিভ কেটে বলতেন—'আপনি আমার পুত্রেব আচার্য। আপনার কাছ থেকে দক্ষিণা নিলে আমার নরকেও স্থান হবে না।'

—'তাই বলো,' অমিতব্রত বলল—'তুমি ডুইব্যা ডুইব্যা জল খাও।'

সবাই হাসতে লাগল।

এই সময়ে মস্ত বড় ট্রেতে পাঁচ পাত্র সুদর্শন পানীয় এবং তার সঙ্গে প্রচুর বাগদা চিংড়ি ও চিকেন ভাজা নিয়ে বেয়ারা উপস্থিত হল।

'হুর রে—' অমিত বলে উঠল—'বকেবকে গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, ঠিক সময়ে এসে হাজির হয়েছে।'

'কী বস্তু দিয়েছে রে?'—সীতাপতি বলল। মহীতোষ বলল—'চিন্তার কিছু নেই, আমার গিন্নি আর অমিতের গিন্নি মিলে নিশ্চযই এক দারুণ ককটেল বানিয়েছে। পরিতৃপ্ত করবে, কিন্তু হৃদয়কে উত্তেজিত করবে না, মস্তিষ্ককেও বিভ্রান্ত করবে না। অর্থাৎ নিদার সম্মোহ নর বুদ্ধিনাশ। চিয়ার্স।' প্রথম গ্লাসটি তিনিই তুলে নিলেন।

এঁদের মধ্যে একমাত্র সীতাপতিই দুধের সঙ্গে ব্র্যান্ডি ছাড়া আর কোনও রকম মাদক স্পর্শ করেন না। অনেক জটিল, সূক্ষ্ম অপারেশন করতে হয়। যখন তখন নার্সিংহোমে ডাক পড়ে। তাঁর এসব খেলে চলে না। খান না বলে সহজেই তিনি কাতও হন। আজকের দিনটা বিশেষ দিন বলেই এই ব্যতিক্রম।

অমিত বলল—'তুই জাস্ট আমাদের কমপ্যানি দে। নইলে বেহেড হয়ে যাবি।'

সীতাপতি বলল—'তাহলে দাঁড়া আমাদের ইমপর্টান্ট কাজটা আগে সেরে ফেলি।' সে উঠে গেল। কেয়ার-টেকারের সঙ্গে ফিসফিস করে কী সব আলোচনা করল, তারপর একটি বড় শোবার ঘরে তার হাত-ব্যাগ শুধু ঢুকে কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এল। এসে সে

একটু ইতস্তত করে, পড়ে থাকা গ্লাসটি তুলে নিল। প্রথম চুমুক দিয়েই সীতাপতি বলল—'চমৎকার খেতে হয়েছে তো! এই ককটেলের কেমিস্ট্রিটা কী? হ্যাঁরে মহী!'

মহী বলল—'বাব্বা। গিন্নিদের কেমিস্ট্রি! শালা, তুমিই ডাক্তার হয়ে বুঝতে পারছ না। অসীমও চুপ মেরে রয়েছে, আর আমি সায়েন্সের ধারে কাছেও কোনও দিন যাইনি, আমি বুঝতে পারব!' সীতু দেখল মহীর গ্লাসের পানীয় অনেক কমে গেছে। সীতু বলল—'এই মহী, খালি পেটে খাসনি, কিছু খা আগে!'

মহী বলল—'আমার গিন্নি জানে, তুই ভী জানিস চিংড়িতে আমার অ্যালার্জি আছে। শেল অ্যালার্জি। কাঁকড়া, ডিম কিস্যু খেতে পারি না। তা সত্ত্বেও তোর পেশেন্ট আর আমার গিন্নি মিলে চিংড়ির চাট সাপ্লাই করেছে। ষড়যন্ত্রটা কি আমি ধরতে পারিনি ভাবছিস!'

এই সময়ে বেয়ারা আরেক ট্রে ভর্তি পানীয় নিয়ে এল। যাদের যাদের গ্লাস খালি হয়েছে, সেগুলো তুলে নিয়ে গেল।

সীতু বলল—'চিকেনও তো রয়েছে। খা। না! খা!'

মহী বলল—'ধুর। ও চিকেনও শালা ডিমে ডোবানো। তোদের সবার কথা ভাবল আমার বউ, খালি আমার কথাটাই ভাবল না।'

অসীম খান দুই চিংড়ি মুখের মধ্যে চালান দিয়ে গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে বলল—'তোরা সারাক্ষণ সরস্বতী ইস্কুলের মাস্টারদের বদনাম করছিলি, আমি কিচ্ছুটি বলিনি, তোরা ছলে-বলে বললি আমার ওপর পার্শিয়ালটি হত, তখনও কিছু বলিনি। দেখছিলুম শেষ পর্যন্ত কী হয়, হেড সার মহীর খাতা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন, বললি, তখনও কিছু বলিনি, পণ্ডিতমশাই অমিতের নাম বদলে অহিত দিয়েছিলেন, হিরু পণ্ডিতমশাইকে ধাপ্পা দিয়েছিল কনফেস করল, ে: তখনও আমি শেষ পর্যন্ত শুনে যাচ্ছি, কিন্তু সীতুর কথাটা শুনে আমার মনে বড্ড দুঃখু হচ্ছে রে!'

সীতু বলল, 'কেন? আমি এমন কী বলেছি যাতে তোর দুঃখ হবে?'

—'তুই হিন্ট দিলি না গরিব মাস্টারমশাইদের বিনি পয়সায় চিকিৎসার লোভ দেখিয়ে তুই হাত করতিস! বেশি নম্বর আদায় করতিস?'

সীতু বলল, 'বেশি নম্বর আদায় করতুম আবার কবে বললুম।'

'তুই বলিসনি কিন্তু আমি ধরে ফেলেছি। ফাইনাল পরীক্ষায় এমন গাব্বু খেলি কেন রে? ক্লাসে বরাবর সেকেন্ড প্লেস পেতিস। আমি ফার্স্ট, তুই সেকেন্ড, হিরু থার্ড, মহী ফোর্থ আর অমু ফিফথ্। প্রায় সব সময়েই এই অর্ডার আসত। অথচ ফাইনালে তুই স্কলারশিপ শুদ্ধু পেলি না। খালি সায়েন্সে লেটার।'

সীতু বলল—'সে আমি আমার ঠিক লাইনটা পাইনি তাই। ডাক্তারিতে গিয়ে প্রথম থেকেই শাইন করেছি। তা ছাড়া শুধু সায়েন্স কেন, জোগ্রাফি আর সংস্কৃতেও আমার প্রায় লেটারই ছিল।'

—'সে তুই পণ্ডিতমশাইকে বাড়িতে রেখে সব আনসার, সব ট্র্যান্সলেশন করিয়ে নিতিস। মেমরিটা তোর বরাবরই ভাল। আর আঁকার হাতটাও ছিল, তাই কোনওক্রমে

সংস্কৃত আর ভূগোলের মার্কস তুলেছিলি। বড়লোক কবরেজের ছেলে। তোর আর ভাবনা কী!'

সীতু হেসে বলল—'তো ঠিক আছে। বড়লোকের ছেলে .আমার কোনও ভাবনা ছিল না, তা অ্যাদ্দিন পরে তুই সেসব কথা মনে করে দুঃখু পাচ্ছিস কেন? তা ছাড়া তোর ফার্স্ট হওয়া তো আমি কোনদিনই আটকাতে পারিনি, অঙ্কের বনোয়ারিবাবুকে মাস্টারমশাই রেখেও।'

অসীম বলল—'সে বনোয়ারিবাবু ছিলেন ইনকরাপ্টিবল। অসুখ করলেই নিজে নিজে হোমিওপ্যাথিক গুলি খেয়ে ভাল হয়ে যেতেন। নিজের জন্যে আমি কোনদিন কান্নাকাটি করিনি রে। হিরু, মহী এরাও তো আমার বন্ধু। তোর জন্যে ওরা কোনদিন স্কুলের প্রাইজগুলো পেল না। সেকেন্ড প্লেসের পর আর তো প্রাইজ দিত না! ওদের কথা মনে করে কান্না পায়, সত্যি বলছি রে মহী, তুই জজ হয়েছিস বটে। কত লোকের হাতে মাথা কাটচিস, কিন্তু তোর ইস্কুলের একটা প্রাইজ নেই। মাইরি তুই ছেলে-মেয়ে-বউয়ের কাছে মুখ দেখাবি কী করে?'

মহী হাতের একটা মাছি তাড়ানোর মতো ভঙ্গি করে বলল—'ও সব যেতে দে। যেতে দে। পুরনো কাসুন্দি কে ঘাঁটে! এখন যদি সীতুর এগেনস্টে কোনও কেস আমার কোর্টে আসে তো দেখে নেব ব্যাটাকে। কথা দিচ্চি তোকে, অসীম, কথা দিচ্চি, এই তোর মাথায় হাত দিয়ে দিব্বি গাললুম। তুই মাইরি চোখ মুচে ফ্যাল।'

অসীম বলল, 'আরও দুক্খু আচে রে। দুক্খে আজ বুকখানা ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্চে। তোর মনে আচে ওই সব মাস্টারমশাই প্রত্যেক বছর যাঁরা কমপিট করা স্কলারশিপ পাওয়া ছাত্তর বার করতেন তাঁরা সব কী গরিব ছিলেন! অকিঞ্চনধন ভট্টাচায্যি, প্রফুল্লকমল চম্পটি, অম্বিকাসাধন তরফদার, বিজনবিহারী চক্কোত্তি! সব সমাসবদ্ধ অদ্ভুত অদ্ভুত বড় বড় নাম। পড়াতেন দারুণ, খাটতেন কী! তারপর টুইশানি, টুইশানি, টুইশানি। জামাকাপড় আধময়লা, মুখে খামচা খামচা দাড়ি, আমরা সবাই আজ কত বড় হইচি। কিন্তু দ্যাখ, গুরু দক্ষিণা দিইনি। কেউ একবারও মনে করি না। অথচ গুরুকুলের যুগে যদি জন্মাতাম তাহলে গুরুদক্ষিণার জন্যে, গুরুদেবকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে কী না করতে হত। জলের পাশে আল হয়ে শুয়ে থাকা, উপোস করে গরু-চরানো, আকাশ-পাতাল টুঁড়ে গুরুর বউয়ের জন্যে কানবালা এনে দেওয়া....। বল!'

অমু এই সময়ে বলে উঠল—'তা ছাড়া পাশ করে বেরোবার পরে আমাদের একটা সংবর্ধনা দিয়েছিলেন মাস্টারমশাইরা তোদের মনে আচে? সরোজশোভনবাবু ভাল বক্তৃতা দিতে পারতেন। উনি বললেন, পণ্ডিতমশাই বললেন, হেড স্যার বললেন। সবাই বললেন—"আমরা তোমাদের এতদিন যত তিরস্কার করছি, গাঁট্টা মেরেছি, কু-বাক্য বলেছি—সবই ভুলে যাও বাবারা। সবই তোমাদের ভালর জন্য। মঙ্গলের জন্য। যাতে বিপথে না যাও। মন নিজের বিষয়ে স্থির রাখতে পারো। আরও পারদর্শিতা লাভ করো। সেই জন্য।" তোরা বলছিলি না এখন দেখলে পণ্ডিতমশাই আমায় অহিতব্রত বলতেন,

মনে পড়ে গেল, সত্যি সত্যিই মাথার টিকি দুলিয়ে, আমায় আদর করে উনি বললেন—"তোমাকে শান্ত করবার জন্যই ওরূপ নামকরণ করেছিলাম। দুরন্ত ছেলেরা সাধারণত অদ্ভুতকর্মা হয়, পৃথিবীর আপামর সাধারণের মঙ্গল করে, উদাহরণ শ্রীচৈতন্য। আজ থেকে তোমার নাম আমার কাছে হল হিতব্রত।"

এই সময় বেয়ারা তৃতীয়বার পানীয় রেখে গেল। হিরু খেলে একটু গুম মেরে যায়। সে এই সময়ে একটু জড়ানো স্বরে বলল—'তাহলে তো অমু তোর অন্তত কোন দুঃখু থাকতে পারে না। চৈতন্যের মতো না হলেও তুই মানুষের হিত সাধন করবার জন্যে কী দৌড়োদৌড়িটাই না করছিসে। আমরা তো দেখতে পাচ্চি। তুই সত্যি-সত্যিই হিতব্রত হইচিস। পণ্ডিতমশাই কী প্রফেট ট্রফেট ছিলেন নাকি রে?'

এই সময়ে অমু হঠাৎ ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কেঁদে উঠল।

অসীম বলল—'কাঁদিস নে অমু, কাঁদিস নে, তোরও বুকটা ফেটে যাচ্চে আমি টের পাচ্চি। আমি তোর সমবেথী। বিশ্বাস কর।'

অমু ফোঁপানির মাঝে মাঝে বললে—'পণ্ডিতমশাই প্রফেট ছিলেন ঠিকই। কিন্তু ভাই ঝোঁকের মাথায়, আমার কাজ-কম্মো দেখে যে নাম দিয়েছিলেন, বোধহয় সেটাই আমার সম্পর্কে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী রে—অহিতব্রত। আমি অহিতব্রত।'

—'কেন এমন কথা বলচিস?' এতক্ষণে সীতাপতির জিভও জড়িয়ে এসেছে। সে মাঝে মাঝে ভেতরের একটা অদম্য আবেগে খিলখিল করে হেসে উঠছে। কিন্তু অমুর ফোঁপানি যেন প্রায় কান্নায় পরিণত হয়েছে। সে বলল—'পণ্ডিতমশায়ের পদবীটা কী ছিল যেন রে?'

মহী বলল—'মিশ্র। ভবানীপ্রসাদ মিশ্র।'

—'যাঃ, তাহলে হয়ে গেল' বলে অমু হু হু করে কেঁদে ফেলল। বন্ধুদের সাধ্যসাধনায় সে মুখ খুলল, বলল—'জানিস তো সাহানগরে একটা ফ্ল্যাট করেছি। প্রেমোটারের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেল। জমিটা অনেক কাল ধরে পড়েছিল। প্রোমোটার বেটা মাটিতে ভাত খেত এমনি অবস্থা। কোথা থেকে সি এম ডি-এর কনট্র্যাক্ট যোগাড় করেছে, তো কী বলব ভাই সেই সি এম ডি-এর মালেই পুরো মাল্টিস্টোরিডখানা উঠে গেল। আমার ফর্টি পার্সেন্ট শেয়ার। তো চল্লিশখানা ফ্ল্যাটের ষোলোখানাই আমার। বেচে মোটা লাভ করেচি ভাই, তা লাস্টখানা বেচলুম—এই মাস কয়েক আগে এক মাস্টারমশাইকে। নাম শিবানীপ্রসাদ মিশ্র।'

বলে অমু হু হু করে কেঁদে উঠল।

—'তো কাঁদচিস কেন? ভাল করেচিস তো?'

—'না রে এ নির্ঘাত সেই পণ্ডিতমশায়ের ছেলে। টিকিফিকি নেই বটে শার্ট-প্যান্ট পরা। কিন্তু নিপাট ভালমানুষ। কেমন নিরীহ-নিরীহ। নইলে ভাল করে না দেখে শুনেই ছ'লাখ টাকা গ্যাঁট-খর্চা করে ওই ফ্ল্যাট কিনে নিলে?'

—'কেন কী ফ্ল্যাট? কী ব্যাপার বল দিকিনি?' সীতু ততক্ষণে চেপে ধরেছে।

অমু বলল—'আরে তিনতলার বেশি তোলবার পার্মিশান ছিল না আমাদের। প্ল্যানও

স্যাংশন হয়নি, তা পোদ্দার বলে ওই লোকটি বললে—সব ঠিক সামলে নেবে, আমিও রাজি হয়ে গেলুম। এখন দ্যাখ, ওই মিশ্রর ফ্ল্যাটটা পড়েছে চারতলায়। আমার খুড়তুত ভাইয়ের নামে জমি, সে তো কানাডায় সেটলড। জমি বিক্রির টাকা বলে তাকে থোক কিছু ধরিয়ে দিয়েছিলুম গতবার। আমাকে খুউব বিশ্বাস করে। পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিয়ে দিয়েছিল। আর বোধহয় আসবে না। এবারেই তো এসেছিল দশ বছর পর। উ হু হু হু। লোকটা আমাদেরই বয়সী হবে। বললে নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের পৈতৃক বাড়ি-বেচা টাকা! সীতু তুই তো পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে পড়তিস। কোথায় থাকতেন জানিস?'

সীতু বললে—'উনি তো আমার বাড়ি এসে পড়িয়ে যেতেন। কোনওদিন ওঁর বাড়ি যাইনি তো। তবে কাচাকাচি থাকতেন নিশ্চয়ই। হতেও পারে নবকেষ্ট স্ট্রিট! কিম্বা লাহা কলোনি।'

মহী বললে—'কাঁদিস নে অমু কাঁদিস নে। দেখ চেষ্টা-চরিত্তির করে ওই মিশ্র না শর্মাকে টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে যদি এখনও বাঁচাতে পারিস। কিন্তু আমি যা করিচি তার আর চারা নেই রে অমু চারা নেই!'

—'তুই আবার কী করলি? তুই বলে সাক্ষাৎ মহাধিকরণের লোক। দেশের জুডিশিয়ারি তোর হাতে!' সীতু বলল।

মহী বলল—'জুডিশিয়ারি! হায় হায় রে অমু, হায় রে সীতু আমরা হলুম গিয়ে মকিং বার্ড, জুডিশিয়ারির মকিং বার্ড। যখন ব্যারিস্টারি করতুম তখন সাংঘাতিক এক গৃহবধূ-হত্যার মামলায় আসামী পক্ষে ছিলুম মনে আচে?'

হিরু বলল—'হ্যাঁ, হ্যাঁ বিখ্যাত, ইনফ্লুয়েনশিয়াল লোক, তুই তো কেস ড্রিবল করে করে ঠিক গোল মেরে দিলি। আমরা সবাই তাজ্জব হয়ে গেছিলাম।'

মহী বলল—'আসল খুনির হাত থেকে বন্দুকের বারুদের দাগ আমি দাঁড়িয়ে থেকে তোলাই। খুনের দায়ে তার ভাই এখনও যাবজ্জীবন জেল খাটচে।'

—'বারুদের দাগ তুলে ফেললি? সে সব করা যায়!'

—'ফরেনসিক টেস্টে স-ব ধরা যায়। তুলে ফেলাও যায়।'

হিরু সংক্ষেপে বলল—'তোমাদের ল' এর লাইন বড় বেয়াড়া।'

—'আরও আচে, আরও আচে'—মহী ডুকরে উঠল—এখন আর কাউকে প্রশ্ন করতে হচ্ছে না, মহী নিজের পেছনে সরে যাওয়া কোঁকড়ানো চুল আঁকড়ে ধরে বললে—'ঘুঘুড়িতে গণ ধর্ষণ হয়েচিল মনে আছে? এনকোয়ারি কমিশন বসাল গভর্নমেন্ট। বাস আমাকে বসিয়ে দিলে চেয়ারে। সব কটা বাঞ্চোৎকে আইডেনটিফাই কত্তে পেরেছিলুম, ছেড়ে দিলুম রে ছেড়ে দিলুম। অথচ মেয়েগুলো আমাকে 'বাবা' বলে ডেকেচিল। সে কী কান্না, অত্যেচারের চিহ্ন। কী হতাশা আর ভয় মেয়েগুলোর। ধারণা করতে পারবি না। বললে—'এই দেখুন বাবা মাটির দেয়াল, টিনের দরোজা আগড় লাগে না, এক লাতিতে খুলে যায়। একন যদি শাস্তি না হয়, আবার এমনি করবে। সারাদিন খেটেখুটে ভয়ে রাতে ঘুমোতে পারিনে। তাদের আশ্বাস দিয়েছিলুম—ধরবই শাস্তি দেবোই। দিইনি। দিইনি রে...' বলে মহী মুখখানাকে নিচু করে ফেলল।

—'কেন? দিসনি কেন? পলিটিকাল প্রেশার নিশ্চয়ই।' —হিরু বলল।

—' সোজাসুজি কেউ কিছু বলেনি। অ্যান্ড জুডিশিয়ারি শুড অলওয়েজ বি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। কেউ কিছু বলেনি। খালি দু'দলের দুই মস্তান আমার দিকে চেয়েছিল। একজন চোখের কোণ দিয়ে, আর একজন সোজাসুজি। ওরে বাবা সে কী চাউনি রে! আমি সে চাউনি ফিরিয়ে দিতে পারিনি। জজ্ হয়েও।' মহী সোফার ওপর দুদিকে দু'ঠ্যাঙ ছড়িয়ে সোফার পিঠে হেলান দিয়ে কান্নার স্বরে বলতে লাগল—'আয়্যাম এ ফেইলিওর, এ ড্যামড্ লায়ার, ডরপোক কাঁহাকা,' —বলে সে নিজেই নিজের দুগালে থাপ্পড় মারতে লাগল।

সীতু বললে—'তাহলে তোরা আমার গালেও চড় মার। আরে বাবা আমার নার্সিংহোম দাঁড়িয়ে আচে কীসের ওপর! বিলেত থেকে যখন ফিরলুম বাবাও গয়া। জ্যাঠাও গয়া। বোনেদের বিয়ে দিতে সংসার ফোঁপরা। বিধবা মা, জেঠি আর আমি। পসার জমচে না। খালি বিলিতি ডিগ্রি হলেই কি আর হয় ভাই। পেট্রল চাই। পয়সা চাই। সে সময়ে অ্যাবর্শন লিগালাইজড হয়নি। কত লোকের পাপ যে খালাস করেছি এই দু'হাতে কী বলব। সব শালা-শালিকে আমার চেনা হয়ে গেচে। বিরাট বিরাট বড়লোকের সব বউ মেয়ে, এক একজন যা অফার করত না শুনলে হাঁ হয়ে যাবি। কতগুলো মরেওচে এই হাতে। দুক্ষু হয় একটা মেয়ের জন্যে। ভদ্রঘরের মেয়ে। অবস্থার পাকে পড়ে কলগার্ল হয়েচে, তো গেচে ফেঁসে। আসামী তো তখন ভাগলবা। অন্য স্টেটে একেবারে। গরিব মেয়ে, কে তার খর্চা দেবে? অ্যাডভান্সড স্টেজ, আমার হাতে পায়ে ধরলে—দু'হাতে দু'গাছা সোনার চুড়ি ছিল, খুলে দিলে, তখন তাকে টেবিলে তুললুম। মেয়েটা মরে গেল। সে কী বিপদ। মার্ডার-কেসে পড়ে যাই আর কি! জোর করে ঠিকানাটা নিয়েছিলুম। শুদ্ধু বাপ-মা, আর ভাই, মা প্যারালিটিক, বাপ হেঁপো রুগি, চুন গরিব। গিয়ে খুব অ্যাগ্রেসিভ হয়ে গেলুম। নিজের গলদ থাকলে অফেন্স খেলতে হয়। জানিস তো? তো দুজনে এইসা ভয় পেয়ে গেল যে চোখের জল গিলে মেয়ের লাশ নিয়ে এল। মেয়েটার মুখখানা এখনও মাঝে মাঝে মনে পড়ে। গরিব-গুরবোর ঘর কিন্তু আফটার অল প্রথম যৌবন, ভারি ডাঁশা ছিল, মুখে খুব সুন্দর একটা আলগা শ্রী। আরও কেউ কেউ মরেচে। কিন্তু এ মেয়েটার জন্যে আমার বড্ড কষ্ট হত!'

হিরু বলল—'সোনার চুড়ি দুটো ফেরত দিয়েছিলি?'

—'এই যাঃ। দেওয়া হয়নি তো!' সীতু মাথায় হাত দিয়ে বসল। 'কত মেয়ে ওরকম দিত। দামি দামি গয়নার পাহাড়ের সঙ্গে ওই ক্ষয়া চুড়িগুলোও বিক্‌কিরি হয়ে গেচে রে! উচিত ছিল ফেরত দেওয়া। উচিত ছিল, উচিত ছিল, উচিত ছিল'... বলতে বলতে সীতু হাসিকান্নার মাঝামাঝি একটা কীরকম অদ্ভুত আওয়াজ করে অবশেষে কেঁদে উঠল হাউ-হাউ করে।

—'মাই সাকসেস-স্টোরি স্ট্যান্ডস অন ক্রাইম, অন সিন, মহী তুই ইচ্ছে হলে আমায় ফাঁসি দিতে পারিস।'

মহী অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলে বলল—'তাহলে, তোরা দুটোতে অসীম আর হিরু তোরাই শেষ পর্যন্ত মাস্টারমশাইদের আশা পুন্ন করতে পাল্লি ভাই। আমরা হেরে গেছি। একদম গো-হারান হেরে গেছি। জীবনের আসল পরীক্ষাগুলোয়।'

অসীম শূন্য চোখে চারদিকে চেয়ে বলল—'আমার অপরাধগুলো একটু টেকনিকাল। তোরা ঠিক বুঝতে পারবি না।'

—'লে-ম্যানদের বোঝবার মত করেই বল।' অমু বলল।

—'তোরা তো জানিস কিছুদিন আই আই টি খড়্গপুরে ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে ছিলাম। সেই সময়ে ডিপার্টমেন্টাল হেড ছিলেন ডক্টর এ কে আচার্যি। উনি আমেরিকা থেকে নতুন কম্পুটার সায়েন্স শিখে এসেছেন। সেই জন্যেই ওঁকে পাঠানো হয়। ডিপার্টমেন্টে উনি কম্পুটার তো তৈরী করছিলেনই, সেই সঙ্গে কতকগুলো সাঙ্ঘাতিক ইমপ্রুভমেন্ট করার চিন্তা করছিলেন। আজ থেকে তিরিশ-বত্রিশ বছর আগেকার কথা। আপনভোলা টাইপের লোক ছিলেন। ফিজিক্স, ম্যাথমেটিকস-এ মাস্টার। কীভাবে কী করবার চেষ্টা করছেন কিছু কিছু বলতেন। অন্য কেউ ধরতে পারত না। আমি পারতুম। তারপর একদিন জানতে পারলুম—উনি পেপার লিখছেন। ল্যাবে ওঁর কেজের চাবি যোগাড় করলুম। নোটসগুলো বার করলুম। তারপর একটু খেটেখুটে পেপারটা তৈরি করে একেবারে জার্মানে ট্রানস্লেট করে পাঠিয়ে দিলুম। বেরিয়ে যাবার পরে ডক্টর আচার্যি যখন পেপারটার কথা জানতে পারলেন তখন বেশ হই-চই পড়ে গেছে—এত আলাভোলা যে বুঝতে পর্যন্ত পারেননি আমি ওঁর নোটসগুলো ব্যবহার করেই পেপারটা তৈরি করেছি। হি ওয়াজ দা ফার্স্ট ম্যান টু কংগ্র্যাচুলেট মি, উনি বললেন—"অ্যায়াম প্রাউড অফ ইউ মাই বয়। আমি এই ব্যাপারটাই ভাবছিলুম। তুমি আমার আগেই ভেবে ফেললে? বাঃ। অফ কোর্স আমি একটু ডিস্যাপয়েন্টেড। কিন্তু বিজ্ঞানের জগতে এ আখচার হচ্ছে, আফটার অল জগদীশচন্দ্রের মতো তো আমার ডিস্যাপয়েন্টমেন্ট নয়, অ্যান্ড ইউ আর মাই কলিগ অ্যান্ড স্টুডেন্ট!' তো তারপর থেকেই আমার ইন্টারন্যাশনাল স্বীকৃতি।'

মহী বলল—'হিরু, তুই যে বড় চুম মেরে আচিস তখন থেকে। তুই কী ব্যাটা ধোয়া তুলসীপাতা, নাকি?'

হিরু তরল জিনিস খেলেই গুম হয়ে যায়। মনের কথাগুলো মনের ওপর ভেসে ওঠে, সেগুলোই তাকে গুম করে দেয়। সে বলল—'আমি কিচু করিনি বিশ্বাস কর। আমি ধোয়া তুলসীপাতা সত্যিই বলচি।'

তখন অসীম চোখ সরু করে বলল—'তুই হঠাৎ প্রেসিডিন্সি থেকে ইউনিভার্সিটি কেন রে? এখানেও প্রোফেসর, ওখানেও প্রোফেসর। দেয়ার ইজ সাম মিস্ট্রি।'

হিরুর মুখটা কালো হয়ে গেল। সে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল, বলল—'বলব, কিন্তু খবদ্দার তোরা কেউ আমার মুখ দেখতে পাবি না।' বন্ধুদের দিকে পেছন ফিরে সে বলল— 'তোরা ভগবান, ভূত, তন্ত্র, মন্ত্র, জ্যোতিষ, সামুদ্রিক এসব বিশ্বাস করিস কি না জানি না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি। আমার মাথার ওপর বুড়ো প্রোফেসর দিনের পর দিন

বসেই আচে, বসেই আচে। তাকে ট্রান্সফারও করবে না, কিছুই না। এক্সটেনশন নিয়ে চলেচে। বেড়াতে গিয়ে একবার দেখা হয়ে গেল এক তান্ত্রিকের সঙ্গে, তা তার কিছু ক্ষমতা নিজের চোখেই দেখলুম। বললে—"মনে কোনও দুঃক্ষু আচে মনে হচ্চে, যেন আশাটি মুকুল অবস্থা থেকেই ঝরে ঝরে যাচ্চে!" বললুম কী করে ধরলেন বাবা। ধরলেন যদি তো উপায় করে দিন। তান্ত্রিক বললে—'দুটো সাদা কালো কচি পাঁঠা লাগবে আর দশ হাজার টাকা।" তখন আমি মরিয়া। দিলুম সব যোগাড় করে। বলব কী, বুড়ো প্রোফেসর মুখে রক্ত উঠে মরে গেল।' মুখ ঢেকে সামনে ফিরল হিরু, বলল—'তোরা এসব বিশ্বাস করিস? বল, প্লিজ বল করিস না, আমি একটু মনে বল পাব, ভাই, বল অসীম, সায়েন্স এসব বিশ্বাস করে?'

অসীম বলল—'সায়েন্স এক ধরনের ভগবানে বিশ্বাস করে। কিন্তু তন্ত্রে-মন্ত্রে নৈব নৈব চ। ওটা কাকতালীয়। লোকটা তোকে রাম ঠকান ঠকিয়েচে। তুই য়ুনিভার্সিটি গেলি কেন? গম্নেন্টের চাকরিতে কত সুবিদে!'

হিরু বলল—'ওরা হার্ভার্ড থেকে লোক এনে আমার ওপর বাসয়ে দিলে। মনে ঘেন্না এল। নিজের ওপর, জীবনের ওপর, অথরিটির ওপর। সরকারের আওতা থেকে চলে গেলুম। বিশ্বাস কর আমি মানুষটার মৃত্যু চাইনি, শুধু সমস্যার সমাধান চেয়েছিলুম। অ্যামবিশন... ওনলি ভল্টিং অ্যামবিশন হুইচ ওভারলিপস ইটসেলফ অ্যান্ড ফলস অন দা আদার।'

হলের একধারে বাথরুম, হিরু হঠাৎ টলতে টলতে তার মধ্যে ঢুকে গেল, একটু পরেই প্রচণ্ড কষ্টে বমি করার আওযাজ ভেসে আসতে লাগল।

হলের শেষ প্রান্তে ভারী ভেলভেটের পর্দার ওধার থেকে খুব মৃদু খসখস আওয়াজ পাওয়া গেল। পাঁচ মহিলা শাড়ি সামলে, অলংকার সামলে পা টিপে টিপে পেছনের হলের দিকে চলে গেলেন। প্রত্যেকের মুখ বিবর্ণ। একে অপরের দিকে তাকাতে পারছেন না। গঙ্গার ধারে পাঁচজন নীরবে অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ালেন, বসলেন, আবার ঘুরতে লাগলেন, কখনও জোড়া, কখনও একা। ভেতরে ভেতরে সবাই একা, আবার সবাই একসঙ্গে। অবশেষে ঈষিতা গলা পরিষ্কার করে বললেন : 'দ্যাখ আমরা সবাই চল্লিশ পার হয়ে এসেছি। কিন্তু এখনও জানি না কদ্দিন আছে, হয়তো আরও চল্লিশ কিংবা তারও বেশি। আমাদের তো এই নিয়েই বাঁচতে হবে! এখনই এমন ভেঙে পড়লে চলবে কেন? আমরা সবাই এক নৌকায়!'

সুপ্রিয়া চোখের জল মুছে ধরা গলায় বললেন—'আমিও তো ওর ছাত্রীই ছিলুম। রিসার্চ করতুম। অনেস্টি, ইনটিগ্রিটি, ব্রিলিয়ান্স এই সবের জন্যেই আরও পছন্দ করেছিলুম!' সবাই চুপ। কিছুক্ষণ পরে কমলা ধীরে ধীরে বললেন—'ওরা সবাই অনুতপ্ত। এটুকুই...' কেউ কিছু বলল না।

অনেকক্ষণ পরে গঙ্গায় স্টিমারের ভোঁ শোনা গেল। দু চারটে পাল তোলা নৌকা

প্রাণপণে দাঁড় বাইতে বাইতে চলে গেল। মীনাক্ষী একটু ভাঙা ভাঙা ধরা-ধরা গলায় আস্তে আস্তে গান ধরলেন :

আরো আরো প্রভু আরো আরো,
এমনি করে এমনি করে আমায় মারো.. ।

তখন পঞ্চনায়ক হলের নানা আসনে নানারকম বিদঘুটে হাস্যকর ভঙ্গিতে ঘুমোচ্ছেন!

(২)

লাঞ্চ খেতে বেশ দেরি হয়ে গেল। আড়াইটে। কেউই ভাল করে খেতে পারলেন না, যদিও নানারকম লোভনীয় পদ এবং উৎকৃষ্ট রান্না হয়েছিল। খাওয়া হয়ে গেলে সীতাপতি বললেন—'দেখো, এ বাংলোয় বড় বেডরুম দুটো আছে। ওই দুটোতেও এক্সট্রা খাট-টাট ঢুকিয়ে আমাদের ব্যবস্থা করে দিয়েছে কেয়ারটেকার। তোমরা ডান দিকেরটায় যাও, আমরা বাঁদিকেরটায় যাই। আমাদের আড্ডা এখনও শেষ হয়নি।'

অসীমাংশু বললেন—'তোমাদের শাড়ির গল্প, লেটেস্ট ফ্যাশন, গয়না ইত্যাদির গল্পও নিশ্চয়ই শেষ হয়নি এখনও।'

মীনাক্ষী বললেন—'ও, আমরা শুধু শাড়ি-গয়না আর ফ্যাশনের গল্প করি, এই তোমাদের ধারণা!'

—'তা আর কী গল্প তোমরা করবে?'

মহীতোষ বললেন—'শ্বশুর-শাশুড়ির পাট পর্যন্ত চুকে গেছে, তাদের যে পিণ্ডি চটকাবে তারও উপায় নেই।'

অমিতব্রত বললেন—'ছেলে-মেয়েগুলো সবই প্রায় বড় হয়ে গেছে, যে যার কাজ করছে। কাকে কী টিফিন দেওয়া যায়, কার যখন-তখন হাঁচি হয়, কে বড্ড কনস্টিপেটেড সেসব নিয়েও গল্প করার সুযোগ বিশেষ নেই। তাহলে?'

ঈষিতার মুখ দেখে মনে হল খুব রেগে গেছেন। বললেন—'ঠিক আছে, শাড়ি-গয়নার গল্পই করব, তবে শাস্ত্রে তো বলেছে স্বামীই স্ত্রীর অলংকার, সুতরাং সেই অলংকার নিয়েই আমরা চর্চা করব এখন। আয় তো রে সুপ্রিয়া, আয় সীতা আমরা ও ঘরে যাই।' ঈষিতার মধ্যে একটা নেত্রী-নেত্রী ভাব আছে। তিনি আর চারজনকে প্রায় ঝেঁটিয়ে নিয়ে ডান দিকের শোবার ঘরে ঢুকে গেলেন। দরজাটা ঈষৎ শব্দ করে বন্ধ করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সীতাপতি এদিক থেকে চার বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন—'পার্ফেক্ট।'

হিরন্ময় মৃদুস্বরে বললেন—'এখনও পার্ফেক্ট নয়, কে কোথায় বসবে, কী ভাবে তার ওপর সবটা নির্ভর করছে।'

সীতাপতি বললেন—'আরে বাবা, লেটেস্ট অ্যামেরিক্যান প্রোডাক্ট, চারটে রেখে এসেছি।' এখন তাঁদের অত্যধিক আবেগ, ক্রন্দন-প্রবণতা স্ল্যাং ব্যবহার করার ঝোঁক সমস্তই প্রায় চলে গেছে। তবে নিদ্রাকর্ষণ হচ্ছে। নিজেদের ঘরে ফিরে এক একজন দুটো তিনটে বালিশ বগলে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর সবাইকার নাক ডাকতে লাগল। মহীতোষ

ঘুমোচ্ছে হাঁ করে, মুখের পাশ থেকে সামান্য লালা গড়াচ্ছে। অসীমাংশুর দু হাত বুকের ওপর ক্রস করা, চোখ দুটো চশমার তলায় বোজা। কিন্তু এমন শক্ত ভঙ্গিতে শুয়ে আছেন, মনে হচ্ছে মাড় দিয়ে ইস্ত্রি করা মানুষ, যে কোনও মুহূর্তে সটান উঠে ঢিসুম ঢিসুম শুরু করে দিতে পারেন। অমিতব্রত কেমন নেতিয়ে আছেন। তাঁর চুলগুলো খাড়া খাড়া। মুখের রং এখন বেশ কালো, ফুর ফুর ফুরুৎ করে নাক ডাকছে। সীতাপতি শুয়ে আছেন খুব সুন্দর একটি শবদেহের মতো। কিন্তু তাঁর অত সুন্দর নাকের ভেতর দিয়ে বাঘের গর্জন বেরোচ্ছে। হিরন্ময় কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন, তারপরে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন। মুখ একদিকে কাত। সোনালি চশমা পাশে খুলে রাখা। হঠাৎ দেখলে মনে হবে তিনি মোটেই ঘুমোচ্ছেন না, মটকা মেরে পড়ে আছেন। কিন্তু আসলে তিনি সত্যিই ঘুমোচ্ছেন। বন্ধ ঘরের মধ্যে কোলে বালিশ নিয়ে মুখে মশলা ফেলতে ফেলতে ঈষিতা বলল—'মীনাক্ষী ককটেলগুলো অত স্ট্রং না করলেই হত, ভেবেছিলুম যে যার লুকোনো প্রেমের গল্প বলে ফেলবে, এ যে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বাব হল?'

সুপ্রিয়া সবাইকে মশলা বিতরণ করছিল, বলল—'আমার তো এখন মনে হচ্ছে যা হয়েছে এর চেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারে না। দ্যাখ ঈষিতা আমি ফ্র্যাংকলি বলছি। এখনও আমি ওর পেপার টাইপ করে দেওয়া, ক্যালকুলেশন করা, গ্রাফ করা—সব করে দিই। অর্থাৎ ওর সেক্রেটারির কাজ করি, সেক্রেটারি কেন, রিসার্চ অ্যাসিসট্যান্টের কাজ করে যাচ্ছি সমানে। বিদেশে বেডাবার আমার খুব শখ, কিন্তু তোরাই বল, আমি যদি আমার থিসিসটা কমপ্লিট করতে পারতুম, কলেজের কেরিয়াটা কনটিনিউ করতে পারতুম, আমিও ফিজিক্সের ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড ভাই, নিজের জোরেই নানা দেশে সেমিনার-টেমিনারে কি আমি যেতে পারতুম না! অথচ সংসারের কাজ এত বেড়ে গেল, দুটো ছেলের দেখাশোনা, পড়াশোনায় তাদের বাবা-মার উপযুক্ত করে তোলা, আর মিঃ অসীমাংশু গুপ্তর ওই নিত্যদিনের টাইপ নোটস নেওয়া, ক্যালকুলেশন করা এতেই আমার সময় চলে যেতে লাগল। সি এস আই আর-এর কাজটা শেষ করতে পারলুম না। মাঝপথে ছেড়ে দিতে হল। ডক্টর ব্রহ্মচারী মুখ গম্ভীর করে বললেন—'এইজন্যেই, এইজন্যেই আমি মেয়ে নেওয়া ডিসকারেজ করি, দেশের কতগুলো টাকা বাজে খরচ হয়ে গেল।' সীতা, এই তিরস্কারই আমার পক্ষে যথেষ্ট। যথেষ্ট অপমান। ফিজিক্স অনার্স আর বি এস সি-তে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার জন্যে আমায় কম খাটতে হয়নি! যখন রিসার্চ ছেড়ে দিলুম, বাবা, কেমিস্ট্রির প্রোফেসর, আমায় নিয়ে খুব গর্বিত ছিলেন, মুখটা কালো করে বললেন—"তোর জীবন থেকে এত কষ্টার্জিত পঁচিশটা বছর জিরো হয়ে গেল রে বুলু!" তখন এগুলো মনে লাগলেও এগুলোকে গুরুত্ব দিইনি। আমার স্বামী একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক, আমি তার সঙ্গে দেশ-বিদেশের নানা কংগ্রেস, কনফারেন্স, সেমিনারে ঘুরতে পারছি, বড় বড় মানুষের সঙ্গে আলোচনাতেও কিছু কিছু যোগ দিতে পারছি, এই না কত ভাগ্য! কী লজ্জার কথা ভাই, ওর ওই কম্পুটারের ব্যাপারটা ও আমাকে এত রং চড়িয়ে বলেছে যে আমি মনে মনে ভাবতুম আমার অসীমাংশু হয়ত

একদিন নোবেল প্রাইজ-ট্রাইজও পেয়ে যেতে পারে। এখন তো দেখছি সব ভাঁওতা, দাঁড়িয়েছিলুম চোরাবালির ওপর। আমার ক্লাস ফেলো একজন আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। মনে হচ্ছে, আমাব বিয়ে, আমার কেরিয়ার ছাড়া কোনটাই কাকতালীয় নয়, সব অসীমাংশু গুপ্তর ক্যালকুলেশন। যে রকম শয়তানি করে ও ডক্টর আচার্যির কেজের চাবি চুরি করেছিল, ঠিক সেই ভাবেই আমাকে চুরি করেছে। অনেক রিসার্চ স্কলার তো ছিল, আমার চেয়ে সুন্দরী ছিল। আমাকেই বা বাছল কেন? বেছে বেছে আমার প্রেমে পড়েছে যাতে আমি ওর...'

সীতা বলল—'বাস বাস বহুত হয়ে গেছে ভাই। তুমি ভীষণ একসাইটেড হয়ে গেছ। চুপ করো একটু সুপ্রিয়া।'

ঈষিতা বলল—'সত্যি সুপ্রিয়া তোর মুখ লাল হয়ে গেছে। চুপ। এখন তো আর পঁচিশ বছরে ফিরে যেতে পারবি না! নতুন করে কেরিয়ার গড়তেও পারবি না। ছাড় ওসব।'

সুপ্রিয়ার গলা কান্নায় গদগদ হয়ে গেছে, বলল—'দাঁড়াও না দেখাচ্ছি মজা। আর যদি ওর সেক্রেটারির কাজ করি তো...'

—সীতা বলল, 'ছি, সুপ্রিয়া স্বামী আর স্ত্রী কি আলাদা! এভাবে ভাবতে নাই। আমরা ওদের পুণ্যের ফলও যেমন নিচ্ছি, পাপের ফলও তেমনি নেব। নিতে হবে। আমিও তো কেরিয়ার ছেড়েছি।'

—'তোমার এ রকম মনে হয় না? মনে হয় না তোমার লাইফটা ওয়েস্টেজ? একটা হিউজ ওয়েস্টজ? তুমি একটা ডাক্তার, গাইনিতে স্পেশ্যালাইজ করেছ, এখন কি না বুটিক চালাচ্ছ?'

—টু স্পিক ফ্র্যাংকলি সুপ্রিয়া, আই ডোন্ট গ্রাজ হিম হিজ সাকসেস। আমার ইচ্ছা ছিল মেডিসিনে স্পেশ্যালাইজ করব। কিন্তু এদেশের লোক মেয়ে ডাক্তারের কাছে ফিমেল ডিজিজ কি বাচ্চাদের ডিজিজ-এর জন্যে ছাড়া যাবে না কভি, না। আমি ভাই চেষ্টা করে দেখেছি। আর ওই গাইনি লাইন আমার একদম ভাল লাগে না। মাই গ্রাজ লাইজ এলস হোয়্যার।' বলে সীতা চুপটি করে বসে রইল।

মীনাক্ষী বলল—'কী তোমার দুঃখ, বলোই না। চুপ করে গেলে কেন?' সীতা থেমে থেমে বলল—'ফার্স্টলি, ও আমাকে একেবারে সময় দেয় না। হি ইজ সো বিজি। আমি নিজে ডাক্তার, বুঝি ডাক্তারের লাইফ এমনি হতে বাধ্য। স্পেশ্যালি যে দেশে দশ হাজার জন পিছু একটা ডাক্তার নেই। কিন্তু ও চোন্দননগরে নার্সিংহোম খুলতে গেল কেন? গরিবদের হেলপ করতে? কোখনওই না। বর্ধমানের ডাক্তারদের পসারের সঙ্গে কমপিট করতে... জরুর। আমি এসব বুঝি। অথচ, এতো টাকা, আড়াইশ ফি তো জানোই। অপারেশন করতে এখন কোতো নিচ্ছে ভোগোবান জানেন। তো ইনকাম-ট্যাক্স ইভেড করতে কী না করতে হচ্চে! টাকা আরও বাড়ছে, সময় আরও কমছে। এই পুওর ওয়াইফের জন্যে আর টাইম নাই। এখন যেটুকু টাইম পায়, তাতে ওকে অ্যাবসল্যুট রেস্ট না দিলে ও মরে যাবে ভাই। সোবাইকে সময় দিচ্ছে, সোবার কথা শুনছে, শুধু আমি ওর

লাইফ পার্টনার আমার কোথাই ওর শুনবার সোময় হয় না। তো আমি বুটিক খুলব না তো কী করব! মীনাক্ষী ডোন্ট মাইন্ড, আই হেট ইট, আই হেট টু কেটার টু দোজ স্নবিশ হাই-ব্রাও সোশ্যালাইট্স্। বাট ইট কিপস মি অক্যুপায়েড। আফটার অল কোর্টশিপেব দিনগুলোর কোথা তো এখনও আমার মোনে আছে। হিজ ডিভাওয়ারিং কিসেস দা ফিল অফ হিজ স্মুদ্ চিকস, এগেনস্ট মাইন।'

মীনাক্ষী বলল—'তো আজ সীতুদার কনফেশন শুনে তোমার কী রী-অ্যাকশন?

সীতা তার ঘাড়হীন মাথা দুলিয়ে বলল—'তোমরা মাইন্ড কববে, আমি বলব না।'

ঈষিতা বলল—'সে আবার কী? বারবাবই তো বলছি আমরা সব এক নৌকোয়। তোর সঙ্কোচ করার কোনও কারণ নেই। তুই বল, বলে হালকা হ।'

সীতা একটু ইতস্তত করে বলল—'টু স্পিক ফ্রাঙ্কলি আমি এতে কুনও দোষ দেখি না। সাবসিকোয়েণ্টলি অ্যাবর্শন তো লিগালাইজড হয়ে গেলই। মেয়েদের তো কিছু সুবিধা হল। পুরুষরা ওইরকম বিহেভ করবেই। তো মেয়েরা কেনো তার জন্য ভুগবে! যা ওনেক আগেই লিগাল হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, সেটা পবে হল, একজন ডক্টর, ট্যালেণ্টেড ডক্টর, দাঁড়াতে পারছিল না, দাঁড়িয়ে গেল। তো এতে দোষের কী হল?'

কমলা আস্তে বলল—'কিন্তু ওই মেয়েটির ক্ষয়া সোনার চুড়ি?'

সীতা হঠাৎ তার দুটো ধবধবে ফর্সা হাত থেকে ষোলো গাছা সোনার চুড়ি খুলে ফেলতে লাগল।

ঈষিতা বললেন—'করছিস কী?' ততক্ষণে সীতা গলার হার এবং কানের দুলও খুলে ফেলেছে। সে বলল—'এই সব দিয়ে দিচ্ছি, দোরকার হোলে আবও দেবো। ঠিকানা বার করে দিয়ে এসো, তার বাবা-মা'কে।'

সুপ্রিয়া বলল—'তারা কোথায় আছে, আছে কি না অ্যাট অল, জানব কী করে! তা ছাড়া একটা মানুষের জীবনের দাম কি টাকায় নির্ধাবণ হয় সীতা?'

সীতা এইবারে দুঃখেব হাসি হাসল, বলল—'উল্টাপুলটা বোলছ সুপ্রিয়া। মানুষের জীবনের থেকে টাকার দাম ওনেক ওনেক বেশি। দেখো না কোথায় গ্যাস লিক হলো কী স্মাগলার ধোরতে গিয়ে কোনও পুলিশ অফিসাব মারা গেলো, কী পুলিশ মোস্তানের লড়ালড়ির মাঝখানে কোতো বেচারা জান দিচ্ছে, ওর্মান তার ফেমিলি টাকা পাচ্ছে, চাকরি পাচ্ছে, একজনের বোদোলে পাঁচজন বেঁচে যাচ্ছে। তো এবার বোলো ওই একটা মেয়ের জানের থেকে তার বাবা-মা-ভাই তিনজনের বেঁচে থাকা বেশি জরুরি কি না। আমার স্বামী তো ইচ্ছা করে মেয়েটাকে মেরে ফেলেনি! পুরুষরা ইচ্ছা করুক বা না করুক মেয়েদের জান ভাই ওদেরই হাতে। বী রিয়ালিস্টিক। আমি সিরিয়াসলি বোলছি, আমি আর গোয়না পোরবো না, আনটিল দ্যাট ফ্যামিলি ইজ ফাউন্ড অ্যান্ড রিকমপেন্সড। যোদিও আসল রেসপনসিবিলিটি দ্যাট সন অফ এ বিচের যে মেয়েটাকে ইউজ করেছিল। তোবে আমার স্বামীর এগেনস্টে আরও কিছু গ্রাজ আছে।'

সীতা চুপ করে রয়েছে দেখে মীনাক্ষী বলল—'কী হল সীতা, বল?'

—'আমি বোলব না। তুমরা লাইটলি নেবে। বাট দা থিং ইজ ভেরি সিরিয়াস উইথ মি।'

ঈষিতা তার নেত্রী-নেত্রী বাচনভঙ্গি ব্যবহার করে বলল—'এতটা বলেছ যখন ডিভাওয়ারিং কিসেস পর্যন্ত, তখন বাকিটাও বলতে হবে। আমরা লাইটলি নেব না। কথা দিচ্ছি।'

সীতা বলল—'ম্যারেজ ইজ গিভ অ্যান্ড টেক মানো তো?'

ঈষিতা ঝুঁকে বসে বলল—'নিশ্চয় মানি।'

—'ইন এভরি স্ফিয়ার? সোব ক্ষেত্রে?'

—'অফ কোর্স।' মীনাক্ষী এগিয়েই ছিল। সুপ্রিয়া এগিয়ে বসে বলল।

সীতা বলল—'তো আমি যদি স্ট্রিক্ট ভেজিটেরিয়ান হয়ে চিকেন খেতে পারি, হ্যাম-স্যান্ডউইচ খেতে পারি, ইলিশ মাছ, ভেটকিমাছ রান্না করে দিতে পারি, হোয়াই কাণ্ট হি টলারেট মাই কাইন্ড অফ ফুড?'

—'সেটা দেখো রুচির ব্যাপার, জিভে যদি ভাল না লাগে তো কী করবে?'

—'না না। খেতে আমি জোর করছি না, যদিও ও হ্যাম আমাকে জোর করে ধরিয়েছে। প্রথম প্রথম বোমি করে ফেলতুম। এনিওয়ে বাজ্‌রি রুটি আর টোকদই এই আমাদের ফুড। খুব সোস্তা। রুটি দেখতেও কালো কালো। বাট উই আর ফন্ড অফ ইট। বোছরের পর বোছর যায়, একটা দিনও খেতে পাই না। ধোক্‌লা করলেই বলে—'ও তোমার সেই ডালের কেক? সোনার প্াথরবাটি?' আমরা রুটিকে খুব কড়া করে সেঁকে টিনে ভরে রাখি, তাকে বলে খাকরা। মাখন, জ্যাম লাগিয়ে খেতে দারুণ লাগে। সোস্তার জলখাবার। ছেলেমেয়েদেব ওগুলো দিলেই বলবে—'আসলে কি জানো সীতা, গুজরাতিরা আসলে খু-উব গরিব জাত। এখন পোয়সা হলে কী হোবে, সেই চিপ্পুস অভ্যেস রয়ে গেছে।' এসোব কোথায় আমি ইনসাল্টেড ফিল করি, হি ডাজ্‌ন্‌ট্‌ সিম টু বদার। তা ছাড়া দেখো কেউ খুব বোড়ো লোক হোয়ে গেলেই যদি নিজেদের ফুড হ্যাবিট পাল্টে ফেলে বিদেশি খাওয়া ধোরে যেমোন তোমরা বাঙালিরা ওনেকেই কোরো, তো সেটা কি খুব ডিজায়রেবল? ইয়োর ফুড গিভস ইউ ইয়োর ফার্স্ট ন্যাশনাল আইডেনটিটি।'

—'অ্যান্ড উইদাউট সাম কাইন্ড অফ ন্যাশনাল আইডেনটিটি ইন্টারন্যাশন্যালিজ্‌ম্‌ ইজ নট পসিবল। আই এগ্রি উইথ য়ু, সীতা—কমলা খুব মৃদু কিন্তু দৃঢ় স্বরে বলল।

—'তা তোরও কি ওইরকম কোনও অভিজ্ঞতা আছে নাকি?'

—'নাঃ' কমলা হেসে বলল—'প্রোফেসর এইচ সি ইডলি, ধোসা, উত্তপম, সবই খেতে ভালবাসেন।'

—'তবে?'

—'তবে আবার কী? কিছুই না।' কমলা হাসল।

—'ওঃ তুই না ইমপসিবল'—ঈষিতা বিরক্ত স্বরে বলল।

কমলা বলল—'একটা গান শুনবে?'

—'অফ কোর্স। গা কমলা গা। তুই যা গাস না! ফ্যানটাসটিক!'

কমলা গান ধরল—

'আমি যখন ছিলেম অন্ধ
সুখের খেলায় বেলা গেল পাইনি তো আনন্দ।।'

গান শেষ হলে তার রেশ রয়ে গেল ঘরের মধ্যে। সুরে ভারী হয়ে উঠেছে যেন হাওয়া অবশেষে ঈষিতা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'সুখের খেলায় বেলা গেলই বটে। সুখকে আনন্দ বলে ভেবে কী ভুলই করেছি।'

—'কেন, এ কথা বলছো কেন, মহীদা ল-এর লোক। এরা কখনও কিছুতেই পুরো পরিষ্কার হতে পারে না ঈষিতা',—মীনাক্ষী বলল।

—'তাই বলে আসল ক্রিমিনালের হাত থেকে বারুদের দাগ তুলে তার ভাইকে বিনা দোষে যাবজ্জীবন জেল খাটাবে! তাই বলে কমিশনের চেয়ারম্যান হয়েও, আসামি ধরতে পেরেও স্রেফ ভয়ে ওই রকম জঘন্য নোংরা অপরাধীদের ছেড়ে দেবে? কাওয়ার্ড। মেয়েরা চিরকাল কাদের সবচেয়ে ঘেন্না করে এসেছে জানিস তো? কাওয়ার্ডদের....' কেউই কোনও কথা বলছে না, ঈষিতা কিছুক্ষণ পরে স্বগতোক্তির মতো বলল—'বাট আই অ্যাম রাইটলি সার্ভড। আমিও তো কাওয়ার্ডই। ছিঃ। আব কাউকে কাওয়ার্ড বলবার অধিকার আমাব নেই। কাওয়ার্ডস ডিজার্ভ কাওয়ার্ডস।'

—'এ কথা বলছো কেন গো?' সুপ্রিয়া জিজ্ঞেস করল নরম সুরে।

ঈষিতা বলল—'তোরা জানিস না, আমার বাপের বাড়ির অবস্থা ছিল খুব খারাপ।'

মীনাক্ষী বলল—'সে কী রে? অত বড় বনেদি ফ্যামিলি তোদের? বিশাল রাজপ্রাসাদের মতো বাড়ি....'

—'হুঃ', ঈষিতা বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলল—'ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন, বাইরে কোঁচার নর্তন। আমার বাবা মা জ্যাঠা কাকা সব ওই এক দলে। মুশকিল হত আমাদের ভাইবোনদের। ওদিকে বাড়িতে যখন তখন ধার করে ভোজ হচ্ছে, শবিকরা পালা করে দুর্গোৎসব করছে। এদিকে আমাদের স্কুল-কলেজের মাইনে জোটে না, বই কিনতে পারি না। চুপি চুপি এক বন্ধুকে বলে কয়ে একটা ট্যুইশান নিলুম। ছোট ছোট দুটো মেয়েকে পড়াকে হবে। সপ্তাহে তিনদিন। মাইনে সে বাজারে দেড়শ' টাকা। পড়াতে পড়াতেই এই মেয়ে দুটোর কাকার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। ক্রমশ দারুণ প্রেম। ছেলেটি লেখাপড়ায় সাধারণ। কিন্তু বাড়ির প্রচুর সম্পত্তি। দুই ভাই। নিজের অংশ তখনই পেয়ে গেছে। মার্কেনটাইল ফার্মে কাজ করে। কিন্তু নিজস্ব গাড়ি আছে। সেই গাড়িতে যে কত ঘুরে বেরিয়েছি! আমার লেখাপড়ার খরচ, এমনকি শাড়ি-টাড়ির খরচও সব ও দিত। আমার ভাইবোনদেরও দিত। এই সময়ে বনেদি বাড়ির কল্যাণে তোদের মহীদার সম্বন্ধটা এল। বাবা-মা তো আনন্দে ভেসে গেলেন একেবারে। ব্যারিস্টার. উঠতি, নাম করেছে! তাকে বললুম, সে বললে—'সিদ্ধান্ত তোমার ঈষিতা। আমি তোমায় ভালবাসি। সুখে রাখতেও পারব। কিন্তু ব্যারিস্টারের স্ত্রীর মর্যাদা তো দিতে পারব না। কখনও মনে করবে না আমি কিছু উপহার দিয়েছি বলে তুমি আমার কাছে ঋণী। তুমি একদম মুক্ত। দুদিন সময় দিচ্ছি। তার মধ্যে যদি আমাকে বিয়ে করার ডিসীশন নাও, তো, আমি স্ট্রেট তোমার বাবার কাছে

গিয়ে তোমার পাণিপ্রার্থী হবো। তিনি যদি রাজি না থাকেন, তক্ষুণি আমার সঙ্গে বেরিয়ে আসতে হবে। আমার এক বন্ধুর বাড়ি থাকবে। নোটিস দেব। তারপর সময় মতো রেজিস্ট্রি বিয়ে হবে।

—'তারপর?' মীনাক্ষী উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

—'তারপর তো দেখছই!' ঈষিতার কণ্ঠস্বর কেমন রুক্ষ হয়ে উঠেছে।—'পারিনি, ব্যারিস্টার, বিলেত-ফেরত, খ্যাতি-নাম-যশ, পার্টি, পুরস্কার তুলে দিচ্ছি আমার চেয়ে অনেক কৃতী মানুষদের হতে। মা রুগ্ন, হিস্টিরিক। বাবা চূড়ান্ত বিলাসী, মেজাজি, ভাইবোনেরা স্বার্থপর, পারিনি। ওরা জাতেও নিচু ছিল! তন্তুবায়।'

সুপ্রিয়া ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল—'সে ভদ্রলোকের খবর জানো! কেমন আছেন? বিয়ে করেছেন কি না!'

—'সব মেয়েদের এই এক ভয়ানক দোষ সুপ্রিয়া', ঈষিতা বিরক্ত গলায় বলল—'গল্প শেষ হয়ে গেলেও তারপর তারপর করতে থাকে।'

কেউ আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। একটু পরে ঈষিতা বলল—'প্রতি মাসে একবার করে আমাকে ফোন করে। বলে—'ঈষিতা, কেমন আছ?'

—'সত্যি?' মীনাক্ষী বলল, 'তুমি কী বলো?'

—'আমি বলি, ভাল আছি। খু-উ-ব ভাল।' বলে ফোনটা নামিয়ে রেখে দিই।'

—'বিয়ে-টিয়ে করেছে কি না...' এবার মীনাক্ষী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল।

'ওসব আমি কোনওদিন জিজ্ঞেস করিনি মীনাক্ষী। জানিস তো ন্যাকামি আমার আসে না।'

—'কিন্তু আমি যে কী ন্যাকামির চূড়ান্ত করতে পারি, তা যদি জানতে!' মীনাক্ষী বলল।

—'তুমি পাবলিক রিলেশনস-এ ভীষণ ভাল পারো, আমি অনেকদিন আগেই সেটা অ্যাপ্রিশিয়েট করেছি, বুটিকে,' সীতা বলল।

ঈষিতা হেসে বলল—'সীতা তুই কি ওর পাবলিক রিলেশনস-এর ক্ষমতাকেই ন্যাকামি বলতে চাইছিস!'

'সীতা জিভ কেটে বলল—'ছি ছি! আমি কি তাই বলতে পারি! আই অ্যাপ্রিশিয়েট, সিনসিয়ারলি অ্যাপ্রিশিয়েট হার এবিলিটিজ।'

সুপ্রিয়া বলল—'কথার পিঠে কথায় কিন্তু ব্যাপারটা তাই দাঁড়াচ্ছে সীতা।

পাবলিক রিলেশনস এবিলিটি ইকোয়ালস ন্যাকামি।'

সীতার মুখ লাল হয়ে গেছে, সেদিকে তাকিয়ে মীনাক্ষী তার বয়কাট চুল দুলিয়ে বলল—'সীতা না বলুক, আমি বলছি, ন্যাকামি ইজ এ ভাইটাল পার্ট অফ পাবলিক রিলেশনস। ঈষিতা তখন ন্যাকামি কথাটা ব্যবহার করে কী বোঝাতে চাইল! যে উপকারী প্রেমিককে ছেঁড়া কাপড়ের মতো ফেলে দিয়ে সে আরও অর্থবান খ্যাতিমান কাউকে বিয়ে করেছে, সেই পুরনো প্রেমিকের ভাল মন্দ জানতে চাওয়ার কোনও অধিকারই তার নেই, কোনও উৎসাহও থাকার কথা নয়, সে বিয়ে করল কি না করল তাতে ওর আর কী আসে যায়? আসে যায় না, অথচ ভাব দেখাচ্ছে কত দরদ, কত জানবার ইচ্ছা—এটাই ন্যাকামি।

একদিক থেকে দেখতে গেলে পাবলিক রিলেশনের বেশ খানিকটা এইরকম প্রফেশনাল ন্যাকামি। তা সে ন্যাকামি আমি বুটিকে তো করেই থাকি, সীতা ঠিকই ধরেছে। কিন্তু আমার স্বামী অমিতব্রতর সহধর্মিণী হিসেবেও করেছি।'

—'মানে?' ঈষিতা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

—'মানে আর কি ওই ষোলটা ফ্ল্যাট ও আমার সাহায্য ছাড়া বিক্রি করতে পারত কি না সন্দেহ। ও নিজে তো কাঠখোট্টা মানুষ। ক্ষণে ক্ষণে লাল হচ্ছে আর নীল হচ্ছে। তা আমাকে বললে—'মীনা, এই ফ্ল্যাটগুলো তোমাতে আমাতে চটপট বেচে ফেলি এসো।' আমি বললুম—'কেন? তুমি পারবে না? আমাকে টানছ কেন?' তখন বলল—"তোমার মতো ডিপ্লোম্যাটের সাহায্য পেলে চটপট হয়ে যাবে। ঘাড়ের ওপর কতকগুলো ফ্ল্যাট বসে থাকাটা আমার মোটেই পছন্দ হচ্ছে না। ওরা যেন প্ল্যান স্যাংশন দেখতে না চায়, এটাই তুমি দেখবে। বেশি সার্চ-টার্চের মধ্যে যেন না যায়। জমির দাগ খতিয়ান সব আমার রেডি আছে।' 'আমি বললুম—'কেন? স্যাংশন করোনি, নাকি?' বলল কি জানিস? —"স্যাংশন তো এখনও শয়ে শয়ে প্রমোটারের বার হয়নি। ইনজাংশন আছে। ইনজাংশন উঠে গেলেই স্যাংশন অটোমেটিকালি হয়ে যাবে। কাগজে অ্যাড দিলুম। প্রত্যেক পার্টির কাছে যেতুম দুজনে কিংবা হোটেলে ডাকতুম আর আমি যত রাজ্যের ন্যাকামি করে ফ্ল্যাটটি গছাতুম। এই মাস্টারমশাইয়ের বেলা মানে মিঃ মিশ্রর বেলায় বললে—"লোকটা নিরীহ, ভালমানুষ, কিন্তু স্ত্রীটি খচ্‌রা।" তোদের অমিতব্রত লেবার অফিসার হয়ে জীবন আরম্ভ করেছিল তো, মদ না খেয়েই এই ভাষা ব্যবহার করতে অভ্যস্ত। বলে বলল, "স্ত্রীটিকে তোমায় সামলাতে হবে।" সেই মিসেস মিশ্রকে নিয়ে বুটিকে গিয়েছি, কী রঙ মানাবে বলে শাড়ি পছন্দ করে রিডাকশন-এ দিয়েছি, একেবারে উপহার দিয়ে বসলে মনে করতে পারে মতলব আছে। চুল ছাঁটবার পরামর্শ দিয়েছি। খাইয়েছি। বুদ্ধির, রূপের প্রশংসা করেছি। কয়েকটা নমুনা শুনবি?—জিজ্ঞেস করলুম, কিছু মনে করবেন না মিসেস মিশ্র, আপনি কি মানে মিঃ মিশ্রর দ্বিতীয় পক্ষ! প্লিজ ডোণ্ট মাইন্ড!' ভদ্রমহিলা বললেন—"আপনি হাসালেন আমার পঁচিশ বছরের ছেলে আছে জানেন, আমার ছেচল্লিশ বছর বয়স।" তখন আমি চোখ গোল গোল করে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম—"ছেচল্লিশ? আমি ভেবেছিলুম আপনার আর্লি থার্টিজ।" এ টোপ খায় না এমন মহিলা আমি কম দেখেছি রে। তারপর দ্যাট রিমেনিং ফ্ল্যাট ওয়জ সোল্ড।' তবে অন গড বলছি ওই ফ্ল্যাটের মধ্যে অত গোলমাল আমি জানতুম না। ওয়েল-বিল্ট, পূর্ব-দক্ষিণ খোলা, প্রধান দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলে ল্যান্ডিংটার ওপর থেকে অপূর্ব সূর্যাস্ত দেখা যায়, একদিক দিয়ে রাসবিহারী কাছে, আরেকদিক দিয়ে সাদার্ন মার্কেট। গুড পয়েন্টসগুলো দেখিয়ে দেখিয়ে, ব্যাড পয়েন্টসগুলো ভুলিয়ে দিয়েছি। লোভ লাগিয়ে দিয়েছি। বলেছি, আমি আপনাদের ইনটিরিয়র ডেকোরেশনে সাহায্য করব। অফ কোর্স আই মেণ্ট ইট। কিন্তু মিঃ এবং মিসেস মিশ্র বোধহয় এখন আমাকে ডাকিনী-যোগিনী বলে অভিশাপ দিচ্ছেন। দিলেও দোষ দেব না। কাজেই সীতা যা বলেছে ভাই ঠিকই বলেছে। আমাদের এই দস্যু রত্নাকরগুলোর পাপের ভাগ আমাদের নিতে হবে। নিতে হবে কেন? নিয়ে ফেলেছি। কিচ্ছু করার নেই।'

ঈষিতা এইবার কমলার দিকে ফিরে বলল, 'এই কমলা আয়ার চ্যাটার্জি তুমি পার পাচ্ছো না। আমরা সবাই এক নৌকায়। তুমি কেন ভিন্ন নৌকায় যাবাব চেষ্টা করে যাচ্ছ হে?'

কমলা হেসে ফেলে বলল--'চেষ্টা করিনি তো।'

—'তবে মুখ খুলছিস না কেন?'

কমলা বলল, 'খুলব?'

—'খোল'—দু-তিনজন একসঙ্গে বলে উঠল। তখন কমলা খোলা, উদাত্ত গলায়, গঙ্গায় জোয়ার আসার মতো গেয়ে উঠল—'এ মোহ-আবরণ খুলে দাও, দাও হে।' সে এমন গান, কারুর আর কিছু মনে রইল না। ঘর থেকে দেখা যায় গঙ্গার ওপর গোধূলি নামছে। নীরব, লাজুক মেয়ের গালেব লালিমাব মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে ভাটার গঙ্গায়। কিছু কিছু নৌকার পাল দেখা যাচ্ছে, তাব তলায় প্রতিপদের চাঁদের আকারের নৌকাগুলো। একটা মন্দিরের চূড়োর ত্রিশূল চোখে পড়ে। কল-কারখানার চিমনি। কোনওটা কোনওটা থেকে কালো ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। ঈষিতা ঘুম ভাঙা গলায় বললেন—'চ-চ রেডি হয়ে নে। এখন আর ঘরে বসে থাকে না।'

ঘরের সঙ্গেই বিরাট বাথরুম। সকলে যে যার ব্যাগ খুলে, সাবান, পাউডার, লিপস্টিক, মাসকারা, ব্লাশার, টাটকা শাড়ি, ব্লাউজ, অন্তর্বাস, সুগন্ধ স্প্রে, পরিত্যক্ত জিনিসগুলো গুছিয়ে বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়, নবানি গৃহ্নাতি, হয়ে গেলেন। বেরোতেই, হলে, পঞ্চ স্বামীব সঙ্গে দেখা। প্রচুর ঘুমোনোর ফলে সবারই মুখটুখ ফোলা হয়ে গেছে। দাড়ি কামিয়েছেন সযত্নে। নানারকম আফটার-শেভের পুরুষালি সুগন্ধ বেরোচ্ছে। বেশ গর্বিত হবার মতো স্বামী সব। বেশ গর্বিত হবার মতো স্ত্রী সব।

সকলেই গঙ্গার ধাবে বেড়াতে গেলেন। শুধু সীতাপতি টুক করে মেয়েদের শোবার ঘরে গিয়ে কী কতগুলো জিনিস গুছিয়ে ব্যাগে ভরে নিলেন। চা খাওয়ার পর সন্ধে ঝপ করে নেমে পড়ল। বাইরে মশা কামড়াচ্ছে। তা ছাড়া নানারকম পোকা। বিরক্ত হয়ে, সবাই ভেতরের হলে এসে বসলেন। মাঝখানের ঝাড়লণ্ঠনটা জ্বলে উঠেছে। বিশাল শাখা-প্রশাখা যুক্ত ঝাড় লণ্ঠন। এ ছাড়াও দেয়ালে দেয়ালে মাঝে মাঝেই আলো। হিরন্ময় মুগ্ধ হয়ে বললেন—'বাঃ চমৎকার তো!' মহীতোষ বললেন, 'এবার একটু হল্লা হোক।' কৌচ-টৌচগুলো একটু সরিয়ে নিয়ে নাচের ফ্লোর তৈবি হল। ওয়ালজ-এর ক্যাসেট চাপানো হল। সীতাপতি ঈষিতার সঙ্গে, অসীমাংশু মীনাক্ষীর সঙ্গে, অমিতব্রত কমলাব সঙ্গে, মহীতোষ সীতার সঙ্গে আর হিরণ্ময় সুপ্রিয়ার সঙ্গে।

দু-তিন দফা নাচের পরেই ঈষিতা বললেন—'আব পারি না বাবা হল্লা করতে। হল্লা করার কোনও ইন্ডিয়ান উপায় নেই?'

মহীতোষ বললেন—'তাহলে ভারতীয় নাচ হোক, ফোকডান্স এবং গান।' সীতাকেই সবাই ধরল—গরবা নাচবার জন্য।

সীতা বলল—'গরবা একা একা নেচে মোজা নেই। তা ছাড়া বাঙালি দেখলেই যদি আমরা বলি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাও, গাইতে পারবে সোবাই?'

মহীতোষ বললেন—'অন্তত মীনাক্ষী তো পাববে? কমলা বাঙালির চেয়েও ভাল পারবে।'

মীনাক্ষী গাইল—'তুমি কিছু দিয়ে যাও মোর প্রাণে গোপনে...'

কমলা গাইল—'এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ প্রাণেশ হে!'

মহীতোষ বললেন—'সবাই মিলে একবার 'পুবানো সেই দিনের কথা' হোক তাহলে?'

ঈষিতা বললেন—'তুমি আর রসভঙ্গ কর না। এখন না হোক এক কালে তো মিড সামার নাইটস ড্রিম-ট্রিম পড়েছিলে?'

মহীতোষ নত হয়ে বললেন—'আই বেগ ইয়োর পার্ডন ম্যাডাম।'

বেয়ারা এসে বলল—'সাব ডিনার রেডি।' লাঞ্চের থেকে ডিনারটা জমল ভাল। বেশ ভাল ওয়াইন পাঠিয়ে দিয়েছে সীতাপতির পেশেণ্ট। মেয়েরাও একটু-আধটু খেল। তারপর চাঁদেব আলোয গঙ্গ'র ধারে একটু বেড়িয়ে সীতাপতি বললেন—'আজ শুয়ে পড়া যাক। কাল আমায় ভোর ছ'টায় বেরিয়ে যেতে হবে। মনে রেখো সীতা।' সীতা বললেন—'রাখব।' মহীতোষ বললেন—'দুপুরের মতোই ব্যবস্থা শোয়ার, ডোণ্ট মাইন্ড মীনাক্ষী।' মীনাক্ষী হেসে বলল—'সব ব্যাটাকে ছেড়ে দিয়ে এই বেঁড়ে ব্যাটাকে ধরলেন কেন মহীদা!' মহীতোষ হেসে বললেন—'আই মিন এভরিবডি।' বলে যেন ট্রেন ধরবেন এমনিই তাড়ায় বাঁ দিকের শোবার ঘরটায় বোঁ কবে ঢুকে গেলেন। নির্জন রাত। নির্জন বাংলো। ডান দিকের শোবার ঘরে নাইট ড্রেস পরিহিত মহিলারা হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে উঠে বসলেন—কোথা থেকে যেন ভেসে আসছে ক্ষীণ স্ববে ঈষিতার গলা—'মীনাক্ষী ককটেলগুলো অত স্ট্রং না করলেই হত। ভেবেছিলুম যে যার নিজের লুকোনো প্রেমের গল্প বলে ফেলবে, এ যে কেঁচো....'

সীতাপতি বলল—'ভলুামটা লো করে দে, লো করে দে, বহুদূর পর্যন্ত শোনা যাবে।'

ঈষিতা বললেন—'কী হল? এ কি ভুতুড়ে বাংলো না কি। এতক্ষণ পরে আমাব কথার প্রতিধ্বনি ভেসে আসছে?'

কমলা মিষ্টি গলায় হেসে উঠল, বলল—'ওরা এ ঘরে টেপ লুকিয়ে রেখেছিল।'

—'ও মা। কী বদমাশ, কী বিচ্ছু, এখন কী হবে? কমলা, তুই আগে থেকে জানতিস বলিসনি আমাদের। তোর হেনপেকড হিরণ্ময় তোকে বলে দিয়েছিল নির্ঘাত।'

কমলা বলল—'সত্যি বলছি ঈষিতা, আমি একদম জানতুম না, আমরা যখন বিকেলে বেড়াতে বেরোলুম, সীতুদা হঠাৎ দেখি চোরের মতো পা টিপে টিপে বাংলোয় ঢুকে যাচ্ছেন। আমাদের ঘবের খোলা জানলা দিয়ে দেখলুম, টেপ-রেকর্ডার ব্যাগে পুরছেন।'

—'হ্যাঁ, জানতিস না, একদম বাজে কথা, তুই একটা বিশ্বাসঘাতক!'

কমলা বলল—'এটা কিন্তু সুবিচার হচ্ছে না ঈষিতা, আমরা চালাকি করে ওদের যত মনের কথা গলদের কথা জেনে নেব, অথচ ওরা নিলে মানতে পারব না! কেন?'

সুপ্রিয়া বলল—'রাইট!'

মীনাক্ষী বলল—'রাইট। তাছাড়া পতি-পত্নীর মধ্যে কোনও গোপনতা না থাকাই ভাল।'

ঈষিতা কমলাকে বলল—'তাহলে নিজের কথা কেন কিছু বললি না—শুনি? আগে থেকে জানতিস বলেই সাবধান হয়ে গিয়েছিলি। পাজি, ছুঁচো!'

কমলা অবাক হয়ে অন্ধকারে তাকাল, তারপর বলল—'কে বললে বলিনি? বলেছি তো!'

অনেক রাত্রে পত্নীদের মনের কথা শোনবার পর এবং তারাও তাঁদের স্বীকারোক্তি আগাগোড়া চালাকি করে শুনে ফেলেছে বোঝবার পর, পাঁচজনের বেশ কিছু আলোচনা হল। মহীতোষ বললেন—'আমার যে টেলিফোন ভীতি হয়ে যাচ্ছে রে!' অসীমাংশু গম্ভীরভাবে বললেন—'আমি ইচ্ছে করে ওর কেরিয়ার নষ্ট করিনি, ওকে নিজের সুবিধের জন্য ব্যবহার করছি না, এটুকু অন্তত সুপ্রিয়াকে আমার বোঝাতেই হবে।' সীতাপতি বললেন—'হেনসফোর্থ আই'ল নেভার সে নো টু খাকরা। একটা হিঁচকোও এনে দেব, যাতে সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে করব, আই'ল অলসো রিমেমবার অ্যাবাউট দোজ ডিভাওয়ারিং কোর্টশিপ কিসেস।' 'চন্দননগরের নার্সিংহোমটা...' অমিতব্রত বললেন—'মীনাক্ষীর রেসপেক্ট ফিরে পাবার জন্য আমি কী করতে পারি তোরা আমায় অ্যাডভইস দে।' তিনি এখন একবার সবুজ, একবার বেগনি হয়ে যাচ্ছেন। 'একা মিশ্রকে তার টাকা ফিরিয়ে দিলেই তো হবে না। দেয়ার আর আদার্স। সব রিফান্ড করব এদিকে, ডেমোলিশ করে দেবে, আমি তো ব্রোক হয়ে যাব রে!' শুধু হিরন্ময় চুপ করে সিগারেট খেয়ে যেতে লাগলেন। অসীমাংশু তার দিকে তাকিয়ে বললেন—'লাকি গাই, কমলার ওর এগেনস্টে কোনও গ্রাজ নেই। হিরন্ময় নিজের সিগারেটের ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে নীরবে ভাবতে লাগলেন—'সত্যিই? সত্যিই কি কমলা কিছু বলেনি। প্রশ্নের উত্তরে সে শুধু গান গাইল। 'সুখের খেলায় বেলা গেল, পাইনি তো আনন্দ।' লাইনটা তাঁকে তাড়া করে ফিরতে লাগল। 'এ মোহ আবরণ', কোন মোহ আবরণ খোলবার কথা কমলা কাকে জানাতে চাইছে—এ মোহ কি সেই গীতোক্ত সম্মোহ?

আস্তে আস্তে ঘুম এল। বহু বহুক্ষণ পরে। ঘুমিয়ে হিরণ্ময় একটি স্বপ্ন দেখলেন। পৃথিবীটা যেন একটা বিরাট ডিউজ বল। সুতোটা তাকে উত্তর আব দক্ষিণ গোলার্ধে ভাগ করেছে। তিনি প্রাণপণে পৃথিবীর ঢাকনাটা খুলে ফেলবার চেষ্টা কবছেন। অসীমাংশু দুই হাত তুলে লাফাচ্ছে। 'করিস না হিরু করিস না!' তাবপর ঢাকনাটা খুলে গেল। ভেতর থেকে ভস ভস করে ধোঁয়া বার হচ্ছে, অন্ধ করে দেওয়া বিষাক্ত ধোঁয়া, তাঁর মুখ জ্বলে যাচ্ছে, সীতু বলছে—'অসম্ভব এ আমি সারাতে পারব না।' অমু বলছে—'সর্বনাশ, এখন কী করে আমাদের আগেকার হিরুকে ফিরে পাই?' এই সময়ে একটা উঁচু টিলার ওপর উঠে দাঁড়িয়ে মহী গর্জন করে উঠল—'আই কনডেম ইউ।' ঝট করে ঘুমটা ভেঙে গেল। হিরণ্ময় বুঝতে পারলেন তাঁকে ভীষণ মশা কামড়াচ্ছে। মুখে। হাতে চাপড় মারতেই হাতটা মুখটা চিটচিটে বক্তে ভরে গেল। তাঁর নিজেরই রক্তে। অথচ ঘেন্না করছে। এত রক্ত খেয়েছে ডাঁশগুলো যে, যে যেখানে ভরা পেটে বসে ছিল সে সেখানেই থেঁতলে গেছে। বন্ধুরা সগর্জনে ঘুমোচ্ছে। জানলার বাইরে এখন পৃথিবীতে সেই দুর্লভ সময় যখন রাত্রি এবং উষা একত্রে অবস্থান করে।

পাতী অরণ্যে এক উপদেবতা

'অপসৃত হোক গুপ্তির জঞ্জাল'—এই বলে দীপু সরে দাঁড়াল। মুখে একটু লজ্জা, একটু বা গর্ব-মেশানো হাসি। দারুণ কিছু একটা করেছে এমনই ভাব। দীপু শুধু লম্বাতেই অনেকখানি নয়, ওর হিলহিলে কাঠামোয় ইদানীং বেশ বস্তু জমা হয়েছে। ফলে আর একটু হলেও ও দশাসই হয়ে যাবে। হিরোর চেয়ে ভিলেনের ভূমিকাতেই মানাবে বেশি। তা, এখনও ততটা হয়নি। এখনও হিরো-হিরো ভাবটা বজায় রয়েছে। দীপু সরে দাঁড়াতে পেছনে যে ছিল প্রকাশিত হল। রাহুমুক্ত চন্দ্রমার মতো। যদিও দীপুকে ঠিক রাহু বলা যায় না, রাহুর পক্ষে বড্ড বেশি সুকুমার। পেছনের মানুষ বা মানুষীটিও কোনও অর্থেই চাঁদেব মতো নয়। বরং যেন ঘাসের মতো, ধানগাছের মতো, যখন শিষ ধরেছে, যখন প্রথম ধবেছে কলি। 'এই হল টিংকু', দীপু বলল। একটু হেসে, একটু লতিয়ে, ধানগাছেরই মতো একটু দুলে, অতএব টিংকু অবনত হচ্ছে। প্রণাম করবে। টিপ করে নয়। সে সব হত কিছুকাল আগে যখন প্রণাম নিয়ে প্রণত ও প্রণম্যব মধ্যে কোনও সংশয় ছিল না। এখন শুধু একটু নত হওয়া, একটু ভঙ্গি। সবাই জানে মাঝপথে অটকে যাবে। 'থাক থাক হয়েছে', 'আরে ও কী হচ্ছে?' 'এখন কি আর ও সব চলে?' ঠিক কোন পর্যায়ে সুস্বাগত বাধাটা আসবে শুধু জানা নেই। কাজেই টিংকু নামের মেয়েটি স্লো মোশনে অবনত হচ্ছে।

রঞ্জা উঠে দাঁড়াচ্ছিল। ছিল সে চেয়ারে। টেবিলে তার বইপত্র। কলমের টুপি খোলা। লম্বা চিঠির কাগজ বুকে কিছু অক্ষর নিয়ে টেবিলের উপর প্রতীক্ষায়। তার উপরে বই। চিঠি আর বই বই আর চিঠির মধ্যে সে ঘোরাফেরা করছিল। দীপুর সাড়া পেয়ে সে তার সাধের ঘুরন চেয়ারে ঘুরে গিয়েছিল দরজার মুখোমুখি। তার মানুষটিকে পুরোপুরি নিজের কাঠামোর অন্তরালে রেখে যখন দীপু এগোচ্ছিল, তখন রঞ্জা ঈষৎ উর্ধ্বমুখ। এখন, 'এই হল টিংকু'র পর পর্যায়ে সে বসে থাকাটা যথাযথ মনে করছে না। উঠে দাঁড়াচ্ছে। তার মুখে বিস্ময়। দেহে বিস্ময়। তার ভঙ্গিতে বিস্ময়। সে এখন দণ্ডায়মান বিস্ময়প্রতিমা। এবং সে ধানগাছের মতো নয়। আর নেই। সে বরং একটা ঋজু অথচ ভেতরে ভেতরে ভাঙতে-থাকা প্রশ্ন। 'তবে অঞ্জলি উদ্যত কেন পলাশে?' এই প্রশ্ন সে যেন ভেতরে ভেতরে তৈরি করছে আজকাল। টগবগ করে ফুটতে ফুটতে প্রশ্নটা পাক হচ্ছে। বেশ চিট হবে তাতে। তুললে চকচকে আঠালো সুতোর মতো ঝুলতে থাকবে, তারপরে শক্ত তীক্ষ্ণ হয়ে যাবে। তখন তাকে জ্যা-মুক্ত করা হবে। ছুটে যাবে সেটা এখানে, ওখানে, সেখানে। 'তবে অঞ্জলি উদ্যত কেন'....

লিখতে যতটুকু সময় লাগে, শব্দ লাগে, তার চেয়ে অনেক কম সময়ে, কম শব্দে দীপুর মনের মধ্যে দিয়েও কতকগুলো প্রশ্ন, কতকগুলো সংশয় ছুটোছুটি করে চলে গেল। দিদিকে এমন অবাক দেখায় কেন? এক্কেবারে যেন হাঁ। যেন আকাশ থেকে পড়া। কিংবা যেন হঠাৎ বিনা মেঘে বাজই পড়েছে চড়াৎ করে? আগে বলা হয়নি ঠিকই। কিন্তু না

বললেও এটাই তো স্বাভাবিক ছিল। যে কোনওদিন, যে কোনও লগ্নে। দিদিকে এত বিচলিত দেখাচ্ছে কেন? দিদি কি প্রস্তুত ছিল না.? আলাদা করে কোনও প্রস্তুতির দরকার ছিল দিদির? সেই দিদি যে বলে 'রেডিনেস ইজ অল।' বলে, না বলত? দীপু ঠিক বুঝতে পারছে না। তার এই বিভ্রম ছড়িয়ে যাচ্ছে আশেপাশের বায়ুকণিকায়, সেগুলো যেন চার্জড্ হয়ে যাচ্ছে। চার্জড্ হয়ে গিয়ে স্পর্শ করছে টিংকুকে, ঘরের বস্তুগুলোকে। সব কিছুই কেমন শিউরে শিউরে উঠছে। টিংকু শিউরোচ্ছে নিচু হতে হতে, টেবিলের উপর কাগজ, বইয়ের স্তূপ সব কিছুতেই সূক্ষ্ম একটা শিহরণ।

রঞ্জা দাঁড়িয়ে আছে, চোখের জমিতে সেই ধাক্কা-লাগা বিস্ময়। সে একহাত কনুই থেকে মুড়ে একটু উপরে তুলছে। আঙুলগুলো বিস্ফারিত হয়ে রয়েছে। অন্য হাত, ডান হাত প্রলম্বিত হয়ে গায়ের সঙ্গে লগ্ন, হাতের পাতা সামান্য একটু প্রসারিত। যেন বুদ্ধেব বরাভয় মুদ্রা। বরাভয়। কিন্তু পাথরের ববাভয়। তাই আশ্বস্ত হতে পাবছে না কেউ। না দীপু, না টিংকু, না এই ঘরের বাতাসে বদ্ধ এবং বাইরে প্রসর্পিত তাদের জীবন।

'বসো, বোস' দুজনের দিকে পর পব তাকিয়ে বলল রঞ্জা। মুখে সেই হাসি। বুদ্ধেব মতো, কিন্তু পাথবের বুদ্ধ। খুব অল্প, একটুখানি, ঠোঁটের প্রান্তে লেগে রয়েছে মথুরার বুদ্ধের মতো। রঞ্জা চলে যাচ্ছে ঘব থেকে স্বপ্নচালিতবৎ। ধীরে ধীরে, টেনে টেনে, যেন সে পথ চেনে না। শূন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু ভরসাহারা। হাত ধবে কেউ নিয়ে যাবে সে নিশ্চয়তা সে প্রাণের মধ্যে অনুভব করছে না।

দিদি কি ভেবেছিল তার জীবনে কেউ আসবে না? ডিমের আকারের চায়ের টেবিলে চা ছেঁকে দিচ্ছি দিদি দীপ্রকে, দীপুকে। দিদি আর দীপু তাড়াতাড়ি খেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আবার রাত্রে। রাত ধরো ন'টায়। টিভি চলছে। শব্দটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শুধু চিত্র। ইচ্ছে হলে দেখো, নইলে দেখো না। দেখার দরকারও নেই। কারণ এখন কথা। এখন শব্দের জাল বুনে তুলছে দুজনে। দীপ্র আর রঞ্জা। হেলায়। এমনই অনায়াসপটুত্ব যে মুখ খুললেই এলাচ-ভুরভুর শব্দরা পেছনে আঁকশি দিয়ে বেরিয়ে পড়ে আঁকশিওলা আরও শব্দ আমন্ত্রণ করে। 'আজকে খুব মজা হয়েছে জানো দিদি'.... 'তোর তো রোজই মজা, নিত্যদিন মজারা তোর আশেপাশে ঘুরঘুর করে তুই তাদের খপ খপ করে ধরবি ব'লে...'আরে শোনোই না। একটা লোক আজকে একশ' পঁচিশ টাকার টোপ ফেলে দশ হাজার পঁচিশ বোধহয় গেঁথে তুলতে চেয়েছিল। টেলার-এর সামনে হঠাৎ দেখি চারদিকে ফরফর করে পাঁচ টাকার নোট উড়ছে বর্ষায় পাখাঅলা পিঁপড়ের মতো। কার টাকা? কার টাকা? আপনার হাত থেকে? আপনার ব্যাগ থেকে? উঁহু, আমার পাঁচ টাকার নোট ছিল না বলতে বলতে ব্যাগটা বুকে চেপে ভদ্রমহিলা কঠিন মুখ করে সরে দাঁড়ালেন। তখন একটা লোক বলল যে ফেলেছে সে চালে ভুল করে ফেলেছে দিদি! ভেবেছিল আপনি থতমত খেয়ে উড়ন্ত টাকাগুলো ধরতে যাবেন আর সে সেই ফাঁকে আপনার হাতের তাড়াটা টেনে নিয়ে ভোঁ-কাট্টা হয়ে যাবে। ভদ্রমহিলা কী বললেন জানিস?—আপনিই সেই টোপ ফেলা লোকটা নন তো? বলে হনহন হনহন করে ছাতা বাগিয়ে চলে গেলেন। হাঃ হাঃ হাঃ

হাঃ'... 'সেই লোকটার অবস্থা হল?'. ..'লোকটা? মুখখানা বেগুনি করে বলল দেখলেন তো দাদা, দেখলেন তো! কক্ষনো মেয়েছেলের উপকার করতে নেই, বলে দেবা ন জানন্তি; ছিঃ!' . নোটগুলোর কী হল?' 'নোটগুলো? কেউ আর কুড়োতে সাহস পেল না, আমার ইচ্ছে হচ্ছিল কুড়িয়ে নিই, সিগ্রেটের খরচটা হয়ে যেত, হাঃ হাঃ। ... .নিশ্চয়ই ওই লোকটাই! দেখিস নি? ট্রামেবাসে পকেটমাব হলে কিছু লোক কীরকম কী হল, কেমন করে হল, আচ্ছা করে ধোলাই দিতে হচ্ছে, এইসব আরম্ভ করে। ওই লোকগুলো আসলে পকেটমারেবই দলের লোক। ভদ্রমহিলা শুধু শুধু সন্দেহ করেননি। আরে বাবা মেয়েদের ইনস্টিংট! দেবতারা না জানতে পারেন, মহিলাবা ঠিক জেনে ফেলেন।'

বঞ্জাবতী বাথরুমে ছিল। প্রাণপণে মুখে জলেব ঝাপটা দিচ্ছিল। দিচ্ছে তো দিচ্ছেই। ঝাপটা দিচ্ছে। কানের পেছনে, গলায, ঘাড়ে জল হাত বুলোচ্ছে। সামনের অর্ধেক চুল ভিজে গেল। তবু সেই চিনচিনে ঝিনঝিনে গরম যেতে চায না! মাথায মুখে হঠাৎ যেন কে এক মালসা ধিকিধিকি আগুন ছুঁড়ে দিয়েছে। কানেব ভেতর থেকে সাপের নিশ্বাসের মতো হলকা বেরোচ্ছে। সে আবার ঝাপটা দিল, আরও জোরে। চোখ টনটন করে উঠল এত জোরে।

টিংকু বলছিল, 'আমার ভীষণ খারাপ লাগছে। আমি ববং চলে যাই।'

—'সে কী? আরে অত ঘাবড়াবার কী আছে?'

—'তুমি কিছু বলোনি?'

—'না।'

—'কিচ্ছু না?'

—'কিচ্ছু না। কোনও দিন ঘুণ্ণাক্ষরেও না।'

—'খুব অন্যায় করেছ, ভুল কবেছ,' টিংকু চোখ নিচু করে ফেলল। আসন্ন কোনও অপমানের আশঙ্কায় তাব চোখে জল আসছে।

—'দূব, অত ভয় পাবার কিছু নেই। দিদি কত মাই ডিয়ার। নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। দিদি একমনে পড়াশুনো করছিল তো। হঠাৎ। হঠাৎ ব্যাপারটা ঠিক....'

—'তাই-ই তো বলছি। বলে আনলে কী হত?' টিংকুর কথার মধ্যে ঠোঁট ফুলে আছে যেন।

—'আমি যাই টিংকু, দেখি একটু,' পা বাড়াল দীপ্র। কিন্তু তার কথার মধ্যে কোনও প্রত্যয় নেই, চলার মধ্যে কোনও পৌরুষ নেই। কলঘরেব বন্ধ দরজার বাইরে থেকে সে জোর করে গলায় উৎসাহ এনে ডাকতে থাকল,

—'দিদি! কী হল রে! কিছু হয়েছে? হঠাৎ শরীর-টরির খারাপ হল, না, কি?'

কোনও জবাব নেই। শুধু জোরে জল পড়ার শব্দ। দিদি কি এই হিমের সন্ধেবেলায় চান করছে না কি? সাড়া দিচ্ছে না কেন? দিদি কি অজ্ঞান হয়ে গেল?

বঞ্জাবতী তখন প্রাণপণে নিজের ঘুরন্ত মাথাটাকে টোকা দিয়ে দিয়ে আঙুলের ঠেকায় লাটিম থামাবার মতো করে থামাতে চাইছিল। তার মাথার মধ্যে থমথমে গনগনে গলায়

কে যেন বলছিল— সবাই যাবে? সবাই-ই এইভাবে যাবে তবে? তার জন্য? তার জন্য তবে কী? আহত আড়াল? শুধু স্বস্তি পাঠ? গনগনে আগুনের শিখার তাপে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত সচন্দন ধানদুর্বো পরিতৃপ্ত শিরগুলিতে অর্পণ? তার জন্য এই থাকবে? কী থাকবে, কী যাবে নিরুপায় মস্তিষ্কের মধ্যে সেই প্রশ্ন দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছিল। কোনটা, কতটা, কখন, কিছুই সে ভাল করে বুঝতে পারছিল না, এত উদভ্রান্ত। তাই তার কান দিয়ে হলকা বেরোচ্ছিল। সে জবাব দিতে পারছিল না কিছুতেই।

শেষকালে নিদারুণ ভয় পেয়ে দীপু যখন দরজায় ধাক্কা মারতে লাগল, তখনই হঠাৎ চিচিং ফাঁক হয়ে খুলে গেল দরজা। দিদি। ভিজে ভিজে দিদি। মুখময় জল চিক চিক। সামনের চুলগুলো সপসপে, জল ঝরছে। কানের লতি থেকে জলের ফোঁটা দুলছে। দিদি।

—'দিদি।' চাপা আর্ত গলায় ডাকল দীপু।

—'চল্।'

—'হঠাৎ শরীর-টরির খারাপ হল না কি?'

—'চল্'—দিদি দীপুর কাঁধ ছুঁয়ে। তাকে আলতো করে টান দিয়ে ঘরে যাচ্ছে। ঘরে টেবিলে দিদির বইপত্তর। ঘুরন্ত-চেয়ার দিদির ছুটির দুপুরের মনোযোগ। ঘরে টিংকু। নতুন ঘাস।

রঞ্জা কেমন বীরাঙ্গনার মতো ঘরে ঢুকল। যেন ঘরে সশস্ত্র সেনাদল আছে। ঢুকলেই সে গ্রেপ্তার হবে, কিংবা শত শত বুলেট এসে ঝাঁঝরা করে দেবে তাকে। তবু সে সেই বিপদকে অগ্রাহ্য করে ঢুকে যাচ্ছে। পুরোপুরি নিরস্ত্র। মাথায় আধভেজা চুলের করুণ শিরস্ত্রাণ। ভিজে চিবুক দুমড়োনো বর্শার মতো বিফল উঁচিয়ে আছে। ঠোঁটের হাসি ভীত, সতর্ক, নিষ্প্রাণ। চোখ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি। তার দীর্ঘ শরীর যেন ভেতরে ভেতরে কোর্ট মার্শালের জন্য সমর্পিত। পেছনে দীপু। তাকে এখন চোরের মতো দেখাচ্ছে। ঘরের মধ্যে টিংকু উঠে দাঁড়াল।

—'বসো বসো' রঞ্জাবতী উদারভাবে বলল, মনে মনে বলল, 'এসেছ যখন!'

—'দিদি, টিংকুর কথা তোমায় আগে বলা হয় নি,' অপরাধীর মতো দীপু বলল।

—'তাই তো দেখছি'—রঞ্জার হাসিমুখের ভেতরে তীক্ষ্ণ শ্লেষ, না বলে যদি অ্যাদ্দিন চলল, তো এখনও চললেই তো পারত!

—'আসলে খুব বেশিদিনের আলাপ নয়। এই গত অক্টোবর থেকে...ওর বাবার স্ট্রোক হতে ও পেনশনটা নিতে আসছিল...আলাপ হয়ে গেল...'

শুচিস্মিতা হয়ে রয়েছে রঞ্জাবতী, কথা বলছে না।

টিংকু বলল—'আপনার কথা অনেক শুনছি। অনেক দিন থেকেই আসবার ইচ্ছে। হয়ে উঠছিল না।'

ভদ্রতা না খোসামোদ? রঞ্জা মনে মনে জিজ্ঞেস করল। কিছু বলতেই হয়, সে বলল,

—'ভালই করেছ। তোমার বাবা ভাল আছেন?'

—'হ্যাঁ, বাবা এবারটা সামলে উঠেছেন। আমার ছোট বোন আছে। দিদি নেই।' ঘুরে

ফিরে খোসামোদের বৃত্তের মধ্যে চলে আসছে কথাগুলো। দিদির অভাবটা পূরণ করবার জন্যেই তাহলে ওর দীপ্রর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। দীপ্রর দিদিকে পাবার জন্য। ধরা যাক ব্যাংকে দেখা। 'এই যে আপনার টাকাটা।' দীপ্র বলছে। 'থ্যাংকিউ' জবাব। 'আচ্ছা ইনি মানে পেনশন হোল্ডার আসছেন না ক'মাস হল দেখছি। কিছু হয়েছে?'

—'হ্যাঁ স্ট্রোক।'

—'ইস্‌স। এখন কেমন আছেন?'

—'ভাল। আচ্ছা আপনার নাম কী?'

—'আমি দীপ্র সেন। আপনি?'

—'আমি টিংকু, টিংকু খাস্তগীর। আচ্ছা আপনার দিদি আছে দীপ্রবাবু?'

—'হ্যাঁ, কেন বলুন তো?'

—'তাহলে আপনার সঙ্গে ভাব করব। আমার দিদি নেই তো!'

এবম্বিধ সংলাপ মনে ভেসে উঠতেই এক চিলতে তেতো হাসি রঞ্জার মুখে ভেসে উঠে মিলিয়ে গেল।

—'কী খাবে? চা না কফি?'

—'কিছু না। আপনি বসুন।'

আহা, কী মধুর! টিংকু খাস্তগীর (?) দীপ্রর দিদিকে দর্শন করতেই এসেছে। আর কোনও স্বার্থ নেই। নেই কোনও কৌতূহল।

—'সবারই কফি আনি! তোমরা বসো!' রঞ্জা আবার বেরিয়ে যাবার সুযোগ পেল।

পনেরো মিনিট পার হয়ে গেলে দীপু রান্নাঘরের দিকে গেল। দিদি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, দীপুর দিকে পিছন ফিরে। জল ফুটে যাচ্ছে।

—'দিদি!'

ভীষণ চমকে উঠে রঞ্জা গ্যাসের নব বন্ধ করে দিল, মন দিয়ে কফি করছে এবার। তাক থেকে বিস্কুটের টিন নামাল। নানখাটাই করে রাখে দিদি ওটাতে।

—'দিদি আমার হাতে দাও, নিয়ে যাচ্ছি। ' সব কিছু সাজিয়ে সামনে থেকে রঞ্জা সরে দাঁড়ল।

দীপ্রকে বলল—'তুই এগো, আমি যাচ্ছি পেছন পেছন।'

—'কী অসাধারণ!' নানখাটাইয়ে কামড় দিয়ে বলল টিংকু।

এই একটা কথা হয়েছে অসা-ধারণ। উপন্যাস অসাধারণ, ছবি মানে ফিল্‌ম্ অসাধারণ, বিস্কুট অসাধারণ!' আর কী কী অসাধারণ হতে পারে? অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্‌স্‌টাকে কতদূর টেনে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে? রঞ্জা কফিতে চুমুক দিয়েই মুখটা বিকৃত করে ফেলল, বড্ড গরম। আনমনা ছিল কি?

পরে টিংকু দীপ্রকে বলেছিল—'আসলে মুখ বিকৃতির কারণটা কফি না, আমি। কফিটা উপলক্ষ।' কে জানে, হতে পারে! মেয়েদের ইন্‌স্টিংট, অসাধারণ। দীপু বলল, 'টিংকুর বাবা-মা, দাদা তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চান দিদি।'

—'আমার সঙ্গে!' কেমন অবাক হয়ে বলল, রঞ্জা, তারপর বলল—'তোমার বাবা এখন চলাফেরা করতে পারেন? আসতে পারবেন?' অর্থাৎ রঞ্জা যাচ্ছে না। টিংকুর পিতৃকুলকেই আসতে হবে. সেই সাবেক কালের মতো। কন্যাদায় যখন তাঁদের। কন্যা নিজে বর সংগ্রহ করে নিলেও এই লজ্জাকর প্রথা, বরের দিদি-টিদির কাছে জোড়হস্ত হওয়া—এটা এই ভদ্রমহিলা নিজে একজন উচ্চশিক্ষিত এবং নিশ্চয়ই নারীবাদীও, সব শিক্ষিত মহিলাদেরই নারীবাদী হবার কথা, ইনি নিজে এই প্রথাটা টিকিয়ে রাখবার সপক্ষে কথা কয়ে ফেললেন। কোনও সামাজিক সংস্কারই নিজের জীবনে খাটাতে পারলেন না। বাঃ।

দীপু অপ্রতিভ হয়ে বলল—'উনি অল্পস্বল্প বেরোন ঠিকই। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম তোমাকেই নিয়ে যাব একদিন।'

—'আমি তো পাঁজি-টাঁজি দেখতে পারি না। নেইও—এদিক ওদিক যেন পাঁজি খুঁজতে খুঁজতে বলে উঠল রঞ্জা। টিংকুর মুখ লালচে। দীপুর মুখ সাদাটে। রঞ্জার মুখ কেমন ভ্যাবলা মতো। 'তোরা পুরুত-টুরুত দেখে ঠিক করে নে না।'—রঞ্জা ওদের মুখেব রঙ বদল লক্ষ করেছে কিনা বোঝা গেল না।

টিংকু উঠে দাঁড়াল। বলল—'আচ্ছা আজ আসছি।' তার গলায় রাগ, কান্না, হতাশা জমে আছে। নম্র, নত, দোলায়িত ধানের শিষ নেই এখন। স্মার্ট, সোজা, আত্মগরিমায় প্রদীপ্ত। টিংকুর পেছন পেছন দীপুও বেরিয়ে যায়।

—'পৌঁছে দিয়ে আসি'—নিরীহ ভঙ্গিতে বললেও ভেতরে রাগ, হতাশা, হয়তো কান্নাও। যে দিদিকে দেখাতে এনেছিল সে দিদিকে দেখানো হল না। টিংকুর ঘাসোপম রূপটাও বড় ভাল লাগছিল, পাল্টে গেল কেমন।

বেশ খানিকটা পথ নীরব। শেষে দীপুই বলল—'আসলে দিদি খুব হতভম্ব হয়ে গেছে। আমার উচিত ছিল বলে কয়ে নিয়ে যাওয়া।' টিংকু কোনও জবাব দিল না। একটু পরে দীপু বলল—'তুমি ঠিকই বলেছিলে. আমারই ভুল। ভেবেছিলাম সারপ্রাইজ দেব একটা।' এখনও টিংকু কিছু বলল না। কিন্তু টিংকুর বাস চলে গেল, টিংকু উঠল না। এটা ভাল লক্ষণ। এর মানে দীপুর সঙ্গে হেঁটে যাওয়াটা টিংকু পছন্দ করছে। অর্থাৎ টিংকুর রাগ-অভিমান যা-ই হয়ে থাক না কেন. সেটা সামলে নেওয়া দুঃসাধ্য হবে না। বাস চলে গেল. মিনি চলে গেল একটা, পেভমেণ্ট ধরে টিংকু হেঁকে চলেছে। তার পাশে একটু পেছন পেছন আসছে দীপু।

একটু ইতস্তত করে সে আবারও বলল—'এখনই কোনও ওপিনিয়ন ফর্ম করে ফেলো না।' টিংকু হেঁটে যাচ্ছে। কোনও জবাব দিচ্ছে না। রাস্তায় ভিড়। কখনও আড়ালে পড়ে যাচ্ছে টিংকু। আবার এঁকেবেঁকে তার সমলয় কক্ষে এসে পড়ছে দীপু। একটা অটো। বিনা বাক্যব্যায়ে অটোতে চড়ে বসল টিংকু। মুখ বাড়িয়ে বলল,

—'ওপিনয়ন তো নয়ই। কোন ডিসীশনও নিচ্ছি না এক্ষুণি এক্ষুণি।'

চলে গেল। ঠ্যাং-গড়াগড়, ঠ্যাং-গড়াগড় করতে করতে অটো চলে গেল দীপুর বুকের উপর দিয়ে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল দীপু সেইখানে, ঠিক সেই বিন্দুতে, বহুক্ষণ, কতক্ষণ

সে জানে না। ফিরতে আরম্ভ করল তখন, যখন বোধোদয় হল নারীজাতি আদতে এক। কী টিংকু, কী রঞ্জা। ধরণধারণ এক রকম একেবারে। এই হইচই করছে, আদরে-আনন্দে গলে পড়ছে, সরলা বালিকা যেন, মুগ্ধা মনোমোহিনী, কোন মুহূর্তে নিষ্ঠুর ক্রূর বাঘিনীর মতো হুড়মুড়িয়ে এসে ঘাড়ে থাবা মারবে কিচ্ছু বলা যায় না। এই প্রচণ্ড ভোগী—সিনেমা যাচ্ছে, নাচের টিকিট কাটছে, দেশ ভ্রমণে যাবার জন্যে এক পায়ে খাড়া। আবার দেখো সব আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে, উদাসীন, হাসছে যেন এখুনি মরণসাগর পার হবে, কথা বলছে যেন শঙ্খমালার দেশ থেকে। অদ্ভুত!!!

ভূভারতে আর কোনও নামের মেয়ে জুটল না? টিংকু? সেই কবে কাবুলিওয়ালা নামে একটা ছবি হয়েছিল, ছোট্ট মিনির ভূমিকায় অভিনয় করেছিল টিংকু ঠাকুর বলে একটা গাবলু-গুবলু বাচ্চা। সেই থেকে এ বাংলায় প্রতি দশ জনের একজনের নাম হচ্ছে টিংকু। আচ্ছা টুকলিফাইং জাত বটে। উঠতে টুকলি বসতে টুকলি, মরতে বসেও বোধহয় টুকলি করবে! ফোঁশ করে একটা গরম নিশ্বাস ফেল্লল রঞ্জা। এত গরম যে নিজেরই হাতের পাতার উল্টো পিঠে পড়তে মনে হল অরেকটু হলেই ফোস্কা পড়ে যেত। সোজা হয়ে চলা, পরিষ্কার ভাবে কথা বলা এসব জিনিস শ্বশুরবাড়ি প্রথমে আসবার সময়ে শতকরা নিরানব্বই জন মেয়ে কেমন প্যাঁটরায় পুরে আসে! কেন রে বাবা! দুদিন বাদেই তো ফোঁশ করবি। মুখোশ গলিয়ে আসিস কেন? ওই যে একটা উচ্চারণের অযোগ্য শব্দ আছে! ব্রীড়া! কোন কাল থেকে যত রাজ্যের গুরুজন আর নাটক-নভেল সবাই মিলে আচ্ছা করে শিখিয়ে আসছে ব্রীড়াময়ী। তাই স্বাভাবিক হাসি, স্বাভাবিক কথা-বার্তা, স্বাভাবিক সব কিছু ব্রীড়ার আড়ালে লুকিয়ে ফেলতে হবে। অপুর বউ যখন এসেছিল। তাকে অবশ্য রঞ্জাই এনেছিল। মুখই তোলে না। কথা বলতে গেলেই চোখের পাতা কাঁপে। গলার স্বর শোনা যায় না। দু' বছর যেতে না যেতে, একটা বাচ্চা হতে না হতেই সেই মেযে ফুলে ফেঁপে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে—কী কাণ্ড! যে পাঁচটা বছর এখানে ছিল নাকের জলে, চোখের জলে করে ছেড়েছে রঞ্জাকে। ভাগ্যে, অপুটা বদলি হয়ে গেল। ভাগ্যে ওদের চট করে কলকাতায় পোস্টিং দেয় না। নইলে ওই আশি কেজির রণরঙ্গিণীকে আবার ভোর সকাল থেকে রাত্ত দুপুর পর্যন্ত সংসার রঙ্গমঞ্চে মহড়া দিতে দেখতে হলেই তো হয়েছিল। অপু, অপু নিজেই বা কী? বউয়ের হাঁক ডাক শুনে তার মন্তব্য—'এতদিনে বাড়িটা জমেছে। বুঝলি দিদি, মা বাবা গিয়ে থেকে মরে ছিল, মনে হচ্ছে মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার হয়েছে।' বলছে আর নিজের ঊরু চাপড়ে হাহা-হোহো করে হাসছে। হাসির উপলক্ষ কী? না বউয়ের সঙ্গে কাজের লোকের ধুন্ধুমার ঝগড়া।

—'প্রাণ সঞ্চার? প্রাণ বলতে তুই কি বুঝিস তার উপর সবটা নির্ভর করছে', রঞ্জা শেষ পর্যন্ত বলেছিল, 'বাবা মা যাওয়ার পর থেকে বাড়িতে প্রাণ ছিল না? তিনটে বালক-বালিকা আর একটা তরুণী নিঃশব্দে নিয়ম মাফিক তাদের পড়াশোনা, খেলাধুলো কাজকর্ম করে যাচ্ছে, তার মানে তাদের প্রাণ নেই!'

—'সরি দিদি, সে অর্থে সত্যিই বলিনি। প্রাণ মানে বেশ সাড়া-শব্দ জানান দেওয়া আর কি যে এখানে কেউ থাকে।'

—'মা-বাবা থাকতে সে রকম সাড়াশব্দ ছিল বলছিস?'

—'বাঃ বাবার পিটুনি মনে আছে? দুই ভাই বোনে কাজিয়া হলেই বাবা কী রকম লাঠিয়াল হয়ে যেত। আর বাবা-মার দাম্পত্য ঝগড়া খুব নিচু টোনে হত কি? বাসন-মাজার অনিলার সঙ্গে মায়ের...'

—'কী জানি?' রঞ্জা উদাস গলায় উত্তর দিয়েছিল, 'অনিলাকে অনর্থক কামাইয়ের জন্য যে বকত সে ছিল কর্ত্রী। দু' একটা তিরস্কারের শব্দই তার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। আর বাবা-মায়ের দাম্পত্য ঝগড়া? তোদের মনে আছে? আমার তো মনেই পড়ে না, যদিও তোদের আগে এসেছি। বাবা যে বড় ছেলে বলে যে কদিন বেঁচে ছিলেন অতিরিক্ত আদরটুকু তোকেই দিয়ে গেলেন রে অপু! একদিন নীপুর সঙ্গে মারামারি করেছিলি বলে রাম ঠ্যাঙানি খেয়েছিল বটে! তা সেটাই মনে রাখলি? আমার বাবার জন্মে আমি এ বাড়িতে এ রকম অশ্লীল চিৎকার শুনিনি।' রঞ্জা কাগজ পড়ছিল, কাগজে মুখ ডুবিয়ে ফেলল। অনুমান করতে পারল অপুর মুখের রঙ বদলে যাচ্ছে। মুখের রঙ বদলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বুকের রঙ-ও। রঙ বদলের সময়ে মনে থাকে না অতীত জীবনের বর্ণ গন্ধের কথা। একটা ডিম চারটে ভাগ করে খাওয়া, দুধ-সাগুর মধ্যে গোলাপজলের সুগন্ধ। দিদির হাত ধরে মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি যাবার পথে সঙ্ দেখা, জেলেপাড়ার সঙ। দিদির হাত ধরে প্যারা-টাইফয়েড পেরোনো, চিকেন পক্স পেরোনো। বাবার প্যাণ্ট কেটে প্রথম ফুলপ্যাণ্ট। একই শার্টের ফাটা কলার উল্টে বসিয়ে নতুন করে দিচ্ছে দিদি। আশ্বিনের আকাশের রঙ, বর্ষার গাছ-গাছালির রঙ। কিছুই মনে থাকে না। অতীত তার রূপরস নিয়ে বেমালুম গায়েব। বর্তমানের রঙটা কিছু কড়া। বড্ড বেশি কালচার্ড! কানে কত ডেসিবেল সয় কালচার্ডদের কে জানে। আসলে ওল্ড মেড! ক্কে বলল? কে বলল কথাটা? অপু? অপুর বউ? না অপুর ভালগার শালী?

বুকের মধ্যে ওল্ড মেড শব্দের পাথর পুরে আয়না থেকে আয়নায় ঘুরে বেড়াল রঞ্জা' জানালার সার্সি, বাথরুম-আয়না, দেওয়াল-আযনা, হাত-আয়না। আয়নাব মধ্যে তখন বিষাদও মধুর ছিল। কেমন এক উত্তেজক একাকিত্ব। সবে কিছুদিন আগে অপেক্ষা করে করে হতাশ উদ্দালক বিয়ে করেছে, উদ্দালক যার আবদার রাখলে ওল্ড মেড শুনতে হত না, উদ্দালক, যাকে ঠাট্টা করে ভাইবোনেরা দিদির তিন নম্বর বলত। ওল্ড মেড কথাটার মধ্যে একটা অবাঞ্ছিত গন্ধ আছে। কেউ নেযনি, কেউ চায়নি তাই। কারুর মনে ধরেনি। অপু তোরা তো জানিস তা নয়। অপু, নীপু, দীপু। তোদের ফেলে যাওয়া গেল না। নীপু একটা সদ্যতরুণী মেয়ে, তাকে দাদা আর ছোট ভাইয়ের হেফাজতে ফেলে দুধে-আলতায় পা রাখা গেল না। যেত, যদি অপু তুই বুঝতিস, বুঝে জোর করতিস। বুঝতিস ঠিকই। কথার কথা বলতিসও ঠিকই। কিন্তু সে তো তোর মুখের বলা। বলতে বলতেই তোর মুখ শুকিয়ে উঠত। আর যদি কেউ চায়নি, কেউ নেয় নি এমনও হত। তাতেই

বা কী! যদি কোনও পুরুষ তাকে না চায় তাহলে কি সে মেয়ে মূল্যহীন? দিদি হিসেবেও। যে দিদির হাত ধরে পুজো, মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি, যে দিদির হাতে খিচুড়ি-পায়েস, যে দিদির হাত ধরে চিকেন পক্সের রাত, সেই দিদি! মূল্যহীন! ওল্ড মেড। এই শব্দবন্ধের মধ্যে তোমাদের অক্ষেপ থাকা উচিত ছিল, কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত ছিল, মায়া থাকা উচিত ছিল, ব্যঙ্গ আসে কী করে? ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, তাচ্ছিল্য এ সব? আর সেই তিন নম্বর? উদ্দালক? সে কী? সে কেন? এক নম্বর, দু নম্বরকে বুঝতে পারা যায়। কিন্তু তিন নম্বরকে না। কোনও দিনও না। ওকে বোঝা গেল না, এই জাতীয় কোনও মায়াময় না বোঝা নয়। সোজাসুজি সাদা সাপ্টা গদ্যময় বোঝা গেল না। এক নম্বর ছিল পতু। পতাকী। দু'তিন বাড়ি পরে থাকত। ছোট থেকেই বাড়িতে খুব আসত। বাবা মারা যেতে পতু হল মায়ের অন্ধের নড়ি। বাবার অফিসেব পি এফ-এর টাকা আনতে যেতে হবে পতু। লাইফ ইনশিওরেন্সের টাকা আনতে যেতে হবে, পতু। দীপুর তেড়েফুঁড়ে জ্বর এসেছে ডাক্তার ডাকবে পতু। যত বলে রঞ্জা 'মা আমি তো আছি। আমি যাচ্ছি।'

—'তুই? তুই একা? এ কি মেয়েদের কাজ?'

—'যদি আর কেউ না থাকে তো মেয়েদেরই করতে শিখতে হয় মা, বোঝ না কেন!'

—'চল। তুইও চল, কিন্তু পতুও চলুক।'

তাই পতাকী ভ্যাবলা চোখে চাইতে চাইতে একদিন খপ করে হাতখানা ধরে ফেলল। রঞ্জা। রঞ্জা। যেন গুড়ে মাছি পড়েছে।—'রঞ্জা আমি তোমাকে বি-বিয়ে করব।' হায়! হায়! রঞ্জাকে বিয়ে করবি কী রে? তোর বাপ কত আশা করে বসে আছে ছেলের বিয়েতে সোফা সেট, ফ্রিজ, মোটর সাইকেল নেবে নগদ ছাড়াও। খরচ করে বছরের পর বছর সি এ পড়াচ্ছে। রঞ্জাকে ঘরে তুলতে গেলে, বাবা-মা, পিসি, জেঠা সব যে হাউ-মাউ করে ঘরখানাই ভেঙে দেবে।

—'তা হয় না পতাকীদা, আমাদের অবস্থায় বিয়ে করা চলে না। এইসব ছোটদের আমায় দেখতে হব।'

—'আমি দেখব রঞ্জা।'

—'তুমি? এখনও তো বাবার পয়সায় সিগারেট খাও। মায়ের পয়সায় সিনেমা যাও।'

—'রঞ্জা, তুমি বড় ঠোঁটকাটা।'

—'একটা দোষ না কি আমার? আরও আছে। অনেক অনেক। লক্ষ করো। বেরিয়ে পড়বে। এখন যাই, হ্যাঁ?'

মা যখন শেষ শয্যায় বড্ড পতু পতু করেছিল। অপুকে দিয়ে ডাকতে পাঠাল রঞ্জা। এল জুতো মশমশিয়ে, সিল্কের পাঞ্জাবিতে হিরের বোতাম ঝলকাতে ঝলকাতে।

—'বলুন মাসিমা।'

—'পতু, তুমি বড় দায়িত্ববান ছেলে, বড় ভাল, আমায় একটা কথা দেবে?'

—'কী কথা মাসিমা? সাধ্যের মধ্যে হলে নিশ্চয় দেব।'

—'আমি আর বেশিদিন নেই। তোমার পাঞ্জাবিতে ও কী পতু? চোখ যেন ধাঁধিয়ে যাচ্ছে।'

—'লাহা বাড়ি থেকে আশীর্বাদ করে গেল যে মাসিমা. আজ সকালেই। এই আষাঢ়েই বিয়ে। বলুন, কী বলছিলেন।'

—'কিছু না পতু, এই অনাথ ছেলেমেয়গুলোকে একটু দেখো।'

পতুকে দেখতে হয়নি। বাবার অফিসে এতদিনে কাজটা জুটল। টাকাকড়ি, ফিকসড্ ডিপজিট সব রঞ্জা একাই সামলাতে পেরেছিল। তার তখন কুড়ি একুশ। অপুর পনেরো, নীপুর তেরো আর দীপুর সাত।

দু নম্বরকেও বোঝা যায়। বাসে ট্রামে আলাপ। বাড়িতে আসতে শুরু করল। তা আসুক দু'ভাই বোনকে ইংরিজি ট্রানস্লেশন দেখিয়ে দেয়, রঞ্জাকে ভাল ভাল বই পড়ায়। দীপুকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় যায়। রঞ্জা মনে মনে ভাবতে শুরু করছে অরূপ তো বেশ একা। মামার বাড়ি থাকে। মা বাবা নেই, ভাই বোন নেই। তাদের বাড়িতে থাকতে কোনও আপত্তি হবার কথা নয়। অরূপের নিজের তো অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা একসঙ্গে পেয়ে গেছে এমনি ভাব। হবি তো হ' লোভী মানুষের সামনে মিড়ল-ইস্টের পেট্রো ডলারের থলি পড়ল ঝুপ করে। অরূপ চলে গেল মধ্যপ্রাচ্য, সেখান থেকে কনট্র্যাক্টের পর কনট্র্যাক্ট শেষ করে অবশেষে সব পথ এসে মিলে যায় যেখানে সেই মার্কিন্ দেশে। ততদিনে রঞ্জাদের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক কোন দিন ছিল কি না, সেটুকুও কারও মনে নেই।

কিন্তু উদ্দালক? উদ্দালক যে আলাদা! সে পতাকী নয়। সে তো অরূপও নয়। উদ্দালক যে একেবারে রঞ্জার নিজের, রঞ্জার আপন, সেই মানুষটি যাকে খুঁজে পেলে বোঝা যায় খোঁজা শেষ হল। উদ্দালকের সঙ্গে যে কথা ছিল! সে যে কথা দিয়েছিল! উদ্দালক, উদ্দালক, তুমি এ কী করলে? এমন কেন করলে? এরা যে আমাকে ওল্ড মেড বলছে। বলছে বড্ড বেশি কালচার্ড। ওভার-রিফাইণ্ড। প্রশংসায় বলছে না। সমীহে বলছে না, তাচ্ছিল্যে বলছে, আক্রোশে বলছে। উদ্দালক তুমি কোথায় গেলে? উধাও হয়ে হারিয়ে গেলে! অত প্রবল ভাবে যে থাকে সে কী করে আবার জীবন থেকে এমন নিঃশেষে হারিয়ে যায়?

দরজা বন্ধ করার শব্দ হল। খুব জোরে। খিলটা কেউ তুলে দিল আক্রোশের সঙ্গে। আচ্ছা, আচ্ছা, আক্রোশ নয়, অভিমান। এবার তাহলে দীপুর পালা। চোদ্দ বছরের ছোট ভাইটি আমার। ছোট্ট। একেবারে তুলতুলে বেড়ালছানার মতো। কোলে করে মানুষ করতে হয়েছে। সাত বছরে যে ছেলের মা চলে যায় সে কেমন কুঁকড়ে ছোট্টটি হয়ে যায়। সবাই দেখে বলত রিকেট না কী রে? এমন পুঁয়ে পাওয়ার মতো। হাতে করে তেল ডলে ডলে, গরস পাকিয়ে খাইয়ে খাইয়ে অনেক যত্নে বড় করা। তবু তেমন চৌখস হল কই? অপুর মতো, নীপুর মতো! কষ্টেসৃষ্টে বি. কমটা করল কোন মতে, তারপর লাগাতার ধর্না দিয়ে যাচ্ছে। যত তার মুখ শুকোয়. তত দিদির আদর বাড়ে, হাসি খুশি মজা। ছুটি পেলেই বেড়াতে যাওয়া। হোটেলে খাওয়া।

—'দীপু রে, নতুন শাকাহারী হোটেল খুলেছে থিয়েটার রোডের কাছে, নাকি খুব ভাল।'

—'চলরে দীপু, আর কোথাও না হোক বকখালি ঘুরে আসি।' 'বকখালিতে যাব না রে দিদি, কর্মখালি আছে কোথাও? কর্মখালি থাকে তো বল।' ধুত্তেরি কর্মাকর্ম সব বিধির হাতে, মিছেই ভেবে মরি। যখন হবার হবে ক'বার কবে, এখন বাইয়া চলো তরী রে!' 'উঃ দিদি, তুই না!' 'সত্যি বলছি রে দীপু, ঠিক হবে। সব ঠিক হয়ে যাবে, শুধু শুধু উৎকণ্ঠায় দুশ্চিন্তায় ভুগে এমন দিনগুলো কেন নষ্ট করবি, বল?' সেই হল। চমৎকার হল। টাই-ফাই হাঁকিয়ে দীপু কেমন ব্যাংক করে বেড়াচ্ছে দেখো। টু-হুইলার কিনল বলে। এখন বন্ধুরটা ধার করে চলছে। এবার কিনে ফেলবে। রঞ্জা অর্ধেক দেবে, দীপু অর্ধেক। কথা হয়েই আছে। আর এবার তো টিংকু এসে গেছে, টু-হুইলার না হলে তো আর চলবেই না। মানই থাকবে না আর। প্রেমিকের পিছনে বসে চুল আঁচল উড়িয়ে এক মুখ হাসি ছড়িয়ে বোঁ-ও-ও করে হাইওয়ে দিয়ে! না হলে হয়! দীপু দীপু শোন ভাই। আমি তো ওরকম করতে চাইনি। একটু আন্দাজ দিসনি কেন। আমি অপুকে ছেড়ে দিয়েছিলাম, নীপুকে ছাড়তে পেরেছিলাম। জেনেছিলাম ছাড়তে হবে। প্রথম থেকেই তৈরি ছিলাম। তোর বেলায় আমি তৈরি ছিলাম না। সত্যি বলছি। দু'হাতে করে তেল ডলে ডলে বড় করা। দীপু অঙ্ক নিয়ে আমার কাছে বোস, বোস বলছি, আচ্ছা তোর বাংলা রচনা, ইংরিজি এসে স-ব আমি লিখে দেব। ওরকম গোঁজ হয়ে থাকিস না! সেই ভাই সাতাশ আটাশ বছর বয়স হয়ে গেল, চাকরি পায় না, দিদিকে চক্ষে হারায়। পুরীতে, শান্তিনিকেতনে বারবার দুজনে ঝুলি কাঁধে বেরিয়ে পড়া, শ্মশানে, মশানে। ঘাটে আঘাটায়। আবার চলে যায় দূরদূরান্তে। অমরনাথ, আন্দামান আইল্যাণ্ডস্। সুবাট, অমরকণ্টক। চলে যায় চাম্বা, মাউণ্ট আবু, কোদাইকানাল। রঞ্জা, তুমি তবে ভাই বেকার থাকায় বেশ খুশিই ছিলে! তোমার কব্জায় ছিল বেশ। না? বুদ্ধিশুদ্ধি কম, তেমন করিৎ-কর্মা চৌখস না, নিজেরটা গুছিয়ে নিতে অক্ষম, ভেবেছিলে চিরকাল তোমার তাঁবে থাকবে।

সত্যি ভেবেছিলাম। তাঁবে না থাকুক। সঙ্গী থাকবে সে আমার। ভিতরে ভিতরে এমনই একটা আশ্বাস দৃঢ় হয়ে বসছিল। ঠিকই। দীপু আর আমি। রঞ্জা আর তার চোদ্দ বছরের ছোট ভাই এই বাড়িটাতে সুন্দর করে হেসে-হেসে সংসার করে। বর-বউ না হলে কি সংসার হয় না? রঞ্জা তো সেই কোনকাল থেকে, পনেরো বছর বয়স থেকে ভাই বোনকে নিয়ে সংসার করে আসছে। কোন বিচারে সেটা সংসার হবে না বলো? বলো তোমরা? বাজার করা নেই, না মাসকাবারি নেই। বিছানা ঝাড়া রান্না-বান্না। কাগজ-পত্রিকা। সময়ে বেরোনো। সময়ে-ফেরা। এঁটো হাতে আড্ডা। গল্প চলছে তো চলছেই। ভিডিও-ক্যাসেট, বইমেলা, শাড়ির দোকান, সোয়েটার বোনা, কোনটা নেই? সেটাকে সংসার ভেবে রঞ্জা ভুল করেছিল? উঠতে দিদি, বসতে দিদি। 'দিদি আমার প্রথম মাইনের শাড়ি।' 'এ কী করেছিস রে! এ যে অনেক দাম রে দীপু!' 'তোর চেয়ে বেশি দামি তো না! দিদি! দিদিমণি! দিদিভাই! এটা প্রথম মাইনের, তারপরে দ্বিতীয় মাইনের, তুই যে

সেই শোকেসে দেখে বলেছিলি!' মনে রেখে দিয়েছিস ভাইটি আমার! কবে পার্ক স্ট্রিট দিয়ে বেড়াতে যেতে-যেতে কোন দোকানের কাচের ওপারে কী শাড়ি ঝুলছিল। 'ওরে দিদি ফ্লু-কে কখনও লাইটলি নিতে নেই। একদম বিছানায়। ভাপ নাও। আর কষে ঝাল দিয়ে মাংস-রুটি খাও। মুখে ভাল লাগছে না তো কী! পেটে খিদে আছে তো!' 'আমার পাশে একটু বোস না দিদি!' 'তুই পড়া করছিস, কাল পরীক্ষা। আজ এখন বসব কী রে?' 'লক্ষ্মীটি দিদি, আমি কিচ্ছু করব না। পড়ব শুধু, তুই বোস।' দিদির আঁচল মুঠোয় পাকিয়ে বসে অ্যাকাউণ্টেন্সি পড়ছে ধাড়ি ছেলে। পরদিন পরীক্ষা। তাকে সঙ্গী ভেবে রঞ্জা ভুল করেছিল? ভুল। ভুলই তো! জীবনধর্ম রঞ্জাকে পাশ কাটিয়ে গেল বলে কি আর ছ' ফুট লম্বা একত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়সের মোটর সাইকেল কিনব-কিনব যুবাপুরুষকেও পাশ কাটিয়ে যাবে? যাবে না। তাই রাস্তার মোড়ে, ব্যাংকের কাউণ্টারে, বাসের জানলায় ঘাস-ঘাস, ফুল-ফুল, লতা-লতা টিংকুরা দুই ভ্রূর মাঝখানে ছোট্ট টিপ পরে দাঁড়িয়ে থাকে। বসে থাকে। একদিন না একদিন ঠিক চোখাচোখি হয়ে যায়, হতে হতে, ঠিক ঘোর লেগে যায়। তারপর আর সব অবিকল অপুর মতো, অপুরই মতো হবে তো!

দীপু আমি জানি, জানতাম সবই। তবু ভাবিনি। হয়তো আমার ভুল, আমার দোষ। টেবিলে কনুই দিয়ে মাথায় হাত এভাবেই বসে থাকে রঞ্জা। দড়াম করে খিল তুলে দিয়ে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে এভাবেই তাকে দেখে দীপ্র। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করে। তারপর নিঃশব্দে চলে যায়। টিংকুর সবুজ শাড়ি ভেদ করে দিদি ঢুকে পড়ছে। প্রচণ্ড রাগ, ক্ষোভ, হতাশা সত্ত্বেও। দিদি ঢুকে পড়ছে মাথার ভিতরে। দীপু তার প্রিয়ভঙ্গিতে নিজের ঘরের তক্তপোশে গিয়ে শুয়ে পড়ল। দুটো হাত কনুই ভেঙে পেছনে জড়ো করা, তার ওপরে মাথা। কড়িকাঠে দৃষ্টি। একটা পায়ের ওপর আর একটা পা। ভঙ্গিটা দেখলেই বুঝতে হবে দীপু কঠিন সমস্যায় পড়েছে।

সমস্যাই বটে। কী বলে গেল মেয়েটা। ডিসিশনটাও নিচ্ছে না এখ্খুনি এখ্খুনি। বাঃ! সব মেয়ের ভিতরেই তাহলে একটা ঘৃণ্য ঝগড়াটি থাকে, কোমরে আঁচল জড়িয়ে যে সুযোগ পেলেই মুখ নাড়া দেবে! বউদিকে দেখেছিল। বাপরে কী গলাব জোর! চোখ তো রীতিমতো ঘুরত। ছোড়দি এ বাড়িতে থাকতে দাদার সঙ্গে খুব ঝগড়া করত। তবে তার মধ্যে ওই কুৎসিত ব্যাপারটা থাকত না। শ্বশুরবাড়ি তো বহু দূর। মুম্বই। সেখানে বরের সঙ্গে একা থাকে। কে জানে কী করে। তা এই ধনী, টিংকুরানি যিনি প্রভাতের শুকতারা সুদুর শৈল-শিখরান্তের মতো দেখা দিয়েছিলেন। ছোট্ট টিপ। মিষ্টি চুলের ফের। ঠোঁটে মধুর মধুর বংশী বাজে হাসি। এই সমস্ত ভেদ করে রাগী বেড়াল দাঁতে নখে ফ্যাচাক করে এইটুকুতেই বেরিয়ে এল? এইটুকুতেই! আচ্ছা এইটুকু কি না ব্যাপারটা বিচার করা যাক। দিদি খুব সম্ভব পড়ছিল। একেবারে অনন্যমনা হয়ে পড়ছিল। দিদির এই বিশেষত্বটা আছে। যখন কিছু করে খুব মন দিয়ে করে। যেন ডুবে যায়। ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে এরকম একটা ভাব আছে দিদির। গাদিয়াড়া গিয়ে জলের দিকে চেয়ে অমনি হয়ে গিয়েছিল। যেন জলে ডুবে গেছে। খুঁজে বেড়াচ্ছে কিছু। কিংবা শুধু দেখছে জলের

তলার রাজ্য-অরণ্য-প্রাণী। এটা দিদির আছে। দিদি সেইভাবেই পড়ছিল। পরে একবার সুযোগ পেলে টুক করে দেখে নিতে হবে কী পড়ছিল দিদি। কোনও পত্রিকা, না বই। বই হলে গল্প উপন্যাস না কবিতা না কী। সব লেখাই নিশ্চয় সমান মনোযোগ আকর্ষণ করে না। যাই হোক্ দিদি নিবিষ্ট হয়ে পড়ছিল। পাকামি করে দীপু 'সুধীন দত্ত' বলল, 'এই হল টিংকু' এটাও বলল। যে দিদির সঙ্গে অত ঘনিষ্ঠতা, ন্যাংটো বয়সে মা, ইস্কুল পালানো ছেলের দিদিমণি, বেকারের মমতাময়ী সখী, এবং শ্মশানে রাজদ্বারে উৎসবে সর্বত্র বন্ধু, বন্ধু, বন্ধু, সেই দিদিকে সে টিংকুর কথা বলেনি। বলেনি কী ভাবে প্রথম আলাপ, প্রথম সিনেমা, প্রথম উট্রাম ঘাট, প্রথম টিংকুর বাবা-মা ইত্যাদি ইত্যাদি। কিচ্ছুটি বলেনি, জানতে দেয়নি। বলল বটে সারপ্রাইজ দেবে। কিন্তু আনপ্লেজেন্ট সারপ্রাইজ হয়ে গেল। গায়ের সঙ্গে শাড়ির মতো লেপ্টে থাকা ছোট ভাই জীবনসঙ্গিনী খুঁজে পেয়েছে, প্রেম করে বেড়াচ্ছে, এত বড় খবরটা দিদির কাছে সুইস-ব্যাঙ্কের লুকোনো অ্যাকাউন্ট করে রেখে দেওয়াটা কি ঠিক? হঠাৎ জীবনসঙ্গিনী কথাটা বুমেরাং-এর মতো ছিটকে এসে দীপ্রর বুকে আঘাত করল। জীবনসঙ্গিনী কে? তার এখন বত্রিশ বছর বয়স। এই বয়সটার মধ্যে সে কতবার ভেঙে ভেঙে গড়ে উঠেছে। কতবার গড়ে আবার ভেঙে গেছে, সেই জিরো আওয়ার থেকে বত্রিশ ইনটু বারো ইনটু চব্বিশ ঘণ্টা কে সঙ্গিনী ছিল? কে ছিল সেই অভয় বরদাত্রী? দিদি। সে যদি ছেষট্টি বছর বাঁচে তাহলে এই মুহূর্তে টিংকুকে বিয়ে করলেও সে কিন্তু অর্ধেকটা জীবনের সঙ্গিনী হচ্ছে, যে অর্ধেকটা অবন্ধুর, যে অর্ধেকটা ফলে-ফুলে ভরা অধিত্যকা, সমস্ত সংগ্রাম পিছনে পড়ে আছে। সেই সংগ্রামের সময়ের বেশি গুরুত্বপূর্ণ জীবনটায়ও একজন জীবনসঙ্গিনী ছিল। সবার থাকে না। তার ছিল। বড় চমৎকার ভাবে ছিল। সেই দিদিকে সে কিচ্ছু বলেনি। সে দিদিকে একেবারে এক ধাক্কায় মুছে ফেলতে চেয়েছে। এটাই সত্য। এই বিকট সত্যটা এখন তার মুখের দিকে ছৌনাচের রাবণরাজার মুখোশ হয়ে কটমট করে চেয়ে রয়েছে।

'দিদি-ই-ই-ই' একটা বুকফাটা ডাক দিল দীপু। মনে মনে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে দিদির দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। আমি যখন তাঁর দুয়ারে ভিক্ষা নিতে যাই। 'দিদি-ই' আস্তে ডাক দিল।

রঞ্জা উঠে দাঁড়াল। তার দীর্ঘ শরীরটা কেমন নমনীয় হয়ে গেছে। যেন ভেতরে হাড় নেই, সব কার্টিলেজ। সে কোনও মুদ্রা করেনি। হাত দুটো দুপাশে ঝুলছে। তবু দীপুর মনে হল দিদি রক্তমাংসের বরাভয়। এতক্ষণে হল। দীপু নত হয়ে বসেছে, তার হাতে ভিক্ষাপাত্র। দিদি দু' হাত ভরে ঢেলে দিচ্ছে, ঢেলেই দিচ্ছে, চিরকাল যেমন দিয়ে এসেছে। তেমনই কি তারও চেয়ে বেশি। বড় করুণ সেই ভিক্ষাদান। দিদি তার শেষ সম্বলটুকু তার পাত্রে ঢেলে দিচ্ছে।

'দিদি-ই!' হাহাকার করে উঠল দীপু।

'কীরে। কী দিদি দিদি করছিস তখন থেকে, খাবি চল,' প্রসন্ন মুখে বলল রঞ্জা।

—'তুই পড়ছিলি, ডিসটার্ব করলুম।' বলতে বলতে বইটা তুলে নিল দীপু পেজমার্কে আঙুল রেখে খুলে ফেলল। 'ক্রয়েটজার সোনাটা', তলস্তয়। 'খুব ভাল নাকি রে বইটা?'

—রঞ্জা কিছু বলল না। দীপু চেয়ে আছে দেখে বলল, 'ভাল কি না জানি না রে দীপু। রিভীলিং। কীভাবে আমরা অহং-এ আবৃত থেকে মিথ্যা দেখি। মিথ্যা জানি। প্রিয়তম জনকে নিজের হাতে খুন করি। এই।' দীপু কেঁপে উঠল। বলে উঠল, 'দিদি দিদি, ফরগিভ মি। আমায় ক্ষমা কর দিদি।' রঞ্জা যেন ভেতরে ভেতরে একটা শক খেয়েছে। এ কি কাকতালীয়? যদি তাই হয়, কী অদ্ভুত! ক্রয়েটজার সোনাটার শেষ উক্তি দীপু কেন বলল? কী করে বলল? তাহলে খুন করার আগেই যদি চৈতন্যোদয় হয় তবে তার চেয়ে আনন্দের ঘটনা এ পৃথিবীতে কখনও কোথাও ঘটেছে?

সে আস্তে বলল, 'ক্ষমা কেন রে দীপু? আমি একটু হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম। তুই যদি ঘুণাক্ষরেও..আমারও বোঝা উচিত ছিল....বড় হয়েছিস...যথেষ্ট...চাকরির কনফার্মেশন হয়ে গেল...এবার তো সেট্‌ল করার সময়..'

—'দিদি', আর্তগলায় দীপু বলল—'দিদি, তুইও তো বড় হয়েছিস যথেষ্ট, চাকরিতে কনফার্মেশন ছেড়ে কত উন্নতি...তোরও তো'। 'বুড়ো হয়েছি, বড় নয়। যথেষ্ট। অনেক। একদিকে উন্নতি তো অন্য দিকে অবনতি। ডিসকোয়ালিফিকেশন। সময় আমাকে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেছে।' রঞ্জা যেন ফুঁপিয়ে উঠল। অথচ সে সোজা দীপুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। চোখ দুটো একটু নামানো, কিন্তু দেখা যাচ্ছে চোখের কোলে কোনও জল-টল নেই।

দিদির কপালে কাশের গুচ্ছ। দুই ভুরুর মাঝামাঝি একটা লম্বা রেখা। মাঝে মাঝে স্পষ্ট হয়, মাঝে মাঝে মিলিয়ে যায়। পড়ার চশমা খুলে রেখেছে। পেছনে চোখ দুটি ক্লান্ত। চোখের পাতায় ক্লান্তির কালিমা। ক্লান্তি এবং ক্লান্তি।

ঝরঝর করে পাতা ঝরে পড়ছে। একটা করে দমকা হাওয়ার ঝাপটা আসে আর শূন্য থেকে শূন্যতর হয়ে যায় হেমন্তের বন। সেই ঝরাপাতার স্তূপ মাড়িয়ে মাড়িয়ে কোন নিরুদ্দেশের যাত্রী চলেছে। উড়ে কুন্তল, উড়ে অঞ্চল, উড়ে বনমালা বায়ুচঞ্চল। মত্ত বোল। শঙ্খধ্বনি ভেসে আসছে, কে যেন জোকার দিচ্ছে। কেন? কেন? সই করা বিয়েতে শাঁখ বাজে কেন, উলু দেয় কেন? আলপনা! আলপনাও দিয়েছে অপুর বউ সেই মত্তমাতঙ্গী। গোল পদ্মের মাঝখানে পাথরের থালায় দুধ-আলতা কেন গো? এইসব না হলে হয় না? এক জোড়া নর-নারী মিলিত হবার সমাজিক আইনগত ছাড়পত্র পেল। তা বেশ তো? এ সব কেন? আহা সাধ। সব মেয়েরই সিঁথিময়ূর পরতে সাধ যায়, সাধ যায় দুধে-আলতায় পা ভিজোতে, তাকে মনে করে শাঁখ বাজবে, উলু বাজবে, কপালে বরণডালা ঠেকবে, সব্বার এই সাধ গো দিদি। কে বলল? নীপু বলল। জানবে, ও জানবে। ও মেয়ে, ও বউ, ওরও একদিন বিয়ে হয়েছিল, ঘটা-পটা করে না হোক, সপ্তপদীর আলপনা এঁকে, অগ্নিতে লাজাঞ্জলি দিয়ে হয়েছিল। অপুরও হয়েছিল। রণরঙ্গিনী তখন শান্তরসের রসিকাটি হয়ে প্রবেশ করেছিলেন। মাসিমা ছিলেন, বরণ করেছিলেন। আহা, আমাদের হয়েছিল, টিংকু-দীপুর কেন হবে না গো? করুণায় সব বিগলিত হঁয়ে জাহ্নবী যমুনার মতো বইতে থাকে।

ফুলের গন্ধে যেন বান ডেকেছে। কী করেছিস রে তোরা? কোথা থেকে এত! চম্পা, চম্পা, তীব্রগন্ধী রোশনাই-ভরা-রঙ চাঁপায় ছেয়ে গেছে ঘর, থোকা থোকা চাঁপা, আর রজনীগন্ধা! ওহ, যেন কাল রজনীতে আস্ত একখানা ঝড়ই বয়ে গেছে রজনীগন্ধা বনে। ওই সব রজনীগন্ধার ঝাড় দীপুর ঘরে এসে আছড়ে পড়েছে, ঢলাঢলি করছে। দরজা বন্ধ করে রেখেছিল। সবাই মিলে থালা ভরে বাটি ভরে খাওয়া-দাওয়ার পরই হাট করে খুলে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে দুকূল পাগল-করা গন্ধের বন্যায় ভেসে গেল সব। আর সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল বিসমিল্লা। ব্যাস, যেখানে যেটুকু বাঁধ ছিল, সব, স-ব ভেসে গেল। ওরে তোরা কী জানিস এখানে একজন আছে নিয়তি যাকে চিরটা কাল রূপসরোবরের তীরে হাত পা বেঁধে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। যার ইন্দ্রিয়গুলো তোদের মতো ভোগে মর্চে-পড়ে-যাওয়া নয়। বঞ্চনায়, ত্যাগে, শিল্প-রস-সুধার নিত্য অভিষিঞ্চনে ধারালো হয়ে আছে, সূক্ষ্ম সুরশ্রুতিগুলোও তার চেতনায় ধরা পড়ে যায়! রঞ্জা সমস্ত শরীরে একটা প্রবল গতি নিয়ে তার নিজের ঘরে ঢুকে গেল। দরজা বন্ধ করে দিল। বিদায় জানাল না। শুভরাত্রি, শুভ কামনা, আশীর্বাদ কিছু না, কিচ্ছু না। সে দরজা বন্ধ করে দিল। জানলা বন্ধ করে দিল। প্রবল বেগে পাখা চালিয়ে দিল। আলো নিভিয়ে দিল। তারপর মেঝের উপর ঝড়ে-ভেঙে পড়া রজনীগন্ধার ডাঁটির মতো লুটিয়ে রইল। পাখার হাওয়ায় তার শাড়ি উড়তে লাগল।

ওরা সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। অপু নীপুর দিকে, নীপু অপুর বউয়ের দিকে। অপুর বউ টিংকুর দিকে, টিংকু দেওয়ালের দিকে, দীপু নীপুর দিকে, তারপর টিংকুর দিকে, তারপর মাটির দিকে।

শেষে নীপু বলল, 'কী হল? হঠাৎ?'

দীপু বলল—'দেখব? ডাকব?' টিংকু শিউরে উঠল। অপুর বউ তার দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে বলল, 'খেপেছ? ডাকবে কাকে? যে উঠে গিয়ে হঠাৎ ঘরে দোর দিল, ডাকলে তার কী মূর্তি দেখতে হবে ভেবেছো?'

অপু বলল, 'আঃ!'

অপুর বউ তার গোল-মুখ আরও গোল করে বলল, 'সঙ্কোচ কাকে? টিংকুকে? টিংকু তো এখন এ বাড়িরই একজন হয়ে গেল। আর সামলাতে তো হবে তাকেই।'

নীপু বলল, 'দীপ তোরা ঘরে যা। টিংকু যাও ভাই।'

টিংকু চৌকাঠের এপারে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। দীপু তার পেছনে, মুখ ব্যথায় পরিম্লান। কার জন্য এ বেদনা দীপ্র? দিদির জন্যে? নিজের জন্যে? টিংকুর জন্যে? টিংকুর জন্যেই হবে হয়তো। এই বাড়িতে আজ তার প্রথম দিন। তা ছাড়া সামলাতে তো হবে তাকেই। যার জন্যেই হোক, বিসমিল্লার মিঞা মল্লার যে সৌরভ ছড়াচ্ছে, চম্পাবতী রজনীগন্ধারা যে সঙ্গীত বাজাচ্ছে তা সমস্তই জিভে বিস্বাদ ঠেকছে। আলুনি। অপুর বউয়ের গায়ে জোর খুব। সে ঠেলে দিল দীপুকে সামনে। দীপুর ঠেলা লাগল টিংকুর গায়ে। টিংকু টাল সামলাতে চৌকাঠ পার হল, দরজায় হাত রাখল। অপুর বউ বলল, 'যাও।' নীপু বলল, 'দীপু যা, আর দেরি করিসনি,' বলে সে-ও দীপুকে একটু মৃদু ঠেলা দিল, তারপর সান্ত্বনা দিতে বলল, 'ভাবিসনি, আমরা তো আছি। দেখছি।'

দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

দরজার এপারে নীপু আস্তে আস্তে দিদির দরজার গায়ে কান পাতল। বেশ কিছুক্ষণ। অপু বলল, 'কিছু শুনতে পাচ্ছিস?'

'উঁহু। শুধু পাখাটার চিক চিক শব্দ।' অপুর বউ বলল, 'যাক, তাহলে পাখার সঙ্গে দড়ি বেঁধে ঝুলে পড়েনি।'

নীপু চোখ বড় বড় করে বলল, 'বৌদি!!'

অপু সজোরে বলল, 'ছিঃ।'

অপুর বউ বলল, 'দ্যাখো, আমি মুখ খুললে কিন্তু ব্যাপারটা ভাল হবে না। রয়ে বসে ছিছিক্কার করো। তোমাদের দিদিকে আমার চেয়ে বেশি কেউ চেনে না। ভাইয়ের ফুলশয্যে দেখে...'

অপু বলল, 'চুপ! চুপ করবে তুমি। উঃ!' 'ভায়েরা ওঁব আঁচল ধরে বরাবরের মতো থুবড়ো হয়ে বসে থাকলে উনি ঠিক থাকতেন। ভায়ের বউ সইতে পারেন না। আমাকেও পারেননি। টিংকুকেও পারবেন না। কুরুক্ষেত্র শুরু হল বলে দিচ্ছি আজ থেকে। এখন এই রাত্তির এগারোটা বেজে সাতাশ মিনিট থেকে। দেখে নিও।' সে দাঁড়াল না। ধম ধম করে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। নীপু বলল, 'কী ভয়ানক সমস্যা! দাদা, দিদি এমনি করে ধৈর্য, আত্মসংযম হারিয়ে ফেললে কী হবে?' অপু অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'কী আর হবে! আমি গেছি! দীপুও যাবে। অন্য কোথাও চলে যেতে হবে।'

—'তারপর দিদি একা?'

—'একা, তাই তো! অপু কেমন মুশকিলে পড়ে গেল। নীপু ধরা গলায় বলল, 'কত সহজে বলতে পারলি দাদা, কোথাও চলে যাবে দীপু। দিদির কী হবে? দিদি দীপুকে ছেলের মতো মানুষ করেছে। দীপু তো দিদির ছেলেই। আমাদের জন্যেও সব, স-ব দিয়েছে দিদি। কিন্তু দীপুর জন্যে দিদিব...' গলায় শব্দ আটকে যেতে লাগল নীপুর। অপু নরম গলায় বলল, 'আমি ভাবতুম, দীপু বিয়ে করবে না। ভাল'ই হবে সেটা দিদির পক্ষে। খুব স্বার্থপরের মতো ভাবনাটা আমি জানি। কিন্তু ভেবেছিলুম। খবরটা শুনে বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিলুম। তারপর এসে দেখি দিদি বাজার হাট করে, গয়না-টয়না গড়িয়ে, এক কাণ্ডই বাধিয়েছে। তখন খচখচানিটা চলেই গিয়েছিল। কেয়াটা বড্ড মুখরা, হয়তো টিংকুর সঙ্গে দিদি পারবে! কিন্তু...'

'পরতেই হবে। টিংকুকে, দীপুকে মানিয়ে নিতে হবে, এ ছাড়া কোনও উপায় নেই। দাদা, তোরা এভাবে ভাব। আর কোনও বিকল্প নেই। আমি বোঝাব, দিদিকে বোঝাব।' নীপু দিদির ঘরের দিকে যাচ্ছিল। অপু তার হাত ধরল, বলল, 'আজ না নীপু, এখন না। এখন ছেড়ে দে।'

চৌকাঠের ওপারে দীপু আর টিংকু মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। চুপচাপ। পাথরের পুতুলের মতো। ঘরে ঢুকেই বোতাম টিপে মিঞা কি মল্লার থামিয়ে দিয়েছিল দীপু। হঠাৎ টিংকু বিদ্যুৎবেগে পেছন ফিরে খাটের উপর ফুল সরাতে লাগল। গোছা গোছা চাঁপা, ঝাড়-ঝাড়

রজনীগন্ধা খুব উত্তেজিতভাবে সব সরিয়ে এক পাশে জড়ো করতে লাগল। দীপু বলল, 'কী করছ? কী করছ টিংকু?' সে বাধা দিতে গেল। টিংকু জলভরা চোখে বিদ্যুৎ হেনে বলল, 'ঠিকই করছি। ফুল-টুল, রোম্যান্স আমার জন্যে নয়। আমাদের জন্যে শুধু সাদামাটা একটা বিছানা.... এই যথেষ্ট! এই যথেষ্ট' সে দুহাতে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকল।

ফুলগুলো আবর্জনার স্তূপের মতো ঘরের একপাশে গাদাগাদি রইল। তাদের গন্ধটা যেন চটকে গিয়ে কেমন বিশ্রী লাগতে লাগল। দীপু বলল, 'টিংকু, টিংকু, অত চট করে ভেঙে পড়ছ কেন, সামনে অনেক দিন পড়ে আছে।' 'হ্যাঁ হ্যাঁ আছে। কিন্তু এইটা প্রথম। প্রথম দিন। প্রথম দিনটাই বুঝিয়ে দিচ্ছে বাকি দিনগুলো কেমন হবে!'

'তা নাও হতে পারে টিংকু', অসহায়ের মতো বলল, দীপু, 'একটু আশাবাদী হও। আমাকেও একটু আশা দাও!' তার গলায় ভিক্ষা, অনুনয়। জবাবে টিংকু কাঁদতে কাঁদতে তার বুকের উপর ভেঙে পড়ল। এবং যুবক-যুবতীর দেহসংস্পর্শের এমনই রসায়ন যে মহাশ্মশানের পশ্চাৎপটেও অপরিমেয় বিদ্যুৎ চমকায়।

রঞ্জার মনে হচ্ছিল সে বাবার মৃত্যুর দিনটাতে, মায়ের মৃত্যুর দিনটাতে ফিরে গেছে। তেমনই চরাচরব্যাপী অন্ধকার। শ্মশানভূমিতে বাসি মড়ার চিমসোনি গন্ধ। অসুখের গন্ধ। ওষুধের গন্ধ। মরণের গন্ধ। কিন্তু এ কেমন মরণ? জীয়ন্তে শিরদাঁড়া দিয়ে হিমের স্রোত নামছে। পেটের মধ্যে যেন এক ফাঁকা গহ্বর, ভয়, মাথায় গরম উনুন। কেউ নেই। কেউ কোথাও নেই। রঞ্জা একা। এই জীবন একটা দীর্ঘ সময়ব্যাপী 'কিচ্ছু না।' ভয়ঙ্কর সব গুহার ছাদ থেকে কালো কালো 'কিচ্ছু না' ঝুলছে। রঞ্জা দাঁড়াতে পারছে না, গুহার ছাদে মাথা ঠুকে যাবে। সে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে চাইলে 'কিচ্ছু না'র ভয়াবহ লতাগুলো ঝুলতে ঝুলতে তার সামনে এসে "শুলামের মতো দুলতে থাকে। সে শুয়ে থাকতেও পারে না, কেমন ক্লেদাক্ত পিচ্ছিল মাটি। আর সবার উপরে তার মাথায় যেন রাবণের চিতা জ্বলতে থাকে। হঠাৎ এ কী হল? রঞ্জা যন্ত্রণায় মেঝেতে নিজেকে রগড়াতে থাকে, মাথা ঠুকতে থাকে। পাতা ঝরতে থাকে। ঝরারই সময় যেন ঝরতে ঝরতে অবশেষে তার অশান্ত শরীরটা চাপা পড়তে থাকে একটু একটু করে। শনশন হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। তেপান্তরের মাঠে বরফ পড়ছে। জনপ্রাণীও দেখা যায় না। বরফে, ঝরা পাতায় ক্রমশ চাপা পড়তে পড়তে ভূতগ্রস্ত সে বুকে হেঁটে এগিয়ে যায় মহাশূন্যতার কিনারের দিকে।

নীপু সারারাত ছটফট করেছে কেয়াব পাশে শুয়ে শুয়ে। সে বোম্বাই থেকে একা এসেছে। ছেলের পরীক্ষা এসে গেছে। বরের কাজ। সে একাই ছোট ভাইয়ের বিয়ের খবর শুনে আহ্লাদে আটখানা হয়ে চলে এসেছে। এই বাড়িতে ঢুকতেই যেন শত সহস্র মায়া-মমতার লতানো শেকড় তাকে চারদিক থেকে আঁকড়ে ধরে। সে দূরে থাকে, অনেক বাদে বাদে আসতে পায়। সে জন্যেই হয়তো এই বাড়ির মায়াময়, দুঃখময়, সুখময়, আনন্দময় অতীত তার সমস্ত বর্ণ গন্ধ নিয়ে নীপার মনের মধ্যে জীবিত আছে। দিদি ভরসা, দিদি আশ্রয়। দিদি যতক্ষণ আছে কিছু ভাবতে হবে না। কোমল মুখলাবণ্যের দিদি, চিবুকে টুলটুলে ঘাম, ডুরে শাড়ি। দিদির হাতে আদর মাখামাখি। আবার দিদি কঠোর, চোখে

তিরস্কার, কালো শাড়ি চুল উড়ছে। দিদির সমস্ত অবয়বে শাসন। দিদির বিনুনি দুলছে, পায়ে চটি, কপালে কুমকুম, চলরে আমরা সিনেমা দেখে আসি। দিদির ঘাড়ের কাছে নরম খোঁপা, নীল শাড়ি, মুখে চাঁদের হাসি, জুঁইয়ের আতর, দিদি-উদ্দালকদা। নীপা হঠাৎ চমকে উঠে বসে। সে সাবধানে বিছানা থেকে নেমে জানলার কাছে যায়। ঘোলা জলে ফটকিরি দিয়ে আঁধার কাটাচ্ছে কেউ। ব্রাহ্ম মুহূর্ত হবেও বা। সাবধানে নীপা দরজা খোলে। প্যাসেজ পার হয়ে দিদির ঘরের সামনে দাঁড়ায়। উল্টোদিকে পর্দা উড়ছে। বসবার ঘরের চৌকিতে দাদা ঘুমিয়ে কাদা। সে সন্তর্পণে কান পাতে। ঘরের মধ্যে একটা গোঙানির মতো শব্দ। ভয় পেয়ে আরও গভীর করে শোনার চেষ্টা করে সে। 'তোরা বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা। বাস্টার্ডস। সোয়াইন!' 'দিদি', ভয়ে আকুল হয়ে নীপা দরজায় ধাক্কা মারে।' 'দি দি। দিদি!' কোনও সাড়া নেই। অনেক চেষ্টায় বন্ধ জানলার খড়খড়ি খানিকটা তুলে সে দেখে·দিদি মেঝের উপর এলিয়ে আছে। একখণ্ড ছেঁড়া কাগজের মতো। তার চোখ বোজা। মনে হয় সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে প্রলাপ বকছে। অন্ধকারে আর কিছু বোঝা যাচ্ছে না। দিদি কিছু খায়-টায়নি তো?

সে আবার জানলা ছেড়ে এসে দরজায় ধাক্কা দিল। 'দিদি।'

এবার দরজা খুলে গেল। দিদির প্রেত। আগের রাতেই দিদিকে জীবন্ত দেখেছিল নীপা। এখন কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে সেই দিদি প্রেত হয়ে গেছে। নীপা দিদিকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরল 'দিদি, আমার সঙ্গে বম্বে যাবি? দিদি প্লিজ!' সে ভিতরে ঢুকে এল। পেছনে দরজাটা ভেজিয়ে দিল চেপে। হঠাৎ রঞ্জার দু' চোখ বেয়ে শীর্ণ জলের স্রোত নামতে লাগল। সে বলল, 'আমার কোনও জায়গা নেই যাবার। কোথাও, পৃথিবীর কোথাও আমার জন্যে জায়গা রাখেনি কেউ।' নীপা বলল, 'দিদি, আমি তো বলছি আমার সঙ্গে বম্বে চল।' 'সেটা তোর জায়গা নীপু, ভরে ফেলেছিস নিজেকে দিয়ে, আমায় ধরবে না। নীপু, আমায় আর কেউ ভোলাতে পারবে না, এতদিনে আমি ঠিকঠাক বুঝতে পারলাম আমার কেউ নেই, কিছু নেই, কোনও স্থান নেই, আমি কিচ্ছু পাইনি। কিছু পারিনি। কিছু না। কিচ্ছু না। একেবারে বৃথা। ব্যর্থ!' নীপা বলতে গেল 'এরকম করে বলিসনি দিদি। এটা ভুল।' কিন্তু সেই দৃঢ় উপলব্ধির সামনে দাঁড়িয়ে সে কিছু বলতে পারল না। মনে হল সব কথাই খুব হালকা, খুব ছেঁদো, বাজে সান্ত্বনাবাক্য শোনাবে। শূন্যতার এই অতল গহ্বর সে ছুঁতেই পারছে না।

দীপুরা বেড়াতে চলে গেছে। অপু কর্মস্থলে ফিরে গেছে। নীপা আবারও বলল, 'দিদি, আমার সঙ্গে চল।'

রঞ্জা ম্লান হেসে বলল, 'তোর দেরি হয়ে যাচ্ছে নীপু, ওদের অসুবিধে হচ্ছে। আমি ঠিক আছি।'

বহু চেষ্টা চরিত্র করেও দিদিকে রাজি করাতে না পেরে নীপা ক্ষুণ্ণ উদ্বিগ্ন মনে চলে গেল। রঞ্জা তখন বিছানা ছেড়ে উঠল। ফ্রিজ খালি করে, সুইচ অফ করে দিল। সব জানলা দরজা একটা একটা করে বন্ধ করল। প্রত্যেক দরজায় একটা করে তালা লাগাল।

তারপর পাতলা একটা ব্যাগে কিছু জামা কাপড় ভরে নিয়ে, সদরে তালা দিয়ে বেরিয়ে গেল। পাশের বাড়ির কাকিমার কাছে চাবির গোছাটা জমা রাখল। অফিসের ঠিকানায় একটা চিঠি ফেলল। তারপর তার চেনা কে ভদ্রমহিলার কাছ থেকে আর একটা চাবির গোছা সংগ্রহ করে ট্রেনে উঠল।

কোন ট্রেন কোথাকার ট্রেন এসব প্রাসঙ্গিক নয়। প্রাসঙ্গিক হল যে কোনও সময়েই যে কোনও ট্রেনেই মানুষের ভিড়। বড্ড ভিড়। অনাত্মীয় ভিড়। অনেকে আছে, তবু কেউ নেই এই জ্ঞানের মধ্যে স্বস্তি আছে অবশ্যই। কিন্তু শান্তি কই! চার্মিনারের উৎকট গন্ধ নাকের সামনে। পাশে টেরিলিনের ভেতরে ঘামের বোঁটকা গন্ধ আটকা পড়ে এক অদ্ভুত আঁশটে তীব্রতা সংগ্রহ করেছে। কালো দাঁত. শিরা-ওঠা হাতে মলিন ব্যাগ। আবার মোটা গাল, ভাঁজে অহঙ্কার, বোকামি, চোখে ধূর্ততা। ইতর ভিড়। দ্যাখে। আবার কিছুই দ্যাখে না রঞ্জা। চোখ অবধি পৌঁছয়। মাথায় পোঁছয় না সব দৃশ্যাবলী। শব্দাবলী। কী নিবিড় বিরক্তি! একে কি বৈরাগ্য বলে? না বোধ হয়। যাবতীয় আসবাব, বাড়িঘর, তথাকথিত আপনজন, চেনা রাস্তা ঘাট এবং ফুল. গন্ধ, গান এ সব কিছুর প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণায় রঞ্জা এখন নিজেকে গৃহহারা করেছে। কোথাও একটা যাচ্ছে বটে, কিন্তু লক্ষ্য স্থির নেই। সে পালিয়ে যাচ্ছে। সব কিছুর থেকে, সবার কাছ থেকে। কিন্তু হায়, নিজের কাছ থেকে যে পালানো যায় না! তাই সাইকেল রিকশা যখন তাকে গন্তব্যের কথা জিজ্ঞেস করল, তখন সে প্রথমে কী উত্তর দেবে ভেবে পেল না। তারপরে মনে পড়ল; ব্যাগ থেকে নোটবই বার করে খুঁটিয়ে বলল, ঠিকানাটা। ঝরঝরে ভাঙা বাড়িটা। ভাঙা গেট ঠেলে ঢুকতে ঢুকতে রঞ্জা ভাবল, ওরই মতো। জীর্ণ। বয়স্ক। একদিন অনেককে আশ্রয় দিয়েছে। তারা ভাবেনি এই আশ্রয় একদিন নিজেই নিরাশ্রয় হয়ে পড়বে। মালি বুধন বলল, 'উপরের ঘর দুখানা সাফা রাখি মাইজি। নীচে থাকা যায় না।' মোটামুটি ঝাড়পোঁছ করা হলেও অব্যবহারের ছ্যাতলা যেন ঘরগুলোর গায়ে লেগে রয়েছে। চারদিকে তাকিয়ে রঞ্জা বলল, 'এই ভাল।' সন্ধ্যা হয়ে আসছে, শেজ বাতি দিয়ে গেল বুধনের বউ। আগে ছিল শুধু আঁধার। এখন বড় বড় কালো কালো ছায়া ঘরময় ঘুরতে ফিরতে লাগল। বুকের ভেতরে ভূতের বাসা। বাইরেও তবে তাই-ই হোক। ট্রাঙ্কের ভিতর থেকে সুজনি, মাথার বালিশ, গায়ের চাদর, টেবিল-ঢাকা বার হল। আর একটা ট্রাঙ্কের ভিতর থেকে চায়ের বাসন, স্টোভ। বুধন বলল, 'আমরা তো চা খাই না। কাল বাজার থেকে এনে বিকেলবেলা দেব।' খুব লজ্জিত মুখে সে তার বউয়ের রান্না মোটা রুটি আর ভিণ্ডি নিয়ে এসে দাঁড়াল। বলল, 'পয়সা টাকা কিছু দিয়ে রাখুন মা, কাল বাজার থেকে সব আনব।' তাকে টাকা দিতে দিতে সে ভাবল কালকে পর্যন্ত, কাল বিকেল পর্যন্ত চা খাবার জন্যে, বাজার থেকে সংগৃহীত খাদ্য দ্রব্য এসব খাবার জন্যে বেঁচে থাকতে হবে। কী ভয়ানক !

বুধন চলে গেলে দরজা বন্ধ করে দিয়ে শূন্য দেওয়ালে ছায়া ফেলতে ফেলতে জানলার ধারে রাখা তক্তাপোশে সে শুয়ে পড়ল। সে মুখে চোখে জল দিয়েছে, হাত পা ধুয়েছে, ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছে কলের মতো, কিন্তু জামা-কাপড় বদলায়নি। যেমন ছিল শুয়ে পড়েছে।

শাড়ির ভাঁজে ট্রেনের ময়লা, ব্লাউজে ঘামের ছোপ। জামা কাপড়গুলো তার শরীরে এঁটে বসে আছে। কিন্তু তার চৈতন্য নেই। সে শুয়ে আছে যেন একটা শবদেহ। নিঃগাঢ় ঘুমের জন্যেও তার কোন আকিঞ্চন নেই। আসলে আসুক, না আসলে নেই নেই। সে আসলে প্রস্তুত শেষ সর্বনাশের জন্যে। এমন কি সর্বনাশকেই সে আহ্বান করছে। যদি এই জীর্ণ বাড়ির ছাদটা তার উপর ভেঙে পড়ে ? যদি উদরের ভেতরের শূন্যতা আস্তে আস্তে হৃৎপিণ্ডে এসে পৌঁছায় ? শেষ হয়ে যাক। অনেক দিন আগেই শেষ হয়ে গেছে সে বুঝতে পারেনি। বুঝতে পারেনি।

খুব ভোরবেলায় তার ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম, না ঘোর সে জানে না। মনে হচ্ছে সারা রাত্তিরই জেগে থেকে মেরুদণ্ডে হিমবাহ অনুভব করেছে। কিন্তু কিছুটা সময় যেন স্মৃতি থেকে খসে গেছে, যে সময়ের মধ্যে আস্তে আস্তে আকাশের রঙ বদলেছে, ফুটে উঠেছে বাইরের দৃশ্যপট, এবং সমস্ত চরাচরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পাখিরা পরস্পরকে ডাকাডাকি করতে লেগেছে। বস্তুত, এই পাখির ডাকই তাকে জাগিয়ে তুলেছে। কচি শিশুর কলকলানির মতো ডাকাডাকি। চোখ বুজিয়ে বুজিয়েই তার মনে হচ্ছিল কে যেন তার মুখের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে ভীষণ হাসছে। খুব চেনা লোক অনেক দিন পর পিছন থেকে টু দিয়ে সামনে এসে যেমন হাসে ! যেমন হাসি দিয়ে ডাকে ! চোখ খুলতেই জানলা দিয়ে প্রকাণ্ড একটা তারা দেখতে পেল সে। একটা অবাক কাণ্ড। সাদা, আলোময় একটা দিব্য বেলুনের মতো জানলার মাঝখানে ঝুলে আছে। এত বড় শুকতারা সে জীবনে কখনও দেখেনি। কিন্তু এটা শুধু প্রথম দেখার মনে হওয়া। দেখতে দেখতে দেখতে দেখতে তার যেন আবছা ভাবে মনে পড়তে লাগল দেখেছিল, সে দেখেছিল। অনেক কাল, অনেক যুগ আগে, কোনও এক পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে এই হাস্যকৌতুকময় তারার মুখোমুখি হয়েছিল সে। সে কি পৃথিবীর প্রথম ভোরে ? প্রথমটা সে একেবারে হারিয়ে গিয়েছিল। বুঝতে পারছিল না কোথায় আছে। এমন কি সে কে। কী তার নামরূপ। সে পূর্ব জন্মের স্মৃতির পাতা উল্টে উল্টে নিজের পরিচয় খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছিল। যখন পাহাড়ের চুড়োয় সে এবং ওই তারা। তারপরে হঠাৎ মনে পড়ল। এ জন্মের পরিচয়, এই মুহূর্তের পূর্ব -ইতিহাস সব মনে পড়ল। ব্যথা কমবার কড়া ডোজ খেয়ে ঘুমিয়ে ওঠবার পর যেমন আস্তে আস্তে ব্যথাটা আবার জানান দেয়, তেমনি। মুখ হাত ধুয়ে সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাগানে গেল। সে পালাচ্ছে। গেট খুলে রাস্তায়, রাস্তা পার হয়ে মাঠে। মাঠের মধ্যে দিয়ে সে হাঁটতে থাকল ভাবতে ভাবতে পৃথিবী তাহলে যুগের পর যুগ লাট্টুর মতো একই কক্ষপথ পরিক্রমা করে চলে শুধু তার ভেতরে কিছু প্রাণী নাটক করবে, দেখবে এবং শুনবে বলে ! রাতের শিশিরে ভিজে মাঠ। লাল, বন্ধুর মাটি। মাঝে মাঝে ঘাসের ঝুঁটি, দিগন্ত বিরাট। এবং যতদূর চাও কোথাও কেউ নেই। ভোর আকাশের ফিকে তারারা হঠাৎ হঠাৎ দপ দপ করে উঠছে। তারপর একটা দুটো করে গাছ আরম্ভ হল। ক্রমশ আরও গাছ, আরও গাছ। শাল মহুলের বন। লম্বা লম্বা থোকা থোকা পত্রগুচ্ছ-ভরা বিশাল বিশাল বনস্পতি চারিদিক থেকে তার সঙ্গে সঙ্গে একই অভিযানে চলতে লাগল। অনেক অনেক

পরে রোদ্দুটা রীতিমতো গিয়ে বিঁধতে নিতান্ত অনিচ্ছায় সে ফিরতে লাগল। একদিনে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না জেনে। কীই বা লক্ষ্য ? তা-ও তো স্পষ্ট করে জানা নেই ! জঙ্গলের প্রান্ত থেকে দেখতে দেখতে পেল তার ভিলার গেটের সামনে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। ফুটকির মতো। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। ওই দেখতে পেয়েছে তাকে। ছোট্ট একটা দাঁড়ির মতো বুধন আস্তে আস্তে বড় হয়ে যাচ্ছে। মাথায় গামছার ফেট্টি। হাঁটু অব্দি কষে মালকোঁচা মারা ধুতি। সাদা ধুতি, কালো বুধন, লাল গামছা, আলতা-সাদা ফুলে-ভরা লতার ফ্রেম পেছনে রেখে বুধন। মুখের দুপাশে হাত রেখে সে ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে চেঁচাচ্ছে 'মা-আঁ-আ, মা-আ-আ।' বাগানে কেঠো চেয়ার পেতেছে। পুরনো বেঙ্গল পটারির বড় মাপের কাপে কালচে রঙের চা পরিবেশন করেছে বুধন। রঞ্জা জিজ্ঞেস করেনি, কিন্তু সে খুব উৎসাহের সঙ্গে বলে যাচ্ছে এত সকাল-সকাল কোথা থেকে, কেমন করে চা জোগাড় হল। লাঠি বিস্কুটের সঙ্গে নিশ্চিন্তে চা খেতে দেখছে সে রঞ্জাকে। তারপরে দেখতে দেখতে হঠাৎই কেমন ভয়ের গলায় সে বলে উঠল, 'মাইজি, জঙ্গলে ডাকু আছে, অত ভোর ভোর অত দূর একলা একলা যাওয়া ঠিক না।' রঞ্জা বলল, 'আমার কাছে তো ডাকাতি করার মতো কিছু নেই বুধন।' মনে মনে বলল, 'একা একা যেতে না পারলে যাবই বা কোথায় ?' তখন বুধন চোখ ভয়ে বড় বড় করে বলল, 'শুধু ডাকু না মা, জঙ্গলে দেও আছে। বাপ রে।'

এবং নিজেকে পরিপূর্ণ একা জেনে, কোনও ভয়ের পরোয়া না করে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে পথ ভাঙে, টিলা পেরিয়ে যায় এক বিপন্ন অস্তিত্ব। পায়ের তলায় ঝুরঝুর করে ভেঙে গুঁড়িয়ে যায় লাল মাটি। লুকোনো গর্ত থেকে লাল পিঁপড়েরা সারে সারে বেরিয়ে এসে তার গুল্‌ফে কামড় বসায়। দুটো ঘাস দাঁতে চিবিয়ে লালমতো জ্বলুনির জায়গাটায় ঘসে দিয়ে, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আরও অনেক দূর চলে যায় সে। উঁচু বাঁধের উপর দিয়ে ট্রেন চলেছে, পেছনে ধোঁয়ার স্তম্ভ টাল খেয়ে শুয়ে পড়েছে, অন্য দিকে মাথায় হলুদ লাল ফুল গুঁজে কালো পাথরের মেয়েরা সারি বেঁধে দুলতে দুলতে চলে যায়। প্রজাপতি ওড়ে, ফড়িং লাফায়। চলমান এই পৃথিবীর মধ্যে সত্যিকার গতিহীন, স্থাবর একমাত্র সে, যতই দু' পায়ে চলুক। শাল মহুল পিয়ালের এই বনও দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু সে-ও তো অন্যরকম জলের চলা চলে, ডালে ডালে। পাতায়, পাতায়। স্থবির সে নয়। বহু পুরনো বাকলের গাছও নতুন পাতায় ঝলমল করে মরশুমে, যখন শাল সেগুনে মঞ্জরী আসে তখন কেউ কি তার বয়স শুধোয় ? শিমূল-পলাশ-মাদার অশোকের ভেরী যখন বাজতে থাকে তখন সদ্যতরুণ মানুষের হৃদয় তরুণতর প্রাণের, জীবন্ততর অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়ার উন্মাদনা অনুভব করে। সেই ভিতরপানে নিতুই চলা জঙ্গলের অভ্যন্তরটিই কেমন করে পছন্দ হয়ে যায় তার। দেখে, এখানে প্রশান্ত মনে খেলা করে উঁচু উঁচু গাছ। স্তূপীকৃত শালপাতার উপর বসে পড়লে কেমন একটা সুখানুভূতি হয় শরীরের ভিতে। চারপাশে যেন অপার্থিব প্রাণীর পা ! পা মাটিতে পুঁতে উর্ধ্বমুখে সব দাঁড়িয়ে আছে।

দু-তিন দিন যাবার পর বুধন আবার সাবধান করে দেয়। তবু রঞ্জা দমে না। মানুষ

কিংবা দৈত্য, কেউই আর কোনও ক্ষতি করতে পারবে না তার। কিছুই যে আর হারাবার নেই ! দুপুরবেলা বড় গরম। সকালে রোদ ওঠবামাত্র হাওয়া তাততে আরম্ভ করে। তাই খুব ভোরে বলতে গেলে মাঝরাত গড়িয়ে গেলেই, জঙ্গলে চলে আসে রঞ্জা। পাঁশুটে রঙের আকাশটা পুরো গায়ে জড়িয়ে। পাশ দিয়ে কাঠবিড়ালিরা দৌড়ে চলে যায়। কান খাড়া করে লাফিয়ে পালায় খরগোশ। আলোছায়ার জাফরির মধ্যে দিয়ে হেঁটে বেড়ায় সবুজ, হলুদ, খয়েরি, কালো পাখি। জঙ্গলের মধ্যে তাদের ডাকের ধার কমে গেছে। তারা যেন সমীহ করছে এই আলো-ছায়াকে, এই বিশাল বিশাল দৈর্ঘ্যকে, এই বিস্তারকে। কিন্তু মৃদু চাপা সুরের একটা জাল বোনাবুনি নিরন্তর চলতেই থাকে, চলতেই থাকে। এখানে যদি কেউ বলল, চিউ চিউ, তো ওদিক থেকে আর কেউ বলে উঠবে চিক চিক। শর শর করে শব্দের ঢেউ তুলে কেউ এদিক দিয়ে চলে গেল তো, মিষ্টি সুরে কেউ দূর থেকে ক্রমাগত ডেকে যাবে কুব কুব কুব কুব কুব কুব কুব। একবার ধরলে আর থামতে চাইবে না। কোথাও থেকে কামার পাখিও আওয়াজ করবে ঠুক ঠুক, ঠক ঠক, ঠুক ঠুক, ঠক ঠক। সকালে এই রকম। বিকেল বেলা রোদ পড়তে দেরি হয় কিন্তু রোদ্দুরে গেরুয়া রঙ ধরতে না ধরতেই রঞ্জা বেরিয়ে পড়ে। গেরুয়া যখন কমলা, তখন সে-ও বন ধরে ফেলেছে।

এইভাবেই যখন শালবনের বুকের ধুক ধুক তার অনেকটা রপ্ত হয়ে এসেছে, তখন একদিন সে দেখল সূর্য অস্ত যেতে যেতে দূরের বনে শাল্মলী তরু শ্রেণীর মাথায় আটকে গেল। গাছের মাথায় মাথায় যেন সে চাক বেঁধেছে। আর পশ্চিমে যাবে না। তার লাল রঙে সেই প্রচণ্ড আঁচ নেই। কিন্তু কেমন মৃদু, মদির মেদুর ঝাঁজ। দেখতে দেখতে তার চোখের মণির মধ্যে সেই লাল যেন নরম তুলতুলে তুলোর শলাকার মতো ঢুকে গেল। ছড়িয়ে পড়ল তন্তুতে তন্তুতে। কাঁচা শাল পাতার পুরু গদিতে সে বড় আরামে শুয়ে পড়ল। বড় সন্তর্পণে। অনেক উঁচুতে আঁকাবাঁকা ডালপালা আর পত্রালির মধ্যে দিয়ে সূর্যের ফেলে-যাওয়া গেলাপি-বেগুনি রঙে রাঙানো আকাশ। আস্তে আস্তে সেই বেগুনি ধূপছায়া, ধূসর হতে হতে, মধুর নীলবর্ণে আগাগোড়া রঞ্জিত হয়ে গেল। রঞ্জা আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল। যেন তার প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শরীরের ভেতরের হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, প্লীহা, পাকস্থলী, ফুসফুস, এমন কি শিরা, ধমনী, লসিকা গ্রন্থিগুলি পর্যন্ত নিবিড় ঘুমে ঢলে পড়েছে। এইভাবে কতক্ষণ কে জানে। সুষুপ্তি সময়ের ধার ধারে না। কিন্তু বোধহয়, যতক্ষণ তার প্রয়োজন ছিল তাজা হবার জন্য ততক্ষণই। কারণ তার চেতনা একটু মৃদু আলসেমি করেই হঠাৎ একেবারে পুরোপুরি জাগ্রত হয়ে উঠল। তার শরীরে তখন কোনও জড়তা নেই। গ্লানি নেই। গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠে সে তখন পৃথিবীর প্রথম মানুষ। কিন্তু তার নামরূপ নেই, পরিচয় তৈরি হয়নি। জঙ্গলটাকেও সে চিনতে পারছে না। তার মনে হচ্ছে সে একটা কূপের মধ্যে, একমাত্র আকাশের নক্ষত্র দীপিকাই তাকে জানিয়ে দিচ্ছে সে এখনও মর্ত্যেই। আশ্চর্য হয়ে সে বুঝতে পারল চার পাশের গাছগুলো আর আলাদা আলাদা নেই। তাকে ঘিরে তারা জমাট বেঁধে গেছে। নিশ্ছিদ্র। নিরন্তর। সবাই একত্র হয়ে জেগে উঠেছে। বোধহয় এখন মাঝরাত, যা নিশা সর্বভূতানাম্। কাঁচা শালপাতা

আর মহুলের তীব্র গন্ধ এতটাই ঘন, ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তারপর সে অনুভব করল কেউ তাকে ঘিয়ে ধরছে, উপুড় হয়ে পড়ছে তার উপর। ভার নেই, অথচ স্পর্শ আছে তার। সেই স্পর্শে তার চোখের পাতা, ওষ্ঠাধর, স্তনবৃন্ত, নাভি, জানুসন্ধি তীব্র আনন্দে শিউরে শিউরে উঠছে। আকাশে কে হঠাৎ দ্যুতিমান জড়োয়া হার ছিঁড়ে ফেলল একখানা। সেই হিরের মতো জ্যোতিষ্করা তার শয্যা লক্ষ করে বহু সহস্র হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি হয়ে নেমে আসতে লাগল। এবং সে অকস্মাৎ বুঝতে পারল দেও, শাল, মহুল, সপ্তপর্ণী, শাল্মলীর ভিতরঘরে যে কতকাল থেকে একলা একলা বিহার করে আসছে, বুধন-কথিত সেই দেও আজ সত্যিকারের একলা আরেকজনকে পেয়ে তার অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে।

রবিবার সকালবেলা। আগের দিন প্রচণ্ড কালবোশেখি হয়ে গেছে। কয়েক দিন চোত মাসের জ্বলি-জ্বলি গরমের পর স্নিগ্ধ বাতাস। সাদা টার্কিশ তোয়ালে দিয়ে জোরে জোরে তার শ্যাম্পু করা চুলের গোছা মুছছিল টিংকু। সে দীপুকে ধমক দিয়ে যাচ্ছে দাড়ি কামাবার জন্য। রবিবারের অজুহাতে এদিকে দীপু গড়িমসি করেই যাচ্ছে, করেই যাচ্ছে। এখুনি দুজনে মিলে বাজার করতে যাবে। উপরন্তু আজ অতিরিক্ত কাজ আলো পাখা পরিষ্কার করা, সব ঘরের ঝুলঝাড়া। টিংকুরও কাজ। পর্দা, বিছানার চাদর-বালিশের ওয়াড় পাল্টাবে ! তারপর রবিবার সকালের মেনু রান্না হবে। স্রেফ ভাতে ভাত। সুগন্ধ চালের ভাত। আর আলু-উচ্ছে ভাতে, মটর ডাল, বড়ি-বেগুন ভাতে, পোস্ত ভাতে, এবং গোটা গোটা কষকষে কাঁচা লঙ্কা। এটা টিংকুর বাপের বাড়ির রীতি, সে-ই চালু করেছে। বিকেল বেলা দুজনে বেড়াতে যাবে, টিপটপ সেজে, কিন্তু কোথায় যাবে ঠিক করবে না আগে থেকে। বাড়ির দরজা পেরিয়ে পথে নামবার আগে পর্যন্ত না। যেদিকে ইচ্ছে যাবে। যেখানে ইচ্ছে যাবে। যা খুশি। এটা চালু করেছে দীপু। টিংকুর হিসেব-কষা মনকে সে প্রতি রবিবার হারানো ছড়ানো পাগল করে দিতে চায়। ঠিক আচ্ছ। তাই হোক। কিন্তু তুমি দাড়িটা জলদি জলদি কামিয়ে নাও দীপু। আর কত দেরি করবে ? এই তকরারের মাঝমধ্যিখানে হঠাৎ দীপু চকিত হয়ে বলে উঠল, 'দিদি, দিদি আসছে।' সে এক লাফে খবরের কাগজটা লণ্ডভণ্ড করে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। টিংকুর হাত থেকে তোয়ালে খসে গেছে। সে পুতুলের মতো দরজার দিকে ফিরল। হাতে একটা পাতলা সুটকেশ, রঞ্জা ঢুকছে, যেন সে প্রতিদিন ঠিক এই সময়ে এইভাবেই ফেরে। সুটকেসটা দীপুর বাড়ানো হাতে চালান করে দিয়ে সে অদ্ভুত একটা হাসির উদ্ভাসে একেবারে এক মাইল শান্তি কল্যাণ ছড়িয়ে নিতান্ত সহজ যোগে বলল—'এক কাপ ভাল দেখে চা খাওয়া তো টিংকু।'

বিবাহ-বিভ্রাট

'জোতে শালার কারবার শুনেচিস তপ্‌না?'

—'বেইজ্জত করে ছেড়ে দিলে মাইরি!'

—'শুধু বেইজ্জত? কেলো! কেলো!'

—'দু-দুবার হড়কে কোনমতে তো একটা এম এস করেচিস। তা মনে করেচিস কি নিজেকে?'

—'করাচ্চি মনে। এর পর ক্লাবে এলে অ্যায়সা ঝাড় দেব না....'

আমাকে মাঝখানে এক চিলতে নেটের মতো সাক্ষীগোপাল খাড়া রেখে শৈল-গোরা দুই বন্ধু দুদিক থেকে উপরি-উক্ত কায়দায় পিংপং পারাপারি করে গেল। দুজনেই মারকুটে, দুজনেরই হাতে বাছা বাছা শট। ঝাড় দেবার সিদ্ধান্ত নিয়ে শৈলটা একটা পয়েন্ট স্কোর করল মনে হল। আপাতত বিরতি। বললুম—'কেসটা কি রে?' টানা আড়াই বছর বেকার-বৃত্তির পর মাত্র মাস ছয় হল দুর্গাপুর স্টীলে কাজ পেয়েছি। প্রোবেশন চলছে। ছুটি-ছাটার তাই সুবিধে নেই। কিন্তু দিন তিনেকের সীজ-ওয়ার্কের সুযোগে প্রথম ট্রেনেই ক্লাবে হাজরে দিয়েছি। মাত্র ক'মাসের মধ্যে এমন কি ফাটাফাটি ব্যাপার হল যে এরা সব্বাই জ্যোতির ওপর এতো খাপ্পা।

শৈলই মুখভঙ্গি করে বলল—'ঢাক্তারি ফাস করে উনি প্র্যাকটিস শুরু করেছেন।'

—'সে তো ভালো কথা। তা আমাদের থেকেও ফি-টি নিচ্ছে নাকি রে?' এটা এদের উষ্মার একটা সঙ্গত কারণ হতে পারে বটে।

—'হুঃ! কার কড়ি কে ধারে? ওসব ফিস-ফাস নয়। উনি মেয়ে দেখা প্র্যাকটিস শুরু করেছেন।'

শেষের কথাগুলো শৈলর দাঁতের ফাঁক দিয়ে চিবোনো ডাঁটার মতো ছিবড়ে হয়ে বেরুলো। সেরেছে! জোতেটা শেষ পর্যন্ত নারীঘটিত কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ল। ছি! ছি! জোতের এমন ন্যক্কারজনক পরিণতি হতে পারে স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি। সম্পর্ক কি আজকের? ছেলেবেলাকার বন্ধু। শুধু এক পাড়ার নয়, এক স্কুলের, এক ক্লাসের। দুজনে দুজনের হয়ে লড়ে যাচ্ছি সেই মার্বেল-ডাংগুলির বয়স থেকে। হায়ার সেকেন্ডারির পর থেকে দুজনের পথ দুদিকে হয়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু পয়লা নম্বরের দোস্ত্ বলতে এখনও আমার জোতে, জোতের আমি। সেই জোতে উন্মার্গগামী হয়ে গেল ভেবে খুবই মুষড়ে পড়েছি। বিমান মাঝে পড়ে প্রাঞ্জল করে দিল ব্যাপারটা।

—'জ্যোতিবাবু বিয়ে করবেন। গড়ে দশখানা করে কমসে কম মেয়ে দেখে যাচ্ছেন ফি মাসে। তা হলে পাঁচ মাসে কটা হয় হিসেব কর। পাঁচ দশে পঞ্চাশ প্লাস ফাউ। তিন দিনে একখানা করে রেট। স্পীড শিগগির বাড়বে মনে হচ্ছে। দুখানা বাংলা কাগজে 'পাত্রী চাই' অলরেডি আউট।'

শৈল মন্তব্য করল—'তবে আর কি? শালার পোয়াবারো। মাগ্‌গি-গণ্ডার বাজারে টিফিনটা রোজ মেয়ের বাপের ঘাড় দিয়েই উঠে আসবে। চেম্বার তো এখনও গড়ের মাঠ। কারবার জানি না আমরা?'

গোরা বলল—'ওঠাচ্ছি ওর টিফিনের খরচা। আমাদের ও চেনেনি এখনও। ডাউরি-সিসটেম উঠে গেল, মেয়েরা বাপের সম্পত্তির শেয়ার পাচ্ছে ; লিগ্যাল টার্মিনেশন অফ প্রেগন্যানসি অ্যাক্ট পাস হয়ে গেল, এখনও শালা খোঁপা খুলিয়ে, পায়ের গেছে দেখে, রসগোল্লা-পানতোয়া-শিঙারা-কচুরির ছেরাদ্দ করে বিয়ে করবে? প্রগতি সঙ্ঘের মেম্বার হয়ে? মামদোবাজি! আজ থেকে তিন দিনের মধ্যে যদি গলির মোড়ে রাতের অন্ধকারে কে বা কাহারা ওর ঠ্যাং ভেঙে দিয়ে না যায় তো আমার নামে তোরা কুকুর বেড়াল যা ইচ্ছে পুষিস!'

জিগগেস করলুম—'মনস্থির করতে পারছে না, না কি?'

—'মন ওর আছে, যে তার স্থির-অস্থির?' শৈল বলল—'একেবারে হার্টলেস চশমখোর। অ্যাদ্দিন মিশছি টের পাইনি। এইবারে খড় বেরিয়েছে।'

বিমান বলল—'বিবির বাগানের হরিহর উকিলের সেজ মেয়েকে দেখেছিস তো তপনা? সুন্দরী না হোক, গ্ল্যামারাস, অস্বীকার করতে পারিস? জোতে দেখে এসে কি বলে জানিস? সব ভালো, নাক ছোট। কতো বড় নাক নিবি রে শালা? বৌ-এর নাক ধুয়ে কি জল খাবি? নাকি কেটে নিয়ে নিজের খ্যাঁদা নাকে সেলো দিয়ে জুড়বি?'

শৈল বলল—'আরও আছে। আরও আছে। মুখ ভালো তো রঙ কালো, রঙ্ চলে তো মুখ চলে না। হাড়-জিরজিরে, চোখ কুতকুতে, ঘাড়ে-গর্দানে, ভুঁড়িদাস, শিড়িঙ্গে, হিড়িম্বা, হোঁৎকা, চ্যাপ্টা, মোটকা, বাঁটকুল....'

—'জোতের নিজের চেহারাখানার কথা চিন্তা করে পার্সপেকটিভটা ঠিক করে নিস তপনা,' গোরা হেঁকে উঠল, 'এ ব্যাপারে চামচাগিরি করতে এলে তুইও ইম্মিজিয়েটলি আউট।'

বিমান সখেদে বলল—'কিছুতেই আর নাক-চোখ-মুখের সাইজ ঠিক হয় না শালার। মেজারিং টেপ পকেটে নিয়ে ঘুরছে। গত হপ্তায় একটা মেয়ে দেখে এসে বললে, এখানেই লাগিয়ে দিতুম, কিন্তু চুলের কালারটা কেমন ম্যাড়মেড়ে, অ্যাকিউট ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি। শিগগিরই পেকে যাবে। বল্‌, এর জবাব আছে! পাকেনি, পাকবে, এর পরে বলবে মোটায়নি মোটাবে। শিঁটোয়নি শিঁটোবে, বুড়োয়নি বুড়োবে।'

গোরা বলল—'আরে বাবা অপ্সরী বিদ্যেধরী মেয়ে এতো লোক থাকতে তোর মতো হামবড়া বোম্বেটেকে কেন মালা দিতে যাবে সে কথা একবারও ভেবে দেখেছিস?'

আমার এই পাড়াতুত বন্ধুদের কিঞ্চিৎ 'স'-এর গোলযোগ আছে। উপরন্তু ল্যাজা-মুড়োয় শালা ছাড়া কেউ কথা বলতে পারে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাদের এ এলাকার শান্তি-সংস্কৃতি রক্ষায় এদের এই প্রগতি সঙ্ঘের গুরুত্বপূর্ণ অবদান যে নিছক কথার কথা নয় তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। চাঁদা নিয়ে গেরস্থকে জোর-জুলুম, শেতলা-

রক্ষাকালী মা-মনসার নাম করে লাউডস্পীকারের হামলা, যখন-তখন বোমাবাজিতে পিলে চমকানো—এইসব পাড়ার-ছেলেসুলভ ক্রিয়াকলাপ প্রগতি সঙ্ঘের প্রোগ্রাম বহির্ভূত। আমাদের রাস্তা বারো মাস ছিমছাম, পরিষ্কার, মিউনিসিপ্যালিটির জমাদার চলে যাবার পর দফায় দফায় রাস্তায় জঞ্জাল ফেলা নিষিদ্ধ। বর্ষায় জলকাদা জমে না, মেয়েদের 'আওয়াজ' দেওয়া, বয়স্কদের অসম্মান করা, পরিত্যক্ত কবরখানায় মদের ভাঁটি, পলিটিক্যাল পার্টির পেটোয়া গুণ্ডাদের নাশকতামূলক কার্যকলাপ—সব বন্ধ হয়েছে এই প্রগতি সঙ্ঘেরই উদ্যোগে। বিপদে-আপদে সঙ্ঘ হামেহাল হাজির। রাজদ্বারে শ্মশানে চ দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে একেবারে আক্ষরিক অর্থে। ইটখোলার জনার্দন ঢ্যাং প্রতিবেশীর দক্ষিণ চেপে তেতলা তুলছিল, পিলার ঢালাই শুদ্ধু সারা। প্রগতি সঙ্ঘ কোর্ট ইনজাংশন বার করে আনল। ইনকাম ট্যাক্সের ঘোষদা, জনান্তিকে ঘুষদা, বাড়ির উঠোনে কি সব বিদঘুটে কেমিক্যাল তৈরি করতে আরম্ভ করে, কিছুতেই কারো কথা শুনবে না। এদিকে বিষাক্ত গ্যাসে লোকের প্রাণ ওষ্ঠাগত। প্রগতি সঙ্ঘের দরবারে কুটিরশিল্প দপ্তরের নির্দেশনামা নিয়ে পুলিশ এসে দু-মিনিটে কারখানার বারোটা বাজিয়ে দিল। এই তো সেদিন সুশান্তদার দু-বছরের পুঁচকে মেয়েটা স্রেফ প্রগতি সঙ্ঘের তৎপরতার জন্যেই বেঁচে গেল। দোতলার বারান্দার গ্রিল বেয়ে বেয়ে কেমন করে উঠেছিল, ধুপ করে পড়ে যায়, গোরা-মুরারির চোখের সামনে। তক্ষুনি দুজনে ট্যাকসি ধরে তাকে নিয়ে ছুট। মেডিক্যাল কলেজের এমার্জেন্সি ইউনিটে তার চিকিৎসা শুরু হয়ে গেছে, তখন সুশান্ত-বৌদি ফোনে খবর পেয়ে বারান্দায় ছুটে এসে কান্না জুড়ে দেন।

কাজেই জ্যোতির এ ব্যবহারে প্রগতি সঙ্ঘের কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্যরা অর্থাৎ বিমান-শৈল-গোরা-মুরারি ক্রুদ্ধ হতে পারে বইকি। সে অধিকার এদের আছে। অতএব জরুরি অবস্থামূলক শীর্ষ সম্মেলন করে স্থির হল জোতেকে আর একটি মাস চান্স দেওয়া হবে, তার মধ্যে ও এসপার-ওসপার কিছু একটা করুক। আলটিমেটাম শুদ্ধু সমনটা আমাকেই ধরাতে যেতে হবে। অন্যথায় গণ আদালতে জোতের গণ বিচার। গর্দান গেলেও যেতে পারে।

এমার্জেন্সি। সুতরাং সেইদিনই সন্ধেবেলায় জ্যোতিকে পাকড়াও করা গেল। শূন্য চেম্বারে বসে খুব গম্ভীর মুখে নাকে চশমা এঁটে জ্যোতি একখানা মেডিক্যাল জার্নাল পড়ছিল। আরও এক ঝাঁক জার্নাল টেবিলের পাশে গাদা করা। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে পড়ার ভান করার পর বলল,—'কবে এলি?'

—'এই তো সকালে। তোর কি খবর? রুগীপত্তর কেমন হচ্ছে?'

—'ওসব আস্তে আস্তে হয়। একদিনে ছপ্পর ফুঁড়ে রোগী পড়ে না। ওয়েট করতে হয়।'

বাপ্ রে। ফোর ফর্টি ভোল্ট। বোম হয়ে আছে। প্র্যাকটিস জমছে না। মেজাজ খারাপ। তায় আবার আমি ভগ্নদূত। কপালে যে আজ কি আছে! যাক, যা হবার তাড়াতাড়ি হতে দেওয়াই ভালো। বললুম—'তুই নাকি....বিয়ে....টিয়ে...করবি-টরবি? মেয়ে-টেয়ে...দেখছিস-টেখছিস....!'

জ্যোতি এক হাতে কলম আর এক হাতে জার্নাল নিয়ে কিছুক্ষণ থম মেরে বসে রইল। ঝড়ের আগের অবস্থা। তারপর আমার দিকে ফিরে বলল—'দ্যাখ তপন, এখানেও একটা ফুল-ফ্রেজেড এস্‌পিয়নেজ সিসটেম কাজ করে যাচ্ছে। মগজের মধ্যে বিলট-ইন ওয়্যারলেসও বলতে পারিস,' নিজের মাথায় টোকা মারল জ্যোতি, 'তোর প্রগতি সঙ্ঘের এগজিকিউটিভ কমিটিকে বলে দিস একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে ইনটারফিয়ার করাটা অরিজিন্যাল স্ট্যাট্যুটে ছিল না।'

আমি বললুম—'না...মানে... কোন্‌টা ব্যক্তিগত কোন্‌টা নয়... আসলে ওদের ফিলিংটা....মানে ওরা ভাবছে....'

—'চেষ্টা করিসনি। চেপে যা তপ্‌না। তবে কথা বলতে না পারিস মগজটা তো একটু-আধটু খেলাতে পারতিস এককালে! এখন কি একেবারে ধোলাই করিয়েই ঢুকেছিস?'

—'না.... মানে....'

—'মানে-ফানে নয়। বিয়েটা কার? তোর না বিমানের না শৈলর না গোরার? ছাঁদনাতলায় তোরা কে দাঁড়াচ্ছিস? খুলে বল, যে দাঁড়াবি তার ফরমাসমাফিক এগোবো। তবে হ্যাঁ, বিয়েটা যদি আমার হয় সেটা আমাকেই করতে দে। প্রমিস করছি বরযাত্রীর নেমন্তন্ন পাবি। পেয়ে যাবি।'

আমি শান্তির জল ছিটোতে থাকি—'এই জ্যোতি, যা যা তুই শুধুমুধু রেগে যাচ্ছিস। আচ্ছা, তোর পয়েন্টগুলোও তো একটু খোলসা করে এক্সপ্লেন করতে পারিস। জানতে পারলে আমার সুবিধে হত।'

জ্যোতি বলল—'তা তুই জানতে চাইতে পারিস তপনা। সে এক্তেয়ার তোর আছে। বলি জেলা-ইস্কুলে বরাবর ফার্স্ট হয়ে গেছে কে? আমি না তুই?'

—'তুই।'

—'দস্তুরমতো ভায়া কমপিটিশন, ভায়া প্রপার চ্যানেল মাটিয়া কলেজে ঢুকেছি। নো বাবা-মামা-কাকা বিজনেস। সত্যি কি না?'

—'ওহ শিওর, শিওর।'

—'নাইনটি পার্সেন্ট বাঙালীর মতো জিয়ার্ডিয়া আর অ্যামিবিক ডিসেন্টরিতে ভুগি না। ফার্স্ট ক্লাস ফুটবলে খেলেছি। ইদানীং জ্যোতিশংকর ডাট ছেড়ে দেবার পর তোদের ক্লাব ফার্স্ট ক্লাস সকার থেকে অর্ধচন্দ্র খেয়েছে? এ শর্মাকে রিপ্লেস করতে পারিসনি। ঠিক কিনা?'

—'ঠিক।'

—'বিড়ি-সিগারেট-গাঁজা-চরস-পান-জর্দা বিয়ার-হুইস্কি চলে না। অর্থাৎ ট্যাঁকের পয়সা চট করে ফুঁকে দিচ্ছি না। ক্যানসারের চান্স মোটে ফর্টি-ফাইভ পার্সেন্ট।'

—'এটা জানি না ভাই।'

—'আচ্ছা, যা জানিস না তেমন আরও কটা বলছি। শুনে যা। ডাউরি-সিসটেম ওঠেনি, পুরোদস্তুর চালু। যে কোনও বিয়ের দলিলে বিটুইন দা লাইনস অদৃশ্য কালি দিয়ে লেখা

থাকে। আমি, ফর ইয়োর ইনফর্মেশন, এক নয়া পয়সাও নিচ্ছি না। ফ্রীজ, টিভি, সোনার বিস্কুট এ বিয়েতে ট্যাবু।'

—'বাঃ বাঃ', আমি প্রশংসায় বিগলিত।

—'আরও শোন। যে যতই যাই বলুক মেয়েরা শ্বশুর-শাশুড়ি-জা-ননদ-দেওর-ভাসুর পছন্দ করে না, কেমন তো?'

—'তা যা বলেছিস।'

—'আমি ঝাড়া হাত পা। আছেন খালি এক পিসীমা। তা তিনি হলেন গিয়ে সেই গরু যে খাবে কম, দুধ দেবে বেশি....ইত্যাদি ইত্যাদি। নিজের জপতপ, নিরামিষ হেঁশেল নিয়ে আছেন। তবে?'

—'তবে কি?'

—'তবে আমি একটা মনেব মতো বিয়ে করতে পারব না কেন? বুঝিয়ে দে। শিক্ষিত, খুব উচ্চশিক্ষিত নয়, স্মার্ট, ওভারস্মার্ট নয়, সুশ্রী। প্রকৃত সুন্দরী-টুন্দরী দরকার নেই। সপ্রতিভ অথচ নাক উঁচু নয় এমন একটি সহধর্মিণী যিনি আমার পাশে বেশ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন। খুব বেশি চাইছি?'

—'মোটেই না', আমি উৎসাহ দিয়ে বলি, 'তা পাচ্ছিস না?'

—'না। উদাহরণ দিই শোন। তোর ওই শৈল গোরা যাই বলুক না কেন। বালিগঞ্জে মেয়ে দেখতে গেছি। বেশ হাসি-খুশি, মিষ্টি-মিষ্টি, চটপটে, তোদের মতো মিটমিটে ফন্দিবাজদের হ্যান্ডল করতে পারবে মনে হচ্ছে। মডার্ন বাড়ি। অভিভাবকরা কথা বলবার সুযোগ দিয়ে আড়ালে আবডালে অপেক্ষা করছেন। জিগগেস করলুম—'আপনার হবি কি?' একগাল হেসে বললে, 'মার্কেটিং। মার্কেটিং করতে না আমার ভী-ষণ ভালো লাগে।' বোঝ তপনা। এ হবির ফুল ইমপ্লিকেশনটা ভালো করে বোঝ। বিষম খেয়ে জল চাইলুম। স্ট্রীট-সিঙ্গারদের হারমোনিয়ামের মতো প্যাঁ পোঁ করে বললে—'ব্যা-রা, সাবকো বাস্তে পানি লাও।' মনশ্চক্ষে দ্যাখ তপন, সারাদিন গাধার খাটুনি খেটে, হাজারটা রোগ আর রোগী ঘেঁটে কেটেকুটে বাড়ি ফিবে জল চাইছি, আর গিন্নি সেজেগুজে মার্কেটিং সেরে মানে পয়সাগুলো স্রেফ ফুঁকে দিয়ে ফিলিম ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাতে ওলটাতে মেমসায়েবি কেতায় হেঁকে বলছে—'ব্যা-রা পানি লাও। লাইফ যে হেল হয়ে যাবে রে!'

আমি বললুম—'বেশ, এ তো গেল একটা। আরগুলো? শুনলুম ডজন ডজন মেয়ে দেখেছিস?'

—'হুঁ। শৈলরা তোকে বেশ বায়াস্ড্ করেই বাজারে ছেড়েছে দেখছি। তোকে জিগগেস করি তপন, তুই খোনা মেয়ে বিয়ে করবি? করতে চাস তো বল। আমার হাতে অপূর্ব রূপসী মেয়ে আছে, এক্ষুনি লাগিয়ে দিচ্ছি।'

—'কি রকম? কি রকম?'— জ্যোতির প্রত্যাখ্যাত সুন্দরী পাত্রী রিবাউন্ড করে আমার দিকে আসার সম্ভাবনায় আমি আগ্রহী হয়ে পড়ি।

—'এ মেয়ে বউবাজারের। দুধে আলতা রঙ। গ্র্যাজুয়েট। পায়ের পাতাগুলো অবিকল

পদ্মফুলের পাপড়ির মতো, বাড়িয়ে বলছি না তপনা। চোখদুটো লিট্যারাল্যালি স্যানসক্রিট কাব্য স্টাইল— জোড়া ভোমরা বসে আছে। নাম জিগগেস করলুম, বললে মিনতি মান্না। তখনও বুঝতে পারিনি। ম ন সবই অনুনাসিক বর্ণ তো?—'কোন্ কলেজে পড়েছেন?' — 'মণীন্দ্র নন্দী।' আবার ম, ন। গান শুনতে চাইলুম। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ডিগ্রি পাওয়া মেয়ে। গান শুনতে চাওয়া কি আমার অন্যায় হয়েছে বল? গাইয়ে মেয়ের কাছে তো লোকে এমনি এমনিও শুনতে চাইতে পারে। তখনই শুরু হল নাসিকা বাদ্য বা নাক সানাই যা বলিস। যাঁও যাঁও যাঁও গোঁ এঁবাঁর যাঁবাঁর আঁগে রাঁঙিয়ে দিয়ে যাঁও। ওরে বাপ রে বাপ। তখন আমি যাওয়া ছেড়ে লেজ তুলে দৌড় লাগাতে পারলে বাঁচি।'

জ্যোতির প্রস্তাব পরদিনই ওর একটা মেয়ে দেখতে যাবার কথা। আমি যেন ওর সঙ্গে যাই। ওরও দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকলে সুবিধে হয়, আমিও ওব বিরুদ্ধে চার্জ শীট তৈরি হয়ে যাবার আগে চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন করে আসতে পারি।

অতঃপর স্থান—উত্তর কলকাতা। কাল—সকাল সাড়ে নয়। পাত্র—জ্যোতিশংকর ডাট এম বি এম এস এবং অধম।

দেউড়িওলা পুরনো স্টাইলের বাড়ি। জ্যোতি চুপিচুপি বলল—'এদিকের বিখ্যাত মিত্তির বাড়ি রে! প্রথমত মিত্তিব কুটিল অতি। দ্বিতীয়ত বুর্জোয়া ফ্যামিলি। বুর্জোয়া ব্যাকগ্রাউন্ড আমার পছন্দ নয়।' মনে মনে বললুম মরেছে। ব্যাকগ্রাউন্ডই পছন্দ নয় তো এলে কেন বাবা।

ধবধবে ধুতি মেরজাই পরা ফর্সা ফর্সা গোলগাল মাঝবয়সী ভদ্রলোক আমাদের এগিয়ে নিতে এলেন। ট্যাকসি থেকে নামালেন প্রায় জামাই খাতিরে। লম্বা দালান। দুদিকে পালিশ-করা কাঠের দরজা। মোটা মোটা পেতলের ডাণ্ডা থেকে ভারি ভারি পর্দা ঝুলছে। দালানের শেষ প্রান্তে একটা গোল চত্বর। দোতলার সিঁড়ি উঠে গেছে। কারুকার্যকরা সেকেলে কাঠের চেয়ার, পুরু গদী দেওয়া, মোরাদাবাদী পেতলের টপওয়ালা এক জমজমাট টেবিল। এইখানেই আমরা উপবিষ্ট হলুম। আমি বসেছি হাত-পা গুটিয়ে মাছ কুটুনির পাশে মেনি বেড়াল মেনি বেড়াল ভঙ্গিতে। জ্যোতি বসেছে সোজা, বুক চিতিয়ে, স্মার্টলি। ওর এখন এসব জল ভাত। অবশ্য পাঁচ দশে পঞ্চাশ প্লাস একের স্ট্যাটিসটিকসটা যদি সত্যি হয়। বসবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির দাসী ট্রেতে করে খাবার নিয়ে এলো। ফুলকো ফুলকো সাদা-সাদা কচুরি, আলুর দম, মাংসের ঘুগনি, ক্ষীর....সর্বনাশ। এরা কি পাকা-দেখার খাওয়াটা আজকেই খাইয়ে দিচ্ছে।

জ্যোতি গম্ভীর মুখে বললে—'আমাদের তো এসব চলবে না।'

বড় মিত্তির বললেন—'সে কি বাবা, ইয়াং ম্যান, এটুকু আর খেতে পারবে না? সকালবেলা! জলযোগের সময়!'

জ্যোতি বাধা দিয়ে বলল—'আজ্ঞে পারব না তা তো বলিনি, বলেছি খাবো না। অন প্রিন্সিপল। পাত্রী দেখতে এসে ফাঁসির খাওয়া খাওয়াটা আমাদের সমাজের একটা বিশ্রী রীতি। খুব দৃষ্টিকটু এবং ক্রুয়েল।' অর্থাৎ প্রগতি সঙ্ঘের সব কথাই কানে গেছে জ্যোতেটার। বেশি করে সাধু সাজা হচ্ছে আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে, যাতে গিয়ে রিপোর্ট করতে পারি।

অনেক উপরোধে একটা রাজভোগ তুলে নিল জ্যোতি। আমার দিকে আড়চোখে চেয়ে বলল—'তুমি খাও না তপন, তুমি তো ভাই থার্ড পার্সন। এঁরা খুব অতিথিবৎসল, মনে দুঃখু পাবেন।'

দুই মিত্তির বললেন—'ঠিক বাবা, তুমি শুরু করো। ও কি কথা, সম্বন্ধ হোক চাই না হোক, একটু সামান্য জলযোগ করাতে কি দোষ?'

আমি মোটেই ওর ও চালে ভুললুম না। মহা ধড়িবাজ ছোকরা। একটা বালিশের মতো চিত্রকূট তুলে নিয়ে আমিও সব প্রত্যাখ্যান করে দিলুম।

তারপর সামনের সিঁড়ি দিয়ে, যাঁর জন্য আসা সেই দ্রষ্টব্যা কন্যাটি নেমে এলেন। আহা! আহা! আহা! দ্রষ্টব্যা তো নয় দর্শনীয়া! নেমে আসা তো নয় অবতরণ! এদেবই বোধ হয় সংস্কৃত সাহিত্যে বরবর্ণিনী বলত। বর বর্ণই বটে। কঁপুরুষ রূপটান মেখে মেখে যে এরা চামড়ার এমন জেল্লা পায়! আগাগোড়া চেহারাটি যেন পলসনের মাখন দিয়ে গড়া। খোলা চুল কোমরের একটু ওপর অবধি এসে থেমে গেছে। মাথার পেছনে চমৎকার একটি চালচিত্তির। সাদা লাল পাড় শাড়ি, সাদা ব্লাউজ, কপালে একটি সূক্ষ্ম কুমকুমের টিপ ছাড়া কোনও প্রসাধন নেই। কানের লতিগুলো পর্যন্ত দোপাটিব পাপড়ির মতো ভিজে ভিজে নরম নরম।

খুব সহজভাবে এগিয়ে এসে নমস্কার করে মেয়েটি বসল। বিনা ভূমিকায মিষ্টি হেসে বলল—'আমি যশোধরা মিত্র। গত বছর বেথুন থেকে বটানি অনার্স নিয়ে বি এসসি পাশ করেছি। এখন সায়েন্স কলেজে এম এসসি করছি। এক বছর চিকেন-পক্সের জন্য পরীক্ষা দিতে পারিনি। আমার একুশ বছর বয়স।'

জ্যোতির মুখে কথা নেই। আমারও না।

একটু পর মেয়েটি আবার তেমনি সহজভাবেই বলল—'আমি গান খুব ভালোবাসি। বিশেষত ইনডিয়ান ক্ল্যাসিক্যাল। অ্যাপ্রিশিয়েট করবার মতো শিখেছি, গাইবাব মতো শিখিনি। সেলাই করতে একদম ভালোবাসি না। ডিসকো-মিউজিক পছন্দ করি না। দেশ-বিদেশের রান্না করতে পারি। বাড়িতে শেফ রেখে শিখেছি। ডাল-ঝোল-সুক্তো-চচ্চড়ি ঠাকুমার কাছে।'

জ্যোতি কিছু বলছে না। আমিও না।

বড় মিত্তির বললেন—'তোমরা কিছু জিগগেস করবে না? লজ্জা-সঙ্কোচ কোরো না। আমরা দু-ভায়ে না হয় একটু সেরেস্তায় গিয়ে বসি। কাজকর্মও আছে তো আবার।'

জ্যোতি হাত তুলে বলল—'না না-না-না-না-না। আপনি ব্যস্ত হবেন না।'

ছোট মিত্তির বললেন—'বেশ তো তোমরা একটু নিরিবিলিতে আলাপ-সালাপ করতে!'

'কোনও দরকার নেই,' জ্যোতি বলল,—'যা বলার উনি তো নিজেই সুন্দর গুছিয়ে বলে দিলেন। যা জানবার পরিষ্কার জেনে গেলুম। তা ছাড়া আমাদের দেখাও তো হয়ে গেছে।'

আড়চোখে তাকালুম। এ মেয়েটি কি আবার ওভার-স্মার্টের ধাক্কায় পড়ল? যা স্লা-টিলে ছোকরা। কিন্তু শুনলুম জ্যোতি বলছে—'আমাদের পছন্দ হয়ে গেছে। অভিভাবক নেই তাই নিজ মুখেই বললুম কথাটা, মনে কিছু করবেন না। আপনাদের যখন সুবিধে দিন ঠিক করুন। তবে তিন মাসের মধ্যে। বরং ইতিমধ্যে আমার সম্বন্ধে যদি ফার্দার কিছু জ্ঞাতব্য বা জিজ্ঞাস্য থাকে....'

দু'ভাই ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন—'সে কি কথা! সে কি কথা! তোমার সম্পর্কে সমস্ত খোঁজখবর না নিয়ে কি আর আমরা অ্যাদ্দুর এগিয়েছি! তুমি যখন কথা দিয়ে দিলে, তখন বাড়ির মেয়েদের বলি, ঠাকুরমশাইকে ডাকাই। বাঃ, খুব চমৎকার চুকে গেল তো ব্যাপারটা!' দু'ভাই যৎপরোনাস্তি খুশি হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন।

জ্যোতি মুখ ফিরিয়ে এবার পাত্রীর দিকে তাকাল।

—'আমার কথা তো শুনলেনই। আপনাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করার একটা চান্স দেওয়া উচিত। আপনার কিছু বলার নেই?'

মেয়েটি হাসিমুখে বলল—'হ্যাঁ।'

—'বলুন কি জিগগেস করবেন।'

—'কিচ্ছু জিগগেস করব না, শুধু একটা কথা বলব। আমি বিয়ে করব না।'

মেয়ের বাবা-কাকা দুজনেই হাঁ-হাঁ করে উঠলেন—'কী বলছিস রে খুকি! বিয়ে করবি না কখনও তো বলিসনি!'

—'করব না তো বলিনি। এখানে করব না।'

—'কেন মা, তোকে তো সব জানিয়েছিলুম।'

—মেয়েটি কিছু না বলে মিটিমিটি হাসতে লাগল।

—'তবে কি তোর পছন্দ হয়নি।'

—'না।'

জ্যোতি গোঁ ধরে বসেছিল বিয়েই করবে না। কতলোক তো চিরকুমার হয়ে, ব্রহ্মচারী হয়ে সারা জীবন কাটিয়ে দেয়। তাদের দিন কি এমন মন্দ কাটে? তা ছাড়া সবাই যদি সংসার ধর্ম করবে তো দেশের কাজ, দশের কাজ করবেটা কে শুনি? এই হতভাগা দেশে প্রজাবৃদ্ধি করেই বা কি লাভ? ডাক্তারের লাইফ এক হিসেবে ডেডিকেটেড লাইফ। বিয়ে করলে সাধনায় বিঘ্ন হতে পারে! জ্যোতির গার্হস্থ্য-সুখ-ত্যাগে গ্রামে গ্রামে, গঞ্জে-গঞ্জে কতো দরিদ্র, চিকিৎসা বঞ্চিত, মূঢ়-ম্লান মূক মুখে হাসি ফুটবে। বিবেকানন্দ, বিধান রায় বলে গেছেন....ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেক করে বোঝানো হল চোরের ওপর রাগ করে কি কেউ মাটিতে ভাত খায়? সব শুনে এমন কি খোদ কার্যনির্বাহক কমিটি পর্যন্ত বোঝাতে এসেছিল। হাজার হোক বন্ধু লোক। ডিপ্রেশনে ভুগছে, বন্ধুদের একটা মানবিক দায়, একটা নৈতিক দায়িত্ব নেই? বিবাদ যা ছিল সে ইডিওলজিক্যাল, বাস্তবের মানসিক দাবীর কাছে ইডিওলজি? আদালত থেকে কেস তুলে নেওয়া হয়েছে। সত্যিই ছেলেটার একটা বিয়ে দরকার। তিনসংসারে কেউ নেই। এক বৃদ্ধা পিসীমা। তিনি চোখ বুজলে দুটো ভাত বেঁধে দেবে কে? সারাদিন হাসপাতাল ঠেঙিয়ে ছেলেটা শুকনো মুখে চেম্বারে বসে থাকে।

জ্যোতির জন্যে আমার দ্বিতীয় মেয়ে দেখা দক্ষিণ হওড়ায়। শুধু আমি নই। এবার আমরা। আমি, শৈল, বিমান, গোরা, মুরারি, শিবে এবং জ্যোতি স্বয়ং তো বটেই। আমরা এতোজনে যেতে ইতস্তত করছিলুম। কিন্তু কন্যাপক্ষ নাকি পই-পই করে বলে দিয়েছে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরও সঙ্গে নিয়ে যেতে।

মাঘ মাসের সন্ধে। ধোঁয়ায় চারদিক ধোঁয়াক্কার। ভারতবর্ষের শেফীল্ড সগর্বে ধূম্র-উদ্গীরণ করে ভারি বাতাসে দিব্যি একটি ধূম্রজালিকার চাঁদোয়া বিছিয়ে দিয়েছে। তার নিচ দিয়ে আমরা পাত্রী সন্দর্শনে সবেগে ধাবিত হচ্ছি। গলির গলি, তস্য গলি। ঢুকছি তো ঢুকছি, বেঁকছি তো বেঁকছিই।

মুরারি বললে—'শ্ শালা। এ যে দেখছি শহরের স্মল ইনটেসটিন! আর ক'গণ্ডা টার্ন নেবে বাবা! মুখস্থ করতে করতে চল্ রে জোতে, জামাই-ষষ্ঠীর দিন "কিছু মিছু" মাথায় নিয়ে মহা বেকায়দায় পড়ে যাবি নইলে, আই মীন বিয়েটা হলে।'

গোরা বলল—'ডাইনে পানা-পুকুর, বাঁয়ে ভাগাড়, বাঃ। ইলেকট্রিক্যাল ফিটিংস-এর দোকান বাঁয়ে রেখে ঢুকছি। টিউবওয়েল লাইন পড়েছে, মিউনিসিপ্যালিটি জল দেয়নি মনে হচ্ছে, 'শ্রী নিবাস', ওল্ড হাওড়া স্টাইল, নতুনদার কায়দায় বলতে ইচ্ছে করছে "ছিরিনিবাস।" টিউবওয়েল নাম্বার টু, লোক নেই, অর্থাৎ ঘটাং-ঘটাং না-ই রস না—ই। ডাইনে বেঁকলুম রাখোহরি মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের পাশ দিয়ে, বাপ রে গলির মধ্যে যে পেল্লায় নার্সিংহোম হাঁকিয়েছে রে। বাঁ-ডান, বাঁ-ডান, একি রিপাবলিক ডে'র কুচকাওয়াজ প্র্যাকটিস করাচ্ছে! সেণ্ট এলিজা নার্সারি স্কুল! সেণ্ট এলিজাটি আবার কে রে? সেণ্ট কি চাদ্দিকে ব্যাঙের ছাতার মতো গজায়?'

ব্লাইন্ড লেন। বিরাট গেটওয়ালা দুর্গের মতো দুর্ধর্ষ বাড়ি। আমাদের ট্যাকসিটা দাঁড়াতেই দু-তিনটে অ্যালসেশিয়ান আর গ্রে-হাউন্ড গাঁউ-গাঁউ করে গম্ভীর অভ্যর্থনা জানাল। বিরাট হাতা। অনেকটা হেঁটে পাত্রীর বাবা এবং আরও বিস্তর আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে ভেতরে ঢোকা গেল। জ্যোতি চুপিচুপি বলল—'যৌথ পরিবার, যদ্দূর শুনেছি তিনপুরুষ একসঙ্গে থাকে। তা এ মেয়ে আমার আপনি-আর-কপনির বাড়িতে থাকতে পারবে তো রে?'

গোরা বলল—'তুই চুপ যা।'

হলঘরের মতো বৈঠকখানা। একদিকে বিরাট চৌকির ওপর ফরাস পাতা। তাকিয়া-টাকিয়া দিয়ে জমিদারি ব্যাপার। তিন-চারটে তাসের প্যাকেট পড়ে আছে। অর্থাৎ নিয়মিত তাসের আড্ডা বসে। অন্যদিকে সোফা-কৌচ। সেখানেই আমাদের আদর করে বসানো হল। পরিচয়ের আদান-প্রদান, আসুন-বসুন, কি সৌভাগ্য। খাতিরের চোটে আমাদের নিজেদের এক-একটা নবাবজাদা মনে হতে লাগল। একটি বাচ্চা ছেলে এই শীতের মধ্যে খানিকটা গোলাপজল স্প্রে করে গেল, আর একজন রুপোর রেকাবিতে তবক-দেওয়া মিঠে পান দিয়ে গেল। ওদিকে ঘড়র-ঘড়র করে জেনারেটর চলছে, তিন সেট ঝাড়বাতি। এলাহি ব্যাপার।

অন্দরের দিকের দরজার পর্দাটা নড়ে উঠতেই শৈল চুপিচুপি বলল—'এই তপন, আমার কিন্তু খেতে-টেতে খুব লজ্জা করবে যাই বলিস। এ মেয়েটাও যদি জোতেকে নো করে দেয়?'

কিন্তু না। খাবার-দাবার নয়, মেয়েই এলো। বাঃ। প্রথম দর্শনেই আমাদের সব্বার একযোগে পছন্দ হয়ে গেল। বাগবাজারের মেয়েটির মতো রূপসী বলাকা হয়তো নয়। কিন্তু মেয়েলি প্রবাদ-বাক্যের যাথার্থ্য প্রমাণ করে—নাকটি চাপা চোখটি ভাসা এ মেয়েটি দেখতে সত্যিই খাসা। জোতের সমান সমান। বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। ঢেউ খেলানো চিকণ চুল।

বড় বড় পল্লব ঘেরা কালো চোখ। আসল কথা, দেখবামাত্র ভালো লেগে যায়। চোখে চোখে ইশারা হয়ে গেল এখানেই ফাইন্যাল। আমি মনে মনে নিজের পিঠ চাপড়াতে লাগলুম। যবে থেকে আমি দেখতে আসছি তবে থেকেই জ্যোতির ভাগ্য খুলে গেছে। মেয়েটি একটু ঘাবড়ে গেছে মনে হল। চোখ নিচু করে রইল। নমস্কারও করল না।

শিবুই গলা-খাঁকারি দিয়ে জিগগেস করল—'আপনার নামটা যেন কি?'

মেয়ের বাবা বললেন—'ললিতা।'

শিবু বলল—'পড়াশোনা কদ্দূর করেছেন?' বড় বড় কথা বলা সত্ত্বেও শিবেটা সনাতন পদ্ধতিতে এগোচ্ছে।

মেয়ের জ্যাঠা বললেন—'বি এ তো পাশ করে গেছে বাবাজি। চিঠিতে তো সব খুলে লিখেছিলুম! ডিগ্রি-টিগ্রিগুলো আনব? ওরে মদ্‌না, তোর খুড়িমার কাছ থেকে চাবিটা নিয়ে মার্কশিট-টিটগুলো নিয়ে আয় তো।'

আমরা সবাই সমস্বরে—'না না ওকি কথা, না না সে কি কথা,' করতে থাকি।

শিবু ইনটারভিউটা একচেটে করে নিচ্ছে দেখে এই সময়ে বন্ধুদের মধ্যে একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। বিমান তাড়াতাড়ি জিগগেস করল—'কোন কলেজে পড়েছেন?' গোরা বলল, 'কি কি সাবজেক্ট ছিল?' শৈল বলল—'এম এ-টা পড়লেন না কেন?'

এক বৃদ্ধ, খুব সম্ভব পাত্রীর দাদু, দাড়ি নেড়ে ফোকলা মুখে ফকফক করে বললেন—'আজকাল তো অনার না হলে এম এ পড়তে দেয় না, জানো না বাবারা! তাই তো দিদিভাইয়ের আমার ইউনিভার্সিটিটা আর দেখা হল না। নইলে ছাত্রী কি খারাপ ছিল? ডিস্টিংশন তো ক'নম্বরের জন্যে ফসকে গেছে!'

এই সময়ে ভেতর থেকে পাকামাথায় সিঁদুর এক মোটাসোটা মহিলা গুচ্ছের কাগজপত্র এবং পর্বতপ্রমাণ টেবিল ক্লথ, ট্রে ক্লথ, রুমাল, শার্ট, প্যান্ট, পাঞ্জাবি ইত্যাদি নিয়ে ঢুকলেন। মেয়ের স্কুল থেকে গ্র্যাজুয়েশন পর্যন্ত সমস্ত প্রোগ্রেস রিপোর্ট, সার্টিফিকেট, মার্কশীট এবং সূচীকর্ম। খুলে খুলে প্রত্যেকটি দেখাতে লাগলেন সবাই। ভদ্রমহিলা ঘোমটা টেনে বললেন—'নিজের নাতনি বলে বাড়িয়ে বলচি না বাবা, ললির মতো লক্ষ্মী মেয়ে আমাদের এতো বড় বংশেও আর দ্বিতীয় নেই. লেকাপড়া তো শিকেইচে, ঘরের কাজ-কর্মে একেবারে এসপার্ট। ইকিবেন শিকে ফুল দিয়ে ঘর যা সাজায় দেখলে চক্ষু জুড়িয়ে যাবে। এইসব সেলাই-ফোঁড়াই অন্য লোকের করা ওর বলে চালাচ্চি মনে কর না বাবা, সব নিজ হাতে একটি-একটি করে করেচে। যেমন ছুঁচের কাজ, তেমনি কাটিং।'

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখলুম নিচের ঠোঁটটা সজোরে কামড়ে ধরেছে। জ্যোতি আমার কানে কানে বললে—'ওসব সেলাই ফেলাই রাখ তপন। আমি কি দর্জি খুঁজতে এয়েচি নাকি? গলার আওয়াজটা খুব ইমপর্ট্যান্ট। পদ্মিনী মেয়ের স্বর হবে সেতারের মতন। এ যে কথাই বলে না রে? এতো লজ্জাশীলা হলে তো আমাকে না করে আমার দাদুকে বিয়ে করলেই পারত!'

ওর নির্দেশমতো জিগগেস করলুম—'ইকেবানা শিখেছেন কার কাছে?' মেয়ে চুপ। আমাদের ধারণা ঠিক। জ্যাঠা-বাবা-কাকা-দাদুরা উত্তরটা জানেন না। মেয়েটি যেন কেমন-কেমন চোখে জ্যোতির দিকে তাকাল। চোখদুটো ছলছল করছে।

জ্যোতি বলল—'জাপানী মহিলা?'

মেয়ে ঘাড় নাড়ল।

—'কি নাম ভদ্রমহিলার? আমারও খুব শেখবার ইচ্ছে কি না তাই জিগগেস করছি।'

সবাই চুপ। মেয়েটি দু-একবার ঠোঁট ফাঁক করল। ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপছে। ঘড়ির কাঁটা তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে। পাঁচ মিনিট পার। দশ মিনিট পার। আমরা সবাই ঘামছি।

জ্যোতিই প্রথম উঠে দাঁড়াল। সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে হাত জোড় কবে নমস্কার করে বলল—'আচ্ছা, তবে চলি।'

যেন হিমঘরের নীরবতার মধ্যে দিয়ে আমরা এগোচ্ছি। বাইরের দিকের দরজা দিয়ে জনাদশেক লোক ঢুকে এল। শেষজন ঢুকল কোলাপসিব্‌ল গেটটা সশব্দে টেনে দিয়ে।

—'কোথায় চোললেন দাদারা? অ্যাতো তাড়া কিসের?' কথায় হিন্দস্থানী টান। ইযা ছাতি, ইয়া গুল।

—'মেয়ে কেমোন দেখলেন?'

মুরারি চড়া গলায় বলল—'ডিফেকটিভ মেয়ে গছাবাব তালে ছিলেন আবাব কেমন দেখলুম জিগ্‌গেস করছেন?'

—'কিসের ডিফেকট?'

—'কিসের ডিফেকট আপনিও জানেন, আমিও জানি।'

—'কাকে চোখ রাঙাচ্ছেন দাদা তোখন থেকে?' বলতে বলতে একজনের হাত জ্যোতির কলারে উঠে এলো।

গায়ে হাত তুলছে যে? আমরা প্রগতিরা হাঁ-হাঁ কবে এগিয়ে যাই। দশ ষণ্ডামার্কা বজ্রমুষ্টিতে আমাদের হাত ধরে ফেলে। একজন ঠাণ্ডাগলায় বলে—'যোগাড় যোন্তোব সোব বেডি। মোন্তোরগুলো পোডে লিয়ে বেরুবে, আগে নোয়।'

—'মানে?'—আমাদের রক্ত টগবগ করে ফুটছে। গোরা শৈল-বিমান আস্তিন গোটাতে থাকে। —'জোর করে বিয়ে দেবে? মগের মুলুক নাকি? পুলিশ নেই?'

—'সেই কোথাই তো বলছিলাম দাদা?' ষণ্ডামার্কাতম একটা নীলচে পিস্তল লোফালুফি করতে করতে হেসে বলে—'ছন্নুর ডেবায় পুলিশ ভি ঘুঁষতে ভোয় পায়, আর আপনাবা তো জেনারল্‌ পাবলিক আছেন।'

এই সময়ে সেই দাড়িঅলা দাদু এগিয়ে এসে বললেন—'কিছু মনে কর না বাবারা, এরা ললিদিদিকে বড্ড ভালবাসে। নাতনির আমার কোনও খুঁত নেই। পার্ট ওয়ান পরীক্ষার পর বরশুলে মামাবাড়ি গিয়ে যে কি সর্বনেশে জ্বর নিয়ে এল, ডাক্তার ধবতে পারলে না পনের-ষোল দিন যমে-মানুষে টানাটানি। ফিরে এল বটে কিন্তু সেই থেকে দিদি আমার নীরব। ফিসফিসিয়ে বই কথা বলতে পারে না, কোঁচার খুঁট দিয়ে চোখ মুছতে লাগলেন বৃদ্ধ, 'তুমি ডাক্তার বলেই আরও তোমার ওপর ওর বাপমায়ের ঝোঁক ভাই। ডাক্তার হয়ে যদি একটা নিদ্দুষী মেয়েকে এ বিপদ থেকে বাঁচাতে না পারো তবে আর কেন লাখ লাখ টাকা খরচ করে সরকার তোমার মতো সোনার চাঁদদের ডাক্তার করে? তোমার হাতযশে আব পয়ে ওর ও-রোগ তো সেরে যেতেও পারে, জন্মগত তো আর নয়। আমি বৃদ্ধ মানুষ। বলছি তোমার মঙ্গল হবে।'

মেঁয়ের বাবা বললেন—'তোমাকে আমরা চৌরঙ্গিতে চেম্বার সাজিয়ে দেব বাবাজীবন। আড়াই লাখ টাকা এক্ষুনি তোমার নামে ব্যাঙ্কে ট্রানসফার করে দিচ্ছি। কাগজপত্র রেডি।'

—'টাকার লোভ দেখাচ্ছেন আমাকে? ছি! ছি! ছি! টাকা দিয়ে জামাই কিনবেন? টাকা দিয়ে মানুষ কিনতে চান?'

—'টাকাব লোভ ঠিক দেখাইনি বাবা। তা হলে তো আরও আগে মেয়ে পার করতে পারতুম। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব? মেয়ের উপযুক্ত জামাই খুঁজছিলাম বাবাজি। নইলে টাকাটা গাপ করে বৌকে ত্যাগ করে কি তার ওপর অত্যাচার করতে কতক্ষণ? এতো আখচার হচ্ছে আজকাল।'

—'আমি তা করব না জানলেন কি করে?' জ্যোতি তেরিয়া।

—'সে তুমি পাবেবে না বাবাজি। তোমার সম্পর্কে আমরা খুঁটিয়ে খোঁজ নিয়েছি। এমন কি তোমার এই বন্ধুদের সম্পর্কেও। এই "অগ্রগতি সঙ্ঘ" না কি? বন্ধু দিয়েই মানুষের পরিচয় এমনি একটা ঋষিবাক্য আছে না? বলো না বাবাজিরা! তোমরা কি তোমাদের বন্ধুকে অ্যাতো বড় একটা অন্যায় করতে দেবে?' সম্ভাব্য অন্যায়ের ব্যাপারটা যে সম্পূর্ণ একতরফা, এ বিষয়ে দেখলুম ভদ্রলোকেব বিন্দুমাত্র সংশয় নেই।

পূর্বোক্ত ষণ্ডামার্কাদের একজন এই সময়ে বাড়ির ভেতর থেকে একটা চওড়া পাড় বেনারসি জোড আর একটা জমকালো টোপব নিয়ে ঢুকে গ্রাম্ভারি চালে বলল—'কুর্তা-পাৎলুন ছেড়ে এ সাড়ি পোবে লিন জলদি। টোপর লাগিয়ে লিন। কনে রেডি।' হাঁ-হাঁ করতে কবতেই ছন্নু এবং তাব সাঙ্গোপাঙ্গদের দুর্ভেদ্য ব্যূহর মধ্যে জ্যোতিব বস্ত্রহরণ এবং বস্ত্র পরিবর্তন পালা সমাধা হল অ্যালসেশিয়ান কুলের গাঁউ গাঁউ রবের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের মধ্যে দিয়ে। আমাদের কুংফু, ক্যারাটে কিচ্ছু কাজে লাগল না। হাতে হাতেই অন্দরে পাচার হয়ে গেল জ্যোতে। একটু পরে আমাদেরও ডাক পড়ল। যদিদং তদিদং করে জ্যোতিশংকবের বিবাহ-পর্ব চুকে গেল।

মেজাজে আছে জ্যোতি। অন্তত আমি তো তাই দেখছি। চৌরঙ্গিতে রাজোয়াড়া চেম্বার। চেম্বারই রুগী টানছে। এর পর হাতযশ চাউর হয়ে গেলে পসার মারে কে? ফি মাসে জ্যোতির শ্বশুরবাডিতে প্রগতি সঙ্ঘের নেমন্তন্ন বাঁধা। ওর শ্বশুরমশাই অবশ্য কক্ষনো প্রগতি বলেন না, বলেন অগ্রগতি। উনি নাকি 'অগ্রগতি'র ভরসাতেই মেয়ে দিয়েছেন। সুতরাং জ্যোতির চাইতে অগ্রগতির খাতিরই ওর শ্বশুরবাড়িতে বেশি। মোগলাই, চীনে, গোয়ানীজ ভোজ হয়ে গেছে। পরের মাসে শুনছি ফরাসী কুইজিন। জ্যোতি বউ কে বড় বড় ই এন টি দেখাচ্ছে। ভেলোরে নিয়ে যাবে শিগগির। সেখানে কিছু না হলে ভিয়েনা। তবে জনান্তিকে আমায় বলেই রেখেছে—'দ্যাখ তপন, সারলে ভালো না সারলে আরো ভালো। মেয়েদেব কথা বলার চান্স দিয়েছিস কি মরেছিস!'

বন্ধু

হাওড়ার ফ্যাক্টরি থেকে সোজা গেছি আমহার্স্ট স্ট্রীটে। সেখান থেকে ভবানীপুর। রবিন আজ ছুটিতে। আমিই ড্রাইভ করেছি সবটা। দোতলার দালান পর্যন্ত পৌঁছুতে আজ আমার দম বেরিয়ে গেল। পায়ে যেন জোর নেই। দালান অবধি পৌঁছতেই কালোমাণিক গুড়গুড় গুড়গুড় করতে করতে এগিয়ে এলো। পায়ের কাছটায় ফোঁস ফোঁস করছে, যেন প্রণাম করছে। আজ মন-মেজাজ এতোই খারাপ যে প্যাটা ছুঁড়তে গিয়েছিলাম। সামলে নিলাম। ড্যাসুনটার কী দোষ! ও তো আমায় ছেড়ে যায়নি; যাবেও না ওর আয়ুষ্কাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত। জানোয়ার মানুষের চেয়ে অনেক বিশ্বস্ত, অনেক বৎসল। উঃ, টুকটুক যে কোথায় গেল! ওর বোঝা উচিত গাড়ির শব্দ পাওয়া গেছে, অতএব আমি এসেছি। কোথায় কি এমন রাজকার্যটা করছে! ঠিক আছে। করো তুমি তোমার রাজকার্য। আমিও কিচ্ছুটি বলব না। জুতো খুললাম না। জামা-কাপড়, ধড়াচুড়ো যা পরা ছিল, রইল। দালানের সোফায় গা এলিয়ে দিলাম। পাখাটা চলছে ফুল স্পীডে। তবু ঘামছি।

অমিতের ব্যবহার বরাবরই বড় শীতল। একেক সময় মনে হত ওর বোধশক্তি হয় নেই, নয় ভোঁতা। অথচ ও যে আমাকে কী টানে টেনেছিল! চিরকালই আমার অনুভূতি তীক্ষ্ণ, তীব্র। অমির পেটে ব্যথা করলে, মাসিমা অনেক সময়ে কাকে ওষুধ খাওয়াবেন ঠিক করতে পারতেন না। হয়ত এতো অনুভূতিপ্রবণ বলেই আমি মানুষটা লোকের চোখে মেয়েলি বলে প্রতিভাত হই। অনুভূতি-টুতি সব নারীজাতির একচেটিয়া কি না! যারা এসব মনে করে তারা অবশ্য ইচ্ছে হলে টুকটুককে দেখে যেতে পারে। যাই হোক, মেয়েলি বলুক, বাড়াবাড়ি বলুক, আদিখ্যেতা বলুক, সব সহ্য করতে রাজি আছি, কিন্তু 'ন্যাকামি' বললে মেনে নিতে পারব না। 'ন্যাকা' শব্দটার মধ্যে একটা হিপক্রিসির ব্যাপার আছে। আমার আর অমির সম্পর্কের মধ্যে কোনও খাদ নেই। অমির আদ্যন্ত নির্লিপ্ততা সত্ত্বেও এই দুর্লভ বন্ধুত্ব টিকে আছে, আমি সে কথা হাজার মুখে বলব, অমি অবশ্য বলবে না, হাসবে। গাধা পিটিয়ে ঘোড়া যদি করাও যায়, অমিকে পিটিয়ে তার মুখ থেকে কথা বার করা সহজ নয়। প্রচণ্ড মুখচোরা। ওই হাসিটাই ওর জবাব। ওর মতামত।

পাখা চলছে। তবু ঘামছি অস্বাভাবিক। দোষ নেই। যত জীবন এগোচ্ছে ততই বুঝতে পারছি প্রয়াত সেই কবির কথাই ঠিক, চতুর্দিকে মুখোশ, শুধু মুখোশ। তুমি কথা বলো, অপরপক্ষের ঠোঁট নড়বে হৃদয় নড়বে না, তুমি কিছু শোনালে কানগুলো শুনবে, কিন্তু মর্মে পৌঁছবে না। হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব—এ একেবারে কাব্যকথা। কবি-বাক্যে বিশ্বাস করে সারাটা জীবন একটার পর একটা ভুল জায়গায় নিজেকে সমর্পণ করে গেলুম।

পেছনে একটা শব্দ হল। নিশ্চয় টুকটুক। পনের মিনিট কেটে গেল, এতক্ষণে বাবুর আসবার সময় হয়েছে। পেছন থেকে সামনে এলো। একটা সবুজ সিল্কের রাজস্থানী পোশাক পরেছে। ভারী সিল্কের ওপর দিয়ে হাওয়া কাটলে একটা অদ্ভুত আকর্ষক শব্দ হয়। সেই শব্দটাই আমি শুনতে পেয়েছিলুম। টুকটুকের জামা-কাপড়ের শখ ভীষণ, কত রকমের যে পোশাক করায়। পরে, বাড়িতেও পরে থাকে!

—'কতক্ষণ এসেছো?' একেবারে অলস টু-দা পাওয়ার ইনফিনিটি। হাতটা পড়ে রয়েছে সোফার হাতলে। নখগুলো লাল, হাতের পাতায় কোথাও কোনও শিরা জেগে নেই। যেন নেতিয়ে পড়া কেয়াফুলের স্তবক। বাপের বাড়ির হতদরিদ্র ঘরে টুকটুক এমন

হাত টিকিয়ে রেখেছিল কি করে—এটা একটা লাখ টাকার প্রশ্ন। আমি যে জবাব দিলাম না, আমার মেজাজটা যে একটু অন্যরকম, ভঙ্গিতে বিষাদসিন্ধু এসব টুকটুক লক্ষ্যই করল না। আপন মনে নিজের আঙুল দেখছে। হাতের কাঁকন দেখছে। পা তুলে একবার সোনালি চটি নাকি তার অভ্যন্তরে নিজের সাদা মসৃণ পায়ের পাতা দেখল। নার্সিসাস!

—'খাবে? নাকি বাইরে খেয়েছো?' —আমার খাওয়া না-খাওয়া ওর কাছে সমান। এবারেও উত্তর না পেয়ে বোধ হয় মেমসাহেবের বোধোদয় হল। বললো—'কি ব্যাপার? কথা বলছো না যে! কিছু হয়েছে?'

জবাব দিলাম না। টুকটুক এবার উঠে পড়ল। আমার কাছে চলে এলো। নিচু হয়ে সোফার পেছনে দুহাত রাখল, আবারও বলল—'কিছু হয়েছে?'

—'অমিত অস্ট্রেলিয়া চলল ফর গুড'—আমি অনেক কষ্টে শব্দগুলো উচ্চারণ করতে পারলাম।

—'তো কি?' বুকের ওপর দু হাত আড়াআড়ি রেখে চূড়ান্ত নির্বেদের সঙ্গে টুকটুক বলল।

আমি উঠে দাঁড়িয়েছি। প্রায় কাঁপছি এত উত্তেজনা। বলছি—'টুকটুক তুমি বলছ কি? অমিত অস্ট্রেলিয়া চলে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে বরাবরের মতো আমাকে ছেড়ে। আর তুমি বলছ,—'তো কি?' তো তুমি কি?"

টুকটুক আড়াআড়ি হাতদুটো নামাল। ঝট করে পেছন ফিরল, ওদিকের ঘরের দিকে চলে যাচ্ছে। হঠাৎ ঘাড়টা ফেরাল, তারপর মুখটা সামান্য বেঁকিয়ে আমাকে আমূল কাঁপিয়ে দিয়ে বলল,—'ন্যাকা'।

এই অসহ্য রকমের ঘৃণ্য শব্দটা আমার দিকে ছুঁড়ে দিল আমার স্ত্রী যাকে আমি কাদা থেকে তুলে এনে রাজসিংহাসনে বসিয়েছি, প্রতিদিন যার সাংস্কৃতিক শিক্ষা-দীক্ষা এবং বিলাসের খাতে আমার আয়ের অঙ্কে রীতিমত একটা বিয়োগ হয়। যার বাবা-মা, দুটি ছোট ভাইবোনের দায়ও আমি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছি। কোনরকম প্রার্থনা, অনুরোধ, উপরোধ বা প্রত্যাশার দায় মেটাতে নয়। এটাই আমার পক্ষে সবচেয়ে স্বাভাবিক, এটাই সবচেয়ে মানবিক বলে। আমাদের নিজেদের মানুষ বলে পরিচয় দিতে হবে তো!

এই মনুষ্যত্ব রক্ষার তাগিদেই না অমির কাঁধে হাত রেখেছিলাম। তখন বাল্য পেরিয়ে কাঁচা কৈশোর। বই আনেনি এই অপরাধে ভূগোলের ক্লাসে সেবারের সেকেন্ড বয় সাঙ্ঘাতিক মার খেল। ভূগোলের মাস্টারমশাই প্রফুল্লবাবু বড় নিষ্ঠুর স্বভাবের ছিলেন। মেরে-ধরে ছেলেটিকে আধমরা করে উগ্রচণ্ডা দুর্বাসার মতো বেরিয়ে গেলেন প্রফুল্লবাবু, আমি বললাম—'চল, আমরা হেড সারের কাছে কমপ্লেন করতে যাই।' কয়েকজন ছেলে সঙ্গে সঙ্গে তৈরি। অমিত অর্থাৎ মার-খাওয়া ছেলেটি বলল—'না।'

—'যাবো না? সে কি? কেন?'

—'সত্যিই তো, গতকাল উনি বারবার করে আনতে বলেছিলেন টেক্সটটা।'

—'ঠিক আছে, কিন্তু এই সামান্য ভুলের জন্য ওই রকম মার? অমিত তোমার যে পিঠ লাল হয়ে গেছে। কানের পাশ দিয়ে রক্ত পড়ছে।'

—'ও কিছু না। ওঁর বাড়ি থেকে চলে গেলেই উনি আর মারবেন না।'

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসার পর জিজ্ঞাসায় জানলাম—অমিত এবং তার মা প্রফুল্লবাবুর বাড়ির নিচের তলায় ভাড়া থাকেন। —ওর বাবা বছরখানেক হল হঠাৎ মারা যাওয়ায় ওরা

একেবারে অকূলে পড়েছে। ভাড়া দিতে পারছে না মাসছয়েক হল। প্রফুল্লবাবুর মারের পেছনের আসল ইতিহাস এই।

অত সহজে, অন্যান্য ছেলেদের সামনে অবশ্য অমি এত কথা বলেনি। আস্তে আস্তে টিফিন পিরিয়ডে মাঠে বেড়াতে বেড়াতে গাছতলায় বসে মুড়ি চিবোতে চিবোতে অনেক জেরার পর একটু একটু করে বেরিয়েছে কথাগুলো অমির পেট থেকে।

আমি বললাম—'আজ ছুটির পর অমিত আমাদের বাড়ি চলো প্লীজ।'

—'আজ নয়।'

—'তবে কাল।'

—'ঠিক আছে দেখা যাক।'

—'দেখা যাক নয়, কাল আসছই।'

বাড়ি গিয়ে বাবাকে সব কথা বললাম। আমার মা নেই। বাবা অত্যন্ত উদার-চরিত্রের মানুষ। বললেন—'আমাদের একতলার দক্ষিণ দিকে দুখানা ঘর তো এমনিই পড়ে রয়েছে, ওঁদের আসতে বলে দাও। —আমি বারান্দাটা ঘেরার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

পরের দিন অমিকে বাড়িতে আনলাম, বাবা কারখানা থেকে ফিরে ওকে দেখলেন, আদর করে বললেন, —'বাঃ, বেশ ব্রাইট ছেলে মনে হচ্ছে!'

কিন্তু আমাদের বাড়ির একতলায় থাকার কথায় অমিত ভীষণ বিব্রত হয়ে পড়ল। খালি গোঁয়ারের মতো ঘাড় বেঁকিয়ে থাকে। শেষে ওদের বাড়িতে গিয়ে ওর মার কাছে কথাটা পাড়লাম। উনি বললেন, —'প্রফুল্লবাবুর ছ'মাসের বাকি ভাড়া না দিয়ে কিভাবে যাই বলো! তা ছাড়া তোমাদের বাড়ির ভাড়াও তো অনেক হওয়ার কথা।'

আমি ছেলেমানুষ। মায়ের মতো এক মহিলার মুখের ওপর আর কি বলব। বাড়ি চলে এলাম। বাড়ি ভাড়ার পরিমাণ পাঁচ শ চল্লিশ টাকা। আমার হাত খরচের টাকা জমেছিল হাজারের সামান্য ওপরে। তার থেকে পাঁচ শ চল্লিশ প্রফুল্লবাবুর হাতে দিয়ে রসিদ নিয়ে অমির মার কাছে গেলাম। হাত ধরে বললাম—'চলুন না মাসিমা, আমার মা নেই। কেউ আমাকে দেখে না।'

এই শেষের তীরটাই বোধ হয় অব্যর্থ হয়ে থাকবে। তাই ওদের বাড়িতে আনতে পারলাম। অমির মা আমার নিজের মায়ের মতো হলেন। ওঁদের একতলার ঘরই হল বলতে গেলে আমার আসল বাসস্থান। রাজশয্যা ছেড়ে ধূলিশয্যা, অনেকেই বলল। —মাসিমার সেলাই-মেশিন এবং অমির কাগজ বিক্রি চলতে লাগল আড়ালে আমাদের বাড়ির ভাড়া এবং আমার পাঁচ শ চল্লিশ টাকার ঋণ মেটাবার জন্যে। এবং কোনক্রমেই আমি অমিকে আমার খাবার টেবিল বা শয্যার ভাগ দিতে পারলাম না, একমাত্র কোনও জন্মদিন-টিনের মতো বিশেষ উৎসবের দিন ছাড়া। এবং মাসিমাও কোনও দিন তাঁর ভাড়া-করা দুখানা ঘর-বারান্দার সীমা অতিক্রম করলেন না।

টুকটুক এসে বলল—'যদি খেয়ে এসে না থাকো, তো চলো খাবার দিতে বলেছি। আমি নিজে রেঁধেছি আজ।'

এটা নতুন। রান্না করতে টুকটুক খুব ভালোই পারে। কিন্তু একদম ভালোবাসে না কাজটা করতে। বললে বলে—'ভালো রাঁধতে পারি, তো কি? তুমি কি রান্নার জন্যে আমায় বিয়ে করেছিলে? তা হলে আমার মাকে বিয়ে করলেই পারতে, মা আরও অনেক অনেক ভালো রাঁধে।'

—'টুকটুক! কি অসভ্যতা! কি বিশ্রী!'

—'আমার যদি দিনরাত শুয়ে থাকতে, কি গল্পের বই পড়তে, কি টি ভি দেখতে ভালো লাগে আমি তা করতে পাবো না! এরকম তো কথা ছিল না!'

কথা কি ছিল তা অবশ্য আমি আদৌ জানি না। কিন্তু টুকটুক যখন পরম আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এই প্রশ্নটা উচ্চারণ করে আমি প্রাণ ধরে পাল্টা বলতে পারি না—"কী কথা ছিল?" আমার খারাপ লাগে। আমি বুঝতে পারি টুকটুক রান্না করতে করতে, রান্না করতে করতে হাঁপিয়ে গেছে। এখন ওর তাই রাঁধতে আর ভালো লাগে না। জীবনে কোনদিন লাগবেও না। আর আমি এতো হ্যাংলা নই যে রান্নায় বীতস্পৃহ স্ত্রীকে দিবারাত্র 'এটা করো' 'ওটা করো' বলে নাজেহাল করে তুলব। এমন কি আমাদের আদ্যিকালের বামুনঠাকুরের রান্না খেয়ে টুকটুক যখন নাক কুঁচকে বলে—'তোমরা ঘটিরা সব তাতে এতো মিষ্টি খাও। তোমাদের বামুনঠাকুর কি মাছের ঝোলেও চিনি দেয়?' তখনও আমি বলি না—'নিজে রাঁধলেই তো পারো, কিংবা নিজের পছন্দটা দেখিয়ে দিলেও তো পারো!' কোনও কথা ছিল অথবা ছিল না বলে যে একথা আমি বলতে পারি না তা নয়। আসলে এ ভাবে বলা আমার স্বভাবে নেই। বিশেষত যখন টুকটুকের ব্যাপারটা আমি আগাগোড়াই বুঝতে পারি।

তো সেই টুকটুক আজ রান্না করেছে। জামা-কাপড় বদলে, হাত-মুখ ধুয়ে নিতে হল। অমি অস্ট্রেলিয়া চলে যাচ্ছে, সেই খবর বুকের ভেতর নিয়ে আজ আমি টুকটুকের রান্না পোলাও, চিতল মাছের কোপ্তা খাচ্ছি, ঠিক সেই দিনেই, এ কেমন নিষ্করুণ কাকতালীয়? আমাকে অন্যমনস্ক দেখে টুকটুক দু আঙুল জিভ দিয়ে চেটেচুটে নিয়ে বলল—'কেমন, ভালো হয়নি বুঝি?'

আমি বললাম—'ভালো হয়নি মানে? দারুণ হয়েছে, সাঙ্ঘাতিক হয়েছে। শুধু তোমার এই একটি গুণের জন্যও আমি পত্নীগর্বে গর্বিত হতে পারি।'

—'থাক'—টুকটুক বলল—'তো বন্ধুকে একদিন ডাকো, খাইয়ে দাও।' টুকটুক কি অমিকে ডাকবার প্রসঙ্গ তুলতেই আজ নিজে হাতে রান্না করেছে। ও কি জানে না, অমিকে নিয়ে আমি প্রায়ই বাইরে খাই, কিন্তু বাড়িতে না। বাড়িতে ডেকে অমিকে কোনও কষ্ট বা অপ্রিয় পরিস্থিতির মধ্যে ফেলবার নিষ্ঠুরতা আমি কেমন করে করব?

—'কি প্রস্তাবটা পছন্দ হল না বুঝি?'—টুকটুকের কাটা কাটা কথা। অমিকে যেমন বাঁচিয়ে চলি, টুকটুককেও তেমনি সত্যি কথাটা বলতে পারি না। আজকে বলে ফেললাম—'তুমি তো জানো অমি আজকাল আর আমার বাড়ি একেবারে আসতে চায় না। তা ছাড়া ও তো কালই চলে যাচ্ছে।'

উত্তরে টুকটুক একটা অদ্ভুত মুখভঙ্গি করল। এই বিচিত্র মুখভঙ্গির মানে কি বোঝবার চেষ্টা করতে করতে আমি খাওয়া শেষ করলাম। হাত মুখ ধুয়ে, সিগারেট ধরিয়ে জানলার পাশে দোলনা চেয়ারে বসলাম। এক হতে পারে—বয়েই গেল। অমি যদি আসতে না চায় ওর জন্যেই নিশ্চয় চাইছে না, সেটা ওর পক্ষে যথেষ্ট অপমানকর। তাই সেটাকে ও উড়িয়ে দিতে চাইছে। আসবে না তো বয়েই গেল। দ্বিতীয় হতে পারে আমার কথা ও বিশ্বাস করেনি। অর্থাৎ অমিকে আমি আসতে বলেছি অথচ সে আসতে চাইছে না। এটা আমার রচনা। টুকটুকের মধ্যে অবিশ্বাসের শেকড় খুব গভীর। আমার এখনও পর্যন্ত সাধ্যে কুলোয়নি যে তাকে উপড়োই। আস্তে আস্তে হবে। আমি অপেক্ষা করতে পারি। তাড়াহুড়োয় কি লাভ?

অমির জন্যেও তো আমায় অপেক্ষা করতে হয়েছে। কত দিন, কত মাস, কত বছ্ব। তবু ওর মনের তল পেয়েছি কি কোনদিন? বড্ড চাপা স্বভাব। একমাত্র যখন আমার বসন্ত হল, তখন, সেই ভয়ঙ্কর সময়টায় অমি আমার ঘরে শুয়েছিল। এক মশারিতে আমি, আরেক মশারিতে ও। কষ্টে ছটফট করছি, ঘুম আসছে না। অমি উঠে এসেছে, নীল আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে, মশারি সামান্য তুলে অমির সেই মৃদু গলার প্রশ্ন এখনও আমার কানে বাজে—'বড্ড কষ্ট হচ্ছে না রে গোপাল? শোন, একদম চুলকোবি না। আমি আস্তে আস্তে ফুঁ দিয়ে দিচ্ছি।' এইভাবে ফুঁ দিয়ে দিয়ে, মৃদু গলায় গল্প কয়ে, গান করে আমায় অন্যমনস্ক রাখত, ঘুম পাড়াত অমি। সে বছর ঠিক তিন নম্বরের তফাতে আমি সেকেন্ড হয়ে গেলাম। মাস্টাবমশাইরা প্রকাশ্যেই বললেন—'প্রশংসনীয় প্রতিযোগিতা। তবে কিছুতেই অমিতকে এর চেয়ে কম মার্কস দেওয়া গেল না। গোপাল তুমি ইচ্ছে করলে খাতাগুলো দেখতে পারো।' খাতা দেখেছিলাম। সেই বয়সেই মনে হয়েছিল অসাধারণ। সেদিনটা আমার রাস্তায় রাস্তায় কেটে গেল একা, ভাবটি অমিটা কি সাঙ্ঘাতিক মেধা লুকিয়ে রেখেছিল। ওর জন্য অনেক বড় কিছু অপেক্ষা করছে। আমাদের স্কুল কলকাতার গর্ব। আমিও অহঙ্কার করছি না, যা-তা ছেলে নই। সেই আমার এতদিনের রেকর্ড ভেঙে যে বেরিয়ে যেতে পারে তাকে তো শাবাশ জানাতেই হয়।

সে রাত্রে আর মাসিমার সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারিনি, পবদিন স্কুল যাবার আগে গিয়ে প্রণাম করতে মাসিমা কেঁদে ফেললেন, বললেন,—'কাল আসিসনি কেন রে গোপাল, দুঃখ হয়েছিল খুব, না রে?'

আমি বললাম—'সে কি? দুঃখ হতে যাবে কেন? আমার আসলে ভীষণ...'

—'না, না, আমি ঠিক জানি এতো দিনের ফার্স্টবয় তুই, মন দিয়ে লেখাপড়া করিস, ফাঁকি তো দিস না, তোর দুঃখ হয়েছে কি না তুই না বুঝলেও আমি বুঝি রে! মাত্র তো তিনটে নম্বর, পার হতে পারবি না!' এতো ভালোবাসতেন আমাকে মাসিমা।

মাসিমার প্রেরণাতেই আর কোনদিন আমাব সেকেন্ড হতে হয়নি। কিন্তু আমি তাতে খুশি হতে পারিনি। অমি ঠিক আমার পেছন-পেছন এসেছে। বরাবর। নয় কি দশ নম্বর পেছনে, যেন পা টিপে টিপে। এই ধরে ফেলল, এই ধরে ফেলল। কিন্তু ধরতে পারছে না। তাতে ওর কোনও বিকারও নেই। যতই বলি না কেন—'অমি, বাক আপ ম্যান, কেন পারছিস না? এরকম কমপিটিশন আমার ভালো লাগে না। আমার মাস্টারমশাইদের কাছে পড়।'

অমি নরম করে হাসে—'না পারলে কি করব বল গোপাল! আর কি-ই বা এসে যায় এতে।' সত্যিই ওর মতো বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের কথা।

অনেকক্ষণ বসে আছি। উঠলাম। জল খেলাম। পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরে গেছে—'টুকটুক, টুকটুক।'

শিবুদা এসে ধরল। এইসা ঝিঁঝিঁ ধরেছে যে নড়তে পারছি না। শিবুদা বলল—'বাঁ পা দিয়ে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল এমনি করে চেপে ধরো।'

—'দু পা-ই ধরে গেছে যে!'

—শিবুদা তখন নিচু হয়ে আস্তে আস্তে পা মালিশ করে দিতে লাগল। একটু পরে ঝিনঝিনে হাসি শুনে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি টুকটুক। হেসে গড়িয়ে পড়ছে একেবারে।

বললাম—'কি হল?'

—'শিবুদা তোমার পায়ে ধরে অত সাধছে কেন?'

—'পায়ে ধবতে যাবে কেন? আচ্ছা তো! ওই জন্যেই তো তোমাকে ডাকছিলাম, তা তোমার পাত্তা পেলে তো!'

—'কেন ডাকছিলে! পায়ে ধরে সাধতে? এরপর কি সকালবেলা বুড়ো আঙুল ধোয়া জল খেতেও ডাকবে?' টুকটুকের হাসি বেড়েই যাচ্ছে।

বিরক্ত হয়ে বললাম—'ঝিঁঝি ধবেছে প্রচণ্ড। কী যে বাজে কথা বলো।'

—'উঃ কত ন্যাকামিই যে জানো!' টুকটুকের প্রস্থান। ওকে সাবধান করে দিতে হবে এই কথাটা ও যেন আর ব্যবহার না করে। আমার অ্যালার্জি হয়ে যাচ্ছে কথাটায়। টুকটুক যেন মনে না করে ওকে যে আমি বিয়ে করেছি এটা একটা ফেরানো-যায় না গোছের ব্যাপাব। আজকালকার দিনে হতে পারে না। এটা ওর জানা উচিত। অমিকেও কয়েকদিন আগেই বলছিলাম—'টুকটুকের বাইরের রূপ-গুণ দেখে আকৃষ্ট হওয়াটা বোকামি কি বল। ভেতবের মানুষটা ঠিক...'

অমিত চুপ করে রইল। আমি হেসে বললাম—'তুই আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। অলটার ইগো বলতে গেলে। তুই এ বিষয়ে মতামত দিলে আমি কিছু মনে করব না।'

অমিত বলল—'না... মানে... ঠিক...।'

—'না.. মানে... ঠিক...?' তুই ইয়ার্কি পেয়েছিস! তুই নিজে ওর মধ্যে কি দেখেছিলি?'

অমিত বলল—'দূর, তুইও যেমন! ছাড় তো!'

ব্যাস। বিষয় পরিবর্তন। আর একটি কথাও ওকে দিয়ে বলাতে পারিনি।

অমি আমাদের বাড়ির একতলা ছাড়ল মাসিমার মৃত্যুর পর। সে এক মর্মান্তিক ব্যাপার। মনে করলে এখনও আমার গা শিউরে ওঠে। মানুষকে ক্ষমা করতে পারি না। মাসিমা কোনদিন নিজেদের ঘরের সীমানার বাইরে পা বাড়াতেন না, কিন্তু আমার বাবা নানা প্রয়োজনে মাঝে-মধ্যেই যেতেন। এই নিয়ে আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী মহলে একটা চাপা গুজগুজ আরম্ভ হল। আমাদের তখন ফাইনাল ইয়ার। রটনা শুনে রাগে আগুন হয়ে গেলাম। আমারই মাথায় আগুন জ্বলছে, তা হলে ওদের না জানি কি হচ্ছে! ঘরে গিয়ে দেখি মাসিমা যেমন অবিশ্রান্ত সেলাই করে যান তেমনি করছেন, অমিত ছাত্র পড়াবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। অমিকে ঝাঁকিয়ে বললাম—'তোর কি দেহে মাছের রক্ত, এইসব রটনা শুনেও তুই নির্বিবাদে ছাত্র পড়াতে যাচ্ছিস?'

মাসিমার মুখটা লাল হয়ে গেল। অমির মুখটা একেবারে নীলবর্ণ। আমি টেবিল চাপড় মেবে বললাম। 'এইসব জঘন্য শয়তানির উচিত জবাব কি জানিস? —বাবার সঙ্গে মাসিমার বিয়ে দিয়ে দেওয়া।'

—মাসিমাব সেলাই-কল দুম করে বন্ধ হয়ে গেল। তিনি যেন একটা উদ্‌গত চিৎকার চাপলেন। অমি উঠে দাঁড়িয়ে বলল—'গোপাল তুমি বলছো কি, ছিঃ। এসব কথা চিন্তা করলেও ওদের নোংরা ধারণাকে মেনে নেওয়া হয়। বোঝো না?'

আমি বললাম—'ভুল। ভুল। সমাজ চিরকাল একভাবে চলবে না অমিত চলতে দেবো না, সমাজের মুখে থাবড়া দেব, এ আমি করেই ছাড়ব। আজই বাবাকে বলছি।'

অমিত বলল—'হঠকারীর মতো কথা বলো না, হঠকারীর মতো কাজ করো না। যাও তো এখন এখান থেকে, যাও।'

একরকম ঠেলে আমাকে নিজেরই বাড়ির ঘর থেকে বার করে দিল অমিত। দরজা বন্ধ

হয়ে গেল। মা-ছেলের মধ্যে কি কথা হয়েছিল জানি না। পরদিন এক বীভৎস দৃশ্য দেখা গেল। আমাদের পরমপূজ্য মাসিমার কুসুমকোমল শরীরটা সিলিং থেকে...।

অমিত ঘরের কোণে বসেছিল। আছড়ে পড়ে বললাম—'এ কি করলেন মাসিমা, এ কি করলি অমি? কী বলেছিলি মাসিমাকে?...'

অমিত ঘরে ছেড়ে চলে গেল।

মাসিমার শেষ কাজ হয়ে যাবার পর আমাকে বা বাবাকে একটা কথাও না জানিয়ে বাড়ি ছেড়ে গেল অমিত। একদিন ভোররাতে উঠে শুধু দেখলাম, দালানে শ্বেতপাথরের টেবিলে সে মাসের ভাড়ার টাকাটা, ঘরের চাবির তলায় চাপা দেওয়া রয়েছে। একটা চিঠি না, কিচ্ছু না।

টুকটুক বলল, 'শুতে চলো। অনেক রাত হয়েছে।'

সত্যিই রাত হয়ে গেছে। শুয়ে পড়লাম। কিন্তু সত্যিই ঘুম আসছে না। সামনের জানলার পর্দা সরানো দু পাশে। চাঁদটা একেবারে ঠিক চোখের ওপর। টুকটুক বলল—'একটা জিনিস করেছি, দেখবে?'

—'এখন? এই এত রাতে?'

—'ঘুমোচ্ছ না বলে বলছি।'

টুকটুক উঠল, আলো জ্বালল, আলমারি খুলল। ভেতর থেকে দুটো প্যাকেট টেনে বের করল। একটা প্যাকেটে হাত-কাটা খুব সুন্দর একটা স্লিপোভার, ধবধবে সাদা। আর একটা প্যাকেটে ঠিক ওইরকম আরেকটা স্লিপোভার, কুচকুচে কালো।

টুকটুক বলল—'তুমি ফর্সা, তোমাকে কালোটা মানাবে, আর তোমার বন্ধু কালো, ওকে সাদাটা...।'

হেসে বললাম—'তোমার কালার ম্যাচিং সম্পর্কে ধারণা খুব পুরনো টুকটুক। এখন সবাই জানে ফর্সা রঙে সাদা পরতে হয়। যাই হোক ওটা একটা ব্যাপারই না। বেশ সুন্দর হয়েছে।'

টুকটুক বলল—'অস্ট্রেলিয়া যাবার আগে এটা তোমাব বন্ধুকে দিয়ে দিও।'

—'বাঃ, তুমি উপহার দিচ্ছো, তুমিই দেবে, আমি দিতে যাবো কেন?' আমি পাশ ফিরে শুলাম। টুকটুক তা হলে এখনও অমির জন্যে ভাবে। আশ্চর্য!

অমিকে সেবার খুঁজে বার করলাম ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে। পেছন থেকে কাঁধে হাত রাখতেই চমকে উঠল। বললাম—'ভূত দেখলি নাকি?'

ফিকে হাসল। বললাম—'ও বাড়িতে থাকতে আর না-ই যাস। আমাকে তোর ঠিকানাটা অন্তত দে। আমি যে তোকে ছেড়ে খেতে শুতে পারি না, একথাটা তো এতদিনে জানিসই।'

ঠিকানাটা খসখস করে লিখে দিল। আমহার্স্ট স্ট্রীটের একটা মেসের ঠিকানা। এরপর আমাদের জীবন, আলাপ, অন্তরঙ্গতা সব একেবারেই লেখাপড়া-কেন্দ্রিক হয়ে উঠল। মাস্টারমশাইরা অর্থাৎ সায়েন্স কলেজের মাস্টারমশাইরা নিত্য আসতেন বাড়িতে। ওঁরা বলতেন কে যে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হবে আর কে যে ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড হবে বোঝা যাচ্ছে না। আমি বলতাম—'অমিত হবে', অমি বলত—'গোপাল হবে।' পাঁচ নম্বর, মাত্র পাঁচ নম্বরের জন্য সেকেন্ড হয়ে গেল অমিত।

সেইজন্যেই মনোদুঃখে কি না জানি না অমি একটা চাকরি নিয়ে বসল। ভালো চাকরি, কিন্তু গবেষণার সুযোগ নেই। শুধু সেলস। অনেক বোঝালাম, শেষে ইনস্টিট্যুটে যোগ

দিতে ও রাজি হল। তারপর আমাদের যুগ্ম গবেষক-জীবনের শুরু। কি পরিশ্রম করছে অমি, আমি বুঝতে পারছি ও এবার কিছু করবে। করবেই। প্রাণপণে ওকে সাহায্য করে যাচ্ছি। ওর নির্দেশমতো চ'লছি। পেপাব বার হচ্ছে আমাদের উভয়ের নামে। তারপর? তারপর ভাগ্যের সেই অদ্ভুত খেলা। জেনেটিক এঞ্জিনিয়ারিং-এর সেই আবিষ্কার যা অদ্ভুতভাবে শেষ পর্যন্ত আমার হাত দিয়েই হল। নেশায় পেয়ে বসেছিল আমাকে। রাতে সবাই চলে যাবার পর আবার গেলাম ল্যাবে। দারোয়ানকে দিয়ে চাবি খুলিয়ে, সারারাত কাজ করছি, খুঁজছি, তারপর হঠাৎ আলোব ঝলক। পর দিন সকালে চতুর্দিকে ছড়িয়ে গেল খবর। প্রেস কনফারেন্স ডাকলেন ডক্টর বর্মা, আমি জোর করেছিলাম আমাদের দুজনের নামই থাক। অমি রাজি হল না। বিসার্চ ছাড়ল অমি। অবশ্য ছাড়ল বলা ঠিক না। চাকরি তো রিসার্চেরই। কিন্তু ওর সেইসব মূল্যবান গবেষণা তো আর ওর ব্যক্তিগত থাকবে না। অনেক বারণ করেছিলাম। কিছুতেই শুনল না। ওর নাকি টাকার দরকার। আমারও আর ভালো লাগল না। ছেড়ে দিলাম ইনস্‌টিটিউট। সেই সময়ে বাবা মারা গেলেন, আমাকে হাল ধরতে হল বাবার ব্যবসার। মনে অশান্তি, নিজের পছন্দমতো কাজ পাচ্ছি না। বাবার ইলেকট্রিক্যাল পার্টস-এর ব্যবসা, বাঁধা খদ্দের সরকার, কাজের মধ্যে রস পাই না। একদিন এসপ্লানেডে গাড়ি থেমে আছে ট্রাফিক সিগন্যালে, দেখলাম ওদের দুজনকে। অমি তখনও পুবনো মেস ছাড়েনি, বলে—'বেশ তো আছি, নিজস্ব বাড়ি মানেই নানান ঝামেলা।' মনে মনে হাসলাম, ও এইজন্য তোমার টাকার দরকার। এইবার তুমি বাড়ির ঝামেলায় যাবে। গাড়ি ঘুরিযে তুলে নিলাম। পরিচয় হল। হেসে বললাম—'রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবি কেন? আমার বাড়িটা কি তোর নয়?'

পরের রবিবারই ডাকলাম ওদের দুজনকে। আলোয় ফুলে ভরে দিলাম বাড়ি। ইনটিরিয়র ডেকোরেটর ডেকে ঘর সাজালাম। ওরা এলো। সারাটা মুগ্ধ সম্মোহিত সন্ধ্যা খালি গান আব গল্প, গল্প আর ছবি, যেখানে যা ভালো খাদ্য আছে, অমি যা ভালোবাসে, যা ওব পক্ষে ভালোবাসা সম্ভব—সবই জড়ো করেছিলাম।

চিকমিকে সব জরির ঝালর। টুংটাং ঘণ্টার মধ্যে দিয়ে বড় বড় চোখ কপালে তুলে টুকটুক বলছিল—'এতো বড়, এতো সুন্দর বাড়ি, এই বিশাল গাড়ি, এতো সম্পদ সব আপনার একার? —কোনও দ্বিতীয় ভাগীদার নেই?'

আমি হেসে বলছিলাম—'আর এই সব রোশনি, এই খুশবু, এই সমস্ত আপ্যায়ন আয়োজন আপনার। আপনার একার। কোনও ভাগীদার নেই।'

স্বপ্নালু চোখে টুকটুক বলছিল—'কথা বলাও কি আপনি মাস্টারমশাই বেখে শিখেছিলেন?'

আমি বলছিলাম—'চলতে ফিরতে হাসতে যদি আপনি মাস্টারমশাই রেখে শিখে না থাকেন, তা হলে কথা বলতে শিখতেও আমার মাস্টারের দরকার হয়নি।'

আমার বাড়ি ওদের জন্যে খোলা রইল। চাবি দিয়ে দিলাম একটা—অমির হাতে। অমি সেটা টুকটুকের হাতে চালান করে দিল।

দু-তিন দিন পর টুকটুক এলো একা একা। অমি নাকি কাজে ব্যস্ত। আরও কয়েক দিন পর টুকটুক আবার এলো একা, অমি ট্যুরে গেছে। আরও কয়েকদিন পর টুকটুক আমার দেওয়া চাবিটা ব্যবহার করল। অর্থাৎ আমি বাড়ি এসে দেখলাম টুকটুক—দালান আলো করে সোফায় এলিয়ে আছে। তারপর একদিন টুকটুক এসে কান্নায় ভেঙে পড়ল। অমি

নাকি বিয়ে করতে চাইছে না। —'প্রায় দু বছর এতো মেলামেশার পর... আমি মুখ দেখাতে পারব না বাড়িতে', টুকটুকু দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছিল। অমির অফিসে গেলাম। খুব উত্তপ্ত হয়ে গিয়েছিলাম সেদিন। ওর ঘরে আরও দুজন কর্মী বসে। গ্রাহ্য করলাম না। যা বলার বললাম। অমি বলল—'আমি ওর সঙ্গে বন্ধুর মতো মেলামেশা করেছি, বিয়ে করব কথা দিইনি তো!'

—'বাঃ চমৎকার। তুই যে এত বড় স্কাউন্ড্রেল তা আমার জানা ছিল না। কথা দিসনি তো ও ভাবল কি করে?' এই সময়ে সহকর্মী দুটি উঠে বাইরে চলে গেল।

অমিত মৃদু হেসে বলল—'তাই তো? ভাবল কেন? আমার বাঁধা পড়বার ইচ্ছে নেই, কাজ অনেক কাজ, আচ্ছা গোপাল, দ্যাখ না ও যদি তোকে বিয়ে করতে রাজি হয়!'

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম—'ওকে যখন এভাবে পরিত্যাগ করেছ, তখন ও এরপর কাকে বিয়ে করতে রাজি হবে সে কথা ভেবে আর নাই মাথা ঘামালে!'

যাক গে, সে সব দিনও গত হয়ে গেছে। গত মাস কয়েক ধরেই আমার নতুন পরিকল্পনা নিয়ে দুজনের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল। আমার এই লোহা-লক্কড় আর ভালো লাগছে না, ওটা আছে থাক। ওষুধের ফ্যাকটরি করব। অমি অনেক প্ল্যান-ট্যান ছকে দিল, এসবে ওর মাথা তো পরিষ্কার! আমি বললাম, 'তোকে কিন্তু আসতে হবে আমার সঙ্গে।'

—'কিভাবে?'

—'কেন? তুই ওয়ার্কিং পার্টনার, ল্যাবরেটরির ভার তোর ওপর।'

অমিত যেন কি ভাবছে। অনেকক্ষণ পরে বলল—'দেখা যাক।'

তারপর কালকে ওই ঘোষণা। আগে থেকে কোনও খবর না, কিছু না। দুম করে—'কাল আমি মেলবোর্ন যাচ্ছি। হ্যাঁ ওখানেই চাকরি নিয়েছি। কবে ফিরব ঠিক নেই। খুব সম্ভব কোনদিন না।'

ভোর হয়ে গেছে। সারা রাত এক ফোঁটাও ঘুমোতে পারিনি।

বলেছিলাম—'আমার ওষুধের কারখানার কি হবে?'

—'তুই একটা ফার্স্ট ক্লাস ডি এস সি বায়োকেমিস্ট গোপাল, তোর ভাবনা হওয়া উচিত নয়।' অমিত আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল।

বোধহয় আধ ঘণ্টার মতো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। টুকটুক জাগিয়ে দিল। —'রেডি হবে না? প্লেন তো ন'টায়।'

—'ঠিক। তা তুমিও যাচ্ছো নাকি?'

—'বাঃ, তুমিই তো বললে উপহার নাকি আমার নিজে গিয়ে দিতে হবে।'

—'এই ফ্যান্সি ড্রেসটা পরেই?'

—টুকটুক গোঁয়ারের মতো বলল, 'হ্যাঁ।'

কালকের সেই রাজস্থানী পোশাকটা পরেছে ও, এটা পরলে ওকে রাণা প্রতাপ সিংহর যুগের রাজপুতানী সুন্দরীদের মতো দেখায়। দারুণ সেজেছে টুকটুক। আপাদমস্তক রঙিন। ম্যাচিং গয়না ঝকমক করছে। পারফ্যুমের গন্ধে ঘর ভরে যাচ্ছে।

আমি উঠে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিলাম। ইচ্ছে ছিল, অমির সঙ্গে দিল্লি পর্যন্ত গিয়ে সী-অফ করবার। কিন্তু এত দেরিতে খবরটা জানায় সেটা সম্ভব হল না। টুকটুকের হাতে মস্ত ব্যাগের মধ্যে প্যাকেট। আমি মনে করিয়ে দিয়েছিলাম একবার। কিন্তু টুকটুকের ভুল হয়নি। খুব জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল ও কোনটা দিচ্ছে অমিকে। সাদাটা না কালোটা। ব্যাগ

ফাঁক করে দেখাল টুকটুক। গোঁয়ারের মতো মুখ। সাদাটাই। ওই সাদাটাব সুতোয় সুতোয় ও বোধকরি অমি সংক্রান্ত ভাবনাগুলো বুনে রেখেছে।

অমিটা স্টেট্স থেকে ঘুরে আসতে পাবত। জার্মানি। ফ্রান্স কিংবা ইউ কে হলেও কিছু বলার ছিল না। ওর কোম্পানি না পাঠাক, আমি পাঠাতাম। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া! ওকি চীজ-রুটি, আর ভেড়ার মাংস, কিংবা ক্রিকেট-ট্রিকেটের লোভে অস্ট্রেলিয়া চলল নাকি? কথাটা মনে করে হাসি পেল আমার। কিন্তু এয়ারপোর্ট যতই এগিয়ে আসছে, হাসি মুছে যাচ্ছে, আমার মন থেকে। মুখ থেকে। অমি চলে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে, আমি কেমন করে বাঁচব? আব দুজনে পাশাপাশি কাজ করতে পাবো না। আর হবে না সেইসব আড্ডা, তর্ক, গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা যেগুলো আমার জীবনে অপরিহার্য ছিল, আমার ধারণা অমিতের জীবনেও ছিল। এখন সে ধারণা আমি পবম অভিমানে পাল্টে নিতে বাধ্য হচ্ছি। একা একা অমি মেলবোর্ন চলল। এখনও ভীষণ মুখচোরা। প্রয়োজনের কথা কাউকে বলতে পারে না। বিদেশি শহরে ওর একাকিত্ব যেন আমার।

ওই তো অমি। লাউঞ্জে ঢুকেই দেখতে পেলাম অমি একটা দলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাচ্ছে। সব ওর সহকর্মী সহকর্মিণী। আমাদের দেখতে পেয়ে হাসল। টুকটুক বলল—'পালিয়ে যাচ্ছেন বেশ! বাঃ!'

অমি হেসে বলল—'যঃ পলায়তি স জীবতি মিসেস সেন।' ওর অফিসের কলীগরা দেখলাম খুব বিচলিত, একটি অল্পবয়সী উৎসাহী ছেলে বলল—'এখনও ভেবে দেখুন অমিতদা। আপনি না থাকলে আমাদের পুরো টিমটাই কানা হয়ে যাবে।'

অমি তার পিঠে হাত রেখে বলল—'কথাটা ঠিক বললে না অরূপ। কারো জন্য কিছু পড়ে থাকে না। নেচার অ্যাভর্স আ ভ্যাকুয়াম, জানো না!'

—'যতই প্রবাদ প্রবচন বলুন, আমাদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা হল যে স্থান একবার শূন্য হয় তা আর কখনও পোরে না।'

—'বিশ্বাস করো এ ছাড়া আমার উপায় ছিল না।' এই অবিশ্বাস্য কথাটা আমাদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে অমি হঠাৎ একটি সহকর্মিণীব দিকে এগিযে গেল ; চলতে চলতে হঠাৎ পেছন ফিরে বলল—'গোপাল, মিসেস সেন আলাপ করানো হয়নি। এই আমার স্ত্রী অর্পিতা।' মেয়েটি দু'হাত জড়ো করে ফিরে দাঁড়াল। অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ করছিলাম—এখন ভালো করে দেখলাম স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ বুদ্ধির শ্রী মেয়েটির মুখে। ঝকঝকে দাঁতে নির্মল হাসি। ধবধবে সাদা একটা দেশী সিল্ক পরেছে, ছোট চুল পেছনে গোছা করে বাঁধা। তার পাশে কটকটে দিনের আলোয় টুকটুক যেন যাত্রাদলের রঙ মাখা সঙ।

আমাদের বিমূঢ় রেখে ওরা দুজন এগিয়ে গেল। এরোড্রোমের টারম্যাকের উপর দিয়ে ওরা হাঁটছে। প্লেনের সিঁড়ি থেকে একবার হাত তুলে বিদায় জানাল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। সিঁড়ি ফিরে আসছে। প্লেন গতি নিল বলে।

পেছন ফিরে দেখি টুকটুক দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে। অমি কবে বিয়ে করল? অস্ট্রেলিয়া যাবার ব্যবস্থার মতো বিয়ের ব্যাপারটাও চুপিচুপি সেরেছে। কেন? আমাকে জানায়নি কেন? কয়েকটা বিদ্যুৎ নির্মমভাবে ঝলকাচ্ছে। আমি অমিকে মেঘের মধ্যে একবাব দেখতে পাচ্ছি, একবার পাচ্ছি না। ও কি আমাকে ভয় পেয়েছে? কেন? ও কি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেনি? কত্ত কাল? ও কি আমাকে কোন দিনই....!

করুণা তোমার

'ঠাকুরমার ঝুলি'র 'ছোটরানী আছাড় খাইয়া পড়িলেন'-এর মতো দৃশ্যটা। পাপু মেঝের ওপর শুয়ে পড়েছে। উপুড় পিঠটা নিথর। কাঁধের তলায় পিঠের ওপর দুদিকে দুটো ত্রিভুজ। একটু একটু উঠছে নামছে। ছোট চুল। বব-ছাঁট ছিল। একটু বড় হয়ে গেছে। তাই আগাগুলো মেঝেতে লুটোচ্ছে।

পাপুর বাবা ঘরে ঢুকেই অবাক।

—'একি? পাপুর কী হলো?' কোথাও কোনও জবাব নেই।

পাপুর বাবার পুনরুক্তি—'বলি, হলোটা কী?'

পাপুর মা অর্থাৎ শ্রীলা উল বুনছিল। উলের থলি টেবিলের ওপব বেখে গম্ভীরভাবে বলল—'তুমি কি চা পান করবে?'

হতভম্ব সুরজিৎ অর্থাৎ শ্রীলার স্বামী ওরফে পাপুর বাবা বলল—'চা তো আমি রোজই এ সময়ে পান করে থাকি। হঠাৎ প্রশ্ন? প্রশ্নের জবাব এড়াতেই প্রতিপ্রশ্ন নাকি?'

—'বোঝ তো বেশ। বুদ্ধি ভালোই। আরেকটু বাড়লে যেটা বুঝেছ সেটা মুখে বলে বোকা-বুদ্ধির পরিচয় দিতে না।'

—'বুদ্ধিও বুঝি। বোকাও বুঝি। বোকা বুদ্ধিটা কী?'—সুরজিৎ তরল গলায় প্রশ্ন করছে। যদিও চোখ দুটো অনড় পিঠটার ওপর স্থির। মেয়ে সুরজিতের প্রাণ।

ঘরে ঢুকে পড়েছে পাপুর পিঠোপিঠি দাদা পিণ্টু।

—'বাবা জানো, আসলে...' পেছন থেকে তার মুখের ওপর হাত চাপা দিয়েছে শ্রীলা।

চা খাওয়া শেষ। চা এর সঙ্গে টা। পিণ্টু খেলতে বেরিয়ে গেল। রান্নাঘরের চায়েব বাসন ঠনঠন করে ধুচ্ছে বোধ হয় চুনী। শ্রীলা বলল—'চুনী, যা ঘুরে আয়। বেশি দেরি করবি না। ঠিক এক ঘণ্টার মধ্যে তোর আড্ডা শেষ হওয়া চাই।'

কাচের চুড়ির আওয়াজ। চুনী বেরিয়ে যাচ্ছে। অন্য দিন মুখে খই ফোটে। আজকে দিদির মেজাজ খারাপ। আবহাওয়া থমথমে। চুনী তাই চুপচাপ বেরিয়ে গেল।

শ্রীলা বলল—'মেয়েকে ভালো শিক্ষা দিচ্ছো না।'

—'যা বাব্বা, আমি আবার কখন শিক্ষা দিলুম, ওসব তো তুমি আর তোমার কনভেণ্টের মিসের এক্তিয়ার।'

—'না, ইয়ার্কি নয়। পুজোর কেনাকাটা করতে গিয়ে সেদিন পাপুর স্কাই ব্লু রঙেব চাইনিজ সিল্কের চুড়িদার সেটটা কিনেছিলুম মনে আছে? সাদা স্যাশের মতো আছে।'

—'তোমরা যে কেনাকাটা করতে গিয়ে কী কেনো, কত কেনো আর কতরকম কেনো...'

—'আচ্ছা, আচ্ছা হয়েছে। দয়া করে পুরোটা শোনো। চুনী সেটা দেখতে পেয়ে গেছে। ধরল ওকেও পুজোয় ঠিক ওই রকমই কিনে দিতে হবে। ওর খুব পছন্দ। ঠিক ওই রঙ, ওই ডিজাইন। এসব জিনিস তো ডুপ্লিকেট হয় না। দামও অনেক। আজকে ঠিক ওই জিনিসটাই দোকানে ঝুলছে দেখে কী মনে হল কিনে ফেললুম। মেয়েটা তো বরাবর

পুরনো, রং জ্বলা জিনিস নিয়েই তুষ্ট আছে। বড় মুখ করে বলল। তা সেই থেকেই তোমার কন্যে অমনি পেছন উল্টে শুয়ে আছে।'

—'কেন?' সুরজিৎ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

—'কেন বুঝতে পারছো না তো! যাক, তোমার সম্পর্কে ভাবনা ছিল সেটা অন্তত ঘুচলো। বুঝতে পাবছো না? তোমার কন্যা চুনীর সঙ্গে একরকম জিনিস পরবে না।'

—'ও হো হো। তা পাল্টে দিলেই তো হয়। চাইছে না যখন।'

—'বাঃ চমৎকার। মেয়ের জেদ বজায় থাকবে। হৃদয়বৃত্তি কোনদিন ডেভেলপ করবে না এমন কবলে। দয়া করে একটু তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করো।'

সুরজিৎ একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল—'তা হলে একটু টাইম দাও। তলিয়ে বুঝি।'

শ্রীলা রাগ কবে সামনে থেকে উঠে গেল।

পাপুটার সঙ্গে চুনীটার যে কী রেষারেষি! অনেক লোক বদলে বদলে অবশেষে এই মেয়েটাকে পেয়েছে সে। বছর পনেরর মেয়ে, পাপুর থেকে সামন্য ছোটই। দেখতে তো ছোট্টখাট্ট। একটু খবখরি। কিন্তু বেশ কাজের। অন্ততপক্ষে কথা বললে শোনে। বেশ চটপটে। মুখে হাসি লেগেই আছে। কথাও আছে সাতকাহন। একটু বড় হয়ে গেলেই এরা যেমনি সেয়ানা হয়ে যায়, তেমনি হয় বদমাশ। চুনী এসে শ্রীলার মনে শান্তি এনেছে। যেমন যেমন শেখায়, তেমন তেমন করে মেয়েটা। নিমেষে বুঝে ফেলে। ঘষর ঘষর বাটনা বাটছে, খচাখচ আনাজ কুটছে, ফটাফট জামা-কাপড় কেচে ফেলছে। কিন্তু কী যে নজর মেয়েটার! পাপুর সঙ্গে সব কিছুতেই ওর পাল্লা দেওয়া চাই। ঠোঁটে রং, নেল পালিশ, জরিঅলা জুতো, চকচকে ঝলমলে জামা—এসব নিয়ে গোড়ায় গোড়ায় খুশি ছিল। এখন আর এ সব মনে ধরে না। পাপুর ফেলে-দেওয়া প্লীটেড স্কার্ট, জাম্পার, দর্জি দিয়ে তৈরি করানো সালোয়ার কামিজ এই সব মোটামুটি পায় ও। এইগুলো পরে পরে ওর রুচি ঘুরে যেতে শুরু করেছে। ড্রেসিং-টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে পাপুর হেয়ার-ব্যান্ড মাথায় দিয়ে দেখছিল একদিন। পাপুর সেই থেকে ওব ওপর রাগ। শ্রীলা পরদিনই ওকে একটা হেযার-ব্যান্ড কিনে দিয়েছে। কিন্তু ও ঠিকই বুঝেছে দিদির জিনিসটার মহিমা আলাদা। মুখ গোঁজ করে থাকে। কথায় কথায় পাপুর সঙ্গে ওর লেগে যায়।

—'দুধে কেন সর রে?' পাপু দুধে মুখ দিয়েই মুখ বিকৃত করে ফেলল।

—'মা তোমাকে কতবার বলেছি তুমি নিজে ছেঁকে দেবে। এরকম করলে আমি দুধ খাবো না।'

শ্রীলা চেঁচাল—'চুনী, দুধ ছাঁকিসনি? এত করে বলি যে...'

চুনীর খ্যানখেনে সরু গলা শোনা যাবে—'ছাঁকলুম তো। কতবার ছাঁকব? আধ ঘণ্টা আগে দুধ ঠিক করে রেখে এসেছি। আবার পড়লে কি করবো? দুধ আর ছাঁকনি নিয়েই সারা দিন দাঁড়িয়ে থাকতে হয় তা হলে...' খরখবি বলেই যাবে, বলেই যাবে।

—'ও কিন্তু ঠিকই বলেছে পাপু, গরম দুধ আলগা থাকলে সর পড়বেই, যখন দেয় তখন খেয়ে নিলেই পারিস।'

—'ও যখন যা দেবে, দয়া করে, ওর হাত থেকে সব নিয়ে নিয়ে খেতে হবে নাকি তক্ষুনি তক্ষুনি!'

পাপু ভীষণ রেগে যায়—'তুমি, তুমিই ওকে আশকারা দিয়ে দিয়ে এমনি কবেছো।'

প্রায় কেঁদে ফেলে মেয়ে—'আমার একটা কথা থাকবে না। নিজের পছন্দমতো জিনিস কক্ষনো পাবো না। খারাপ হলে বলতেও পাবো না, যাও আমি খাবোই না।'

সাধাসাধি করেও মেয়েকে আর খাওয়াতে পারে না শ্রীলা। মহা জ্বালা হয়েছে তার। কোন দিকে যাবে? পাপুর নালিশও ঠিক, পাপুর দিক থেকে। আবার চুনীর সাফাইও কতকটা ঠিকই তো।

পাপু পিণ্টু কেউই খাবার দিলে সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসে খায় না। ডেকে ডেকে মুখ ব্যথা হয়ে যায়। কাজের একটা শৃঙ্খলা আছে তো!

সুরজিৎ ডাকল—'পাপ্পু, আপ্পু উঠে পড়ো।'

কাঁধটায় একটু ঝাঁকানি দিল মেয়ে। ওর গড়ন একটু দোহারা। সামান্য এদিক ওদিক হলেই মোটা হয়ে যাবার ধাত। বাবা আপ্পু বলে ডাকলে ক্ষেপে যায়। খুব একটা সত্যি সত্যি নয় অবশ্য। সুরজিৎ নিচু হয়ে চুলের ঝুঁটি ধরল—'উঠে পড়।'

হঠাৎ একটা ঝটকা দিয়ে উঠে বসল পাপু। —'না বাবা, ইয়ার্কি নয়। মা কী বলতে চায়। একটা কাজের মেয়ে আব আমি এক মায়ের কাছে? আমাকে মা যা দেবে ওকেও ঠিক তাই দেবে! পুজোর সময়ে ও আর আমি একরকম পরে ঠাকুর দেখতে যাবো!'

সুরজিৎ হেসে ফেলল—'বলিস কি রে! একে দাদা তোর ভাগে ভাগ বসিয়ে রেখেছে। আবার আরেক শংকরা?'

শ্রীলা বলল—'তুমি চুপ করো তো। দাদা ভাগ বসিয়েছে কী? ও কি একবারও বলেছে সে কথা? তুমি তো দেখছি আরও জটিলতা, হিংসেহিংসি সৃষ্টি কবছো।'

পাপু মুখ তুলে বলল—'হ্যাঁ আমি বাচ্চা কি না, বাবা বলল আর অমনি দাদাকে হিংসে করতে শুরু করে দিলাম।'

সুরজিৎ বলল—'আরে আমিও তো তাই-ই বলতে যাচ্ছিলুম। হাযাব সেকেন্ডারি পাশ করতে চললি, তুই কি একটা বাচ্চা? বেবি!'

—'বেবি হলে এগুলো মনে হত না বাবা। মা লোকজন নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি করে। মার সঙ্গে তো আর কিছু করবে না। তোমার সঙ্গেও না। মা মাথায় চাপাচ্ছে। আমাদের মাথায় উঠে নাচবে। তোমরা ফল ভোগও করবে না, বুঝবেও না।'

শ্রীলার ভীষণ রাগ হয়ে যায়, সেই সঙ্গে হতাশা। কাজের লোক তো দূরস্থান। অন্য কেউই যে কখনও ছেলে মেয়ের সমান হতে পারে না, তা কী করে ওকে বোঝাবে! সে বলল—'একটা, মাত্র একটা পোশাক তোমার মতো দিলেই, তোমার মনে হয়, ও আর

[illegible] ওর হয়ে ওকালতি করো। আমি

[illegible] পারবো না।'

পিণ্টু এসে ঢুকল। হাতে ঝুলছে ব্যাডমিণ্টন র‍্যাকেট। বলল—'এখনও তোমাদের সেই এক নীলজামা প্রসঙ্গ চলছে? আরে বাবা এটা বুঝছিস না কেন, তোর মতো জামা পরলেই কি চুনী তুই হয়ে যাবে? চুনী চুনীই থাকবে।'

সুরজিৎ যেন হালে পানি পেল, বলল—'রাইট। দুজনে এক রকম জামা পরে বেরোলেও, কখনও দুজনকে একরকম দেখাবে না রে পাপু।'

পাপু গম্ভীর হয়ে বলল—'ঠিক আছে।'

সপ্তমীর দিনে চুনী সেজেগুজে নীল রঙের চুড়িদার পরে একগাল হেসে শ্রীলাকে প্রণাম করল, বলল—'পাপু দিদি, তুমি এই জামাটা কবে পরবে?'

পিণ্টু বলল—'আরে এ চুনী, তু যে শাঁকচুন্নি বন গিয়া রে!'

চুনী বেশ কথার পিঠে কথা শিখেছে বলল—'আমার শাঁকচুন্নিই ভালো বাবা, কটা ভূত হয়ে কাজ নেই।'

পাপু নীল পোশাকটা আর কোনদিনই পরল না। অথচ খুব পছন্দ করে নিজে উদ্যোগী হয়ে কিনেছিল জিনিসটা।

জটিলতা এখানেই থেমে থাকল না। একদিন ওর বাতিল করে দেওয়া স্কার্ট-ব্লাউজ পরে চুনী পেছন ফিরে কি করছিল ঘরে, সুরজিৎ তাকে পাপু বলে ডেকে ফ্যালে। সেই থেকে পাপু আরও গম্ভীর হয়ে গেছে। ইদানীং ওর পুরনো জামা-কাপড়গুলোর শ্রীলা হদিস পাচ্ছে না। নিজের মেয়ের বয়সী কাজের মেয়ে থাকলে জামা-কাপড়ের খাতে খরচটা কমে। লোক রাখবার সময়ে এ হিসেবটাও মনে মনে করে নিতে হয়। জামা-কাপড়ের খরচ কি কম? দিন কে দিন বেড়েই যাচ্ছে, বেড়েই যাচ্ছে। একদিন পাপুর অনুপস্থিতিতে তার আলমারিটা ভালো করে খুঁজে, দেখল, তাকের পেছনের দিকে পুরনো তোয়ালে মোড়া বাতিল জামা-কাপড় গুছনো রয়েছে। কাউকে দেবে? না নিজেই কিছু ভেবে রেখে দিয়েছে? মেয়েকে হালকা গলায় জিজ্ঞেস করল—'হ্যাঁরে তোর কালো স্কার্টটা তো আর পরিস না, কোথায় গেল রে?'

পাপু উদাস গলায় বলল—'কি জানি?'

অথচ একটু আগেই শ্রীলা দেখেছে কালো স্কার্ট তোয়ালে-মোড়া সযত্নে রাখা রয়েছে। নিজেই রেখে দিয়েছে, অথচ অনায়াসে বলে দিল 'কী জানি!' মেয়েকে কিছু বলতে আর সাহস পায় না শ্রীলা। আসল কথা ওগুলোও চুনীকে দিতে দেবে না। এইভাবে নীরবে ওগুলো সরিয়ে রেখে সে কথাই ও জানাতে চাইছে। এখন শ্রীলা কী করে?

অগত্যা আর বছরখানেকের মধ্যে শ্রীলা চুনীকে শাড়ি ধরায়। পাপুকে পারবে না। পাপু এখনও অনেক বয়স পর্যন্ত অনেক রকম পোশাক পরবে। চুনী তো আরও ক্ষয়া চেহারার মেয়ে, স্বাস্থ্য অনেক ভালো হলেও পাপুর কাঠামো সে পাবে কোথায়? অনায়াসেই আরও ক' বছর চালিয়ে দিতে পারা যেত। চুনীর খুব পছন্দ হচ্ছে না ব্যাপারটা, বোঝাই যাচ্ছে। ফ্রক স্কার্টে বয়সটা বেশ ঢেকে রাখা যায়। সব মেয়েই বাচ্চা থাকতে চায়। শ্রীলাদের ঘরের মেয়েও। চুনীদের ঘরের মেয়েও। শ্রীলা নিজের একটা লাল শাড়ি বাছে। লাল রংটা আজকাল আর পরছে না সে। শাড়িটা দিব্যি নতুন।

—'চুনী, চুনী, দ্যাখ দিকি, এই শাড়িটা পছন্দ হয় কিনা।'

লাল টাঙ্গাইল শাড়ি, জরিপাড়। এই অসম্ভব প্রাপ্তিতে খুশিতে ঝলমল করতে থাকে চুনী।

—'এটা আমার, মা?'

—'হ্যাঁ রে তোর, বেশ লম্বা হয়ে গেছিস, শাড়ি ধরে ফ্যাল এবার।'

চুনী আমতা আমতা করতে থাকে—'মাঝে মাঝে পরব মা। সব সময়ে পরলে কাজের অসুবিধে হবে না?'

—'যেগুলো আছে সেগুলো পরতে থাক। এরপর যখন দরকার হবে শাড়িই দেবো।' সিদ্ধান্ত নেওয়ার গলায় শ্রীলা বলে। আরেকটা পরিত্যক্ত ছাপা শাড়ি এনে চুনীকে গছায়, সেই সঙ্গে আনুষঙ্গিক সমস্ত। ব্লাউজগুলো একটু ঢলঢল করে, ছুঁচ-সুতো দিয়ে তাকে মেরে ছোট করে নেয় চুনী। কখনও শ্রীলা নিজেই করে দেয়। এইভাবে একরকম হঠাৎই চুনীব ফ্রক-স্কার্ট থেকে শাড়িতে উত্তরণ ঘটে যায়। পাপুর সঙ্গে তাকে গুলিয়ে ফেলবার কোনও উপাযই থাকে না। একজন জীনস টিশার্ট, অন্যজন শাড়ি। একজন লম্বা স্কার্ট, অন্যজন শাড়ি। একজন কাফতান, অন্যজন শাড়ি। শাড়ি এবং শাড়ি এবং শাড়ি।

প্রথম প্রথম কাঠিতে জড়ানো কাপড়েব মতো দেখাতো শাড়ি-পরিহিত চুনীকে। কিন্তু বেশ কয়েক বছর শ্রীলা সুরজিতের সংসারে থেকে তার কালো রঙে চাকচিক্য এসেছে, চুলে ঔজ্জ্বল্য। এখন শাড়ির আড়ালে হঠাৎ-ই যেন তার শরীর ভরে উঠতে থাকে। পরিচ্ছন্ন পাট পাট করে ধোপদুরস্ত, রঙ-মিলানো শাড়ি ব্লাউজ পরে চুনী যখন ঘোরে ফেরে দোকানের শো-কেসেব কালো মডেল পুতুলের কথা মনে পড়ে যায় শ্রীলার। কিন্তু খুব শীগগিরই শ্রীলা অস্বস্তির সঙ্গে আবিষ্কার করে চুনী শুধু তাব চোখেই নয়, পাড়ার রিকশঅলা, বহুতলের কেয়ারটেকার, দারোয়ান, চায়েব দোকানেব ছেলে, পাড়ার কিছু অকালকুষ্মাণ্ড—এদের চোখেও বেশ আকর্ষণীয় হযে উঠেছে। চুনীর বিকেলের ছুটিব সময় ক্রমশই বাড়ছে। অন্যান্য বাইরের কাজ, যেমন দুধ আনা, বাজাব করা, মিষ্টির দোকান ইত্যাদিতেও সে অনেক বেশি সময় নিচ্ছে। এবং সময়-টময় নিয়ে যখন বাড়ি ফিরছে তখন সারা শরীরে বেশ একটা হিল্লোল নিয়ে ফিরছে। চোখে মুখে যেন খুশি আব ধরে রাখতে পারছে না।

একদিন পিণ্টু এসে বলল—'মা, চুনীটা কি ওস্তাদ হয়েছে জানো, রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে একটা কুলি-কাবাডি লোকের সঙ্গে যাচ্ছেতাই ইয়ার্কি দিচ্ছিল। আমি দেখেও ফেলেছি, শুনেও ফেলেছি।'

শ্রীলা গৃহ-সমস্যার সব কথা সুরজিৎকে বলে না। এটা বলল—'দিনকাল ভালো না। এভাবে চললে বিপদে পড়তে কতক্ষণ?'

সুরজিৎ গম্ভীরমুখে বলল—'আরেও আদব করে শাড়ি পরাও।'

—'কেন, কত দুঃখে শাড়ি ধরিযেছি জানো না নাকি?' শ্রীলা বাগ করে বলে। সুরজিৎ হেসে বলল—'যে কারণেই পরিয়ে থাকো, তোমার হাত থেকে তাস এখন বেরিয়ে গেছে। এবার ট্রাম্পড হবার জন্য প্রস্তুত থাকো।'

সত্যিই চুনীকে সামলানো এবার দায় হয়ে উঠল। যখন-তখন খিল খিল খিল, চুনী কাজ করছে না তো, ঘরে-দোরে নদী বইছে, এত ঢেউ। চুড়ির রিনিঠিনি, বাহারি টিপের রং-চং,

চটির ফটাস ফটাস। মাথায় টপ নট। ক্লিপ দিয়ে দু পাশ থেকে চুল তুলে মাথার পেছন দিকে আটকানো, বাকি চুল ছাড়া পেছনে, চুনী কিছুই শিখতে বাকি রাখেনি। লাল শাড়ি পরে এইভাবে ঢেউ কাটতে কাটতে চুনী সুরজিৎকে, পিন্টুকে জলখাবার দেয়। শ্রীলার চোখ করকর করে। নানা ছুতোয় ধমকায় সে মেয়েটাকে।

পিন্টু বলে—'কি রে চুনী, আজ যে দেখছি টিকায়াম আগুনম।'

চুনী দারুণ চালাক। ঠিক ধরতে পারে, বলে—'বাজে বকো না দাদা। যতই অং বং চং বলো ফিলিমের আসল হিরোইনরা বেখা শ্রীদেবী সব কালো, কুচকুচে কালো।'

সুরজিৎ বলে—'তাই নাকি রে?'

শ্রীলা প্রসঙ্গ থামাতে এক ধমক দেয় —'তুমি চুপ করো তো। চুনী চুপচাপ কাজ কর। যত্ত বাজে কথা।'

চুনী দাঁত বার করে বলল—'হিঁ, আমি সত্যি জানি মা, সব্বাই তো আর পাপুদিদির মতো গোরে গোরে নয়।'

—'তুই থামবি?' শ্রীলা আবার বলল।

পাপু শেষ লুচিটা কোনমতে মুখে পুরে উঠে গেল।

চুনীকে সোজাসুজি ধমকানোটা আর এড়ানো যাচ্ছে না। হেমন্তের সন্ধে। রবিবার। শ্রীলা ছাড়া কেউ বাড়ি নেই। চুনী আড্ডা সেরে বাড়ি ফিরল।

শ্রীলা গম্ভীর মুখে বলল—'চুনী শোন। চটিটা ছেড়ে এসে এ ঘরে শোন।'

চুনী আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে এসে দাঁড়াল।

—'যত রাজ্যের ছেলের সঙ্গে অত বাজে বকবক করিস কেন রে? সিঁড়ির মোড়ে দাঁড়িয়ে লিফটম্যান জালাল। নিচে দারোয়ান বাহাদুর, রাস্তায় হরেক রকমের ছোকরা তাদের সঙ্গে তোর অত কলকলানি কিসের? বিপদে পড়তে চাস না কী?'

চুনী আঙুলে শাড়ির আঁচল জড়াতে জড়াতে বলল—'দিদিও তো করে। দিদির তো অত ছেলে-বন্ধু, তারা বাড়িতে এসে যখন গল্প করে দিদিও তো হেসে হেসে ইয়ার্কি দেয়। তখন তো কিছু বলো না। তা ছাড়া আমি তো শুধু রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে একটু গল্প করি, দিদি যে সিনেমায় যায়, পিকনিকে যায়, সেগুলো বুঝি কিছু না।'

হাসবে না কাঁদবে শ্রীলা ভেবে পায় না। বলল—'ওরা তো সব দিদির কলেজের, ক্লাবের বন্ধু, মেয়ে-বন্ধুদের সঙ্গে ওদের কোনও তফাত-ই নেই। তোর কি তাই? তুই যেটা করিস সেটা ভালো দেখায় না তো বটেই, তুই একদিন মহা বিপদে পড়বি। কী বিপদ, কেন বিপদ কিছু কিছু বোঝবার বয়স তোর হয়েছে চুনী।'

চুনী গোঁয়ারের মতো বলল—'সব্বাই মোটেই দিদির কলেজের বন্ধু নয়, দিদি তো একজন লম্বা গোঁফ দাড়িঅলা ছেলের সঙ্গেও একা একা ঘোরে। সিনেমা যায়। ইস্টিশানে একদিন ট্রেন থেকে নামল।

—'তুই কোত্থেকে দেখলি?'

—'আমি জানি।'

শ্রীলা স্তম্ভিত।

সেদিন সুরজিৎ ফিরলে তাকে সব খুলে বলে শ্রীলা দৃঢ়কণ্ঠে দাবি জানাল—'মেয়ের বিয়ে দিতে হবে।'

সুরজিৎ বলল—'ক্ষেপেছো? সবে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ছে, পার্ট ওয়ান এসে গেল। এখনই বিয়ে? তুমিই না বলতে মেয়ে তোমার ছেলেব সমান সমান। পড়বে, যতদূর ইচ্ছে, ডক্টরেট করবে, চাকরি করবে।'

—'সে আমার ভাগ্য আর আমার মেয়ের ভাগ্য। কপালে যদি না থাকে আমি কি করবো বলো, আমার দিক থেকে তো চেষ্টার ত্রুটি ছিল না।'

সুরজিৎ বলল—'তুমি এখনই অত হতাশ, অদৃষ্টবাদী হয়ে পড়ছো কেন? সে ছেলেটি কে, কার সঙ্গে মিশছে, ব্যাপারটা আদৌ সত্যি কিনা এসব জানো, জানতে চাও। চুনী কি না কি বলল, তুমিও অমনি বিশ্বাস করে বসলে? তা ছাড়া সত্যিই যদি সিরিয়াস কিছু হয় মেয়েকে টেনে এনে বিয়ে দিতে পারবে? না সেটা উচিত হবে? তুমি কোন কালে আছো বলো তো?'

শ্রীলা গম্ভীরভাবে বলল—'তুমি ঠিকই বলেছো। কিন্তু আমি মা। আমাকে সব সময়ে আগামী কালে থাকলে চলে না। তুমি যত সহজে 'জানো, জানতে চাও' বললে আমি তা পারবো না। উপদেশটা তোমাকে ফিরিযে দিচ্ছি। এটা আমার চ্যালেঞ্জ। বাবারা সব সময়ে কথায়-বার্তায় সুপার ফাস্ট। কাজে-কম্মে মান্ধাতার যুগে। আমি অন্তত এ বিষয়ে এটা চলতে দিতে রাজি নই।'

সুরজিৎ বলল—'ঠিক আছে। চ্যালেঞ্জটা আমি গ্রহণ করলাম।'

সুরজিৎ চ্যালেঞ্জ নেবার দিন সাতেকের মাথায় শ্রীলা জানল—'গোঁফ-দাড়িঅলা লম্বা একটি বন্ধু সত্যিই পাপুর হয়েছে। ছেলেটি হোস্টেলে থাকে। এম-ই কবছে। য়ুনিভার্সিটির চত্বরেই আলাপ। পাপুর গ্রুপের সঙ্গেও ওর ভালোই চেনা। তবে হ্যাঁ, পাপু দু-এক দিন ওর সঙ্গে কয়েকটা খুব ভালো ভালো বিদেশি ছবি দেখতে এসপ্লানেড পাড়ায় গিয়েছিল। বালিগঞ্জ স্টেশনে একবাব ওরা কয়েকজন বন্ধুকে ট্রেনে তুলে দিচ্ছিল, নিজেরা কোথাও যায়নি। পাপু জানতে চেয়েছে কোথা থেকে সুরজিৎ এত কথা জানতে পারল। সে তো লুকিয়ে কিছু করেনি। অন্যান্য বন্ধুদের মতোই জয়ও একদিন এ বাড়িতে আসতোই। ইন ফ্যাক্ট জয় পরেব রবিবার নিজেই আসতে চেয়েছে।

ছেলেটি—জয়দীপ—যেদিন বাড়িতে এলো সুরজিৎ. শ্রীলা তো বটেই পিণ্টু শুদ্ধ মুগ্ধ হয়ে গেল। সোজা স্বাস্থ্যবান চেহারা, দাড়ি গোঁফে দারুণ ইনটেলেকচুয়াল দেখায়। অথচ কোনও কৃত্রিমতা, কোনও দম্ভ নেই। এঞ্জিনিয়ার হলে কি হবে, কবিতা এবং ফিল্ম সম্পর্কে দারুণ আগ্রহ, শুধু পাশ্চাত্ত্য সংগীত সম্পর্কে কথা বলেই সে পিণ্টুকে কাত করে দিল। খাবার সময়ে খুব সহজভাবে জয় জানাল সে শিগগিরই এম আই টিতে ডক্টরেট করতে চলে যাবে। বাবা মার ইচ্ছে বিয়ে করে যায়। বউকেও শিগগিরই নিয়ে যেতে পারবে। পাপুর সঙ্গে বিয়ে হলে সে খুব আনন্দিত হবে। শ্রীলা সুরজিৎ উভয়েই অবাক। এত তাড়াতাড়ি, এভাবে যে এমন প্রস্তাব কেউ করে ফেলতে পারে তারা ভাবতেই পারেনি। পাপুটারও মুখ লাল হয়ে গেছে। সে বোধ হয় এত সব ভাবেনি।

সুরজিৎ বলল—'সে কি! তোমার বাড়ি, বাবা-মা?'

জয় হাসল, বলল—'বাবার বর্ধমানে নার্সিং হোম আছে। ডাক্তার। মাও সেসব সামলান। ওঁরা নিশ্চয়ই শিগগিরই এসে দেখা করবেন। তবে বিয়ের ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। পাপুর পার্ট ওয়ানেব পরই বিয়েটা হতে পারে। ডিসেম্বর নাগাদ আমি চলে যাবো। পাপু পার্ট-টু-টা দিক। তারপর আমি এসে নিয়ে যাবো। পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স ওখানেই করবে। অসুবিধে কি? স্টুডেন্টস ভিসায় বরঞ্চ এটাই যাবার সুবিধে। আমি আমার বায়োডাটা কাল পরশুর মধ্যেই দিয়ে যাবো।'

জুলাই মাসের এক আশ্চর্য সুন্দর বৃষ্টি-ধোয়া অকালবসন্তের হাওযা-বওয়া দিনে মাত্র উনিশ বছর বয়সে পাপুর বিয়ে হয়ে গেল। এবং জুলাই মাসেরই এক উপর্যুরস্ত বাদল দিনে চুনী এসে শ্রীলাকে জানাল, সে কাজ ছেড়ে দিচ্ছে। কারণ সে বিয়ে করছে। বর রাজ-মিস্ত্রী। সনাতন মিস্ত্রির নাম এ দিকে কে না জানে, ঢালাই বাবদই হাজার হাজার টাকা কামায়। তাকে আর চাকরি করতে দেবে না বর। বারুইপুরে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে থাকতে হবে। কোনও ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা নেই। খালি এক শাশুড়ি।

শ্রীলা অবাক হয়ে বলল—'কবে হবে বিয়ে? কোথায়?'

চুনী সলজ্জে জানাল—'বিয়ে হয়ে গেছে গত পরশু। কালীঘাটে। চুলের ভেতরে সিঁদুর সে লুকিয়ে রেখেছিল।

শ্রীলা বলল—'আগে বললেই পারতিস। তোর বাবা-মা নেই। আমরাই দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দিতে পারতুম। একটু খোঁজ-খবর নিতে পারতুম।'

চুনী সলজ্জ নতমুখে নখ খুঁটতে খুঁটতে জানাল—'তারও দিদির মতোই হুট বলতেই বিয়ে হয়ে গেল।'

শ্রীলা মনে মনে খুব খানিকটা হাসল। কে জানে, দিদির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতেই বিয়েটা ও হুট করে করে ফেলল কি না। কিছুই অসম্ভব নয়। সে পাপুর উপহারেব শাড়ি থেকে বেছে একটা রঙচঙে ভালো সিল্কের শাড়ি চুনীকে দিল। নিজের একটা হালকা রুপোর সেট ছিল, সেটাও দিয়ে দিল। বলল—'এতদিন চাকরি করে যা পয়সা জমালি সব পোস্ট অফিসে তোলা আছে। এই নে পাস বই। সাত বছরে এগার হাজারের মতো জমেছে। সাবধানে রাখিস চুনী। এই এখন তোর সর্বস্ব।'

চুনী শ্রীলাকে প্রণাম করে ছলছল চোখে বাড়ি ছাড়ল।—'বাবার সঙ্গে, দাদার সঙ্গে দেখা হল না মা। পরে এসে নিশ্চয়ই দেখা করে যাবো।'

আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর শেষ হয়ে গেল। প্রত্যেক মাসে, প্রত্যেকবার যখন পাপু আসে, শ্রীলা অবাক হয়ে দেখে, সে প্রতিদিন আরও সুন্দর, আরও শ্রীময়ী হয়ে উঠছে। বরাবরের গোলগাল ভাবটার ভেতর থেকে কে যেন বাটালি দিয়ে কেটে বার করে আনছে ধারাল চেহারা। গোঁয়ার, জেদী, রাগী ভাবটা কোমল ঝলমলে লাবণ্যে কবে মিলিয়ে গেল। সে যে আপাদমস্তক জয়দীপ নামে মানুষটার বিস্ময় দিয়ে মোড়া, এখনও বুঝতে পারছে না একটা অপরিচিত আনন্দের ভাণ্ডার তার সামনে কেমন করে খুলে গেল, এ বিস্ময় কেমন করে তার নিজের ভেতরেই লুকিয়ে ছিল—এ কথা শ্রীলা-সুরজিৎ বুঝতে পারে। নিজেদের মধ্যে সুখের হাসি হাসে। যা হয়েছে ভালোই হয়েছে। ডিসেম্বরে জয়দীপ চলে গেল। এপ্রিলে ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে পাপুও যাবে। এ কটা মাস

প্রধানত মায়ের কাছেই থাকছে সে। একদিন নিজের পুরনো আলমারি গোছাতে গোছাতে পাপু একটা প্যাকেট হাতে বলল—'মা, একদম নতুন একটা চুড়িদার-কামিজ রয়েছে, দ্যাখো, কি সুন্দর পাউডার ব্লু রংটা।'

শ্রীলা মুখ ডুবিয়ে ডাঁই জামায় বোতাম বসাচ্ছিল। মুখ না তুলেই বলল—'যা হঠাৎ তোর বিয়ের ঠিক হয়ে গেল, এখনও কত ওরকম নতুন ড্রেস পড়ে রয়েছে দ্যাখ। স্কার্ট-টার্ট নিয়ে যা না ক'টা। বিদেশে পরতে পারবি। নতুন নতুন জিনিসগুলো নষ্ট হবে, খুব গায়ে লাগে রে!'

পাপু বলল—'না মা, এটা একদম নতুন। কি সুন্দর চওড়া সাদা স্যাশ!'

শ্রীলা এইবাব ফিরে দেখল। চিনতে পারলো। তিন-চার বছর আগের পুজোয় কিনে দেওয়া সেই চায়না-সিল্কের পোশাক যা পাপু কোনদিন স্পর্শ করেনি। কেন পরেনি সেটা ও বেমালুম ভুলে গেছে। সে হেসে বলল—'পর না পাপু, আজই পর।'

—'পরব?' চুল দুলিয়ে পাপু বলল—'আজ বিকেলে একটু লাইব্রেরি যাবো মা, তখন পরব, হ্যাঁ?'

সন্ধে পার হয়ে গেছে। এসব পাড়ায় শাঁখ বাজে না। কিন্তু ধূপ জ্বলে। শ্রীলা ঘরে ঘরে চন্দন-ধূপ জ্বালিয়ে দেয়। ধূপের অনুষঙ্গে শাঁখের আওয়াজও কেমন মনে এসে যায়, মনের মধ্যে বসে স্বর্গত পূর্বনারীরা শাঁখ বাজান। অমঙ্গল অশুভ দূর হয়ে যাক এই প্রার্থনা বুকে নিয়ে মধ্য কলকাতার ভীরু কিশোরী সন্ধের শাঁখ। সে সময়ে চারপাশ ঘিরে বাবা-মা-ঠাকুমা-দাদা-দিদিরা থাকা সত্ত্বেও সন্ধের মুখটাতে পৃথিবীটাকে কেমন একটা নাম-না-জানা অপরিচিত রহস্যের জায়গা, দুঃখের জায়গা বলে মনে হত। সেই বিষাদের অনুষঙ্গও ধূপেব গন্ধের সঙ্গে সঙ্গে মনে আসে। এই সময়কার নির্জনাতাটুকু শ্রীলা খুব রোম্যান্টিকভাবে উপভোগ করে।

বেল বাজল। ছেলে গেছে দীঘা। সুরজিৎ আজ অফিস-ফেরত পাইকপাড়ায় যাবে। তার বৃদ্ধ জ্যাঠামশাই খুব অসুস্থ। আসতে দেরি হওয়ার কথা। তবে নিশ্চয় পাপুই। দরজার ফুটোয় চোখ লাগিয়ে কিন্তু সে পাপুকে দেখতে পেলো না। আধা-অন্ধকারে ল্যান্ডিংটাতে পুঁটলি হাতে করে যেন চুনী দাঁড়িয়ে আছে। দরজা খুলে দিয়ে শ্রীলা থমকে দাঁড়াল—চুনীই তো!

—'কি রে চুনী?'

চুনী হঠাৎ ল্যান্ডিংটার ওপরই বসে পড়ল। হাঁউ মাউ করে কেঁদে উঠে বলল—'মা আমায় তোমার কাছে আবার কাজ করতে দাও মা। তোমার কাছে আমায় ঠাঁই দাও মা!'

আলোটা জ্বেলে দিল শ্রীলা। পেছনে পাপু এসে দাঁড়িয়েছে। হালকা নীল চুড়িদারে তাকে বড় পরিচ্ছন্ন, উজ্জ্বল, শান্ত, সুস্থিত লাগছে। কিন্তু শ্রীলা তাকে দেখছে না। দেখছে চুনীকে। চুনীর সেই কালীঘাটের কালীর মতো চকচকে কালো কোথায় গেল? আপাদমস্তক খসখস করছে। এই ক'মাসে সে অমন হাড়-জিরজিরেই বা হল কী করে? পরনের শাড়ি ব্লাউজ দুটোই চিট ময়লা। চুলে জট, যেন হাওড়া-শেয়ালদার সারাদিন ধরে বেগুন-ঢেঁড়স-বেচা শহরতলির ফেরিওয়ালী। কিংবা সোজাসুজি ভিখারিণী। কোলে একটা পেট ফুলো, ন্যাংটাপুটো বাচ্চা ধরিয়ে দিলে মানাত।

শ্রীলা বলল—'কাজ করবি তো বেশ কথা। কাঁদছিস কেন? সনাতনের কী খবর?'

—'ও মিনসের নাম করো না মা', এ ক'মাসে চুনীর মুখের ভাষারও অনেক অবনতি ঘটেছে, 'ঠগ, জোচ্চোর, আমার জমানো টাকাগুলো তুইয়ে বুইয়ে নিয়ে নিয়েছে, শাউড়িতে আর ওতে মিলে মেরে মেরে আমায় উচ্ছন্ন করে দিয়েছে মাগো! এই দ্যাখো।' ছেঁড়া ব্লাউজের ভেতর থেকে কালশিটের দাগ দেখায় চুনী, বলে, 'তারপর পরশুদিন কোত্থেকে ছেলেপুলে সুদ্ধ একটা বউকে নিয়ে এসে বললে—'এই আমার আসল বউ। তুই দূর হয়ে যা'—চুনী আবার হাঁউমাউ করে উঠল।

শ্রীলা এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বলল—'কাঁদিসনি চুনী। ওরা ওইরকমই হয়। তুই তো আমাদেব কথা শুনিসনি। ঘরে আয়। কাপড় দিচ্ছি, সাবান দিচ্ছি, পরিষ্কার-পবিচ্ছন্ন হয়ে নে। সে আবার এসে গোলমাল করবে না তো?'

—'ইস, গোলমাল করলেই হল? নিজেই তো বলল "কালীঘাটের বিয়ে আবার বিয়ে!" এই বাড়িতে তোমার কাছে থাকতে পেলে আমি আর কোথাও কখনো যাবো না মা!'

শ্রীলার এত দুঃখেও হাসি পেলো। তার শাশুড়ি একবার বলেছিলেন, 'পেটের খিদে মিটে গেলে, গায়ে-গতরে একটু শাঁস-জল লাগলেই এদের অন্য খিদে চাগাড় দিয়ে উঠবেই। তখন মিষ্টি কথাই বলো আর টাকাই দাও। কিছু দিয়েই বশ মানাতে পারবে না।'

চুনী পুঁটলী খুলে বলল—'তোমাব দেওয়া সিল্কের শাড়িখানা খালি আনতে পেরেছি মা, গয়নাগুলো সুদ্ধ গা থেকে খুবলে খুবলে নিয়েছে।'

'ঠিক আছে। তুই এই কাপড়খানা পর।' শ্রীলা নিজের ঘরে গিয়ে আলনা থেকে তার ঘরে পরার একখানা শাড়ি আর ব্লাউজ তক্ষুনি এনে দিল।

—'যা বাথরুমে যা চুনী। এরকম নোংরা হয়ে থাকিসনি। দেখতে পারছি না।

চুনী বাথরুমে ঢুকে গেল. শ্রীলা হালকা মনে পাপুর ঘরে ঢুকল।

—'ভালোই হল, বুঝলি পাপু। এতদিন ধরে লোক খালি আসছে আর যাচ্ছে। একটাও ভালো...'

থমকে গেল শ্রীলা। পাপু বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে। নীল চুড়িদার পরনে। তার পিঠের দুটো তিনকোণা হাড় জামার মধ্যে দিয়ে উঠছে নামছে। ঝুঁটি বাঁধা চুল পিঠ থেকে কাঁধের ওপর জাপানি পাখার মতো ছড়িয়ে গেছে। ছবিটা কেমন পরিচিত লাগল শ্রীলার। সে ঝুঁকে পড়ে পাপুর পিঠে হাত রাখল। হঠাৎ কী হল?

সে নরম গলায় বলল—'পাপু! জয়ের জন্য মন কেমন করছে? আর ক'মাস পরেই তো দেখা হবে, কাঁদছিস কেন?'

পাপু তেমনি উপুড় হয়ে ভাঙা ভাঙা বোজাগলায় বলল—'মা... চুনীর কী কষ্ট...মা! কেন এমনি হবে?'

শ্রীলা ঝুঁকে ছিল। সোজা হয়ে গেল। খাটের মাথার দিকে শুভ্র দেওয়াল। সেখানে কি কোনও লিখন? অনন্ত-কারুণিক কোনও আশিস-দৃষ্টি? নিদাগ দেয়ালের সেই অলক্ষ্য চাহনির দিকে শ্রীলা তাকিয়ে রইল পরম আনন্দে, বিষাদে। কৃতজ্ঞতায়। পাপু কাঁদছে। নিজের জন্য নয়। চুনীর জন্য।

শিরিষ

আমার, তোমার, সবার দেশের মতনই সে এক দেশ ছিল। দেশে নগর ছিল, গ্রাম ছিল, গঞ্জ ছিল, বাজার-হাট-মেলা-মোচ্ছব সবই ছিল। কিন্তু কোনও কিছুরই যেন কোনও ছিরি ছিল না। কেউ গাইলে মনে হত সারাক্ষণই কেন অমন কাক ডাকে গো! কেউ নাচলে মনে হত যেন মামদো-গোভূতে নেত্য করছে। তাল ছটকে যায়, সুর হড়কে যায়, লয় পিছলে যায়। অন্নের স্বাদ খড়ির মতন। আনাজপাতি ভুসকো, জলের মাছ জলেই মরে, দেশ ভরা শুধু ধোঁয়া কালি আঁধার আর আওয়াজ।

কেউ জানে না সেই মামদো-গোভূতের গাঁক গাঁক আওয়াজের দেশে শিরিষ কোথা থেকে এলো। এ চত্বরের সবচে' বুড়ো মানুষ, যার নাম নবীনমাধব, সে নাম এখন কেউ জানে না, সবাই ডাকে সাণ্ডেলখুড়ো, সেই খুড়ো যে চোখে দেখে না, কানে শোনে না, কি শীত কি গ্রীষ্ম বাঁদুরে টুপি চড়িয়ে যে খালি কে যায়, কোথায় যায়, বলে সারাবেলা খামোখা হাঁকড়ে হাঁকড়ে ওঠে, সেই নবীনমাধবও না। কেউ যদি একবার জিজ্ঞেস করে— 'শিরিষ ঠাকরুণ কোত্থেকে এলো গো?' অমনি সে কানের পেছনে হাত দিয়ে সাত বার কোশ্চেন করে শোনে, তারপর ভুরু কুঁচকে সরু চেরা বাঁশের মতো গলায় বলে ওঠে— 'কি জানি বাপু, কেমন করে কখন ঘটে গেল ঘটনাটি।'

রাস্তার মোড়ে ঘেরা মাঠ, মাঠের ঈশান কোণে ঈশানী এক মহীরুহ বৃক্ষ। তার আগাপাশতলা খালি পাখির বাসা আর পাখির বাসা। সন্ধের ঝোঁকে গাছ ঘিরে কলকলানি ক্রমেই এমন জোরালো হয়ে ওঠে যে মনে হয় পাহাড়ি নদী বইছে, পাগলাঝোরা হয়ে এখুনি পাথর টপকে টপকে নামবে। এই গাছটিতে কখন পাতা ঝরে, কখন পাতা গজায়, কখন কোন পাখি বাসা বাঁধে, ডিম পাড়ে, বাচ্চা ফোটায়, আবার উড়ে যায়, কেউ কি কখনও নজর করে দেখেছে? কেউ দেখেনি। অথচ বৃক্ষ ক্রমেই আরও বলবান, আরও বীর্যবান, আরও আশ্রয়শীল, আরও ছায়াময় হয়ে উঠছে। কেউ জানে না তার ইতিহাসও।

মাঠের কোণের গোলাপি বাড়িটা কবে শিরিষের পিতৃপুরুষ কিনেছিলেন, কবে শিরিষ অন্য কোথাও জন্মালো, কবে, কেমন করে বড় হল, কেন এখানে সোমত্ত বিধবা (?) চলে এলো, কবে তার বিষাদ যোগ, সাংখ্যযোগ শেষ হয়ে কর্মযোগ শুরু হল, অতশত ইতিবৃত্ত কে-ই বা মনে রেখেছে। নবীনমাধব বলে—'আমায় শুধিও না বাপু, বলে নিজের জ্বালাতেই মলাম!' বুড়ো যেন সংসারের ভারি ভুরি বড় গিন্নির মতো পেটের মধ্যে অনেক কথা রাখে ঢাকে।

শিরিষের ঘরসংসারের বাইরের দিকে একটি দারোয়ান, একটি কোচোয়ান। একটি মালি, আর ভেতরদিকে একটি দাস, একটি দাসী, এবং একটি একমাত্তর কন্যে। এরাই বাড়ির বারমহলে, অন্দরমহলে হাত পা ছড়িয়ে বসবাস করে। অতবড় বিঘের ওপর বাড়ি বাগান! তার দেখ্-দেখালি, গোছ-গোছালি সব এরাই রয়ে বসে করে। ছোট্ট টুকটুকে মেয়েটি

সাবেক কালের টমটম গাড়ির বাইরে বড় একটা পা দেয় না, টকাটক আসে, টকাটক যায়, এক ঝলকে লোকে শুধু দেখতে পায় ঠাকরুণের কন্যেটি যেন ভবা গ্রীষ্মের চম্পক, কিংবা গন্ধরাজ, সূর্যের সবটুকু সৌরভ শুষে নিয়ে তৈরি হয়েছে। অন্দরের বাগানে সে আপনমনে খেলে বেড়ায়, নেচে বেড়ায়, গেয়ে বেড়ায়, সব একা-একা। নয়তো তার মায়ের সঙ্গে। কিন্তু তার মা শিরিষ ক্রমেই অন্দরমহল থেকে বারমহল, বারমহল থেকে দেউড়ি, বারান্দা থেকে বাগান, বাগান থেকে বড় রাস্তা, দোকান, বাজার, ব্যাঙ্ক, ইস্কুল, কলেজ, কেলাব, খেলাধূলা, যোগব্যায়াম, সাঁতার....।

জিনিসটার শুরু হয় এইভাবে। পাড়ার বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা চাঁদা চাইতে এসেছিল। সরস্বতীপূজা করবে। দারোযান রামখেলাওন তাদের হাঁকিয়ে দেয়। তার বক্তব্য যুক্তিসঙ্গত। পাড়া বেপাড়া যেখানে যোতো সোরোসতী মাঈ আসছে সোবাই কি তার মাকে পুছে পুছে আসছে! পুছে পুছে যদি না আসলো তো ভাগ্ ভাগ্ হিঁয়াসে। বাচ্চা তো নয়, চুহা এক-একটা। বিল্লি ভি আছে। লেকিন মিলে মিশে আছে, তাইতে কেস বহোৎ খতরনাক হয়ে যাচ্ছে। এই রকম রামখেলাওনি বিশ্লেষণের মাঝমধ্যিখানে একটি চুহাসম বাচ্চা ভেতর বাড়ির দিকে দৌড়ে গিয়ে 'মাসিমা, মাসিমা, আসতে দিচ্ছে না' বলে সরু গলায় চেঁচাতে থাকে। শিরিষ তখন সেই মুহূর্তটা নিরানন্দের কেন্দ্রবিন্দুতে মধুতে আটকানো মক্ষীর মতো নিশ্চল ছিল। বাচ্চার মিঠে গলার তীক্ষ্ণ ডাক একেবারে তার বুকের মধ্যে গিয়ে পৌঁছালো, তার মনে হল সে নিজেই বুঝি কাকে কিছুতেই আসতে দিচ্ছে না। সেই কেউ তার দোরের বাইরে ধর্না দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার মিষ্টি সরু গলা অনেক আকিঞ্চনে তার কাছে প্রার্থী। সে তার দোতলার পুরনো মার্বেলের ঘর থেকে এক ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। হঠাৎই যেন তার মরা নদীর সোঁতায় জোয়ার এসেছে। উঠোনের এক দিকে লম্বা চওড়া ইয়া গোঁপ, ইয়া গুল রামখেলাওন, অন্যদিকে অস্বাভাবিক সাদা, ক্ষীণা এক উদাসিনী নারী। মাঝখানে পড়ে বাচ্চাটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চেঁচাতে ভুলে গেছে।

শিরিষ বলল—'চাঁদা নিয়ে কি করবি খোকন?'

বাচ্চাটি ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেলে বলল—'খাবো।'

—'কী খাবি?' শিরিষের মুখে সামান্য হাসি।

—'লুচি আলুর দম'— বাচ্চাটি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল।

আরও ছেলে-মেয়ের দল তখন অন্দরমহলে ঢুকে পড়েছে। আস্তে আস্তে প্রকাশ পেলো পাড়ার বড়রা সরস্বতীপুজো করে ঠিকই, কিন্তু সকালের খিচুড়ি-লাবড়া-ভোগ পর্যন্ত বাচ্চাদের অধিকার। সন্ধ্যেবেলায় যে লুচি, আলুর দম, ফুলকপির তরকারি, পায়েস দিয়ে রাজসিক ভোগ হয় সে ভোগের কণামাত্র বাচ্চাদের কাছে পৌঁছায় না। তাই তারা এ বছর প্রতিজ্ঞা করেছে টুলুর বাড়ি কাঠের সরস্বতী আছে, তাই দিয়ে মিন্টুর বাড়ির বাইরের ঘরে পুজো করবে, গণেশের বাবা অবসর সময়ে পুজো-আচ্চা করে থাকেন, তিনিই পুজো সেরে দেবেন এবং চাঁদা তুলে সবাই লুচি আলুর দম খাবে, খাবেই।

—'কতজন আছিস তোরা?' শিরিষ নরম গলায় জিজ্ঞেস করল।

—'সতেরজন।'

—'আমার বাড়ি সরস্বতী পুজো হয়, সন্ধেবেলা তোদের নেমন্তন্ন। প্রসাদ খাবি।'

রামখেলাওনের মুখ ক্রমশই হাঁ হয়ে যাচ্ছিল।.

সরস্বতী পুজো? পুজো-উজো এ কোঠিতে সে কোন দিন দেখেনি।

কিন্তু ছেলের দল এলো। প্রথমে সসঙ্কোচে, একটি দুটি করে। তারপর বেশ সপ্রতিভভাবে দলে দলে। বড় হলঘরে আসন পেতে সব্বাইকে খাওয়ালো শিরিষ। বালভোজন। সাদা সাদা লুচি, লালচে-হলুদ ফুলকপি, সাদা সবুজ আলু-মটরশুঁটি, টুকটুকে লাল চাটনি, হালকা বাদামি পায়েস। কমলাভোগ, যে যটা পারে।

বা রে বা! সরস্বতী ঠাকুব কোথায়? পুজো হবে না? কাঁসর ঘণ্টা বাজবে না? ছেলের দল হই-হই করছে! তখন ঘরে ঢুকল সত্যিকাবেব বাল-সবস্বতী শিরিষের মেয়ে প্রসর্পিতা। সাদা সিল্কের শাড়িতে নীল পদ্ম-পাড়। হাতে তানপুরা। সে সবাইকে নিয়ে গাইবে, নাচবে। সরস্বতীর গান, লক্ষ্মীর গান, দুর্গার গান, আসলে যে যেখানে সব যশো দেহি, দ্বিষো জহি আছে সব্বাইকার গান।

এইভাবে দিন যায়। একদিকে প্রসর্পিতা গান গায়, অন্যদিকে বাগানের ফুলগুলি সব আহ্লাদ নিয়ে ফুটে ওঠে, গাছ আলো করে। প্রসর্পিতা হাসে। পাখিগুলির মধ্যে কূজনের প্রতিযোগিতা পড়ে যায়, প্রসর্পিতা নাচে তার সঙ্গে সঙ্গত করে বৈশাখ-আশ্বিনের ঝড়, আষাঢ়-ফাগুনের বিষ্টি, সহনর্তকীর ভূমিকায় নেমে পড়ে ফুলো ফুলো ব্যালের পোশাক-পরা সাদা মেঘের দল। শিবিষ প্রথমে ছোট ছেলেদের, তারপর মেয়েদের, তারপর বড় ছেলেদের, তারপর গিন্নিদের মজলিশে যায়। মজলিশের চেহারা পাল্টে যেতে থাকে। কবে যে পাল্টে গেল, কেউ বুঝতেই পারে না। খুব আশ্চর্যের বিষয়, কিন্তু একদম নির্জলা সত্যি কথা যে শিরিষদের পাড়ায় কোনও বাড়িতে দেওয়াল-লিখন নেই। মিছিল যায় না। যে যার সময়মতো কাজে কম্মে যায়, বাড়ি ফিবে আসে। ছেলেমেয়ের দল প্রাণভরে খেলাধূলো করে আঁধার নামলে যে যার মতো বাড়ি যায়। আজান, গ্রন্থসাহেব আর গীতার আয়োজন যারা লাউডস্পীকারে করেছিল তারা আজকাল বড্ড ব্যস্ত। ওই যে মৌলভিসাহেব দাঁড়ি আঁচড়িয়ে, চোখে সুর্মা, কাকে কাকে যেন আজকাল আরবি পড়াচ্ছেন। বলবন্ত সিং-এর দলের এমন রমরমা সূর্য-উনুনের ব্যবসা যে তারা আর কিচ্ছুটির সময় কবতে পারে না। গীতা-ভাস্কর নীলমণি পণ্ডিত বাড়িতে টোল খুলেছেন। বহু জায়গা থেকে কথ্য সংস্কৃত শিখতে তাঁর কাছে লোক আসছে। সেই যে একবার নীলু পণ্ডিত সপ্তমী পূজোব শেষাশেষি বৃষ্টি আসতে দেখে বলে ফেলেছিলেন ঃ

বৃষ্টি পততি পট পট পট
মনঃ করোতি ছট ফট ফট
ছত্রং ধরয় চট পট পট
তাত মণ্টু ডোণ্ট সে নট।

সেই থেকে ছেলেদের বায়না হল নীলু পণ্ডিতকে এই সহজ সংস্কৃত শেখাতেই হবে। শিরিষের বাড়ির ঠাকুরদালানে তার ব্যবস্থা হল। শিরিষ এখন ছড়িয়ে গেছে সবখানে, সবখানে, সবখানে। সে আব সাদা একখানা খড়ির পুতুলের মতো নেই। কড়ির মতন সাদা কবেকার শঙ্খিনীমালার মুখ তার নেই। শঙ্খমালা এখন কাঞ্চনমালা হয়ে গেছে। ঘরে ঘরে লক্ষ্মীর পায়ের আলপনা-ছাপ ফেলে শিরিষ এ কাজে সে কাজে নানা কাজে ঘুরে বেড়ায়। অঞ্চলটি আনন্দে গৌরবে সাফল্যে থই থই করে। তার ছটপরবের ঢোল কাঁসি, তার রঙ্গোলিবিহুর নাচ, তার বৈশাখীর আমোদ, তার লক্ষ্মীর পাঁচালি আর ভাদুর গানের মৃদু মধুর সুর গ্রাম-গঞ্জের আবহাওয়াতে গাবগুবাগুবের মতো বাজতেই থাকে, বাজতেই থাকে।

এইসব করতে করতে শিরিষের হৃদয়ের কেন্দ্রবিন্দুতে মধুর মতো গাঢ়, সেই বিষাদসিন্ধুর পরিধি ক্রমেই ছোট হতে থাকে। এক-এক দিন নিশিরাতে ঘুম ভাঙলে শিরিষ ছাতে উঠে যায়। নারকোল গাছের পেছনে একটি বাঁকা চাঁদ ঝুলে থাকে, কালচে আকাশে ফুটফুট করছে তারা। সেদিকে তার সাদা মুখের দ্যুতি তুলে ধরে শিরিষ কোন গোপন গহন অতীতের উদ্দেশ্যে বলে ওঠে—'তুমি কোথায় আছো হে বঞ্চক, যেখানে যে স্বর্গের ময়ূরসিংহাসনেই থাকো তুমি আর আমার মনের নাগাল পাবে না। তুমি থাকো কঠিন মণিমাণিক্যময় প্রতারক স্বর্গে, আমি এই কঠিন পৃথিবী সবুজে ভরিয়ে ফেলব। সবুজ আরও সবুজ। সবুজের অগ্রভাগে স্বর্ণাভা লাগবে, সুবাস দুলবে বাতাসে, আমি যেখানে যেখানে যাবো, সেইখানে সেইখানে তোমার সোনা মরকতকে লজ্জা দিয়ে পৃথিবীর আপন হৃদয়ের সোনিমা শ্যামলিমা আমার পেছনে পেছনে যাবেই যাবে। বলে শিরিষ হাসতে থাকে। সে কোনও সশব্দ টংকারঅলা চ্যালেঞ্জের হাসি নয়। দিকদিগন্ত শান্তি ও সুষমায় ভরিয়ে তোলা সে এক অদ্ভুত অরোরা বোরিয়ালিস।

শিরিষ যখন তার মধ্যরাত্রির উদগীথ সেরে এইভাবে নেমে আসে তখন শোবার ঘরে তার হৃদয়ের কাছে চন্দ্রকান্তমণির মেয়েটি ঘুমের ঘোরে হেসে ওঠে। তার কোমল কপালে আলতো পরশ রাখে শিরিষ!

—'তুমি কী স্বপন দেখছো জাদু? তুমি কি আমার মতো ভুবনময় পঙ্কসরোবরে কমল ফোটাবার কাজটি নেবে? তোমাকে আমি শিখিয়ে দিয়ে যাবো ফুল ফোটাবার মন্ত্র। পাখি-হরিণ-কীটপতঙ্গ বশীভূত করাব অখণ্ড বাঁশিটি আমি অনেক সাধনায় খুঁজে পেয়েছি, তোমার হাতে তুলে দিয়ে যাবো।

পাশ ফেরে প্রসর্পিতা। তারপরেই তার চোখের পাতার ভেতরে মণিদুটি কাঁপতে থাকে, মেয়ে ঘুমের ঘোরে ফুঁপিয়ে ওঠে। শিরিষ সন্তর্পণে মেয়ের অফোটা পদ্মের মতো বুকের ওপর থেকে হাত দুটি সরিয়ে রাখে। বুকের ওপর হাত রেখে শুলে পাথর-দত্যি পিষে মারে। —'মা আমার ঘুমাও, শিয়রে জাগিয়ে রাখলাম ঘিয়ের বাতি, আমার নিঝুম দুটি চোখ, শীতল দুটি হাত রইল তোমার শিথানে। সুখে নিদ্রা যাও মা।'

মেয়ে শিরিষের সুখ, মেয়ে শিরিষের শান্তি, মেয়ে তার আনন্দ আহ্লাদ, বিস্ময়, রোমাঞ্চ, মেয়ের ভেতর দিয়েই শিরিষ তার ভুবনখানি দেখে। প্রসর্পিতা যদি বলে—'মা আমি কেন এমন একা?' শিরিষ বলে—'আমার ঊর্ধ্ব এবং অধঃ, আকাশ এবং ভূমি, একবার মাত্র

একবারই যে ঐকতানে বেজেছিল মা, এমন ঘটনা তো আর দ্বিতীয়বার ঘটে না!' প্রসর্পিতা যদি বলে, 'মা, আমার পিতা কে?' শিরিষ বলে—'তোমার পিতা পুরুষ, বীজ রোপণ ভিন্ন যার আর অন্য ভূমিকা নেই।' প্রসর্পিতা তখন বলে—'মাগো তুমিই কি আমার সব?' মেয়েকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে শিরিষ বলে ওঠে—'আমি তোমার সব কি না জানি না মাগো, কিন্তু তুমি আমার সর্বস্ব।' সত্যি-সত্যি, মেয়ে হাসছে বলেই তার কোলের কাছে ভিড় করে আসা যাবতীয় শিশু বালক বালিকার হাসি শিরিষের বুকে দোলা দেয়। মেয়ে গায় বলেই, সে তার বাগান, বাগান পেরিয়ে পর-প্রতিবেশীর বাড়ির চুড়োয় দোয়েলের শিস শুনতে পায়, ফিঙের দোল দেখতে পায়, বেনে-বউ গটগটিয়ে হেঁটে গেলে ঝিলিক ঝিলিক হাসে। আর গভীর রাতে পাপিহা তীব্র করুণ স্বরে পিউ কঁহা পিউ কঁহা বলে ডেকে উঠলে কিশোরী মেয়েকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে মধ্যযৌবনের দ্রুতচ্ছন্দ চঞ্চল হিন্দোলটি সে প্রাণপণে কল্যাণ ঠাটে এনে বাজাতে থাকে।

ওরা কেউ জানে না এই মৌজা, এই গ্রাম, এই গঞ্জ, এই উপনগর, মহানগর সব স-ব আসলে শিরিষরাই গড়েছে। কারণ গড়ে অনেকে মিলে, কিন্তু মন্ত্রটি কানে দেয় একজন-দুজন। থাকতে পারে রাজ্য, প্রয়োজনের খেয়ালে গড়ে ওঠা, কিন্তু তার বিচিত্র বেসুরে যে সঙ্গতি আনে সেই প্রকৃত রাজ্যপাল। ওরা এ-ও জানে না বন্ধ্যা নিষ্ফলা কপিশ ভূমির এই যে তীব্র সবুজ স্বপন এর পেছনে আছে একটি মানুষের বিষাদের পারে পৌঁছানো গভীর মন্দ্রিত আনন্দ। ওরা এও জানে না এই আনন্দের পেছনে আছে রক্তমাংস নাক চোখ মুখের প্রাণভরা, তৃষাহরা, নয়নের মণি, বুকের কলজে এক কন্যে। শিরিষ নিজেও জানে কি? সে যে এক দিক থেকে আরেক দিক পর্যন্ত একটা সাদা ফুরফুরে প্রজাপতির মতো উড়ে উড়ে বেড়ায়, তার পাখায় এমন বেগ, শরীরে এমন লঘিমা কে দিল, কেমন করে দিল, অতশত বিশ্লেষণে কি তার মন যায়? সে শুধু জানে অনেক মিথ্যের ঝকমকানি তাকে এক সময়ে অন্ধকারের গহনে নিয়ে গিয়েছিল, সেই অন্ধকার সে একা একা পার হয়েছে, এখন তার চোখে মুক্তার লাবণ্যচ্ছটা। তাই সে প্রজাপতি, তার উড়ন্ত পায়ের আঙুলগুলি পরাগের রেণুতে রেণুতে রঞ্জিত হয়ে থাকে, আর সেই রঞ্জন আদিগন্ত ছড়িয়ে গিয়ে অফলা আমগাছটির শীর্ষ শাখাটি পর্যন্ত বউলে বউলে ঝমঝম করতে থাকে। আর, সবাই অতশত জানে না বলেই মানুষের ঠোঁটে ঠোঁটে নামগুলি হাটে হাটে বাটে বাটে ফেরে, যেন তারা প্রশ্বাস নিচ্ছে। নিশ্বাস ফেলছে।

সেদিন বসন্তকালের সন্ধেবেলা। মধুমাধবী সারঙের শেষ মূর্ছনার মতো গোধূলিবেলা মিলিয়ে গেল। আকাশ থেকে সাঁঝের কুয়াশা গাছগাছালির অলিতে গলিতে ঝুপঝাপ করে নেমে পড়ছে। শিরিষের বাড়িতে জগদ্দল কটা দু-ঠেঙে গাড়ি এসে নামল। কী তাদের চক্কর! কী-ই বা তাদের গর্জন! গাড়িব থেকে নেমে এলো এক, দো, তিন, চার, পাঁচ, ছে, রামখেলাওন গুনেছিল, মুশকো মুশকো লোক। শান্তিমণি দেখেছিল তাদের হাতে ইস্টিলের বালা, কানে রুপোর মাকড়ি, গলায় সোনার চেন, জামার খোলা বুকের ভেতর দিয়ে দলা দলা রোম দেখলে গা শিউরোয়। রামখেলাওন কবে ছেলেমানুষ আর ভিখারি তাড়াবার দারোয়ানগিরি করত, তাও সে কবেই ভুলে মেরে দিয়েছে। খইনি ডলতে ডলতে তার

হাতের তালু ঝুলে পড়ল। ঘড় ঘড় করে গেট খুলে ছ জোড়া বুট সোজা অন্দরবাড়ির দিকে চলে গেল। গট গট গট গট গট...।

—শীর্ষা দেবী আছেন? শীর্ষা দেবী?

—আপনারা কে? এখানে শীর্ষা দেবী বলে কেউ থাকেন না।

—তাহলে শিশির দেবী, শিশিরকণা, শিশিরবালা, কিংবা শিশির মালা.

শিরিষ চুপ করে রইল।

—চট্টরাজদাকে চেনেন? মোহিতবরণ চট্টরাজ?

কে না চেনে? শিরিষ চুপ করে রইল।

— মোহিদ্দা আপনাকে জানিয়েছেন এবার থেকে আপনি আমাদের নেত্রী। অভয়বিন্দু দাঁকে নেক্সট্ নির্বাচনে কাত করতে হবে।

শিরিষ গম্ভীর গলায় বলল—আমি এসব বুঝি না।

—বুঝে নেবেন। মোহিদ্দা বুঝিয়ে দেবেন।

—আমি এসব দলাদলি করি না।

— মোহিদ্দা করবেন, আপনি শুধু দাঁড়াবেন।

—আমি এসব ঘেন্না করি।

—আপনি ঘেন্না করলে কি হয়, মোহিদ্দা এসব ভালোবাসেন। অট্টহাস্য করে উঠল পাতালবাসী যুবকের দল।

—'নির্বাচন আমাদের রুজি, নির্বাচন আমাদের পুঁজি, নির্বাচনকে যে গাল দেয় আমরা তার কপালে স্টেনগান গুঁজি....।

দু পেয়ে জগদ্দলগুলো রাস্তা কাঁপিয়ে চলে গেল। নবীনমাধব তক সমস্ত মানুষ ক্রমে ক্রমে এসে ভেঙে পড়ল শিরিষের ভেতরবাড়ির আগুনে। কাঁচা-পাকা নানান গলায় শোনা গেল—'শিরিষমা, শিরিষদিদি, শিরিষ বোন। না করো না মা, না করো না! মোহিতবরণ আর অভয়বিন্দু ও দুজনেই কাঁচাখেকো দেবতা। এ ছাড়লে ও ধরবে, ও ছাড়লে এ ধরবে। আর নিস্তার নেই।' যারা আরও অভিজ্ঞ, আরও বয়স্ক তারা ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়লে—'কথাটা যত সহজ সোজা শোনাচ্ছে ততটা কখনো নয়, উঁহু, এর ভেতরে কিছু গুহ্য কথা আছে, কিছু ভয়ঙ্কর কথা।'

সবাই চলে গেলে তখনও সিঁড়ির শেষ ধাপে বসে রয়েছে শিরিষ। চোয়াল দুটি কঠিন, কপালের মধ্যিখানে নীলশিরা দপদপ করছে। চুল যেন রুক্ষ ধূসরবর্ণ।

ঝড়ের আগের সময়ের মতো থমথমে দিন যায়। এক দুই তিন করে সাত দিন। শিরিষ আস্তে আস্তে আবার কাজকর্ম করছে। রামখেলাওন গেট খুলছে গেট বন্ধ করছে। সাত দিনের দিন বাড়ি ফিরে শিরিষ দেখল, রামখেলাওন কপাল চাপড়াচ্ছে। শান্তিমণি কেঁদে কেঁদে অজ্ঞান হয়ে গেছে। মোহিতবরণের বিশাল ল্যান্ডরোভার এসে প্রসর্পিতাকে গেটের সামনে থেকে তুলে নিয়ে গেছে। শিরিষ ছুটল চট্টরাজের বাড়ি। গেটের পরে গেট, তারপরে গেট, তারপরে আরও গেট,- সব তালাবন্ধ। লোকে বলল চট্টরাজদা হনিমুনে গেছেন। কোথায় কেউ জানে না। শিরিষ ছুটল থানায়, ভারপ্রাপ্ত অফিসার দেখালেন আঠার

বছরের মেয়ে স্বেচ্ছায় মোহিতবরণের সঙ্গে চলে গেছে, তলায় স্বাক্ষর। শিরিষ সরোষে বলল 'এ সই জাল।' অফিসার বললেন—'স্ত্রীলোক বড় গোলমাল করে, সামনে থেকে নিয়ে যাও।' শিরিষ ছুটল অঞ্চলপ্রধানের বাড়ি, তিনি বললেন—'এ তো তোমার সৌভাগ্য মা। মেয়ে রাজরাণী হয়ে গেল।' শিরিষ গেল রাজ্যপ্রধানের বাড়ি। অনেক দিনের অনেক ধরনার পর তিনি যখন দেখা দিলেন, বললেন—'এতো বড় রাজ্য, তাতে এতো প্রদেশ, এতো মহকুমা, এতো জেলা, এতো তার কর্মযজ্ঞ, কোন পাড়াতে কোন মায়ের কোন মেয়ে উচ্ছন্নে গেল সে-ও কি তবে আমায় ব্যক্তিগতভাবে দেখতে হবে?'

মাঠের কোণের গোলাপি বাড়িটির পলেস্তারা খসে গেছে। ভাঙা গেটের ধারে টুলে বসে রামখেলাওন আর 'রাম ভজো' গান ধরে না। বাগানটি বিছুটিতে আক্রান্ত। কেউ জানে না শিরিষ কোথায়। মাঠে ছোট ছেলেমেয়েরা আর বল খেলে না, বড়রা খেলে। সন্ধে হলেই ফিসফাস, হি হি হি, হো হো হো, হিং টিং ছট। সকাল হলে রজনীগন্ধাব বাসি মালা, আর খালি বোতল, চাটের ঠোঙা আর কাগজের পেলেট, আরও হাজারো অকথ্য নোংরা ঝাঁটাতে ঝাঁটাতে মালি খুশি মনে পকেটের পয়সা বাজায়। যখন--তখনই হাতে সাইকেলের চেন নিয়ে দু ঠেঙে গাড়িতে টহল দিয়ে বেড়ায় রাক্ষুসে যুবকের দল, যাকে হাতের কাছে পায় মেরে উচ্ছন্ন করে দেয়, রাতেব আঁধারে ফ্যামিলিকে ফ্যামিলি কাদেব চপারে শেষ হয়ে যায়, কেউ জানে না, খালি রক্তগঙ্গায় চুবে হু-হু করে কাঁপতে থাকে। হাটে বাজারে দোকানে রাস্তার মোড়ে বোমা ফাটে, টুকবো টুকরো হয়ে যায় বেসাতি, দোকানঘর, কেনা-বেচা-করতে আসা মানুষজনের দল। নবীনমাধবের আজকাল পক্ষাঘাত। মেয়ে বউগুলি চোখ গোল গোল করে কেচ্ছা শোনে, কার বাড়ির ছেলে.... কোন বাড়ির মেয়ে!

সে বছর বিষ্টি হল না। মাটি জ্বলে গেল, ধানগুলি সব খড়। দিগন্ত পর্যন্ত খাঁ খাঁ খোয়াইয়ের মতো লালচে মাটির দিকে তাকিয়ে রমজান মিএগ আর সুরিন্দর সিং, দুলাল হাজরা আর গোবিন্দ মাঝি হাহাকাব করে কপাল চাপড়ালো। কুয়োর জল শুকিয়ে গেছে। শ্যালোয় শুধু চাগাড় মারাই সার। খালতলায় একটুখানি কাদাঘোলা। মাঠের ঈশান কোণের গাছটি এতদিন দাঁড়িয়েছিল, কেউ দেখেনি ঘুণকোণায় তার ভেতর ফোঁপবা হয়ে গেছে। সেই ফোঁপরা গাছটি হঠাৎ একদিন দড়াম করে মাটিতে পড়ে গেল। আর তাবপব আরম্ভ হল বিষ্টি, বিষ্টি, বিষ্টি। এক দিন দু দিন তিন দিন, তারপর দিনের পর দিন। গোঁ গোঁ শব্দ শুনে মাঝঘুমের মধ্যে একদিন চকিত হয়ে উঠে বসল মানুষগুলি, অন্ধকারে ভালো ঠাহর হয় না, তবু বোঝা যায় লক্ষ ফণা তুলে ছুটে আসছে হড়পা বান। গরু, বলদ, রাখাল, বাগাল ভাসিয়ে, মাটি খড়ের ঘর দুয়োর ফাঁসিয়ে, পাকা বাড়ির ভিত নাড়িয়ে অবশেষে ডাঙায় জলে একাকার করে সেই সর্বনেশে বন্যা সব ডুবিয়ে দিয়ে চলে গেল। থই থই করে দুলতে লাগল জল শুধু জল আর জল। এ মেরু থেকে ও মেরু পর্যন্ত। কৈলাস থেকে আরারত। সেই প্রলয়পয়োধিজলে একটি নুহর নৌকাও রইল না।

আসন

সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে গেল। দর-দাম, দলিল-দস্তাবেজ, ইনকাম-ট্যাক্স ক্লিয়ারেন্স, সব। সব হয়ে যাবার পর গলদঘর্ম বাড়ি ফিরে একটু জল গরম করে নিয়ে ঠাকুর্দার আমলের বাথটাবটাতে শুয়ে শুয়ে বিকেল সাড়ে তিনটেয় একটা লম্বা অবগাহন স্নান। আ-হ্। যেন অনেক দিনের পুরনো পাপের বোঝা নেমে গেল ঘাড় থেকে। শুধু স্নান নয় শুচিস্নান। সত্যিই, পিছটান বলে তো কিছু নেই। শুধু আপনি আর কপনি। তা আপনির ইচ্ছেমতো কপনি চলবে? না কপনির ইচ্ছেমতো আপনি! এ ক' দিনের মধ্যে এই নিয়ে বোধহয় সাতবারের বার গুরুদেবের ছবির দিকে তাকিয়ে দু হাত কপালে ঠেকালো সুনন্দা। স্থাবর সম্পত্তি বড় জ্বালা! বড় গুরুভার। হালকা হয়ে যে আকাশে পাখা মেলতে চায় ইট-কাঠ তার ঘাড়ের ওপব অনড় হয়ে বসে থাকলে সে বাঁচে কেমন করে? সবই গুরুদেবের কৃপা! বাড়িটা শেষ পর্যন্ত কিনতে রাজিই হয়ে গেল শরদ দেশাই। তিন শরিকের এক শরিকি অংশ। বাবা নিজের অংশটুকু ঢেলে সাজিয়ে নিয়েছিলেন তাই বাসযোগ্য ছিল এতদিন। সামনের উঠোন চৌরস করে ভেঙে খোলামেলা নিশ্বাস ফেলবার জায়গা খানিকটা। একটা আম গাছ, একটা নিম, সেগুলো ফেলেননি। নিম-আমের হাওয়া ভালো। তা ছাড়াও আমের কোঁকড়া পাতায় ফাগুন মাসে কেমন কচি তামার রঙ ধরে! বাকি জায়গাটুকু নানারকমের বাহারি গাছপাতা দিয়ে সাজানো। ফুল গাছ নয়, পাতাবাহার। বাবার শখের গাছ সব। না-বাগান না-উঠোন এই খোলা জায়গাটুকু পার হতে হতে দোতলার লাল টালি ছাওয়া বারান্দাখানা চোখে পড়বে। তার ওপর ছড়ানো বোগেনভিলিয়ার ফাগ আর মুক্তো রঙের ফুলঝুরি। মার্চ-এপ্রিল থেকে ফুল ফোটা শুরু হবে, চলবে সেই মে অবধি।

বারান্দাটা যেন বেশ বড়সড় একখানা মায়ের কোল। তেমনি চওড়া, নিশ্চিন্ত-নির্ভয়। সুনন্দার নিজের মায়ের কোলটিও বেশ বড়সড় ছাড়ালো দোলনার মতোই ছিল বটে। মনে থাকার বয়স পর্যন্ত সেই শীতল, গভীর কোলটিতে বসে কত দোল খেয়েছে সুনন্দা। তারপর মায়ের বোধহয় বড্ড ভারি ঠেকল। হাত-পা ঝেড়ে চলে গেলেন, ফিরেও তাকালেন না। টাকার সাইজের এক ধামি সাদা ময়দার গোল পিংপঙ বলের মতো লুচি সাদা আলুভাজা দিয়ে না হলে যে সুনন্দা রেওয়াজে বসতে পারে না এবং সে জিনিস যে আর কারো হাত দিয়েই বেরোবার নয় সে কথা মায়ের মনে থাকল না।

অনেকদিন আগলে ছিলেন বাবা। মায়ের কোল থেকে বাপের কাঁখ, সে তো কম পরিবর্তন নয়! ঈশ্বর জানেন বাবাকে মা হতে হলে স্বভাবের নিগূঢ় বাৎসল্য রসের চালটি পর্যন্ত পালটে ফেলতে হয়। তিনি কি তা পারেন? কেউ কি পুরোপুরি পারে? মায়ের জায়গাটা একটা বায়ুশূন্য গহ্বরের মতো খালি না থাকলে বুঝবে কেন সে কে ছিল। কেমন ছিল? বোঝা যে দরকার। মা হতে পারেননি, কিন্তু চেষ্টা করেছিলেন, তাই বাবা আরও ভালো বাবা, আরও পরিপূর্ণ বাবা হতে পেরে গিয়েছিলেন। পাঁচজন যেমন বউ মরলেই হুলু দিয়ে থাকে তেমন দিয়েছিল বই কি! তিনি চেয়েছিলেন মাথায় আধ-ঘোমটা গোলগাল ছবিটির দিকে। চোখ দুটি ভারি উদাস, কিন্তু ঠোঁটের হাসিতে ফেলে-যাওয়া সংসারের প্রতি মায়া ষোল আনার জায়গায় আঠার আনা। তারপর ফিরে তাকিয়েছিলেন ঘুমন্ত ফুলো-ফুলো মুখ, ফুলো-ঠোঁট আর বোজা চোখ দুটির দিকে। ঘুমের মধ্যে চোখের মণিদুটো পাতার তলায় কাঁপছে। আহা! বড় বনস্পতির বীজ। কিন্তু কত অসহায়! মাতৃকুলে যন্ত্রসঙ্গীত পিতৃকুলে কণ্ঠসঙ্গীত। সরু সরু আঙুলে এখনই কড়া পড়ে গেছে। ওইটুকুন-টুকুন আঙুল

তার টেনে টেনে এমন নাজনখরা বার করে যে মনে হবে রোশেনারা বেগম স্বয়ং বুঝি হোরি গুনগুন করছেন।

—'মানুষের আপন পেটের বাপ-মা কি দুটো হয়?' ভ্যাবলা মেরে-যাওয়া কন্যাদায়গ্রস্ত কিংবা হিতৈষীদের তাঁর এই একই উত্তর। নাও এখন মানে করো।

বালিকা থেকে কিশোরী, কিশোরী থেকে তরুণী, তরুণী থেকে যুবতী বাবা ঠায় কাঁধে মাথাটি নিয়ে। আয় ঘুম যায় ঘুম বর্গীপাড়া দিয়ে। একটি দিনের জন্যও ঢিলে দেননি। 'সুনি নতুন শীত পড়েছে, বালাপোষখানা বার কর', 'সুনি, আদা তেজপাতা গোলমরিচ দিয়ে ঘি গরম করে খা, গলাটা বড্ডই ধরেছে', 'টানা তিন ঘণ্টা রেওয়াজ হল সুনি, আজ যেন আর খুন্তি ধরিসনি, তোর বাহন যা রেঁধেছে তাই ভালো।'

মাতৃহীন, অবুঝ, অভিমানী, তার ওপর অমন গুণী পিতৃদেব কিছুতেই আর বিয়ের জোগাড় করে উঠতে পারেন না। পাত্র ঠিক বলে তো পাত্রের বাড়ি যেন উল্টো গায়। বাড়ি-ঘর ঠিক আছে তো পাত্র নিজেই যেন কেমন কেমন! অমন ধ্রুপদী বাপের সেতারী মেয়ের পাশে দাঁড়াবাব যুগ্যি নয়। গুণীর পাশে দাঁড়াতে হলে গুণী যে হতেই হবে তার কোনও মানে নেই। কিন্তু সমঝদাবিটাও না জানলে কি হয়? বাবার যদি বা পছন্দ হয়, মেয়ে তা-না-না-না করতে থাকে।

—'অমনি রাঙা মুলোর মতো চেহারা তোমার পছন্দ হল বাবা? সব শুদ্দু ক'মণি হবে আন্দাজ করতে পেরেছো?

মেয়ের যদি বা পছন্দ হল তো বাপের মুখ তোম্বা হয়ে যায়—'হলোই বা নিজে গাইয়ে। দুদিন পরেই কমপিটিশন এসে যাবে বে সুনি, তখন না জানি হিংসুটে-কুচুটে তোর কী হাল করে!'

এই হল সুনির বিবাহ বৃত্তান্ত। বেলা গড়িয়ে গেলেও উৎসুক পাত্রের অভাব ছিল না। কে বাগেশ্রী শুনে হত্যে দিয়ে পড়েছে, কে দরবারীর আমেজ আর কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছে না। কিন্তু পিতা-কন্যার মন ওঠেনি। আসল কথা ধ্রুপদী পিতার ধ্রুবপদটি যে কন্যা! আর কন্যা তার পরজ-পঞ্চমের আরোহ-অবরোহ যখন ঘাট নামিয়ে-নামিয়ে বেঁধে নিয়েছিল পিতার সুরে, জীবনের সুরটিও তখনই ঠিক তেমনি করেই বাঁধা হয়ে গেছে।

বেলা যায়। বেলা কারো জন্যে বসে থাকে না। একটু একটু করে একজনের মাথা ফাঁকা হতে থাকে। আরেকজনেব রুপোর ঝিলিক দেয় মাথায়। বাবার মুখে কালি পড়ে। শেষে একদিন পাখোয়াজ আর পানের ডিবে ফেলে উঠে আসেন শীতের মন খারাপ করা সন্ধ্যায়।

—'কি হবে মা, বেশি বাছাবাছি করতে গিয়ে আমি কি তোর ভবিষ্যৎটা নষ্ট কবে দিলুম?'

ঝঙ্কার নিয়ে উঠল সুনন্দা—'করেছোই তো, খুব করেছো, বেশ করেছো! এখন তোমার ডিবে থেকে দুটো খিলি দাও দেখি, ভালো করে জর্দা দিও, কিপটেমি করো না বাপু!' হেসে ফেলে মেয়ে। বাপের মুখের কালি কিন্তু নড়ে না।

অবশেষে সুনন্দা হাত দুটো ধরে করুণ সুরে বলে—'বাবা, একবারও কি ভেবে দেখেছো, আর কেউ সেবা চাইলে আমার সেতার, সুরবাহার, আমার সরস্বতী বীণ সইবে কি না! এই দ্যাখো, কড়া পড়া দু আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে সুনন্দা বলে—'এই দ্যাখো আমার বিবাহ-চিহ্ন, এই আমার শাঁখা, সিঁদুর।'

—'আমি চলে গেলে তোর কী হবে সুনি?' আঁধার মুখে বাবা বললেন।

—'বাঃ, এই আমার একলেশ্বরীর শোবার ঘর, ওই আমার তেত্রিশ কোটি দেবতার ঠাকুরঘর,

ও-ই আমার জুড়োবার ঝুল-বারান্দা, আর বাবা নিচের তলায় যে আমার তপের আসন! আমি তো আপদে থাকবো না! এমন সজ্জিত, নির্ভয় আশ্রয় আমার, কেন ভাবছো বলো তো?'

বাবার মুখে কিন্তু আলো জ্বলল না। সেই আঁধার গাঢ় হতে হতে যকৃৎ-ক্যান্সারের গভীর কালি মুখময়, দেহময় ছড়িয়ে পড়ল। অসহায়, কাতর, অপরাধী দু চোখ মেয়ের ওপর নির্নিমেষ ফেলে রেখে তিনি পাড়ি দিলেন।

তার পরও দশ-এগারোটা বছর কোথা দিয়ে কেটে গেছে, সুনন্দা খেয়াল করতে পারেনি। রেডিওয়, টেলিভিশনে, কনফারেন্সে, স্বদেশে-বিদেশে উদ্দাম দশটা বছর। খেয়াল যখন হল তখন আবারও এক শীতের মন খারাপ-করা সন্ধ্যা। এক কনফারেন্সে প্রচুর ক্লিকবাজি করে তার প্রাপ্য মর্যাদা তাকে দেয়নি, চটুল হিন্দি ফিলমের আবহসঙ্গীত করবার জন্য ডাকাডাকি করছে এক হঠাৎ-সফল সেদিনের মস্তান ছোকরা, যে গানের গ-ও বোঝে না এখনও, এই বয়সেও এক আধা-বৃদ্ধ গায়ক এতো কাছ ঘেঁষে বসেছিলেন যে টেরিউলের শেরওয়ানির মধ্যে আটকে পড়া ঘামের দুর্গন্ধ দামী আফটার শেভের সৌরভ ছাপিয়ে যেন নাকে চাবুক মেরেছে।

সামনের কম্পাউন্ডে নিমের পাতা আজ শীতের গোড়ায় ঝরে গেছে। আম্রপল্লবের ফোকরে ফোকরে শীতসন্ধ্যার কাকের চিকারি কানে তালা ধরায়, শরিকি বাড়ির ডান পাশ থেকে স্বামী-স্ত্রীর চড়া বিবাদী সান্ধ্য ভূপালির সুব বারবার কেটে দিয়ে যাচ্ছে। বাঁ দিকের বাড়ি থেকে কৌতূহলী জ্ঞাতিপুত্র বারান্দায় মুখ বাড়িয়ে থেকে থেকেই কী যেন দেখে যাচ্ছে। এতো রাগ-রাগিণীর ঠাট মেল জানা হল, নিজের রক্তের এই রক্তবীজটি যে কোন ঠাটে পড়ে, কী যে ও দ্যাখে আর কেন যে, সুনন্দা তা আজও ধরতে পারল না। শিল্পীবাড়ির শরিক যে কি করে এত রাম-বিষয়ী হয়, তাও তার অজানা। দেখা হলেই বলবে—'তোমাদের ড্রেনটা ভেন্ন করে ফ্যালো, আমি কিন্তু কর্পোরেশনে নোটিফাই করে দিয়েছি, এর পরে তুমি শমন পাবে।' হয় এই, আর নয়তো বলবে—'ইস মেজদি, চুলগুলো তোমার এক্কেবারেই পেকে ঝুল হয়ে গেল! বয়ঃ কতো হল বলো তো!'

চুল পেকে গেলে যে কি করে ঝুল হয় তা সুনন্দা জানে না। আর, বিসর্গ যে উচ্চারণ করতে পারে 'স' উচ্চারণ করতে তার কেনই বা এতো বেগ পেতে হবে, তা-ও না। ও যেন যমের দক্ষিণ দুয়ার থেকে রোজ এসে একবার করে জানান দিয়ে যায়। 'এই যে মেজদি, তুমি হয়ে গেলেই আমার হয়ে যাবে।'

সামনের ঝুপসি অন্ধকারের দিকে চেয়ে সুনন্দা হঠাৎ বলে উঠল—'ধ্যাত্তেরি।'

বারান্দার আরাম-চেয়ার থেকে সে উঠে পড়ে, শোবার ঘরে ঢুকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে তার একলার খাট-বিছানা, চকচকে দেরাজ-আলমারি, দেয়াল-আয়নার গোল মুখ, আবার বলে—'ধ্যাত্তেরিকা।' পাশে ছোট্ট ঠাকুরঘর। সোনার গোপাল, কষ্টিপাথরের রাধাকৃষ্ণ এসব তাদের কুলের ঠাকুর। মার্বেলের শিব, কাগজমণ্ডের বুদ্ধ, পেতলের নটরাজ, এসব শেলফের ওপর, নানা ছাত্র-ছাত্রী, গুণমুগ্ধ অনুরাগীর উপহার। চারদিকে সাদা পঙ্খের দেয়াল, খালি, বড্ড খালি। সিলিং থেকে জানলার লিনটেল বরাবর বেঁকা একটা চিড় ধরেছে। সেই খালি দেওয়ালে একটি যোগীপুরুষের ছবি। সেই দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে শেষকালে সে বলে—'তুমিই ঠিক। তুমিই সত্য। তুমিই শেষ আশ্রয়।'

' ড্রয়ারের ভেতরে ফাইল, ফাইলের ভেতর থেকে 'মধুরাশ্রম' ছাপ মারা খামটা দিনের মধ্যে এই তৃতীয়বার সে তুলে নেয়।

মোটা সুতোর কাগজ। হাতের লেখা খুব জড়ানো। ঠাকুর এক বছর ধরে রোগশয্যায়। স্মিতমুখে শরের মতো টান-টান শয়ান। বুকের ওপর খাপ কাটা হেলানো লেখার ডেস্ক্, মাথার দিকটা তোলা। ঠাকুর সিদ্ধদাস নিজ হাতে সুনন্দাকে এই চিঠি দিয়েছেন অন্তত ছ'মাস আগে।

সুরাসুরসিদ্ধাসু মা সুনন্দা,

তোমার সমস্যা নিয়ে গত কয়েক সপ্তাহ অনেক ভাবাভাবি করেছি মা। আমি ভাবার কেউ নয়, যাঁর ভাবনা তিনি ভাবছেন বলেই বুঝি তোমার সুরসমুদ্রটি এবার এমন স্রোত গুটিয়ে ভাটিয়ে চলল। তোমার হৃদয়ে যখন তাঁর ডাক এমন করে বেজেছে তখন দরজা দু হাতে বন্ধ রাখবে সিদ্ধদাসের সাধ্য কি? তুমি এসো। মনের সব সংশয়, দ্বিধা ছিন্ন করে চলে এসো। বিষয়-সম্পত্তি তুমি যেমনি ভালো বুঝবে, তেমনি করবে। আশ্রমে খাওয়া-থাকার জন্য নামমাত্র প্রণামী দিতে হয়। সে তো তুমি জানোই। এখানে বরাবর বাস করতে গেলে লালপেড়ে সাদা শাড়ি পরার বিধি। নিজের পরিধেয়র ব্যবস্থা তুমি নিজেই করবে। খালি এইটুকু মনে রেখো মা, তোমার বস্ত্র যেন অন্য আশ্রমিকাদের ছাড়িয়ে না যায়। তোমার যন্ত্র সব অবশ্যই আনবে মা। তাঁর আশ্রম স্বর্গীয় সুরলাবণ্যে ভরিয়ে তুলবে, তাতে কি আমি বাধা দিতে পারি? তোমার সিদ্ধি সুরেই। সে তুমি এখানেই থাকো আর ওখানেই থাকো। আমি ধনঞ্জয়কে তোমার ঘরের ব্যবস্থা করে রাখতে বলছি। আসার দিনক্ষণ জানিও। গাড়ি যাবে। শ্রীভগবানের আশীর্বাদ তোমার ওপর সর্বদা থাকে প্রার্থনা করি।

সিদ্ধদাস

চিঠিটা কোলে নিয়ে অনেকক্ষণ ঠাকুরঘরে জোড়াসনে বসে থাকে সুনন্দা। তারপর আস্তে আস্তে ওঠে। ঠাকুরকে ফুল জল দেয়, দীপ জ্বালে। ধূপ জ্বালে। একলা ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে, কালো পাথরের চকচকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামে। নিজের ঘরের তালা খুলে সুইচ টিপে দেয়। অমনি চারদিক থেকে ঝলমল করে ওঠে রূপ। আহা। কী রূপ, কত রূপ! কাচের লম্বা চওড়া শো-কেসে শোয়ানো যন্তরগুলো। সবার ওপরে চড়া সুরে বাঁধা তার হালকা তানপুরা। পরের তাকে ঈশ্বর নিবারণচন্দ্র গোস্বামীর নিজ হাতে তৈরি, তার ষোল বছর বয়সে বাবার উপহার দেওয়া তরফদার সেতার। তারপর লম্বা চকচকে মেহগনি রঙের ওপর হাতির দাঁতের সূক্ষ্ম কারুকাজ করা সুরবাহার। আর সবার শেষে, একেবারে নিচের তাকে অপূর্ব সুন্দর সমান সুগোল দৈবী স্তনের মতো ডবল তুম্বি শুদ্ধ সরস্বতী বীণ। তানসেনের কন্যা সরস্বতীর নামে খ্যাত সুগম্ভীর গান্ধর্বী নাদের বীণা। ডান দিকে নিচু তক্তাপোশে বাবার খোল, মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ। কোণে বিখ্যাত শিল্পীর তৈরি কাগজের সরস্বতী মূর্তি—কাগজ আর পাতলা পাতলা বেতের ছিলে। বাঁ দিকে শ্বেতপাথরের বর্ণহীন-সরস্বতী, গুরুদেব জব্বলপুর থেকে আনিয়ে দিয়েছিলেন। বলতেন 'অবর্ণা মা'। এই মূর্তির সানুদেশ ঘেঁষে মেঝের ওপব সমুদ্র নীল কার্পেট। তার ওপর সাদা সাদা শুক্তি-ছাপ। পাশেই আর একটি নিচু কাচের কেসে তার শেখাবার সেতার এবং ডবল ছাউনির টঙটঙে তবলা। ঘরের মাঝখানে নিচু নিচু টেবিল-সোফা-মোড়ায় বসবার আয়োজন। মায়ের হাতের নকশা করা চেয়ার-ঢাকা, কুশন-কভার এখনও জ্বলজ্বল করছে।

সুনন্দা এই সময়ে রেওয়াজে বসবার আগে এ ঘরেও দীপ ধূপ জ্বালিয়ে দেয়। ঘর খুলতেই যেন কতকালের ধূপগন্ধ তার নাকে প্রবেশ করল। অগুরু গন্ধে আমোদিত ঘর। মার্বেলের প্রতিমার সামনে দীপগাছ জ্বালিয়ে বিজলিবাতি নিবিয়ে দিল সুনন্দা। আধা-অন্ধকার ঘর যেন গন্ধর্বলোক। বাবার পাখোয়াজের বোল কি শুনতে পাচ্ছে সুনন্দা? না, না, সেখানে শুধু ইষ্টনাম। শুনতে পাচ্ছে

কি গুরুজীর সেই অনবদ্য বঢ়হত, আওচার, মন লুটিয়ে দেওয়া তারপরণ? দীপালোকে অস্ফুট ঘরে প্রতিমার সামনে আসনপিঁড়ি হয়ে বসেছে সুনন্দা। হাতে নিবারণ গোঁসাইয়ের সেতার। সোনালি রুপালি তারে মেজরাপের ঝঙ্কার। রাগ দেশ। গুরুজী সিদ্ধ ছিলেন এই রাগে। সেতার ধরলেও যা সুরবাহার ধরলেও তা। বীণকারের ঘরের বাজ। সুরে ডুবে ডুবে বাজাতেন। আলাপাঙ্গে তাঁর অসীম আনন্দ। আলাপ থেকে জোড়, মধ্য জোড়, ডুব সাঁতার কেটে চলেছেন। নদীর তলাকার ভারী জল ঠেলতে ঠেলতে গর্তের মুখটাতে এসে যখন তেহাই মেরে ভেসে উঠতেন তখন আঙুলে সে কী জয়ের উল্লাস! অনেক দিনের স্বপ্ন বুঝি আজ সত্য হল। যা ছিল রূপকথার কল্পনাবিলাস তা বুঝি ধরা পড়ে গেল প্রতিদিনের দিনযাপনের ছন্দে রূপে। এমনিই ছিল গুরুজীর বাজের তরিকা। কনফারেন্সে বাজাতে চাইতেন না। অভ্যাস ছিল নিজের গুরুদেবের ছবির সামনে বীণ হাতে করে বসে থাকা। কিংবা গুটিকতক নিষ্ঠাবান তৈরি ছাত্র-ছাত্রী ও সমঝদারের সামনে আনন্দসত্র খুলতেন। বলতেন, 'আজ তোদের কাঁদিয়ে ছাড়ব। লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদবি বাবারা।'

কিন্তু সুনন্দা আজ জানতেই পারল না কখন তার দেশ তিলককামোদ-এর বাস্তা ঘুরে ঘুরে বৃন্দাবনী সারঙের মেঠো সুর তুলতে লেগেছে। একেবারে অন্যমনস্ক। ক'দিন ধরেই এই হচ্ছে। দিন না মাস! মাস না বছর! সুনন্দা যেখানকার সেতার সেখানে শুইয়ে রেখে হাত জোড় করে বলল, 'আমি চললুম, আমায় মাফ করো।' অবর্ণা সরস্বতীর দিকে ফিরে বদ্ধাঞ্জলি আবারও বলল, 'পারলে ক্ষমা করো, আমি চললুম।'

মধুরাশ্রমে ধনঞ্জয়ের সাজানো ঘরে, নিশ্বাসে মালতী ফুলের গন্ধ আর দু চোখ ভরা তারার বৃষ্টি নিয়ে তবে যদি এ হাতে আবার সুরের ফুল ফোটে। আর যদি না-ই ফোটে তো না ফুটুক। অনেক তো হল। আর কিছু ফুটবে। এই আর কিছুর জন্যে সে বড় উন্মুখ হয়ে আছে।

।। ২।।

মধুরাশ্রমে ঢোকবার গেট বাঁশের তৈরি। তার ওপরে নাম-না-জানা কি জানি কি নীল ফুলের বাহার। মধুরে মধুর। জমিতে মধু, হাওয়ায় মধু, জলে মধু। ভেতরে দেখো বিঘের পর বিঘে বাগান, ফলবাগান, ফুলবাগান, সবজিবাগান। প্রতি বছরেই একবার করে এখানে এসে জুড়িয়ে যায় সুনন্দা। কোলাহল নেই। না যানের, না যন্ত্রের, না মানুষের। নিস্তব্ধ আশ্রম জুড়ে শুধু সারাদিন বিচিত্র পাখির ডাক। সন্ধান দিয়েছিল আজ দশ-এগার বছর আগে—মমতা বেন। এক ছাত্রী। মমতার বাপের বাড়ির সবাই সিদ্ধদাসের কাছে দীক্ষিত। বাবার মৃত্যুর পর তখন সেই সদ্য সদ্য সুনন্দার মধ্যে একটা হা-হা শূন্যতা তেপান্তরের মাঠের মতো। সব শুনে বুঝে ছাত্রী মমতা গুরুগিরি করল। ঠাকুর সিদ্ধদাসের হাতের ছোঁয়ায় অনেকদিনের পর সেই প্রথম শান্তি।

দেশাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগও মমতার মাধ্যমে। মধুরাশ্রমে যখন মন টানল যখন শরিকি বাড়ির অংশটুকু নিয়ে মহা মুশকিলে পড়েছিল সুনন্দা। মোটে আড়াই কাঠার বাস্তু, তার ওপরে তো আর জগদ্দল কংক্রিট-দানব তৈরি করা যাবে না, সুতরাং প্রোমোটারে ছোঁবে না। যারা বাস করবার জন্য কিনতে চায় তারাও দুদিকে শরিকি দেয়াল দেখে সরে পড়ে। জমির দাম আকাশ-ছোঁওয়া। কে আর লাখ লাখ টাকা খরচ করে বিবাদ-বিসংবাদ কিনতে চায়? এইরকম হা-হতোস্মি দিনে মমতা বেন দেশাইয়েব খোঁজ দিয়েছিল। কোটিপতি ব্যবসায়ী, কিন্তু সমাজসেবার দিকে বিলক্ষণ নজর। সোশ্যাল সার্ভিস সেন্টার খুলবে। একটা ছোটখাটো বাড়ি কিনতে চায়। পরিবার-পরিকল্পনা, ফার্স্ট এড, শিশু কল্যাণ ইত্যাদি ইত্যাদি। সুনন্দার বাড়ি তার খুব পছন্দ হয়ে গেল। বসবার ঘরটাকে পার্টিশন করেই তিনটি বিভাগ খুলে দেওয়া যায়। ভালো দাম দিল দেশাই।

সবটুকুই সামলালো মমতা আর তার স্বামী। সমস্ত আসবাবসমেত বাড়ি বিক্রি করে দিচ্ছে সুনন্দা। মায়ের বিয়ের আলমারি, খাট, দেরাজ, সোফাসেট, রাশি রাশি পুতুল আর কিউরিও-ভর্তি শো-কেস, বাহারি আয়না, দেওয়ালগিরি, ঝাড়বাতি, সমস্ত সমস্ত। শ্বেতপাথরের সরস্বতী প্রতিমাটি মমতাকে সে উপহার দিয়েছে। বেত-কাগজের শিল্পকীর্তি দেশাইয়ের বড় পছন্দ। তার নিজস্ব বাড়ির হলঘরে থাকবে। বিক্রিবাটার পর যতদিন সুনন্দা থেকেছে, বাড়ি যেমন ছিল তেমনি। আশপাশের কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি কিচ্ছু।

ঠাকুরঘরের ফাটল আর শোবার ঘরের বাঁ কোণে চুঁইয়ে-পড়া জলের দাগটার দিকে তাকিয়ে সুনন্দা মনে মনে ভেবেছিল, 'বাব্বাঃ, এসব কি একটা একলা মেয়ের কম্মো!' ওই ছাদ কতবার হাফ-টেরেস হল, টালি বসানো হল, তা সত্ত্বেও জল চোঁয়াচ্ছে দেখে মাঝরাত্তিরে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠেছিল সে। এখন বেশ ঝড়া হাত, ঝাড়া পা, পরনে লাল পেড়ে সাদা শাড়ি আর হাতে সেতার, বাঃ!

এবার যেন মধুরাশ্রম আরও শান্তিময় লাগল। গুরুভাই ধনঞ্জয় সেই ঘরটাই ঠিক করে রেখেছে যেটাতে সে প্রত্যেকবার এসে থাকে। সরু লম্বা। ছয় বাই বারো মতো ঘরটা। ঢোকবার নিচু দরজা সবুজ রঙ কবা। উল্টো দিকে চার পাল্লার জানলা। খুলে দিলেই বাগান। এখানকার সবাই বলে মউ-বাগান। মউমাছির চাষ হয় ফুলবাগানের এই অংশে। ঘরের মধ্যে নিচু তক্তাপোশে শক্ত বিছানা। একপাশে সেতার রেখে, শুতে হবে। একটিমাত্র জলচৌকি। ট্রাঙ্ক সুটকেস রাখতে পারো, সে সব সরিয়ে লেখার ডেস্ক হিসেবেও ব্যবহাব করতে পারো, কোণে চারটে ইটের ওপর মাটির কুঁজো। আশ্রমের ডিপ টিউবওয়েলের জল ধরা আছে। ঘরের বাইরে টিউবওয়েলের জলে হাত পা ধুয়ে পাপোশে পা মুছে, কুঁজো থেকে প্রথমেই এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেল সুনন্দা। আহা! যেন অমৃত পান! ধনঞ্জয় বলল, 'দিদি, ঠাকুরের সঙ্গে যদি দেখা করবেন তো এই বেলা।'

ট্রেনের কাপড় ছেড়ে সঙ্গে আনা বেগমপুরের লালপেড়ে শাড়িটা পরে দাওয়া পেরিয়ে ঠাকুর সিদ্ধদাসের ঘরে চলল সুনন্দা। চারদিকে খোলা আকাশ, একেবারে টইটম্বুর নীল। সেই আকাশটা তার রঙ, তার ব্যাপ্তি, তার গাঢ়তা আর গভীরতা নিয়ে ফাঁকা বুকের খাঁচাটার মধ্যে ঢুকে পড়ছে টের পেল সে। প্রণাম করল যে, আর প্রণাম পেলেন যিনি উভয়েরই মুখ সমান প্রসন্ন। সিদ্ধদাস বললেন, 'মা খুশি হযেছ তো?' আলোকিত মুখে জবাব দিল সুনন্দা।

ঠাকুর সিদ্ধদাস তাঁর পুবের ঘরের আসন থেকে বড় একটা নড়েন না। ব্রাহ্ম মুহূর্তে একবার, সন্ধ্যায় একবার আশ্রমের চত্বর বাগান ঘুরে আসেন। নিত্যকর্মেব সময়গুলো ছাড়া অন্য সময়ে তিনি তাঁর আসনে স্থির। ভোরবেলা তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় সুনন্দাব। সে-ও সে সময়টা বেড়াতে বেরোয়। কিন্তু তখন সিদ্ধদাস তদগত তন্ময়। কারো সঙ্গে কথা বলেন না, হনহন করে খালি হেঁটে যান। কে বলবে ক'মাস আগেও কঠিন রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন!

এখানকার দিনগুলি যেন বৈদিক যুগের। শান্তরসাম্পদ। পবিত্র, সরল, উদার, সুগন্ধ। একটু কান খাড়া করলেই বুঝি মন্ত্রপাঠের ধ্বনি শোনা যাবে। নাসিকা আরেকটু গ্রহিষ্ণু হলেই যজ্ঞধূমের গন্ধ পাওয়া যাবে। যেন জমদগ্নি, শ্বেতকেতু, নচিকেতা, উপমন্যু এই বন বাগানের অন্তরালে কোথাও না কোথাও নিজস্ব তপস্যায় মগ্ন। কিন্তু কী আশ্চর্য, আশ্রমের রাতগুলি যে আরব্য উপন্যাসের! তারার আলো যেমন একটা রহস্যজাল বিছিয়ে দেয় রাত আটটা নটার পরই। কে যেন ড্যাঁও ড্যাঁও করে রবারের তাঁতের তারে চাপা আওয়াজ

তোলে, চুমকি বসানো পেশোয়াজ, ওড়না সারা আকাশময়, ঘুঙুর পায়ে উদ্দাম নৃত্য করে কারা, হঠাৎ কে তীব্র স্বরে চিৎকার করে বলে 'খামোশ'! একদিন দু'দিন করে মাস কেটে গেল। আকাশে বাতাসে চাপা রবারের আওয়াজ শুনে শুনে সুনন্দা আর থাকতে পারে না। ব্রাহ্ম মুহূর্তে বেড়াতে বার হয় না সে, চৌকির ওপর বিছানা গুটিয়ে রাখে। সদ্যতোলা গোলাপফুল রেকাবির ওপর রেখে অদৃশ্য সরস্বতী মূর্তিটির উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে সেতাবের তারে মেজরাপ ঠেকায়। ললিতে আলাপ। মন্দ্র সপ্তকে শুরু। খরজের তারে অভ্যাস মতো হাত চালায়, টাঁই আওয়াজ করে তার নেমে যায়, নামিয়ে তারগুলোকে আবার টেনে বাঁধে সুনন্দা। কান লাগিয়ে লাউয়ের ভেতরের অনুরণন শোনে। আবার আলাপ ধরে! তারগুলি কিন্তু সমানে বিরুদ্ধাচারণ করতে থাকে, সুনন্দার তর্জনী আর মধ্যমার তলায় যেন কিলবিল কবছে অবাধ্য, সুর ছাড়া, সৃষ্টিছাড়া কতকগুলো সাপ, জোর হাতে কৃন্তন লাগাতে গিয়ে আচম্‌কা ছিঁড়ে যায় তার।

সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুরের ঘরের ধ্যানের আসর থেকে নিঃশব্দ পায়ে উঠে আসে সুনন্দা: সকালবেলাকার সেই ছেঁড়া তার যেন আচমকা তার বুকের মধ্যে ছিটকে এসে লেগেছে। সারি সারি নিস্তব্ধ, তন্ময় গুরু ভাইবোনেরা। কেউ লক্ষ্যও করে না। কিন্তু তার মনে হয় ধূপজ্বলা অন্ধকারের মধ্য থেকে জোড়া জোড়া ভুরু তার দিক পানে চেয়ে কুঁচকে উঠছে।

বাতে তার ঘুম আসে না। সকালের ডাকে কলকাতার চিঠি এসেছে। অন্তরঙ্গ এক সহকর্মী দুঃখ করে লিখেছেন, তিনি ছিলেন না বলেই সুনন্দা এমন সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছেন। তিনি থাকলে নিশ্চয় বাধা দিতেন। কেন যে এ কথা লিখেছেন পরিষ্কার করে বলেননি। সুনন্দাব ভালো-মন্দ সুনন্দা কি নিজে বোঝে না! জানলা দিয়ে কত বড় আকাশ দেখা যাচ্ছে। শহরের সেই গলির বাড়িতে এতো বড় আকাশ অকল্পনীয় ছিল। আস্তে আস্তে মনটা কি বকম ধোঁয়ার মতো ছড়িয়ে পড়ছে ওই আকাশে, তার যেন আর কোনও আলাদা অস্তিত্ব থাকছে না। কিছুতেই তাকে গুটিয়ে নামাতে পারছে না সে আঙুলে।

মাস তিনেকের মাথায় সিদ্ধদাস নিভৃতে ডেকে পাঠালেন—'মা, খুবই কি সাধন ভজন করছ?'

সুনন্দা চুপ।

'তোমার বাজনা শুনতে পাইনে তো মা!'

—'বাজাই না ঠাকুর।'

চমকে উঠলেন সিদ্ধদাস, 'বাজাবার কি দরকার হয় না মা? এমন দিন আসা অসম্ভব নয় যখন বাজাবার দরকার আর হয় না, মন আপনি বাজে।'

—'আমার সে দিন তো আসেনি!' সুনন্দা শুকনো মুখে বলল—'আঙুলে যেন আমার পক্ষাঘাত হয়েছে। হাত চলে না। সুর ভুলে যাচ্ছি, হৃদয় শুষ্ক,' সুনন্দার চোখ দিয়ে এবার অধৈর্য কান্না নামছে, 'অপরাধ নেবেন না ঠাকুর, কিছু ভালো লাগছে না, সব যেন বিষ, তেতো লাগছে সব।'

সিদ্ধদাস বললেন, 'অপরাধ কি নেবো! তুমিই আমার অপরাধ মার্জনা করো মা। তোমাকে সঠিক পথ দেখাতে পারিনি। কিছুদিন ধরেই শুনতে পাচ্ছি, তুমি খাচ্ছো না ভালো করে, ঘর ছেড়ে বেরোও না, ধ্যানের সময়ে আসো না। মন অস্থির চঞ্চল হয়েছে বুঝেছি। তুমি আর কিছুদিন অপেক্ষা করো, একটা না একটা উপায় বার হবেই, আশ্রম কখনও তোমাকে জোর করে ধরে রাখবে না। তোমার যেখানে আনন্দ, তাঁরও যে আনন্দ সেইখানেই।'

সেই রাত্রে অনেক ছটফট করে ঘুমিয়েছে সুনন্দা, দেখল সে সমুদ্রের ওপর বসে বাজাচ্ছে। বার বার ঢেউয়ে ডুবে যাচ্ছে, আবাব ভেসে উঠছে। বিশাল তুম্বি সুদ্ধু বীণ বারবার তার সিল্কের শাড়ির ওপর দিয়ে পিছলে যাচ্ছে। খড়খড়ে তাঁতেব কাপড় পরে এলো সে। বীণে মিড় তুলেছে। পাঁচ ছয় পর্দা জোড়া জটিল মিড়। কার কাছে কোথায় যেন শুনেছিল। কিছুতেই পারছে না। বীণ শুধু ড্যাঁও ড্যাঁও করে মত্ত দাদুরির মতো আওয়াজ তুলে চলেছে, হাত থেকে ছটাং ছটাং করে তাব বেবিযে যাচ্ছে। এক গা ঘেমে ঘুম ভেঙে গেল, বীণ কই? সুরবাহার কই? সে সব তো এখনও আসেইনি। আঁচল দিযে সেতার মুছে দাঁতে দাঁত চেপে বসে রইল সুনন্দা। শেষ রাতে আবার চোখ জড়িয়ে এসেছে। আবারও সেই স্বপ্ন। সমুদ্রের ওপর বীণ হাতে একবার ডুবছে, একবার ভাসছে। হাত থেকে বীণ ফসকে যাচ্ছে। ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে কেঁদে উঠল সুনন্দা।

দরজার কড়া নড়ছে জোবে। ঝাঁকাচ্ছে কেউ। খুলতেই সামনে মমতা।

—'সারা রাত কী বৃষ্টি! কী বৃষ্টি! এখানে পৌঁছে দেখি বালি মাটির ওপর দিযে সব জল কি সুন্দর সরে গেছে', মমতা একগঙ্গা বকে গেল, তারপর অবাক হয়ে বলল—'একি সুনন্দাদি, কাঁদছ কেন!'

সুনন্দা চোখের জল মুছে বলল, 'তুই হঠাৎ? কি ব্যাপার? আমার বীণ নিয়ে এসেছিস?'

মমতা বলল, 'ব্যাপারই বটে সুনন্দাদি। বীণ আনবো কি? গোটা বাড়িটাকেই বুঝি তুলে আনতে হয়।'

ঘরে এসে বসল মমতা, 'শোনো সুনন্দাদি, রাগ করো না। দেশাই তোমাব বাড়ি নিতে চাইছে না। বলছে ওখানে ভূত আছে। রি-মডেলিং করার আগে যোশী আর দেশাই ক'দিন তোমার নিচের ঘরে শুয়েছিল, অমন সুন্দর ঘরখানা তো। তা সারা বাত বাজনা শুনেছে।'

—'যাঃ'—সুনন্দা অবাক হয়ে গেছে, 'কি বাজনা।'

—'ওরা কি অত জানে! খালি বাজনা, কত বাজনা। ঘুম আসলেই শোনে, চোখ মেললেই সুর মিলিয়ে যায়। ঘরের একটা জিনিসও সরাতে পারেনি।'

—'কেন?' মমতাকে দু হাত দিয়ে চেপে ধরেছে সুনন্দা।

—'কেন আর? কিছুই না। জিনিস সরাতে গেলেই অমন কাঠখোট্টা ব্যবসাদাবেরও মনে হয় আহা থাক। বেশ আছে, বড় সুন্দব আব ক'দিন থাকই না।'

সুনন্দা বলল—'তুই বলছিস আমার ঘর যেমন ছিল তেমনি আছে?'

—'শুধু ঘব নয় গো। বাড়ি আসবাব যা যেখানে ছিল, সেখানেই আছে।'

সুনন্দা হঠাৎ উত্তেজিত পায়ে বাইরে ছুটল, 'ধনঞ্জয়! ধনঞ্জয়!'

—'কি দিদি!'

—'আমি আজকের গাড়িতেই কলকাতা যাচ্ছি। আমাব বাজনা প্যাক করে তুলে দেবাব ব্যবস্থা করো ভাই।'

বৃষ্টি ভেজা ঘাসের ওপব দিয়ে ঘবে ফিরছেন ঠাকুব সিদ্ধদাস। উদ্‌ভ্রান্ত সুনন্দা উল্কাব মতো ছুটে আসছে।

—'ঠাকুর ঠাকুর, আমি বাড়ি ফিরছি, বাড়ি ।'

স্মিতমুখে ডান হাত তুলে সিদ্ধদাস বললেন, 'স্বস্তি স্বস্তি।'

কেউ নেই এখন। কেউ না। না তো। ভুল হল। আছেন। অবর্ণা, বর্ণময়ী আছেন। সর্বশুক্লা। তাঁই লক্ষ সুরের বণ্ডবাহার তাঁর পায়ের কাছে মিলিয়ে গিয়ে আরও লক্ষ সুরের

আযোজন করে। সেতার নামিয়ে আজ বীণ তুলে নিয়েছে সুনন্দা। গুরুজীর শেষ তালিম ছিল বীণে। বলতেন নদী তার নাচন-কোঁদন সাঙ্গ করে সমুদ্রে গিয়ে মেশে বেটি, বীণ সেই সমুন্দর সেই গহিন গাঙ। বীণ তক পঁহুছ যা। সুনন্দা তাই বীণে এসে পৌছেছে। মগ্ন হয়ে বাজাচ্ছে, হাতে সেই স্বপ্নশ্রুত মিড়। সুরের কাঁপনে বুকের মধ্যে এক ব্যথামিশ্রিত আনন্দ, তবুও মিড়ের সূক্ষ্ম জটিল কাজ কিছুতেই আসছে না। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে. সুনন্দা অসম্পূর্ণ সুরের জাল বুনেই চলেছে, বুনেই চলেছে। খোলা দরজা, বাইরের ছায়াময় উঠোন বাগান দেখা যায়। কিন্তু সুর বন্দিনীর মতো গুমরে গুমরে কাঁদছে ঘরময়। কিছুতেই মুক্তি পাচ্ছে না। সেই সঙ্গে মুক্তি দিচ্ছে না তাকেও, দরদর করে ঘাম নামছে, ঘাম না কি চোখের জল যা দেহের রক্তের মতোই গাঢ়, ভারী! পরিচিত জুতোর শব্দ। খোলা দরজা দিয়ে গুরুজী এসে ঢুকলেন, বললেন, 'সে কি! এতোক্ষণেও পারছিস না বেটি! এই দ্যাখ।' চট করে দেখিয়ে দিলেন গুরুজী। কয়েকটা শ্রুতি ফসকে যাচ্ছিল। স্মৃতির কোণে কোথায় লুকিয়ে বসেছিল। গুরুজী তাদের টেনে আঙুলে নামিয়ে আনলেন। সুনন্দা বাজিয়ে চলেছে। হুঁশ নেই আনন্দে। গুরুজী যে চলে যাচ্ছেন, ওঁকে যে অন্তত দু'খিলি পান দেওয়া দরকার সে খেয়ালও তার নেই। যাবার সময়ে বলে গেলেন—'আসন, বেটি। আসন! তুই যে আসনে ধ্যান লাগিয়েছিস, তুই ছাড়লেও সে তোকে ছাড়বে কেঁন?' বলতে বলতে গুরুজী মসমস করে চলে গেলেন। হঠাৎ দেয়ালঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজল। সুনন্দা যেন এতক্ষণ ঘোরে ছিল। সে বীণ নামিয়ে উঠে দাঁড়াল। গুরুজী এসেছিলেন এত রাত্রে? সে কি? পান? অন্তত দু খিলি পান...কাকে পান দেবে? গুরুজী তো বাবা যাবার তিন বছর পরেই কাশীতে...। চার দিকে চেয়ে দেখে সুনন্দা। খোলা দরজায় এসে দাঁড়ায়। নিমের পাতায় হু হু জ্যোৎস্না। কোথাও কারও চিহ্ন নেই। দ্রুত দরজা বন্ধ করে দিল সে, তারপর তীব্র ভঙ্গিতে এসে বীণ তুলে নিল। মিড় তুলল। সেই জটিল, অবাধ্য মিড়। হ্যাঁ। ঠিকঠাক বলছে। অনেক দিনের স্বপ্নের জিনিস তুলতে পেরে এখন সুনন্দার হাতে সুরের জোয়ার। আরও মিড়, জটিলতর, আরও ব্যাপ্ত, আরও প্রাণমন কাঁদানো, সব মানুষের মধ্যেকার জাত-মানুষটাকে ছোঁবার মিড়। গুরুজী সত্যি এসেছিলেন কি আসেননি তৌল করতে সে ভুলে যায়। সে তার আসনে বসেছে, তার নিজস্ব আসন। সমুদ্র নীলের ওপর বড় বড় শুক্তি ছাপ। সাত বছর বয়স থেকে এই আসনে বসে সে কচি কচি আঙুলে আধো আধো বুলির মতো কতো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নাজ নখরা ফুটিয়েছে ত্রিতন্ত্রী বীণায়। ঠিক যেমনটি কেসর বাই কি রোশেনারাব রেকর্ডে শুনেছে। অবর্ণা দেবীমূর্তির দিকে মুখ করে, কিন্তু নতমুখ আত্মমগ্ন হয়ে, সারারাত সুনন্দা সমুদ্রের দিকে চলতেই থাকে, চলতেই থাকে। পাশে শোয়ানো সেতারের তরফের তারগুলি ঝংকৃত হয় থেকে থেকে। কাচের কেসের ডালা খোলা। সেখান থেকে সরু মোটা নানান সুরে আপনা আপনি বেজে ওঠে সুরবাহার, তানপুরা।

কে আছে দাঁড়িয়ে এই সুরের পারে? তারের ওপর তর্জনীর আকুল মুদ্রায় প্রশ্ন বাজাতে থাকে। কে আছে? কে আছো? ঝংকারের পর ঝংকারে উত্তর ভেসে আসে সুর। আরও সুর। তারপরে? আরও সুর। শুধুই সুর। ধু ধু করছে সুরের কান্তার। ঠিক আকাশের মতোই। তাকে পার হবার প্রশ্ন ওঠে না। শুধু সেই সুরের ধুলি বৃন্দাবন রজের মতো সর্বাঙ্গে মাখো। সেই সুরের স্রোতে ভেসে যাও, আর সুরের আসনে স্থির হয়ে বসো। 'মন রে, তুই সুরদীপ হ'।

হারান-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ

মেজদার ছেলে অমুর ছবিটা টিভি-তে এলো মঙ্গলবার। মেজবউদি খাটের ওপর উপুড় হয়ে পড়েছিল। মেজদা কৌচে বসে। আমি ঘটনাচক্রে ওঘরে ছিলাম সে সময়টা। চেঁচিয়ে ডাকলাম বড়দাকে। বড়দা-বড়বউদি মন্টুল পাপুল চারজনেই ছুটে এল। দীপু এখন নেই নইলে সেও আসত। আমার ছেলে অরু এ সময়টা কোচিং-এ যায়। মাকে আমি ডাকিনি, মা নিশ্চয়ই ছাদেব ঠাকুরঘরে। কিন্তু কি ভাবে আমার ডাকের শব্দ ও অর্থ দুই-ই মায়ের কানে পৌঁছে গেল জানি না, মা-ও দেখলাম তাড়াতাড়ি এসে ঢুকছে। তখন ঘোষণা শেষ হয়ে এসেছে। অমুর একটু গম্ভীরগোছের, ছেলেমানুষি, আঠার বছরের মুখখানা সেকেণ্ড কয়েক টিভি-র পর্দায় থমকে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মেজবউদির ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ। মা বলল—'মেজবউমা, ওরকম অধীর হয়ো না। ওতে অকল্যাণ হয় !'

বড়বউদি বলল—'আমরা তো সবাই আছি শীলা, মাথা ঠাণ্ডা বাখাটাই এখন আসল।'

বড়দার একটা নিশ্বাসের শব্দ মনে হল শুনলাম। মা বেরিয়ে গেল। পেছন পেছন মন্টুল পাপুল। বড়দা একটু দাঁড়িয়ে থেকে কী যেন বলবে বলবে করে চলে গেল। বড়বউদিও। মেজদা সিগারেট পাকাতে পাকাতে সেদিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলল, 'হুঃ।'

অমুর ছবিটা ভালো আসেনি। মুখের বাঁ-দিকটা আবছা। ডান দিকটা অবশ্য চোখ, ভুরু, ওর খাড়া খাড়া কান, চুলের ঢেউ, ছোট্ট পাতলা মেয়েলি ঠোঁট সবসুদ্ধু নিয়ে মোটামুটি স্পষ্টই। এই ছবি দেখে আধা-পরিচিত লোক হলে হয়ত চেহারাটা দেখে চিনত পারবে কিন্তু একেবারে অচেনা লোকর পক্ষে কতখানি চেনা সম্ভব বলা মুশকিল। আমার মনে হল এই একই ধরণের কিশোর মুখ আমি অনেক দেখেছি। অরুর মুখ, দীপুর মুখও মূলত একই ধাঁচের। রাস্তায় বেরোলেই এরকম পাতলা ছাঁচের সরল গম্ভীর চোখ-অলা, নরম চুল, নরম নতুন গোঁফদাড়ির কিশোর যেন অনেক দেখা যায়। মেজদাকে কথাটা বলতে গিয়েও বললাম না। কে যেন আমার বুকের ভেতর বসে নিষেধ করে দিল বলতে। সত্যিই, কথাবার্তা আমাকে অনেক বুঝে-সুজে কইতে হয়। অরুর বাবা যাবার পর আমার মুখে কুলুপ পড়েছে। কানে শুনি অনেক বেশি, চোখেও দেখি বেশি। কিন্তু অত সব দেখলে শুনলে আমার চলবে না এটা আমার চেয়ে বেশি আর কে জানে ! অরুর বাবার বেখে যাওয়া টাকার সুদে ওর লেখাপড়াটা হয়, খাই-খরচ বাবদ সামান্য কিছু দিতে পারি, কিন্তু মোটের ওপর তো আমি দাদাদের ওপর নির্ভর করেই আছি ! মা আছে, এটাই মস্ত ভরসা।

তিন দিন হল অমু নিরুদ্দেশ। উচ্চমাধ্যমিকটা হতে না হতেই অমুটা জয়েণ্টে বসল। আই আই টি-র এনট্রান্সটা কিছুতেই দিল না। এ জন্য ওর মা ওর পায়ে মাথাটা কুটতে শুধু বাকি রেখেছে। বড়দা বড়বউদি দুজনে মিলে দীপুকে তো তৈবি করেছে ভালো ! হাজার হোক দুজনেই মাস্টার। দীপুর বেরোতে আর বছর দুয়েক। ওর বাবা-মা মুখে রক্ত তুলে টাকার যোগাড় করছে। বেরোলে আর ভাবনা নেই, মেজদাই বলে, আমি আর জানব কোত্থেকে, ওর বাঁধা চাকরি, চাইকি এক্ষুনি বিদেশি স্কলারশিপ। এই পরিস্থিতিতে মেজবউদির রোখ চেপে যাওয়া স্বাভাবিক। বংশের একটা ধারা আছে তো ! ঠাকুদা ছিলেন পি আর

এস পি এইচ ডি। বাবা হেডমাস্টার, লোকে বলত স্বয়ং নেসফীল্ডও বাবার কাছে গ্রামার শিখে যেতে পারতেন। আমার বড়দাকে ঠিক দেবদূতের মতো দেখতে। স্বভাবেও তাই। অত সরল হাসি, নম্র স্বভাব, বৈষয়িক নির্লিপ্ততা যেন ঠিক এ যুগে, এ সমাজে খাপ খায় না। বড়দাও ঠিক বাবার মতো গ্রামার-পাগল, ডিকশনারি-পাগল। তবে, বাবার যতটা সাফল্য আমরা দেখেছি, বড়দার তার কিছুই নেই। দায়িত্ব নিতে ভয় পায়, সাধারণ শিক্ষক হয়েই জীবন কাটিয়ে দিল।

ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যারিস্টার এসব হওযা মেজদার কপালে হয়ে উঠল না, সে নেহাত কপালেরই দোষ। ফিজিক্সে অত ভালো মাস্টার্স ডিগ্রি করে মার্চেন্ট অফিসে চাকরি করছে। আসলে বাবার পয়সার জোর ছিল না, মেজদার তাই পয়সাব জন্য রোখ চেপে গিয়েছিল। দুঃখের কথা কি বলব আমাকে বাবা নিজে মাস্টারমশাই হয়ে গ্র্যাজুয়েট হবার সুযোগ দিলেন না, ইন্টারমিডিযেট পড়তে পড়তে বিযে দিয়ে দিলেন। তার ফলভোগ আমি করছি, তাঁর সৌভাগ্য তাঁকে এ জিনিস দেখে যেতে হয়নি। আমার ছোড়দা যেটি ছিল, সে তো ক্ষণজন্মা। যা শুনত, অবিকল মনে রেখে দিত। ক্ষণজন্মারা থাকে না, ছোড়দাও থাকেনি। অমুব ওপর ওর বাবা-মায়ের, আমাদের সবার অনেক আশা। দীপ্ত এঞ্জিনিয়ার হচ্ছে, হোক। অমু আমাদের ডাক্তার হবে। আমার দাদামশাই ছিলেন ধন্বন্তরী কবিরাজ। সেই ঐতিহ্য যদি অমুর মধ্যে বর্তায় আমরা খুশি হই। মেজদার অবশ্য বরাবরের ইচ্ছে অমু দীপ্তর মতো ইলেকট্রনিক্স-এর দিকেই যাক। দীপ্ততর এঞ্জিনিয়ার হোক। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা অমুর খুবই ভালো হয়েছে। পাঁচ ছটা লেটার বাঁধা। অঙ্কর দুটো পেপারেই পুরো নম্বর। প্রশ্নপত্র পরীক্ষা করে মেজদা তো খুবই প্রসন্ন মনে হল। মা তারকেশ্বরের কাছে মানত করেছে আমি জানি। বিকেলের দিকে কোন ছেলে আর বাড়ি থাকে ! অমুরও বেরিয়ে ছিল। কোথায় আর যাবে ? পাড়ার ক্লাবে, কিংবা কোনও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা মারতে। রাত বাড়ল অমু ফিরল না। এখানে ওখানে ফোন, খবরাখবর। কেউ কিছু বলতে পারল না। বাড়ির সামনে একটা দর্জির দোকান। তার মালিক চৈতন্য বলল—'আবে অমুদাদা তো সন্তুদা আর মিণ্টুর সঙ্গ রকে বসে বসে গল্প করছিল। কিছুক্ষণ পর দেখি কেউ নেই।'

সন্তু আর মিণ্টুকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। ওরা দুজনেই কিছুক্ষণ অমুর সঙ্গে গল্প করেছে তারপব প্রথমে মিণ্টু পরে সন্তু চলে গেছে। সন্তু যখন গেছে তখনও অমু নাকি আমাদেরই রকে বসে।

অগত্যা পুলিশে ডায়েরি। কাগজে ছবি ছাপা, টিভি-তে প্রচার। কিন্তু তিন দিন তো হয়েই গেল। মেজবউদি শয্যা নিয়েছে। বাড়ি সুদ্ধু সবাই হানটান করছে। মেজদা নাম কা ওয়াস্তে অফিস যাচ্ছে। বড়দা দেখছি সাবাক্ষণ গালে হাত, ভেতরের দালানের বেঞ্চিটাতে বসে। চোখ বসে গেছে, গালে বাসি দাড়ি। কদিনেই বড়দার টকটকে রঙে একটা ময়লা ছোপ পড়েছে। শুধু অমু বাড়ির ছেলে, সবার প্রিয় বলেই নয়। এই সেদিন পর্যন্ত ও দাদা-বউদির কাছেই পড়াশোনা করত। মাত্র মাধ্যমিকের আগের বছরই মেজদা ওর আলাদা আলাদা বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা টিউটর রেখে দিল।

চতুর্থ দিন ভোরবেলা নিচে একটা হাউমাউ হই-হই মতো গোলমাল শুনে তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখি সদর দরজা খুলে বড়বউদি চেঁচামেচি করছে, দরজার সামনে অমু। চেঁচামেচিতে সবাই-ই তখন নেমে এসেছে। নিচের উঠোনে সব জড়ো হয়ে গেল দেখতে দেখতে। অমুর চেহারা এই তিন দিনেই হয়েছে কাঙালির মতো। চুল মাটিমাখা, পরনের জামা-কাপড় ঝুল-ময়লা, কেমন উদভ্রান্তের মতো চাউনি। মেজবউদি তখন খুব কাঁদছে আব বলছে—'কোথায় ছিলি ? কোথা থেকে এলি ? শিগগিরই বল, বল, বল।'

অমু দাড়িতে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'আমাব কোনও দোষ নেই। আমাকে একটা লোক ডেকে নিয়ে গিয়েছিল।'

—'বলিস কি রে ?' মেজদা এগিয়ে এসে বলল।

বড়দা বলল—'তোমরা জায়গাটা একটু ফাঁকা করো। ওকে আগে খাওয়া-দাওয়া করতে দাও।'

সত্যিই অমু যেন টলছিল।

স্নান, খাওয়া-দাওয়া এবং লম্বা ঘুমেব পব অমু যা বলল তা বড় অদ্ভুত। বিংশ শতাব্দীর শেষ হয়ে এসেছে। জলজ্যান্ত একটা শহরের বুকেব ওপর এরকম ঘটনা ঘটতে পারে যেন বিশ্বাস হতে চায় না। পাপুল বলল—'দ্যাখো দ্যাখো পিসিমণি আমার কেমন গা শিউরোচ্ছে!'

অমুর গল্পটা এইরকম। ও মিণ্টু আর সন্তু আমাদের বাড়ির রকে বসে গল্প কবছিল, সন্তু অমু দুজনেই এইচ এস দিয়েছে। মিণ্টু পরের বছর দেবে। ওদের খুব ভাব। মিণ্টু আগে চলে যায়, তারপর সন্তু বলে—'চল্ ক্লাবে যাই।' অমু রাজি হযনি। এমনিই রকে বসেছিল, ভাবছিল এখুনি ভেতরে ঢুকবে। তখন মোটামুটি সন্ধের ছায়া পড়ে গেছে। এমন সময় পেশকার লেনের ভেতর থেকে একটা লোক বেরিয়ে এসে অমুকে হাতছানি দিযে ডাকে। লোকটার পরনে গেরুয়া জোব্বা। মুখে বেশ লম্বা দাড়ি, চুলগুলো বাবরিমতো, কাঁচা পাকা, হাতে একটা গেরুয়া রঙের থলি ছিল।

মেজদা বলল—'ডাকল, অমনি তুই চলে গেলি ?'

অমু বলল—'আমি ভেবেছিলুম, ও আমাকে কোনও ঠিকানা-টিকানা জিজ্ঞেস কববে। কিন্তু ও আমাকে দেখেই হাতছানি মতো একটা ইশাবা কবে চলতে লাগল।'

—'তুইও অমনি চলতে লাগলি।'

—'হ্যাঁ। কিন্তু কেন আমি জানি না। লোকটা অলিগলি দিয়ে ঘুবতে ঘুরতে চলেছে আমিও পেছন পেছন চলছি। মাঝে মাঝে খেয়াল হচ্ছে আমার ডান পাশে একটা বড়নদী, কলকারখানা, চিমনি, এইভাবে আমি চলেছি। তারপরে কি হয়েছে জানি না। হঠাৎ যেন আমার খেয়াল হল আমি বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও যাচ্ছি। একটা লোক আমাকে নিয়ে চলেছে, তখন আমি খুব চেঁচিয়ে উঠি, লোক জড়ো হয়ে যায়। জায়গাটা একটা আধাশহব মতো। দেখি গেরুয়া-পরা লোকটা নেই। ওই লোকগুলোই বলল—জায়গাটাব নাম জযনগর, মেছুয়াপাড়া। ওরাই আমাকে পয়সা দিয়ে বাসে তুলে দিল। তারপব এই এসে পৌঁছচ্ছি।'

মেজদা বলল—'ব্যাটাকে আমি ছাড়ব না। পুলিশ লাগিয়ে যেমন করে হোক খুঁজে বার করব।'

মা বলল—'তোমরা তো বিশ্বাস করো না, নিশির ডাক, নিশিতে পাওয়া এসব আছে, এখনও আছে।'

—'দূর করো তোমার নিশি' মেজদা বলল, 'নিশি-ফিশি নয়। ব্যাটা ছেলে-চোর। কত কি বদ উদ্দেশ্যে আজকাল ছেলে গাপ হচ্ছে খবর রাখো ?'

বড়দা বলল—'কিন্তু অমু তো বাচ্চা নয় ! ওভাবে একটা লোকের পেছন পেছন যাওয়াটা...'

মেজবউদি বলল—'নিশ্চয় হিপনোটাইজ করেছিল ! কী সাঙ্ঘাতিক !'

বড়বউদি বলল—'অত বড় একটা ছেলেকে অতক্ষণ ধরে হিপনোটাইজ করে রাখবে, যেখানে খুশি নিয়ে যাবে....এ তো আমি ভাবতেও পারছি না। এরকম হলে তো কারুরই নিরাপত্তা বলে কিছু থাকবে না !'

মেজদা তেতো গলায় বলল—'হিপনোটাইজ অনেক ভাবেই করা যায় ; অনেকেই করতে জানে। সেটা কোনও কথা নয়। কথা হল আমার ছেলে হয়ে অমু এতটা সফ্‌টি হয় কি করে ? দুর্বল হয় কেন ?'

মেজদা সত্যিই খুব কড়া ধাতের লোক। কোনও আবেগ-সেন্টিমেণ্টের ধার ধারে না। ওর বিয়ের সময়ে বাবা চাননি কিন্তু মেজদা নিজেই দশ হাজার টাকা পণ দাবি করেছিল, বাবাক বলে দিয়েছিল ওই পণের টাকা যার কাছে পাওয়া যাবে সেই বাপের মেয়েকেই ও বিয়ে করবে। মার্কেনটাইল ফার্মের এগজিকিউটিভ জামাই করতে খরচা লাগে। এটা ওর এক ধবনের জেদ। বাবা একটু আদর্শবাদী ধাতের মানুষ ছিলেন। বড়দার ওপর ঝোঁকটা ছিল বেশি। বড়দার বিয়েতে এক পয়সাও নেননি। নিজের সঞ্চয় থেকেই খরচ করেছিলেন। মেজদার সেটা রাগের কারণ ছিল। হিপনোটাইজ করার কথাটা মেজদা ওভাবে বলল কেন বড়বউদি বোঝেনি, আমি কিন্তু বুঝেছি। অমু ওদের একমাত্র ছেলে কিন্তু বড়দা-বউদির বড্ড ন্যাওটা ছিল ছোট থেকে। দীপু, মহুয়া, পাপুয়া, অমু, অরু একটা গ্রুপ। পাঁচজনের খুব ভাব। অনেক সময় অমু বড়মার ঘরে শুয়ে পড়ত দাদার পাশে। মেজদা এল টি সি নিয়ে নিয়মিত বেড়াতে যায়। অমু সব সময়ে যেতে চাইত না। এটা মেজদা মেজবউদি ভালো চোখে দেখত না। ছোটতে যখন সুবিধে ছিল ছেলে ট্যাঁকে না থাকার, তখন কিছু বলত না। সিনেমা যেতে, বন্ধু-বান্ধবের বাড়ি বেড়াতে যেতে অমুকে বড়মার কাছে রেখে চলে যেত। কিন্তু অমু বড় হয়ে যেতে এটা ওদের একদম পছন্দ হচ্ছিল না। অমুর জন্য আলাদা টিউটর রাখাতে বড়দা-বউদি দুজনেই খুব আঘাত পায়। বড়দা অঙ্ক ইংরেজি ভালো জানে। বউদি ভূগোলের টিচার। আমি শুনেছি বড়দা বলছে—'দ্যাখো উমা, তুমি অসিতকে বারণ করো, অতগুলো পয়সা খরচ করবে কেন শুধু শুধু ? ওতো ভালোই করছে আমার কাছে। আমি না পারলে দীপু রয়েছে। যখন আসবে দেখিয়ে দেবে। তা ছাড়া মাধ্যমিকের জোগ্রাফির কত ফ্যাচাং ! তুমি না দেখালে কে আর ওভাবে দেখাবে ?'

বড়বউদি বলেছিল—'আমার যা কিছু শেখাবার তা অমু কবেই শিখে গেছে। আমার আর ওর মাস্টারি করবার দরকার নেই। আর ওর বাবা-মা যদি তোমার পড়ানোয় সন্তুষ্ট হতে না পারে, তাতে তোমারই বা এতো কি ?'

বড়দা ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিল—'সন্তুষ্ট-অসন্তুষ্ট কথা উঠছে কোথা থেকে ? তুমি সবটাই বড় ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে দ্যাখো। আসলে ও মনে করেছে আমি আদতে ইংরিজির লোক, অঙ্কটা......'

বড়বউদি বলেছিল—'মনে তো ঠিকই করেছে। তুমি এই নিয়ে রগড়ারগড়ি করা ছেড়েদাও।'

অমু নিজেও খুব ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল, বলেছিল—'জেঠু আমার অ্যাডিশনাল ম্যাথ্স্ পর্যন্ত সামলে দিচ্ছে ! আমার আবার টিউটর কি হবে ? ফিজিক্স তো তুমি ইচ্ছে করলেই দেখাতে পারো। কেমিস্ট্রি দরকার হলেই বড়মার কাছে যাই।'

—'ভূগোলের মাস্টারনি কেমিস্ট্রির কি জানে রে ?' মেজদা তেড়েমেরে বলেছিল।

—'জানে অনেকরকম। ডাকিনীবিদ্যা, মন্ত্রতন্ত্র', মেজবউদি মন্তব্য করল। হিপনোটিজমের প্রসঙ্গের উৎস ওইখানে। আমি ঠিকই ধবতে পেরেছি।

পুলিশের কাছে আবার নতুন করে যাতায়াত শুরু হল। থানাব ও-সি মেজদার সঙ্গে এক ক্লাসে পড়তেন। খাতির আছে। বললেন—'নৈহাটি অঞ্চলে ছেলেধরা সন্দেহে স্থানীয় লোক দুজন যুবককে পিটিয়ে খুন করেছে। ছেলেধরার উপদ্রব আমাদের এদিকে তো ছিল না। অমিতাংশুকে দিয়ে শুরু হল। তার মানে লোকটা চট করে এ অঞ্চল ছাড়বে না। ওকে ফিরে আসতে হবেই। আর তখনও ওকে ধরা পড়তে হবে আমার জালে। এক কাজ করো, অমিতকে আমাব সঙ্গে একটু একলা কথা বলতে দাও। দরকারি কথাগুলো জেনে নিই।'

আধ ঘণ্টাটাক অমুকে নির্জনে জেরা করে ছেড়ে দিলেন প্রতাপদা। মেজদা বলল—'প্রতাপ বলেছে বড়জোর এক মাস। তাব মধ্যে ব্যাটা ভণ্ড সন্ন্যাসীকে ও খুঁজে বার করবেই।'

কিন্তু আমরা অমু সম্পর্কে একটু সাবধান হয়ে গেছি। ওকে বড় একটা বাড়ি থেকে বার হতে দেওয়া হয় না। হলে সঙ্গে অরু থাকে। অরু অবশ্য নেহাত ছেলেমানুষ। তবু একটা মানুষ তো ! অমুর বন্ধুবান্ধবদেরও পইপই করে বলে দেওয়া হয়েছে ওরা যেন ওকে একলা ফেলে অন্যত্র না যায়।

বড়দা অবশ্য আমাদের এতো সাবধানতা দেখে বলল, 'ছেলেধরাই যদি হয় তা হলে তোরা অরুর ওপরও নজর রাখ। ও তো সত্যিই পুঁচকে। একলা একলা স্কুল, কোচিং, খেলার মাঠ, বাজার সবই তো কবছে। অমুর বয়সের ছেলের চেয়ে অরুর বয়সের ছেলের তো বিপদ বেশি।'

শুনে আমার বুকেব মধ্যেটা কেমন কেঁপে উঠল। আমি একেবারেই নিঃসহায়। অরুর ওপর পাহাবা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মা বলল—'অরু ডাকাবুকো ছেলে, ওর ওপর চট করে কেউ হাত দেবে না।' মা যেন সব জেনে বসে আছে। মহুয়াকে ডেকে বললাম—'অরুকে একটু তোর কাছে আটকে রাখিস তো ।' দিদিকে অরু খুব মানে। মহুয়া বলল—'তোমারও ভয় করছে পিসিমণি ?' সাহসী, মাথা-ঠাণ্ডা বলে আমার খুব খ্যাতি এ বাড়িতে। আমার সাহস যে নিরুপায়ের সাহস তা মহুয়া কি করে বুঝবে !

দিন দশেক পরে প্রতাপদা এলেন। মেজদার সঙ্গে কি চুপিচুপি কথাবার্তা হল, তারপরেই শুনলাম আমাদের সবাইকেই, অর্থাৎ বড়দের সবাইকে উনি ডাকছেন। আমি, মা, বড়দা, বড়বউদি সবাই গেলাম। সব চুপচাপ। প্রতাপদা সিগারেট খাচ্ছিলেন, মাকে দেখে সেটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিলেন।

'কী ব্যাপার ? কিছু পেলে ?' বড়দা বললেন।

রহস্যময় হাসি হেসে প্রতাপদা বললেন—'পেলাম আবার পেলামও না।'

'খুলেই বলো না !' মেজদা মাথা ঝুঁকিয়ে বসেছে।

প্রতাপদা বললেন—'অমিতাংশু আদৌ কারো ডাকে সাড়া দিয়ে যায়নি, এমনি এমনিই চলে গিয়েছিল। ওসব দাড়ি-অলা গেরুয়াধারী ওর কপোলকল্পনা। মিথ্যে কথা।'

মেজদা গরম হয়ে বলল—'অমু মিথ্যে কথা বলছে ?'

বড়বউদি বলল—'তাতে ওর লাভ ?'

'সেটাই তো ধবতে পারছি না। প্রথমে ওর বর্ণনা থেকে মনে হয়েছিল লোকটা ছদ্মবেশ পরে আছে। দাড়ি চুল সব নকল। সেটা মাথায় রেখেই অমু যেখানে গেছে বলে বর্ণনা দিয়েছে, সেখানে সেখানে খোঁজ কবেছি। অমুর খোঁজ পেয়েছি অথচ লোকটার কথা কেউ বলতে পারছে না। অমুর যাত্রাপথটা আমি মোটামুটি ট্রেস করতে পেরেছি।'

'পেরেছ ?'

'পেবেছি। কিন্তু সেটা লোকজনকে জিজ্ঞেস করে করে। ওর বর্ণনামতো এগোতে গিয়ে দেখলাম ও মিথ্যে কথা বলছে। উত্তেজিত হয়ো না অসিত', একটু হেসে প্রতাপদা বললেন—'ছেলে তোমার একা একা কোথাও এখনও যায়নি বিশেষ কিছুই জানে না, চেনে না। বড় নদী, কলকারখানা এইসব অস্পষ্ট বর্ণনা দিয়ে ও আমাদের বোঝাতে চেয়েছে ও গঙ্গার পশ্চিম পাড় ধরে এগিয়েছে মোটামুটি। শেষকালে পৌঁছেছে জয়নগর। অথচ জয়নগরের পথ আদৌ গঙ্গার ধার দিয়ে নয়। আর সেখানে মেছুয়াপাড়া বলেও কিছু নেই। আমি যদ্দুর ধরতে পেরেছি, ও ঘুসুড়ি, বালি, উত্তরপাড়া হয়ে হুগলির দিকে চলে যায়। ব্যাণ্ডেল পর্যন্ত ও গিয়েছিল, কখনও বাসে, কখনও পায়ে হেঁটে। এখন বলো ওদিকে তোমাদের কোনও আত্মীয় বা অমিতের কোনও চেনাশোনা আছে ? কিংবা জয়নগরে ? যার কাছে ওর যাওয়ার ইচ্ছে থাকতে পারে !'

আমরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। কেউ নেই। আমাদের চেনা কেউ নেই। না ব্যাণ্ডেলের দিকে, না জয়নগর। অমুর চেনা কেউ আছে কি না কি করে জানব ? এতদিন ধারণা ছিল অমুকে আমরা চিনি, অমুর চেলাদেরও চিনি। এখন মনে হচ্ছে অমুকেও পুরো চিনি না, সে ক্ষেত্রে ওর চেনা অথচ আমাদের অজানা লোক থাকতেই পারে। প্রতাপদা এবার খাটো গলায় বললেন—'বাগ করবেন না, কোনও লভ অ্যাফেয়ার-ট্যাফেয়ার!'

'পাগল হয়েছো ? অমু করবে প্রেম ? মেয়ে দেখলে এখনও শিঁটোয় !'

'ওইরকম ছেলেরাই বেশি প্রেম-ট্রেমে পড়ে, অসিত।'

বড়বউদি বলল—'না, না, ওসব নয়। হলে আমি জানতে পারতুম।'

'পরীক্ষা দিচ্ছিল না ?' প্রতাপদা জিজ্ঞেস করলেন, 'পরীক্ষা কি রকম হয়েছে ? কবে রেজাল্ট ?'

বড়দা বলল—'খুব ভাল হয়েছে। জয়েণ্টে চান্স পাওয়া তো কারো হাতে নয়, তবে উচ্চমাধ্যমিক খুবই ভালো হয়েছে।'

বড়বউদি বলল—'রেজাল্ট বেরোতে এখনও অনেক দেরি।'

'হু', প্রতাপদা গম্ভীর হয়ে গেলেন। 'বাড়িতে কোনও ঝগড়া বিবাদ, ছেলেপুলেদের পক্ষে ট্রমাটিক কিছু ! সঙ্কোচ করলে চলবে না।'

মেজদা বলে উঠল—'প্রশ্নই ওঠে না। এ বাড়ি পাড়ার মধ্যে সব চেয়ে ভদ্র বাড়ি। কোনও ঝগড়া ঝাঁটি এখানে কখনও হয় না।'

কথাটা সত্যি। আশেপাশের বাড়িতে যখন তখন ধুন্ধুমার ঝগড়া, বাসন ফেলাফেলি, কান্নাকাটির আওয়াজ পাই। আমাদের বাড়িতে ওসব নেই। কিন্তু আওয়াজ নেই বলে যে বিবাদও নেই, কথাটা সত্যি না। মহুল বলে, 'পিসিমণি আমাদের বাড়ি ঠাণ্ডা লড়াইয়ের বাড়ি, কি বলো ?' ঠিক কথা। এটা বরাবর ছিল। আমার বাবা যখন বেঁচে ছিলেন তখনও। বাবা বড়দাকে পছন্দ করতেন, ভালোবাসতেন বেশি। বড়বউদির ওপরও তাঁর ভরসা ছিল বেশি। বিনা কারণে হয়নি ব্যাপারটা, বড়দা যেমন নির্মলচিত্ত, স্নেহপ্রবণ, বড়বউদিও তেমন কর্মঠ আপন পর জ্ঞানশূন্য ছিল। সে সময় আমাদের পয়সার টানাটানি চলেছে, মেজদার চাকরি হয়নি, ছোড়দা ভুগছে, তখন বড়বউদি ঘরে বাইরে যে পরিশ্রম করেছে ভাবলে চোখ দিয়ে জল পড়ে। এমনিতে ওর সকালবেলায় স্কুল। দুপুরেও একটা পার্ট-টাইম নিল। বাড়ি ফিরে তিনটে থেকে টুইশনি। সপ্তাহে তিন চার দিন। কোন ভোরবলা উঠে রান্না সারছে, আমি বাপেব বাড়ি থাকলে হয়ত যোগান দিচ্ছি। মা পূজো না করে নিচে নামবে না। বাবারও তখন অনেক ফরমাস ছিল। সেসব মা সামাল দিত। দু হাতে সব কাজ সেরে, গোছগাছ করে বউদি ঝড়ের বেগে স্কুলে চলে যেত। ফিরে স্নান খাওয়া করে আবার। সে সময়টা পাপুল হয়নি। বাবা-মা সব সময়ে বাইরে কিংবা কাজে ব্যস্ত। দীপু আর মহুয়া যে কী করে মানুষ হয়েছে ! যাই হোক। মায়ের ঝোঁক কিন্তু বরাবর মেজদার দিকে। ছোটকে মা খানিকটা সমীহ করত। মেজ বরাবর রাগী, জেদী, মা তার রাগকে তেজ, জেদকে দৃঢ়তা বলে প্রশ্রয় দিয়ে গেছে। বাড়ির মধ্যে এই দুই-দুই চিরকাল অশান্তি জাগিয়ে রেখেছে। ধিকি ধিকি আগুনের মতো। বড়বউদির মার ওপর গভীর অভিমান। বড়দাও বাবা চলে গিয়ে যেন সংসারের মধ্যে খুঁটিহীন একলাটি পড়ে গেছে। মেজবৌ শীলা কোনদিন বড়বউদিকে দেখতে পারে না। ওর জ্বালাটা আমি বুঝি। বড়লোকের মেয়ে, বড় চাক্‌রের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, কিন্তু একেবারে গো-মুখ্যু। সংসারে বড়বউদির এই প্রতিষ্ঠা, বাইরে তার মান সম্মান এ জিনিস ও এখনও সইতে পারেনি। মানতে শেখেনি। অথচ বড় ওকে আপন বোনের মতো স্নেহ করতো। স্পষ্টাস্পষ্টি দোষ ধরতে না পারলে জ্বালাটা বোধ হয় আরও তীব্র হয়। আমি জানি মেজবউদি তার জ্বালার অনেকটাই মেজদার মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে পেরেছে। মেজদা আগে থেকেই বড়দার ওপর খাপ্পা ছিল, এখন তাকে একেবারে দেখতে পারে না। বড়বউদিকে বলে মাস্টারনি। বাড়িতে কেউ খেতে এলে, জোব করে মেজবউদিকে দিয়ে একটা পদ রাঁধায়। অতিথিকে খাওয়ার সময়ে জিজ্ঞেস করে—'কোন কোন রান্নাটা ভালো হয়েছে ?' যদি কেউ এখনও মেজবউদিরটা ভালো বলে তো কূট চোখে চারদিকে তাকায়, বিশ্রী হাসে। শুধু বড়বউদি নয়, মহুয়া পাপুল পর্যন্ত এ জিনিসগুলো ধরতে পারে। পারে না খালি আমার মা। বলে, 'হ্যাঁ, শৌখীন রান্নায় মেজবউমার হাত ভালো। ব্যাগারঠালা কাজ নয়তো !'

বড়বউদির অভিমান হবে না কেন ! তা এইসব ক্ষুদ্রতা, প্রতিদিনকার নীচতা কি ভাষায় প্রকাশ করার যোগ্য ? না এ কাউকে বলা যায় ! অফিস ফেরত মেজদা যে বড় দোকানের কেক-প্যাটিস আনে, ভালো সন্দেশ আনে, দরজা বন্ধ করে স্বামী-স্ত্রী খায়, ছেলের জন্যে রেখে দ্যায়। আর বড়দা যে সামান্য একটু নতুন গুড়ের সন্দেশ আনলেও তার কুটি কুটি

ভাগ হয় সবার জন্যে, আর এই জিনিস নিয়ে বড়বউদি কান্নাকাটি করলে মা বলে—'ও করছে করুক গে, বউমা, তুমি বড়, বড়র মতো ব্যাভার করো'—এ-ও তো সত্যি! দীপু হোস্টেলে থাকে। কিন্তু মহুয়া পাপুয়া যে মেয়ে, সংসারের ভেতরকার সব গোঁজামিল টের পায়। টের পয়েও চুপ করে থাকে। কখনও কখনও গম্ভীর উদাস হয়ে যায়, এ তো আমি দেখতেই পাই। সত্যিকার মানসিক ধাক্কা খাওয়ার কথা ওই দুটি মেয়ের। অমু, গুরু এরা কতদূব এসব অনুভব করে আমার জানা নেই।

প্রতাপদা বললেন, 'ইনভেস্টিগেশন আমি চালিয়ে যাচ্ছি। তবে কোনও লাভ নেই। আমি নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন পার্সেন্ট শিওর অমিত মিথ্যে বলছে, সত্যটা তোমরা স্বীকার করো চাই না করো।'

প্রতাপদা বেরিয়ে গেলেন। মেজদা ফুঁসছে। 'আমার ছেলে মিছে কথা বলবে ?' মেজবউদিও ফোঁপাচ্ছে—'অমু আমার ছেলে হয়ে মিছে কথা বলবে এ আমি ভাবতেও পারছি না', কেন ভাবতে পারছে না ভগবান জানেন। আমি যা জানি তা হল এই মেজদা মেজবউদি প্রায়ই ট্যাক্সি ভাড়া করে আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি লৌকিকতা করতে যায় এবং বড়দা-বউদির নামে তাদের ছেলেমেয়েদের নামে অকথ্য সব মিথ্যে কথা লাগিয়ে আসে। আমার নামেও লাগায়। আমি নাকি ননদিনী রায়বাঘিনী, আমার সমস্ত খরচ ওরাই বহন করে, অথচ আমি ছেলেকে চুপিচুপি আলাদা খাওয়াই। পরিবেশন করতে গেলে বড় মাছটা নিজেব ছেলের পাতে তুলে দিই। আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি গেলে আমার বা বড়দার পরিবারের আজকাল যে হতচ্ছেদ্দা মিলছে তা এই কারণেই, আমি জানি। এ সব কথা কেন যে লোকে বিশ্বাস করে সেটাও আমার কাছে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য। ওরা কি দেখেনি বড়দার নিষ্পাপ চোখ, মহু পাপুর মিষ্টি ব্যবহার। নিজেদের চোখে দেখেনি বড়বউদির ভূতের খাটুনি। দেখেছে, দেখে অনেক সময়েই বলেছে—'বড়কে একটু সব দিক দেখতে হবে বইকি !' তা না হয় দেখল। কিন্তু তারপরেই মা যদি নালিশ করে, 'সংসারের চাবিকাঠিটি বড়বউমার হাতে ! কলকাঠি সব ওই নাড়ছে।' তবে সেটা অন্যায় হয় না ? সে গতরে করবে, বুদ্ধিতে করবে, অর্থ দিয়ে করবে, তোমাদের হাতে চাবিটি তবে থাকে কি করে ?

বড়দা বলল—'অসিত, প্রতাপ যতই হোক একজন অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার, তার কথাটা একেবারে ফেলে দিও না।'

মেজদা তেড়ে উঠল—'মানে, তুমি তা হলে ওকে মিথ্যেবাদী হতেই শিখিয়েছ ?'

বড়দা বলল—'মিথ্যের প্রশ্নই উঠছে না। আমি বলছিলুম ওকে একজন ভালো সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাও।'

'বলছ কি, আমার ছেলেকে পাগল বলছ ? পাগল বলতে চাইছ ?'

'শোনো অসিত, মাথা ঠাণ্ডা করো, মাথা গরম করার সময় এ নয়। শুধু পাগলরা সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যায় না। অনেক রকমের মানসিক বিপদ আছে তাছাড়াও। তুমি ওকে ডাক্তার দেখাও। ওকে যেন এখন মিথ্যেবাদী বলে শাসন করতে যেও না।'

'শাসন করব না মানে ? পিঠের ছাল তুলে নেব !'

'তার আগে শিওর হও যে ও মিথ্যে কথা বলছে !' বড়দাকে কোন দিন দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে এত কথা মেজদার সঙ্গে বলতে দেখিনি। বড়দা নিজের ঘরে গিয়ে বড়বউদিকে বলল—'উমা, টাকা বার করো, ও না যায় আমিই ডাক্তারের কাছে যাব।'

বউদি বলল—'না, তুমি যেতে পারবে না। টাকা আমি দেব না।'

বড়দা আহত দৃষ্টিতে চেয়ে বলল—'একথা তুমি বলতে পারলে ? এই মহা বিপদের সময়ে তুমি ছোটখাটো সাংসারিক মনোমালিন্যর কথা ভেবে হাত গুটিয়ে নিচ্ছ ?'

বউদির চোখ ছলছল করছে, সে বলল—'সুবর্ণ, তুই সাক্ষী রইলি, যার ছেলে তার সিদ্ধান্তের ওপর হাত দিলে যে কী ভয়ানক অশান্তি হতে পারে তা জানি বলেই নিষেধ করছিলুম। কিন্তু তোর দাদা আমাকে আপাদমস্তক ভুল বুঝল।' বউদি আলমারি থেকে বার করে দিল টাকা।

বড়দা বলল—'আমি তো ওকে নিয়ে যাচ্ছি না উমা, ডাক্তারকে শুধু কেসটা বলব, মতামত নেব। কাউকে কিছু বলবার দরকার নেই। আমার প্রাণটা বড় অস্থির লাগছে।'

সত্যিই বড়দা যেন ধড়ফড় কবতে কবতে বেরিয়ে গেল।

মেজদা অবশ্য শেষ পর্যন্ত বন্ধু-বান্ধবের পরামর্শে ঠিকই করল অমুকে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। সকলেই বলছে কৈশোর বড় খারাপ সময়। ডাক্তার দেখিয়ে নিতে ক্ষতি কি ?

অমু প্রত্যেক সপ্তাহে ডাক্তারের কাছে সিটিং দিতে যায়। দু'বার করে। মেজদার সময় হয় না সব দিন। বেশির ভাগ দিন আমিই যাই। আমার কাজ আর কিছু না। বাইরে ওয়েটিং রুমে বসে থাকি। আধ ঘণ্টা কি পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় নেন ভদ্রলোক। ইনি শুধু ডাক্তারই নন, সাইকো-অ্যানালিসিসও নিজেই করেন। হয়ে গেলে অমু বেরিয়ে আসে, আমি ওকে নিয়ে বাড়ি ফিবে যাই।

মাসখানেক পরে ডাক্তার আমায় ডেকে পাঠালেন। কথাবার্তা যা হল তা এই ঃ ডক্টর চন্দ্র ঃ 'আপনি তো অমিতাংশুর পিসি !'

'হ্যাঁ।'

'নিজের ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কত দিন এদের বাডিতে আছেন ?'

'বছর দশেক।'

'আপনার ছেলেব বয়স ?'

'চোদ্দ।'

'আপনার ছেলে অমিতাংশু যে স্কুলে পড়ত সেখানে পড়ে না কেন ?'

এসব প্রশ্নের অর্থ কি আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। বিরক্তিও লাগছিল। এটা আমার একটা গোপন ক্ষতের জায়গা। অরুকে পাড়াব স্কুলে দিয়েছি। অর্ধেক সময় ক্লাস হয় না। পাজি ছেলেদের আখড়া একটা। পাঁচিল টপকে টপকে সব পালায়। প্রতিবছর অর্ধেক ছেলে ফেল করছে, সবাই প্রোমোশন পেয়ে যাচ্ছে। এখানে আমার দেওয়ার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু অরুকে যখন ভর্তি করেছি ওর মাথাটা কাঁচা ছিল, একদম। অমুদের স্কুলটা দূরেও বটে, কড়াও বটে। মেজদা একটু ধরাধরি করলে হয়ে যেত কারণ দীপ্ত, অমু

দুজনেই ওই স্কুলের ভালো ছাত্র। কিন্তু মেজদা বা বড়দা কেউই সেটা করেনি। বড়দার স্কুল কলকাতায়। সেখানে ভর্তি করার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু আমি আশা করেছিলাম, মেজদা না হোক বড়দা অমুদের স্কুলে অরুকে ভর্তি করবার চেষ্টা করবে। কিন্তু করল না। বড়দাও না। আমি এখন বুঝি বড়দা খুব ভালো, কিন্তু মাস্টারমশাই হিসেবে ও ভালো ছেলেদের জন্যে যতটা দরদ অনুভব করে, সাধারণ ছেলেদের জন্য ততটা নয়। তা ছাড়া আমার সন্দেহ হয় অরুর বাবার নামটা ওরা সবার কাছে বার করতে চায় না। অরুকে পড়িয়ে শুনিয়ে অবশ্য বড়দা-বউদিও তারপর তৈরি করেছে। স্কুলের সায়েন্স টিচারের কোচিংয়ে না দিলে তিনি ওকে ঠিকঠাক নম্বর দেবেন না তাই দেওয়া। এত কথা ডাক্তারকে বলা যায় না। বলার মানেই বা কি ? আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ডক্টর চন্দ্র বললেন— 'প্রাসঙ্গিকতা না থাকলে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করতাম না। মাই পেশেন্ট ইজ ভেরি মাচ হার্ট।'

আশ্চর্য ! কি বলছেন উনি ? আমি বললাম—'দেখুন আমার স্বামীর রেখে যাওয়া সঞ্চয়ের ওপর নির্ভর করে আমাকে চলতে হয় অনেকটাই। অমুর স্কুলে পড়াবার আর্থিক সাধ্য আমার নেই। আমার ছেলে ভর্তির সময়ে তত চৌখসও ছিল না। অ্যাডমিশন টেস্টে পারেনি। এ প্রশ্ন উঠছে কেন আমি বুঝতে পারছি না।'

ডক্টর চন্দ্র হেসে বললেন, 'দেখুন পিসিমণি, আমার পেশেন্ট বহুদিন ধরে লক্ষ্য করেছে বাড়ির সব ছেলেমেয়ে বড়দের কাছ থেকে এক ব্যবহার পাচ্ছে না। আপনার ছেলের স্কুল ভর্তি নিয়ে নিশ্চয় বাড়িতে যথেষ্ট কথা কাটাকাটি হয়েছে। আমার পেশেন্ট মনে করে আপনার ছেলেকে এবং আপনাকেও অবহেলা করা হচ্ছে, এটা একটা পয়েন্ট। কিন্তু শুধু তাই-ই নয়, অনেক রকম পারিবারিক অবিচার, স্কুলের অবিচার, সামাজিক অবিচার ওর মনের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে বলে মনে হচ্ছে।'

'তো কি ? ও কি তাই জন্যেই পালিয়ে গিয়েছিল বাড়ি থেকে।'

'মে বি, হী ওয়াজ ট্রাইং টু গেট অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য ফ্যামিলি, ফ্রম দা সোসাইটি। বাট হী ইজ টেলিং আস ট্রুথ হোয়েন হী সেজ হী ওয়াজ সর্ট অফ ডিউপ্ড্ বাই এ ম্যান। পিসিমণি ওই লোকটি সত্যি। তবে সে লোকজন জড়ো হতে পালিয়ে গিয়েছিল কি না, অমিতাংশু অ্যাট অল ঘুসুড়ির পথে গিয়েছিল না বামুনগাছির পোল হয়ে কোনা জগদীশপুরের দিকে যায় সেটা এখনও বুঝতে পারিনি। বাই দা ওয়ে, আপনারা কি জানেন অমিতাংশু খুব ভালো ছবি আঁকতে পারে ?

—'না তো ! তবে বউদি বলে ম্যাপ-ট্যাপ খুব ভাল আঁকে। বউদির ইচ্ছে ছিল ও জোগ্রাফি পড়ে। কার্টোগ্রাফি নিয়ে পড়াশোনা করে।'

'কে বউদি ? পেশেন্টের মা ?'

'না, ওর জ্যাঠাইমা, বড়মা বলে।'

'হুঁ।' ডক্টর চন্দ্র চুপ করে গেলেন, তারপরে বললেন, 'অমিতাংশু আমাকে একটা ছবি এঁকে দিয়েছে, ফ্রি হ্যান্ড এঁকেছে, কিন্তু একেবারে নিখুঁত। ওই লোকটির ছবি।'

—'কে লোক ?'

—'যে ওকে ডেকেছিল।'

ড্রয়ার থেকে সাদা একটা কাগজ বার করে আমার সামনে রাখলেন ডক্টর চন্দ্র। এবং

আমি ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম। ছবিটা এগার বছর আগে নিরুদ্দিষ্ট আমার স্বামীর। ওর একটা ছবি আমার ঘরে আছে। ধুলোময়লা পড়ে মলিন চেহারা। বছরে একদিন হয়ত হাত পড়ে তাতে। মালা কখনও পড়ে না। যদিও আমার বিশ্বাস ও আর নেই, তবু মালা পরাতে হাত কেঁপে যায়। তাছাড়া যে মানুষ তার স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে পুরো সংসারের সামনে একলা অসহায় ফেলে রেখে নিজের যন্ত্রণা, নিজের অভিমানকে বড় করে দেখে পালিয়ে যেতে পারে তার ফটোর কি মালা পরা সাজে ? অবিকল সেই ছবিটি এঁকেছে অমু। মাথায় কাঁচা পাকা চুল, কাঁচা পাকা দাড়ি। কিন্তু ভেতরের মুখটি চিনতে অন্তত আমার কোনও ভুল হয়নি। ও কি তবে বেঁচে আছে ? সত্যিই আমাদের বাড়ির কাছে এসেছিল ? অমুকে ডেকে আমার কথা জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিল? তা হলে তা না করে ওকে ওভাবে ডেকে নিয়ে যাবার অর্থ কি ? ওভাবে পালিয়ে যাবারই বা অর্থ কি? ওর কি মাথার ঠিক নেই ?

ডাক্তার আমার মুখের ভাব দেখছিলেন, বললেন—'চেনেন ?' আমাব দিকে এক গ্লাস জল এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'জলটা খেয়ে নিন। তারপরে উত্তরটা শুনব।'

খানিকটা কবুল করতেই, বললেন—'গোপন করবেন না। ডাক্তার আর উকিলকে কিছু গোপন করতে নেই, জানেন না ?'

গোপন করার আর আছেটা কি ? তব সেসব কথা এখন আমার মনে করতেও কষ্ট হয়। অফিসে টাকা তছরূপের দায়ে সাসপেণ্ড হলেন। মস্ত দায়িত্বশীল পদে কাজ। পেমেণ্টের জন্য বিল সই হতে আসে অজস্র, প্রতিদিন। রুটিন কাজ। গোছা গোছা ফলস বিল সই করিয়ে নিয়ে গেছে। অধস্তন অফিসারদের এতো বিশ্বাস করতেন যে তাঁর নিজের সইয়ের জায়গাটি পর পর খুলে ধরলে বিলে তাদের সই আছে কি না দেখে নেবার দরকারও মনে করতেন না। কখনও কখনও এরা তাড়াতাড়ির নাম করে ব্ল্যাঙ্ক চেকও নাকি সই করিয়ে নিয়েছে। এসব আমি পরে শুনেছি। মুখের কথাই ছিল বিশ্বাস করে ঠকব তা-ও ভালো। তো ঠকো। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের কথা ওর আত্মপক্ষ সমর্থন কেউ বিশ্বাস করেনি। নিজের উকিলও না। কেস যখন সাব জুডিস তখন কোথাও আমাদের মুখ দেখাবার উপায় ছিল না। রকম-সকম দেখে ওর রোখ চেপে গেল, বলল—'কারা করেছে এখন আমার কাছে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। তাদের আমি ধরাবই।' অফিস থেকে কোনও সাহায্য পাবার উপায় নেই। কজন অনুগত পিওনের সাহায্যে প্রত্যেকটি অফিসারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ যোগাড় করল, অমানুষিক পরিশ্রম আর বুদ্ধি খরচ করে।

এই পর্যন্ত শোনার পর ডক্টর চন্দ্র বললেন, 'ও হো মনে পড়েছে. সে তো সেনসেশন্যাল কেস। আসামী ধরা পড়েনি। পি কে দত্ত বেনিফিট অফ ডাউটে মুক্তি পেলেন। আচ্ছা। সেই কেস।'

আমি বললাম—'আসামী ধরা পড়েছিল। প্রতীক দত্ত বেনিফিট অফ ডাউটে মুক্তি পাননি। বেকসুর খালাস পান। তাঁর অধস্তন তিনজন অফিসার এক সাপ্লায়ারের সঙ্গে মিলে বেশ কিছুদিন ধরে এভাবে টাকা মারছিল। তাদের শেষ পর্যন্ত প্রতীক দত্তই ধরিয়ে দেন। প্রত্যেকের সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। কিন্তু ডক্টর চন্দ্র, আপনি যেমন কেসটার সম্পর্কে ভুল তথ্য জানেন, বিশ্বসুদ্ধু লোকও তেমনি জানে। কেন জানেন ? খবরের

কাগজের গাফিলতি। যতদিন একটা পদস্থ, মানী লোককে টেনে মাটিতে নামাবার সুযোগ ছিল, তার নাম কলঙ্কিত করবার সুযোগ ছিল ততদিন রগরগে সংবাদগুলো তেল মশলা ঢেলে পরিবেশন করেছে। তার পরের কথা আর কিছু লেখেনি। কিচ্ছু না। কাজেই আপনার মতো সবাই অর্ধসত্য জানে।'

ডক্টর চন্দ্র মুখে একটা দুঃখসূচক শব্দ করলেন, উনি আমার দিকে সোজা তাকিয়ে আছেন। আমি বললাম, 'আর আজ আপনার ব্যবহার যা, এগার বছর আগে গোটা সমাজের ব্যবহারও অবিকল তাই-ই ছিল। আমাদেব নিজেদের লোকেরা, আমার এবং আমার স্বামীর বাবা ভাই কেউ বিশ্বাস করেননি সে নির্দোষ। বেকসুর খালাস পাবার পরও তার সঙ্গে আপনজনদের ব্যবহারে দ্বিধা অবজ্ঞা অবিশ্বাস মিশে ছিল। উকিল বলেন—'এইবার আপনি সরকারের নামে মানহানির মামলা করুন মিঃ দত্ত।' উনি চুপ করেছিলেন। অপরাধীদের ধরতে ওঁর সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। এবং অপরাধীরা যে তাঁর ভাইয়ের মতো ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো ছিল, এই চেতনা, এই বিশ্বাসঘাতকতা তাঁর রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল, কেস মিটে যাবার পরও। আর তারপর একদিন শেষ রাতে, এই অসহনীয় সামাজিক নির্যাতন সইতে না পেরে উনি নিরুদ্দেশ হয়ে যান।'

ডক্টর চন্দ্র বললেন—'এক্সট্রীমলি ইন্টারেস্টিং। তার মানে বোঝাই যাচ্ছে উনি বেঁচে আছেন। আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছেন। অমিতকে হয়ত নিজের ছেলেই ভেবেছেন। কেন বাড়িতে আসেননি, বাড়ির কাছাকাছি কোথাও বসে ওর সঙ্গে কথা বলেননি, ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই তার কোনও সঙ্গত ব্যাখ্যা আছে। তা হলে আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে যান ইটস নট এ কেস অফ হ্যালুসিনেশন। যদিও একটা কথা আমি আপনাদের বলবই ডাক্তার হিসেবে, অমিতাংশু ছেলেটি একেবারে স্বাভাবিক নয়। একটু বেশি স্পর্শকাতর। ও পরিবারের এবং তার বাইরের বৃহত্তর সামাজিক গণ্ডির সব সমস্যা নিয়েই ভেতরে ভেতরে খুব উদ্বিগ্ন। তা ছাড়াও, ও নিজে যা হতে চায়, তা ওর প্রিয়জনেরা ওকে হতে দিচ্ছে না। এ সমস্যাগুলো রয়েছেই। আপনারা ওর সম্পর্কে একটু সাবধানে চলবেন।'

'কী হতে চায়, ও' জিজ্ঞেস করলাম।

—'সম্ভবত পেন্টার বা আর্কিটেক্ট।'

ডাক্তারবাবুর কথা শেষ হলে তাঁর একশ পঞ্চাশ টাকা পারিশ্রমিক টেবিলে রেখে এয়ার কণ্ডিশনের বাইরে বেরিয়ে এলাম। সপ্তাহে দুবার দেড়শ করে তিনশ, তার মানে মেজদার মাসিক খরচ হল বারোশ, ডাক্তারের ফি বাবদ। এ ছাড়া ব্রেন স্ক্যান, ই ই জি, ইত্যাদির জন্য আলাদা খরচ তো হয়েছেই। ওয়েটিং রুমে ঢুকতেই একঝলক গরম হাওয়া লাগল। অন্ধকার বাইরে। অমু ছিল শেষ পেশেন্ট। শূন্য ঘরে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ও বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল।

বললাম—'অমু, আয় রে, হয়ে গেছে।'

অমু আমার চোখে চোখ রেখে বলল—'পিসিমণি, আজ এতো দেরি করলে ? আজও ডাক্তার দেড়শ টাকাই নিলেন ?'

আমি হেসে বললাম—'আধঘন্টা 'তোর সঙ্গে আধঘণ্টা আমার সঙ্গে কাবার করতে হল—ফি-টা আর এমন বেশি কী !'

অমুর মুখে একটা তীব্র প্রতিবাদ ঝলসে উঠল। পরক্ষণেই খুব মোলায়েম গলায় বলল—'পিসিমণি। ঠিক করলাম, আমি ডাক্তারই হবো।'

—'কেন রে ? এতো রোজগার দেখে ?'

—'তাই-ই। একজন, অন্তত একজনও যদি রোগীকে টাকা ম্যানুফ্যাকচার করবাব যন্ত্র বলে না ভাবে, আস্তে আস্তে তার থেকে একটা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়বে না ?'

তা জানি না, কিন্তু ওর এই সিদ্ধান্তে ওর বাবা খুব খুশি হবে না। ডাক্তারের দাঁড়াতে, উপার্জন করতে অনেক বছর কেটে যাবে। সে তুলনায় একজন এঞ্জিনিয়াব অনেক তাড়াতাড়ি উপার্জনক্ষম হয়ে ওঠে। কিন্তু আড়চোখে ওর মুখে দিকে তাকিয়ে দেখি ওর মুখের সেই ধন্দ-লাগা, বোকা-বোকা উদাস ভাবটা একদম চলে গেছে। আমি জানি, ডক্টর চন্দ্রর সিদ্ধান্ত ঠিক নয়, অমু যার ছবি এঁকেছে, তাকে ও ওর মনের গোপন ইচ্ছা থেকেই এঁকেছে। তাকে ও সত্যি দেখতে পারে না। প্রতীক দত্তর সুইসাইড নোটটা যে আমি পেয়েছিলাম। ঠিক এগার বছর আগে সে আমায় লিখে জানিয়েছিল—সমস্ত জীবন তার কাছে বিস্বাদ হয়ে গেছে। সে আত্মহননের পথ বেছে নিল। হিমালয়ের দুর্গম প্রদেশে গিয়ে সে বহু ফুট নিচুতে ঝাঁপ খেয়ে নিজের প্রাণ নষ্ট করবে। আমরা কেউ তার দেহ পাবো না।

বুঝলাম, তোমার যন্ত্রণাটা বুঝলাম। তোমার সঙ্গে সঙ্গে যে আমিও সে যন্ত্রণা সমানে ভোগ করছি, তোমাকে সান্ত্বনা আর সাহস যোগাবার জন্যে যে আমি প্রাণপণ করেছিলাম। কিন্তু প্রতীক, এভাবে পালিয়ে যাওয়ায় তোমার সারা জীবনের সততার ইতিহাসটা মিথ্যে হয়ে গেল। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে যে শেষ পর্যন্ত রুখে যাওয়া চাই। সত্য যার হাতের অস্ত্র সে কেন কাপুরুষের মতো স্ত্রী-পুত্রকে তার নিজের পরিত্যাগ করা সমাজের হাতে ফেলে রেখে চলে যাবে ? তাই তুমি নিরুদ্দিষ্ট। পথভ্রষ্ট। তুমি আমাদের প্রতি প্রাথমিক কৃত্য করোনি, আমিও তোমার শেষকৃত্য করিনি। কিন্তু আমার আশা পূর্ণ হয়েছে। অমু পালিয়ে গিয়েছিল। তার পরিণত কৈশোরের স্পষ্ট সরল দৃষ্টি দিয়ে গোটা সমাজখানার চেহারা দেখে ভয়ে, বিতৃষ্ণায় পালিয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল তার পিসেমশাইয়ের পথটাই একমাত্র পথ। ও-ও তো ওই নিরুদ্দেশের গল্পটাই জানে। পালিয়েছিল। কিন্তু অমু ফিরে এসেছে। এমনি করেই দীপু, অরু, মহুল, পাপুল সব্বাই যে যার পলায়নের জায়গা থেকে যদি ফিরে আসে ! আমরা যারা নিরুদ্দিষ্ট, আর আমরা যাবা হারিয়ে গেছি, ক্রমাগতই হারিয়ে যাচ্ছি, আমি, মেজদা, বড়দা, মেজবউদি, বড়বউদি, মা, ডক্টব চন্দ্র, সেই সব *সাংবাদিক যাঁরা স্টেট ভার্সাস প্রতীক দত্তর মামলার অসম্পূর্ণ অর্ধসত্য বিবরণ ছেপেছিল,* এই সব সবাইকে, এমন কি আত্মঘাতী প্রতীক দত্তকেও ফিরিয়ে আনবার দায়িত্ব যদি অমিতাংশুরা নেয় !

বলাকা

সত্যপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় ওরফে কর্নেল চ্যাটার্জীর বয়স আটান্ন পার হল হপ্তা দুই আগে। কেউ বলবে না। চোখের দৃষ্টি তীরের মতো, পড়ার জন্যে ছাড়া চশমা লাগে না। দাঁড়ান সটান, চলেন সোজা, কপালে একটি, একটিমাত্র ভাঁজ। অনুভূমিক, ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক। চোখ বা ঠোঁটের পাশে কাকের পা নেই। পঞ্চাশ পার হয়েছেন কিনা সন্দেহ হয়। ষাটে জীবনে দ্বিতীয়বার অবসর নেবেন।

ইতিমধ্যেই নানান জায়গা থেকে আগাম ডাক আসছে, তারই মধ্যে যে-কোনও একটাকে বেছে নেবেন। নিজের সময় এবং পছন্দমাফিক। যৌবনের তেজ আর কর্মক্ষমতা, প্রৌঢ় বয়সের অভিজ্ঞতা ও প্রাজ্ঞতা এ সবের প্রয়োগের দিন শেষ হতে তাঁর এখনও অনেক দেরি। এ কথা তিনি একাই বোঝেন না, বোঝে যারা আশে-পাশে অর্থাৎ সংসারে, সমাজে, কর্মক্ষেত্রে কাছাকাছি রয়েছে তারাও। ছিলেন মিলিটারিতে। চিন-ভারত যুদ্ধে একটানা দু মাস নিখোঁজ থাকার পর ফিরে এলে মায়ের কান্নাকাটি, ঠাকুরমার টানা তিন দিন 'জল স্পর্শ করব না' ইত্যাদির পরও সেই রোমাঞ্চকর চাকরিটি ছাড়েননি। অ্যাডভেঞ্চারের নেশা তাঁর রক্তে। এখন আছেন বাণিজ্যিক সংস্থায়। এখানকার অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ আলাদা। অনেকটা দাবা খেলার মতো। এখানে কর্নেল মনের সাধে ঘোড়ার চালে কিস্তি মাত করে চলেন। কিন্তু জীবনযাপনের কায়দায়, চলায় ফেরায়, সর্বোপরি শিকারের নেশায় কর্নেল চ্যাটার্জী এখনও মিলিটারি লোক রয়ে গেছেন। হাতটা কেমন নিশপিশ করে। এখনও লক্ষ্য স্থির আছে তো? নিশানা? কিছু করতে পারবেন এখনও দরকার হলে? ঘুমের মধ্যে তীর ছোঁড়েন। বন্দুক বাগিয়ে ধরেন। ঘুমের মধ্যে নিক্ষিপ্ত তীর, বন্দুকের গুলি, প্রায়ই পাশের মানুষটির বুকে পিঠে গিয়ে বিঁধত।

'উঃ! উঃ! কী রে বাবা!' ঘুমের মধ্যে সে কাতরে উঠত। কর্নেলের ততক্ষণে হয় ঘুমটা একেবারেই ভেঙে গেছে, তিনি পাশের মানুষটির আঘাত লাগা জায়গাটা ডলে দিতে দিতে বলছেন, 'এইটুকুতেই জখম হয়ে গেলে? আরে বাবা, সম্মুখসমরে তো কখনও যাওনি, যাবেও না!' আর আধো-ঘুম অবস্থায় থাকলে তিনি মটকা মেরে পড়ে থাকতেন, কিছুটা ঘুম ফিরিয়ে আনার জন্য, কিছুটা বা লজ্জায়। এখন পাশের জায়গাটা শূন্য। খুব আশ্চর্যের কথা, এখন কর্নেলের ঘুমের মধ্যে তীর-ছোঁড়ার রোগটা সেরে গেছে। গত দেড় বছরে একবারও, অন্য কারণে হলেও এই কারণে জেগে ওঠেননি। চাঁদমারি নেই বলেই কী? কথাটা মনে করে দুঃখের মধ্যেও কর্নেলের হাসি পেলো। চাঁদমারিই বটে! শেষ দিকটায় অতসী কঞ্চির মতো রোগা হয়ে গিয়েছিল। শুধু বক্ষ এবং নিতম্ব সামান্য গুরুভার। ছোট্ট মুখটা ভরাট। কপালে একটা নীল শিরা। কেউ বলত অলক্ষণ, কেউ বলত রাজরানী হবার লক্ষণ। কোনটাই মেলেনি। অলক্ষণ? অর্থাৎ বৈধব্য? তিনি এখনও বহাল-তবিয়তে বেঁচে আছেন। সে-ই বরঞ্চ অত্যন্ত অসময়ে তাঁকে যেন একটু অস্বস্তিতে ফেলে চলে গেল। আর হবো হবো করেও তিনি কিছুতেই কোম্পানিতে এক নম্বর হতে পারলেন

না। চেয়ারম্যান সাহেবের স্তাবকমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করতে পারেননি বাঙালি হওয়ার দরুন। দ্বিতীয়ত, তাঁর কর্মক্ষমতা, মৌলিকত্ব ইত্যাদি বহুজনের ঈর্ষার বস্তু হয়ে পড়েছিল। কাজেই রাজা, যুবরাজ হওয়া আর হয়ে উঠল না। তবে এ-যুগের বাণিজ্য সংস্থার চেয়ারম্যান যদি বিক্রমাদিত্য হন, তাহলে তাঁর নবরত্নসভার একজন তিনি। নিজের ক্ষমতা ও প্রতিভাবলে হয়েই আছেন। কিন্তু বরাহমিহিরের স্ত্রীকে তো আর কেউ রাজরানী বলবে না! সুতরাং অতসীর কপালের নীল শিরাটা জ্যোতিষীদের সব রকম গণনাকে হারিয়ে দিয়েছে, বা বলা ভালো, ভুল প্রমাণিত করেছে। ক্ষীণতার কারণে ইদানীং কর্নেল স্ত্রীকে অতসী না বলে বেতসী বলে ডাকতেন।

কলকাতা নামক বিকট শহরটির থেকে অন্তত একশ কিলোমিটার দূরে এই নির্জন বনবাংলা বানিয়েছেন তিনি। মাসের দুটো সপ্তাহান্ত অন্তত কাটিয়ে যান। বাংলার গ্রাম যেরকম হয় তার চেয়ে একটুও কম বা বেশি ভালো না জায়গাটা। কিন্তু সব রকম ময়লা, আবর্জনা, অগোছালোপনা, দৈন্য ঢেকে যায় সবুজে। শীতের কটা দিন ধরণী মলিন, কিন্তু আকাশ অথৈ নীল। যেন প্রশান্ত মহাসাগর। রোদ যেন কাঁচা হলুদ বাটা। বাটি উপুড় সেই নীল চাঁদোয়ার দিকে তাকিয়ে থাকো, দেখবে খুশিয়াল মেঘদের পশ্চিম-মেঘ পর্ব। আর দেখবে পারাবাতের খেলা। বিকেল বেলার ছাদে দিনশেষের রাঙা মুকুল আকাশ দেখতে এলে আরও দেখবে টানা কুন্দফুলের একটি মালা সমানভাবে দুলতে দুলতে চলে যাচ্ছে। যাযাবর হাঁস না বকেদের দল—বকের পাঁতি। কর্নেলের বনবাংলাব থেকে সোয়া কিলোমিটারের মধ্যে রয়েছে একটা বিরাট ঝিল। এলোমেলো তার তটরেখা। কোথাও বাঁধানো পাড় নেই। কচুরিপানার দাম কখনও কখনও ভেসে আসে। আবার ভেসে চলে যায়। ধোপায় কাপড় কাচে, জেলেতে মাছ ধরে, কিছু কিছু লোক চান করে, কিন্তু গাগরি-ভরণে কাউকে যেতে দেখা যায় না। দূরবীন চোখে নিয়ে কর্নেল দেখেছেন অনেক সময়ে কচুরিপানার দামের পাশ কাটিয়ে তরতর করে পানসি চলেছে। কোমর জলে নেমে খ্যাপলা জাল ফেলে প্রচুর কুচো মাছ তুলছে অল্পবয়সী জেলের ছেলে, কুচকুচে হাতে জ্যান্ত রুপোর কুচিগুলো তুলে পরখ করছে। তারপর সবসুদ্ধ কাঁধে ফেলে চলে যাচ্ছে খুশ-কদমে। শহরে কর্মজীবনের এবং জীবনযাত্রার একটা ধনুকের ছিলার মতো টানটান ভাব আছে। সব সময়ে শরীরের স্নায়ুতন্ত্রী চড়া সুরে বাঁধা থাকে। যাকে বলে টেনশন। সব সময়ে গেল গেল ভাব। গাড়ি চালাতে চালাতে সামনে 'বাবু, ও বাবু, দিন না' এসে গেল, ঘ্যাঁচ ব্রেক, সেই সঙ্গে দরদর ঘাম, আরেকটু হলেই চলে গিয়েছিল লোকটা চাকার তলায়, গাড়ির চালক জনগণের হাতে, গাড়ি পুলিসের হেপাজতে। ট্যাঁ ট্যাঁ ফোন—'শিগগিরই চলে এসো, মিঠু, হ্যাঁ মিঠুর... বোধহয় গ্যালপিং হেপাটাইটিস।' 'চেষ্টার ত্রুটি হবে না', 'নাঃ, তোমার তো ডক্টর দাশগুপ্তর সঙ্গে খুব জানাশোনা।' 'আরে বাবা পেলে তো! সব সময়েই ডাক্তাররা আজকাল কনফারেন্সে বিদেশে— দেখছি...।' বুকের মধ্যে টিপটিপ, মিঠু...মিঠু বড়দার একমাত্র নাতনি, ঝুলঝুলে চুল, তুলতুলে মুখ, গ্যালপিং...হে..পা টাইটিস! 'হ্যালো চ্যাটার্জী' 'কে?' 'হিতৈষী। কংগ্র্যাচ্যুলেশনস।' 'হোয়াট ফর?' 'ফর রিমেইনিং ; হোয়্যার ইউ ওয়্যার।' শিট! ফোনটাকে এবার শোবার ঘর থেকে দূর করে দেবেন।

—'দুধে গন্ধ কেন রে? এই গোবর্ধন!'

'— কৌটোর দুধ সাহেব। বাজারে দুধ নেই।'

—'কেন? গরুমোষরাও স্ট্রাইক করেছে নাকি?'

—'খাটাল হঠাও আন্দোলন হচ্ছে না সাহেব। গোয়ালারা তাই...'

...'দমাদ্দম আওয়াজ কিসের, শেষ রাত্রিরে?' জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখলেন পাশের ছ তলাটার ওপর থেকে ভাঙা শুরু হয়েছে। ডেমলিশন অর্ডার হয়ে গিয়েছিল, অনেক দিন। ফ্লু-এ ঠিক যেদিন তাঁর সারা বাত মাথায় বোমা পড়েছে আর শেল ফেটেছে, সেই রাতের পর ভোরে প্রথম ঘুমঘোরের সময়টাই ডেমলিশন অর্ডার কার্যকরী করা শুরু হয়ে গেল। এরই নাম শহুরে টেনশন। তাঁদের বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়ির হাতা বেশ খানিকটা। তারপর গাড়ি-বারান্দা। ভেতরের ঘরগুলো উঁচু উঁচু বড় বড়, তবু সে সমস্ত পেরিয়ে, দীর্ঘদিনের অপরিষ্কৃত আবর্জনা-স্তূপের গন্ধ, মিছিলের স্লোগান, রাজনৈতিক বক্তৃতা, পুজোটুজোর হই-হল্লা সবই প্রবেশ করে। তাই এই নির্জন বনবাংলা। শরীর-মন শিথিল, চিন্তাভারমুক্ত. শহুরে ক্লেদ-বর্জিত থাকে কিছুক্ষণ। অতসীরও খুব পছন্দ হয়েছিল বাংলোটা। বিশেষত ওই ঝিলের জন্য।

আরও একটা শরীর-মন ঠাণ্ডা করার, চাঙ্গা করার জায়গা আছে তাঁর। সল্ট লেকে। রীমা তরফদারের বাড়ি। রীমা আর রীতা দুই বোন একসঙ্গে একা থাকে। তাদের বাড়ি কর্নেল চ্যাটার্জী চাঙ্গা-ঠাণ্ডা হতে যান মাঝে মাঝে। কোনও নির্দিষ্ট সময় নেই। হঠাৎ। একটা ফোন করে দেন আগে থেকে। না হলে ওরা অপ্রস্তুতে পড়তে পারে। অন্য কেউ যদি চাঙ্গা হতে এসে থাকে! রীমা রীতা কর্নেলের অনেক দিনের অভ্যাস। যেহেতু মেজাজ-সাপেক্ষ এই দেখাশোনা, তাই রোমাঞ্চটা এতদিন পরেও চলে যায়নি। কবে রীতা আর কবে রীমা এটাও একটা মেজাজ অনুযায়ী শেষ মুহূর্তের নির্বাচনের ব্যাপার। সেখানেও তাই রোমাঞ্চ। এক পাশে রীমা, দোহারা সুন্দরী, সপ্রতিভ, বাকপটু, কিন্তু যাকে বলে গ্রেসফুল, অন্য দিকে রীতা, অনেক অল্পবয়স্ক, উচ্ছল, অশ্লীল, মাদক, সুন্দরী নয়, কিন্তু উত্তেজক। ওখানে ঝিল নেই, আকাশ নেই, বিশৃঙ্খল সবুজ নেই, আচে মরসুমি ফুলের কেয়ারি-করা বাগান, সুইমিং পুলে স্ট্রীপটিজ।

আকাশে ঝটপট ডানার শব্দে চমকে মুখ তুলে তাকালেন কর্নেল চ্যাটার্জী। বকের পাঁতি। খুব নিচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। এখন আর কুন্দ ফুলের মালা নয়। গলার লম্বা, পেটের ফোলা, ডানার ঢেউখেলানো চওড়া—সবই দেখা যাচ্ছে। অস্পষ্ট ক্লাক ক্লাক ডাক অবধি শোনা যাচ্ছে। কর্নেল অবাক হয়ে দেখলেন প্রথম মালার পেছনে আরও মালা আসছে, আরও আরও, ছেঁড়া মালা, গোটা মালা। তারপর অদূরে ঝিলের চারপাশটায় সাদা সাদা ফোঁটা পড়তে শুরু করল। ঝিলের একধারটা একেবারে সাদা হয়ে গেছে। বকগুলো কোন সুদূর থেকে এসে তাঁর বনবাংলার সংলগ্ন ঝিলের চারদিকে নেমে পড়েছে! আশ্চর্য তো! তিন বছরের ওপর এ বাড়ি তৈরি হয়ে গেছে, এ দৃশ্য তিনি এখনও দেখেননি। এই বছর এই প্রথম এরা এখানে এলো? না কী? বাইনোকুলার চোখে লাগালেন কর্নেল। ঝিলের ওপরে এখনও বকের দল এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়েনি। এখনও বেশ প্যারেডের ভঙ্গিতে আছে, কেউ কেউ অতি মনোহর ভঙ্গিতে শরীর লম্বা করে ডানা ঝাড়ছে। রোটারি

ক্লাব বছরে একবার করে আন্তঃস্কুল পি টি প্রতিযোগিতা করে। মেম্বাব হিসেবে এগুলো তাঁকে দেখতে হয়, দেখতে খুব ভালোও লাগে। সাদা গেঞ্জি আর মেরু শর্টস পরে ছেলেরা মাটিতে সহস্রদল পদ্ম হয়ে যাচ্ছে। আবার নতুন ফর্মেশন। ভারতবর্ষের মানচিত্র। মেয়েরা বেঁটে বেঁটে ডিভাইডেড স্কার্ট আর আলগা ব্লাউস পরে পিয়ানোর সুরের তালে তালে লাল বলটা এক জনের থেকে আরেক জনের কাছে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে পাঠিয়ে দিচ্ছে। পায়ে নাচের ছন্দ। হাত আর মাথা একদিকে বেঁকিয়ে পাঠাচ্ছে বলগুলো, মাঝে মাঝে একেকটি মেয়ে লাফিয়ে ধরছে বল, ব্লাউজের হাতা উড়ছে পাখনার মতো, অবিকল ওই বক না হাঁসগুলোর মতো। মাথার ওপরে আবার আওয়াজ ক্লাক ক্লাক। চোখ তুলে তাকালেন কর্নেল। ইউনিফর্ম-পরা এক দল স্কুলের মেয়ের মতো উড়ে যাচ্ছে বলাকা। ছাই-সাদা উইনিফর্ম।

হঠাৎ বহুদিন আগে দেখা এইরকম এক ঝাঁক স্কুল-গার্লের কথা মনে পড়ে যায়। তুলনাটা আজ এতদিন পর একটা বিদ্যুচ্চমকের মতো মনে এলো। তখন মনে হয়নি। সিক লিভে বাড়িতে। প্রতিদিন এই রকম একটা ঝাঁক রাস্তা পার হত। প্রথমে মনে হত সবগুলো এক, আস্তে আস্তে আলাদা করতে পারলেন। কোনটা রোগা, কোনটা মোটা কোনটা দোহারা, কোনটা বেঁটে, কোনটা মাঝারি, কোনটা লম্বা। কেউ দোদুল বেণী, কেউ বব-কাট, কেউ ফর্সা, কেউ কালো, কেউ শামলা। দেখতে দেখতে দেখতে দেখতে চোখ আটকে গেল। আর নড়তে চাইল না। অনবদ্য। অনুপম। —'অতসী এই অতসী তোর জোগ্রাফির খাতাটা আমায় একবার দিবি!'

—'নে নো! এতে আর বলবার কি আছে?'

—'মুখার্জি আঙ্কল বকবেন না তো!'

—'বকবেন কেন?'

—'উনি কপি করা পছন্দ করেন না। শেষকালে যদি ভূগোলেতে গোল!'

—'ধুত্ আমার বাবা, আমি বুঝব, তুই নে।'

দু চারদিন বন্ধুদের স্কুল-ফিরতি হাস্যালাপ থেকে ধরে ফেলা গেল অতসী মুখার্জি, মেয়ে-স্কুলের ভূগোলের সার অমলেশ মুখার্জির মেয়ে। তখন মার কাছে গিয়ে হ্যাংলাপনা—'দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে।' মার চোখ ড্যাবডেবে খুশিতে। সংলাপ আরম্ভ হয়।

অমলেশ মুখার্জি—'দেখুন, অতসী আমার একমাত্র সন্তান।'

মিসেস চ্যাটার্জী—'সী ইজ দা বেস্ট স্টুডেন্ট, দিস স্কুল হ্যাজ এভার প্রোডিউস্‌ড্।'

অমলেশ মুখার্জি—'মাতৃহীন সন্তান। প্রাণপণে মানুষ করছি। আমার ইচ্ছে ও ডাক্তার হয়। কিংবা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস। এখনই বিয়ে....'

মিসেস চ্যাটার্জি—'বেশ তো। ও স্কুলটা পাস করুক। আমাদের বাড়ি থেকেই পড়তে পারবে। মা নেই, মা পাবে। আপনিও ছেলে পাবেন!'

সুবিখ্যাত চ্যাটার্জিবংশের গৃহিণী মিসেস চ্যাটার্জি কন্যা প্রার্থনা করছেন জোগ্রাফির টিচার অমলেশ মুখার্জির কাছে, যিনি স্ত্রীলোকহীন সংসারে সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, উচ্চাশী কিশোরী কন্যাকে নিয়ে ভেতরে ভেতরে ব্যতিব্যস্ত। নিজের বা মেয়ের বাড়ি ফিরতে একটু দেরি

হলেই ঘর্মাক্ত হয়ে যান দুর্ভাবনায়, অসুখ করলে অসহায়। নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন। অনেক ভেবেছিলেন। মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। অনেক কথা। যতই বুদ্ধিমতী হোক, যতই উচ্চাশী হোক, সপ্তদশী বই তো নয়! সুতরাং মিসেস চ্যাটার্জির জয়। কর্নেল চ্যাটার্জির জয়। অভিজাত, বনেদী পরিবারের জয়। বৈভব এবং আভিজাত্য ছিল বংশে, বুদ্ধিবৃত্তি এবং সত্যিকারের সৌন্দর্য যোগ হল। এতদিন বাড়িতে রমণীকুল বলতে সোনা এবং হিরেয় মোড়া আলুসেদ্ধ ছিল, এবার এলো স্নিগ্ধ তন্বী দীপশিখা। বিয়েবাড়িতে হই-চই পড়ে গেল। কর্নেল চ্যাটার্জির বুক ক্রমশই ফুলছে। উচ্চমাধ্যমিকে একগাদা লেটার। ন্যাশনাল স্কলারশিপ। জয়েন্টে দুটোতেই সুযোগ ডাক্তারি, এঞ্জিনিয়ারিং। —'তুমি তো বরোদা চলে যাচ্ছো, আমি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়ে যাই?'—'আমি কি একা থাকবো, বরোদায়? দু বছর? ছুটি পাবো না, তার পরই ফ্রন্ট।'—'কিন্তু আমি তাহলে কি করে পড়ব?' 'আরে বরোদায় কি আর কলেজ নেই? ভর্তি হয়ে যাবে।' 'ডাক্তারি?' 'সম্ভব হবে কি করে?' চোখের আলো দপ করে নিবে গেল।

সপ্তদশী অষ্টাদশীদের কুমারী শরীর নতুন জাগে। ঠিক ফোটার পূর্ব মুহূর্তের কুঁড়ির মতো। সোহাগে, অভ্যস্ত, শিক্ষিত, নিপুণ হাতের যত্নে সেই দীপশিখা জ্বালাতে কতক্ষণ! 'বলো, বলো তুমি আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে?' অস্পষ্ট অব্যক্ত কণ্ঠের গোঙানি 'আমি যে কী করি? কী করি? চার পাঁচটা তো বছর...' 'চা-র, পাঁ-চ বছর, নাহ্ অতসী তুমি আমায় একটুও...' পেছন থেকে মুখের ওপর হাত চাপা।

বরোদা। মিলিটারির জিপে করে অতসী কলেজ যাচ্ছে। ইতিহাস পড়ছে। টুকটাক শিখে নিচ্ছে, বাংলো সাজাবার কায়দা, এনটারটেইন করার কায়দা, অফিসার্স ক্লাব, উইমেনস ক্লাবের পার্টি। 'হ্যাললো মিসেস চ্যাটার্জি, য়ু আর সো চা-র্মিং, লেটস হ্যাভ এ ডান্‌স্।' দূর থেকে সকৌতুকে দেখছেন কর্নেল। উদ্ধার করবার জন্য এগিয়ে যাচ্ছেন না। ওর নাকের ওপর এখন নিশ্চয় চিরঞ্জীব সুদের হালকা হুইস্কি আর কড়া তামাক মিশ্রিত নিশ্বাস। খুব অনিচ্ছুকভাবে পা ফেলছে অতসী। তাঁর সঙ্গিনী মিসেস তলোয়ারকর অবশ্য খুব স্মার্ট। শী ইজ এনজয়িং হারসেলফ। তাঁর নিশ্বাসের গন্ধ মাদাম তলোয়ারকরের ভালো লাগছে। তীব্র পুরুষালি গন্ধ।

গ্র্যাজুয়েশন হতে না হতেই গোল্ডি এসে গেল। সোনালি রঙের বাচ্চা। তাই চম্পক। সে মা যে নামেই ডাকুক না, বাবার আদরের নাম গোল্ডি। 'আহ্ কি বিশ্রী একটা কুকুরের মতো নামে ডাকো।' 'কিস্যুই জানো না, অতসী, আমি ঠিক একেবারে সঠিক নামে ডাকছি।' গোল্ডি সাইকেল চড়ছে, গোল্ডি এয়ার গান চালাচ্ছে, গোল্ডি মারপিট করছে, গোল্ডির মা তার নানান স্বপ্নের কথা বলে চলেছে, রূপকথার মাধ্যমে, উপকথার মাধ্যমে। সোনালি রঙের গোল্ডি বলে—'এই ট্র্যাশ গল্পগুলো তুমি কোথায় পেলে মাম্মি! গোস্টস? হাঁড়ি উপুড় করলেই মিষ্টি ঝরবে? মার মেইড, এ সমস্ত আজগুবি'—'কেন? তোর জিরো জিরো সেভেন, টিনটিন এসব আজগুবি নয়?' 'আজগুবি কেন হবে? ডিফিকাল্ট। কিন্তু অসম্ভব নয়।' বাবা ছেলে একসঙ্গে বলে ওঠে। কর্নেল চ্যাটার্জি বিজয়ীর হাসি হেসে বলেন 'গোল্ডি ইজ হিজ ফাদার্স বয়, নট হিজ মাদার্স বেবি।' গোল্ডি চলে গেল দেরাদুন। চোখ

ভর্তি জল, অতসী বলল—'আমি কী করবো, বলে দাও'—'সোশ্যাল সার্ভিস করো, মিসেস তলোয়ারকর যেমন করেন।' 'ধুত্ ওকে সোশ্যাল সার্ভিস বলে? আমাকে একটা মেয়ে দাও।' মেয়ে কি ইচ্ছে করলেই দেওয়া যায়। অনেক কিছু ইচ্ছে করলেই কেড়ে নেওয়া যায়, কিন্তু হাজার চেষ্টা করলেও কিছু কিছু জিনিস দেওয়া যায় না। কর্নেলও দিতে পারলেন না। দুবার নষ্ট হয়ে গেল। শেষেরটা আকার পেয়ে গিয়েছিল একটা। ফর্সা, গার্ল-চাইল্ড। অতসীর সে কী বুক ফাটা কান্না। সেই একবারই। তারপর অতসী শুকোতে থাকল। অতসী ছায়াময়ী হতে থাকল। মিলিটারি থেকে রিটায়ারমেণ্ট নিয়ে যখন তিনি এই শহরে, উঁচুর দিকে ওঠার কাজে ব্যস্ত, তখন অতসী বালিগঞ্জ প্লেসের বিশাল বাড়িতে প্রেতিনীর মতো প্রায় কায়াহীন শূন্য চোখে ঘুরে বেড়ায়। রাজ্যের কুকুর আর বেড়াল জড়ো করেছে, রাস্তার ভিখারি বাচ্চা ডেকে ডেকে খাওয়ায়। বিশেষত মেয়ে দেখলেই। অতএব রীমা রীতার দরকাব হলো। গোল্ডি ছুটিতে এসে বলে—'মা, কুকুর পুষবে তো ভালো কুকুর পোষো, পেডিগ্রি দেখে, কোত্থেকে এই খেঁকি-নেড়িগুলো জড়ো কবেছো?' শান্ত, কিন্তু কেমন একরকম দৃঢ় চোখে চেয়ে অতসী বলে 'আমি যদি থাকি ওরাও থাকবে।' গোল্ডি গার্ল ফ্রেন্ডকে হিরো হন্ডার পেছনে বসিয়ে হু হু করে ছুটে চলে যায়। মাঝরাত্তিরে সামান্য মাদকের গন্ধ মুখে নিয়ে কর্নেল বাড়ি ফেরেন। অতসী, ক্ষীণা, অস্বাভাবিক সাদা বেতসী শোবার ঘরের দরজা খুলে কেমন একরকম চোখে তাকায়, তারপর সযত্নে কর্নেলের জামাকাপড় খুলে বাথরুমের বালতিতে ফেলে এসে, নাইট সুট পরিয়ে দেয়। শুইয়ে দেয়। দরজাটা বন্ধ করবার শব্দ পান কর্নেল। তারপর ঘুমিয়ে পড়েন। সকালে উঠে বুঝতে পারেন পাশটা সারা রাত খালিই ছিল।

'অতসী-ই, বেতসী-ই' কর্নেল চ্যাটার্জি ডাকছেন। নিঃশব্দে চৌকাঠেব ওপর এসে দাঁড়িয়েছে অতসী। টাইয়ের নটটা নিজে নিজেই বাঁধতে বাঁধতে আয়নার মধ্যে দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে মুখে নির্মল হাসি নিয়ে কর্নেল বলছেন—'মদ্য তো আমি আগেও পান করেছি, তখন তক-বিতর্ক করতে, তোমাব সঙ্গে যুক্তি-তর্কে আমি কখনোই পারতাম না, আফটার অল ইউ ওয়্যার দা ব্রাইটেস্ট স্টুডেণ্ট ইয়োর স্কুল হ্যাড সো ফার প্রোডিউসড। কিন্তু এত রাগ তো করতে না।'

আয়নার মধ্যে দিয়ে অতসী চেয়ে আছে। কোনও কথা বলছে না।

'—কি হল? কিছু বলো? দাও-টাও টাইটা ঠিকঠাক করে বসিয়ে দাও তো!' আফটার সেভের বোতলটা হাতড়াচ্ছেন কর্নেল। মুখ তুলতে তুলতে বলছেন—'কই দিলে না?'

কাকে বলছেন? আয়নার মধ্যে প্রতিবিম্ব অদৃশ্য হয়ে গেছে।

—'অতসী। অতসী!' রোববারের মরা মরা দুপুব। অতসী চৌকাঠ।

—'চলো আজ তোমার বাবাকে দেখে আসি। চট করে তৈরি হয়ে নাও। সাবিরকে গাড়ি বার করতে বলে দিয়েছি।' অতসী চৌকাঠে এখনও দাঁড়িয়ে।

—'কি হল? যাও!'

—'আমি গতকালই ঘুরে এসেছি।'

—'সে কি? বলোনি তো! সাবির বলেনি তো!'

—'সাবিরকে নিইনি!'

—'সে কি? তোমার এই শরীর, কি ভাবে গেলে! ট্যাক্সিতে?'

—'বাসে?'

—'সে কি? কেন?'

—'বৃদ্ধাবাসে গাড়ি নিয়ে ঢুকতে লজ্জা হয়'—অতসী আর দাঁড়ায়নি।

বাবা যখন অথর্বপ্রায়, শাশুড়ি মৃত, এত বড় বাড়িতে কর্নেল, তাঁর পত্নী এবং ভৃত্যকুল ছাড়া আর কেউ নেই, সে সময়ে কর্নেল-পত্নী বাবাকে এখানে নিজের কাছে এনে রাখতে চেয়েছিলেন। কর্নেল হেসে বলেছিলেন—'এই জন্য তোমার বুদ্ধির তারিফ করতে পারি না অতসী, সংসারে থার্ড পার্সন কখনও আনবে না। বাইরে, অন্য বাড়িতে রেখে তুমি বাবার যত খুশি সেবা-যত্ন কর না! টাকার অভাব হবে না।'

কাচের মতো চোখে চেয়ে অতসী বলছে—'আমার তো কোনও টাকা নেই!...বাবার একমাত্র আমিই আছি...

—'তোমার টাকা নেই! তোমার টা...নাহ্ অতসী, আই অ্যাম ড্যাম্‌ড্।'

শহরতলির কোন বৃদ্ধাবাসে জায়গা হয়েছে ভূগোল-শিক্ষক মিস্টার অমলেশ মুখার্জির। তাঁর নিজের সঙ্গতিমতো।

এ সপ্তাহে দেখে গেলেন। পরের সপ্তাহে প্রস্তুত হয়ে আসবেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে, ডানায় হাওয়া কাটার একটা মোহময় সু উ শ্ শ্ শ্ শব্দ শুনতে শুনতে ভাবলেন কর্নেল। অনেক অনেক দিন শিকার হয়নি, কোনও লক্ষ্যভেদ হয়নি। বন্দুকগুলোয় মরচে ধরছে। সাফ করতে হবে ভালো করে। নাকি তীর ধনুক? আর্চারি? এই বিশেষ খেলাটিতে তাঁর বড্ড সুনাম ছিল এক সময়ে। সব সময়ে এক নম্বর।

ফেরবার সময়ে হাইওয়েতে পড়ে মাথায় এলো কথাটা। দুইয়েরই পরীক্ষা হয়ে যাক। তীরন্দাজ এস. পি চ্যাটার্জি আর বন্দুকবাজ এস. পি. চ্যাটার্জি। সাবিরকে বলতে হবে ওর বউকে নিয়ে আসবে। হাঁসের মাংস পাকায় চমৎকার! একবার খাইয়েছিল। অবশ্য খাওয়াটা জরুরি নয়, জরুরি হল নিশানার পরীক্ষা। গোল্ডিটাও খুব ভালো করছে। ডিফেন্স অ্যাকাডেমিতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ একদম ঠিকঠাক লেগে গেছে সব। যেখানে যা লাগবার। গোল্ডিকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হবে না।

ডিসেম্বরের শেস সপ্তাহে, মরা বিকেলের আলোয় ছাদে রিভলভিং চেয়ার নিয়ে বসলেন কর্নেল চ্যাটার্জি। পাশে তাঁর পরিষ্কৃত পাখি মারা বন্দুক, আর গোল্ডেন রিট্রিভার। সাড়ে চার বছর বয়সের দুর্দান্ত আব এক গোল্ডি। বাচ্চাটাকে দেখে প্রথমেই তাঁর অতসীর কথা মনে পড়েছিল। 'কি একটা কুকুরের মতো নামে ডাকো ছেলেটাকে!' আহা, একেও গোল্ডি বলতেই ইচ্ছে করে তাঁর। কিন্তু ছেলে বাড়ি ফিরে বাবার কাণ্ড দেখে কিছু মনে করতে পারে। যতই যুক্তিনিষ্ঠ, যতই প্র্যাকটিক্যাল হোক! কর্নেল চ্যাটার্জি একে স্কাড বলে ডাকেন, যদিও মনে মনে বলে ফেলেন— গোল্ড, গোল্ডি। ওই চলে গেল প্রথম সারি। ওরা গিয়ে বসবে ঝিলের ধারে, গাছের ওপর বাসা বাঁধবে, ছোট ছোট টিলা শাদা করে বসে থাকবে। বন্দুকটা হাতে তুলে নিলেন কর্নেল— ডোণ্ট কিল এ সিটিং বার্ড। পাখিগুলো অর্ধবৃত্তাকারে উড়ে যাচ্ছে। তাদের কাজল পরা চোখের মতো ডানায় এখন

নিচের দিকে টান। একটা...দুটো...তিনটে...চারটে...দলছুট.. চতুর্থটা সামান্য দলছুট। তাতেই নিশানার সুবিধে হয়ে গেল। বুম্‌ম্‌ম্‌ম্‌...ঘুরতে ঘুরতে লাট খেতে খেতে পড়ছে। যতই নিচে নামছে গতিবেগ বাড়ছে। একদম অব্যর্থ লক্ষ্য। কোথায় লেগেছে গুলিটা তিনি এখনও জানেন না। লক্ষ্য ছিল পেটটার ওপর। ওই জায়গাটাই সবচেয়ে নধর তো! স্কাড ছুটছে, ছুটুক। তিনি তীর-ধনুক তুলে নিয়ে পেছন পেছন ছুটেছেন। পরনে শর্টস, হাফ-হাতা সোয়েটে শার্ট, পায়ে হান্টিং শু্য। ঝিলের কাছটা কাদা জলা। ওখানে এখন পাখিদের মেলা বসে গেছে। ওরা বোধ হয় বুঝতেই পারেনি। ওদের একজন সাথী কম পড়ে গেছে। এখন ঝিলের পানা, শ্যাওলা, গেঁড়ি, গুগলি, কুচো মাছ খেতে ভারি ব্যস্ত। কাদার মধ্যে ক্লাক ক্লাক করছে মেলাই।

কিন্তু এখানেও তিনি বসা পাখি মারবেন না। সেই যে শরীরটাকে লম্বা করে দিয়ে অসম্ভব সুন্দর ভাবে ডানা ঝাপটায়! সেই সময়ে, সেই সময়ে ছুটে যাবে অর্জুনের তীর। একটা বিশাল তেঁতুল গাছের পাশে দাঁড়িয়ে শরসন্ধান করলেন কর্নেল ; উঠছে, একটা পাখি উঠছে, টানছেন তিনি ছিলা টানছেন, হঠাৎ কনুইয়ে টান পড়ল ঃ 'ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যঃ...।' চমকে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলেন লুঙ্গির মতো করে ধুতি-পরা মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক।

—'কী করলেন? কে আপনি? হাউ ডেয়ার য়ু?' কর্নেল চ্যাটার্জি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে টকটকে লাল হয়ে গেছেন।

—'আমিও আপনাকে ওই একই প্রশ্ন ফিরিয়ে দিতে পারি। হাউ ডেয়ার ইউ?' সংযত কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে বললেন ভদ্রলোক।

—'এই নির্জন ঝিলের ধারে শামখোলগুলো কতদূর থেকে এসে জিরোতে বসেছে। ঝিলের সৌভাগ্য, আমাদের সৌভাগ্য, আপনারও অশেষ ভাগ্য যে এমন দৃশ্য দেখতে পেলেন। ওরা যেমন চায়, তেমনভাবে ওদের হাসতে দিন, খেলতে দিন, বাসা বানাতে দিন, বিশ্রামান্তে নতুন শাবক-দল নিয়ে দূরে আরও দূরে উড়ে যেতে দিন, যেখানে ওদের প্রাণ চায়। কী রাইট আছে আপনার ওদের হত্যা করবার?' ভদ্রলোকের চোখমুখ ক্রমশ তপ্ত হয়ে উঠছে। কর্নেল কিছু বলতে পারছেন না।

—'এ ঝিলে হঠাৎ শামখোল আসছে, সরকারের কাছে খবর চলে গেছে। শিগগিরই পাহারা বসবে।' ভদ্রলোক আর দাঁড়ালেন না। হনহন করে চলে গেলেন। নইলে দেখতে পেতেন স্কাড তীরবেগে ছুটে এসে কর্নেলের পায়ের কাছে মৃত পাখিটাকে ছুঁড়ে দিচ্ছে। সাদা লম্বা গলা। যৌবনাগমে ধবধবে বুক, বক্র চঞ্চুসমেত মুখটা ডান দিকে নেতিয়ে আছে। ডানা দুটো দুদিকে অসহায়ভাবে ছড়ানো, একটা ভেঙে ঝুলছে। ওইখানেই তাহলে লেগেছিল গুলিটা। খুব সামান্য এক ফালি রক্তের ধারা ডানায়। কর্নেলের চোখে কেমন ধাঁধা লেগে গেল। শাদা শাড়ি পরে কাত হয়ে পড়ে রয়েছে এক বিদ্ধ নারী। এক হাত ছড়ানো, আরেকটা লাল-মাদুলিপরা হাত কনুই থেকে ভাঁজ। দুটি পায়ের পাতা দুদিকে। শেষ শয়ন।

বারান্দা

আলমারির গা-আয়নায় চুল আঁচড়ানো এক মহা ঝামেলার ব্যপার। জলের ছিটে লাগবেই লাগবে। ঘোলাটে জলের ছিটে। পার্থর চুল খুব ঘন, একটু লম্বা। জলসুদ্ধ না আঁচড়ালে বসতে চায় না। এদিকে মায়ের কড়া হুকুম আছে, জলের ফোঁটা পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে মুছে দিতে হবে। মা বলে, বসন্তের গুটির মতো দেখায়। আয়না জিনিসটা পরিষ্কার করে মোছা কিন্তু কঠিন কাজ। এদিকটা ঠিক হল তো ওদিক দিয়ে ল্যাজ বেরলো। বাথরুমে একটা ছোটখাটো বেসিন আর আয়নার ব্যবস্থা যে কেন করা গেল না পার্থর মাথায় ঢোকে না। বললেই, মা বলবে—তুই করবি। এটা এমন কি একটা মহামারী ব্যাপার যে পার্থর জন্য অপেক্ষা করতে হবে! মা যেন বলতে চায়—তোর বাবা তোদের সবই করে দিয়েছে। ওই বেসিন আর আয়নাটুকুই যা বাকি। ওইটুকুই করে দেখা!

ধ্যাত্তেরি! যত শিগগির সম্ভব রাধুদার দোকানে একটা চোদ্দ ইঞ্চির বেসিন আর একটা আয়না-অলা ছোট ক্যাবিনেট দর করতে হবে। ওরাই মিস্ত্রি দিয়ে বসিয়ে দেবে। ট্যুইশনির রোজগার পার্থর নেহাত মন্দ নয়। তার জামাকাপড়, রাহা-খরচ, হোটেল-রেস্তোরাঁ, সিনেমা-থিয়েটার, ক্যাসেট-ট্যাসেট, এমন কি ছোটখাটো বেড়ানো পর্যন্ত সবই তাতে হয়ে যায়। উপরন্তু সে সব সময়েই কিছু না কিছু সঞ্চয়ের চেষ্টা করে যাচ্ছে! মায়ের হাতে মাঝে মাঝে কিছু দেয়ও। একটা বেকার ছেলের কাছ থেকে বাবা-মা আর কী আশা করতে পারে!

বাবা ঘরে ঢুকে বলল—তোর মাকে দেখেছিস? বাবার হাতে এক তাড়া খবরের কাগজ।

—এইটুকু তো কৌটোর মতো একটা জায়গা। যাবে আব কোথায়?—চিরুনির পেছন পেছন হাত-বুরুশ টানতে টানতে বলল পার্থ।

বাবা কী যেন বলবে বলে মুখ খুলেছিল। থেমে গেল আচমকা।

উত্তরের জানলা দিয়ে খুব শিরশিরে হাওয়া আসছে। সব কিছুর মতোই শীতও দেখা যাচ্ছে লেট হয়ে যাচ্ছে। কোথায় ডিরেইল্ড হয়ে পড়েছিল কে জানে! কত দিন টানবে তা-ও বোঝা যচ্ছে না। পাশের জমিটাতে দুটো শিমুল গাছ ন্যাড়া হয়ে এসেছে। হলদে পাতা দু-চারটে লেগে আছে মাত্র। দেখতে দেখতে আরও একটা বছর কেটে গেল। কিচ্ছু হলনা এখনও। সে কি তবে কনফার্মড বেকার হয়ে যাচ্ছে না কি! অচিন্ত্যদার মতো? গা-টা শিরশির করে উঠল। পুরনো পাড়ায় অচিন্ত্যদা ছিল উৎসহী পাড়া-দাদাদের একজন। পুজোর চাঁদা, জলসা, কেউ মরলে শ্মশানবন্ধু জোগাড় করে কাঁধ এগিয়ে দেওয়া সব বিষয়েই এক নম্বর। বি. কম-টম কিছু একটা পাস করল বোধহয়। স্টেনোগ্রাফি, টাইপরাইটিং শিখলো, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নামও লেখালো। তখন পার্থরা স্কুলের নিচের ক্লাসে পড়ে। চারদিকে এত কম্পিউটার সেণ্টার হয়নি। অচিন্ত্যদা বলত, চাকরি পেলেই চকলেট খাওয়াবে। কিন্তু চাকরির জন্য অনন্ত প্রতীক্ষা বেচারির আর শেষ হল না। ক্রমে এক বছর পুজো-মণ্ডপে ব্যস্ত পাড়া-দাদাদের মধ্যে অচিন্ত্যদাকে আর দেখা গেল না। কবে যে সে সব বিষয়ে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে, কবে যে তাকে হেপাটাইটিসে ধরেছে, সে যে খাচ্ছে না, বিছানা থেকে উঠছে না কেউই খেয়াল করেনি। অচিন্ত্যদা লোকচক্ষুর অগোচরেই মরে গেল। স্রেফ মরে গেল। একজন অত্যন্ত সাধারণ ছেলে যদি জীবন-দৌড়ে ক্রমে পিছিয়ে

যায়,তবে? তবে সে বাতিল হয়ে যায় এইভাবে। তাব চেয়ে এম. এ পাশ করেছি, ল'পাশ করেছি এ সব গ্যাদা গুমোর না রেখে যা হোক একটা ব্যবসা ধরে ফেলা ভাল! জেরক্স আজকাল ভাল ব্যবসা। যে কোনও জিনিসের তিন-চারটে ফটোকপি চাওয়া ফ্যাশন হয়েছে আজকাল। লাইব্রেরির বই পর্যন্ত আজকাল কেউ নোট করে না। সব জেরক্স। বাবাকে ফটোকপি মেশিন কেনার কথাটা সে বলেছিল ক'মাস আগে। তা বাবা বলল—এফ ডি, ভেঙে, ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে না হয় তোর মেশিন হল। কিন্তু বসবি কোথায়? একটা চার বাই আট-দশ ফুট দোকানঘরের ভাড়া-সেলামি এখন কত শুনবি?

বলেই বাবা বলেছিল—আহা, বাড়িটা বেচে দিলুম! থাকলে নিচের ঘরটাতে বসতে পারতিস!

পাঁউরুটিতে দ্রুত হাতে মার্জারিন লাগাতে থাকে পার্থ। ঘুম থেকে উঠতেই আজ দেরি হয়ে গেছে। আসলে আজ ট্যুইশ্যনিতে যেতে হবে তার মনেই ছিল না। মাকে হাতের কাছে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। দ্বিতীয় কাপ চা-টা বোধহয় হবে না। না-ই হোক। সিংঘিদের বাড়িতে তো চা-টা দেবেই। টা যা দেবে সে সব অবশ্য শৌখিন খাবার। সাবুর পাঁপর, সন্দেশ, রসগোল্লা, ডালমুট। ও সবে পেট ভরে না। তাছাড়া পড়াতে গিয়ে রোজ রোজ খেতে কেমন ঘেন্নাও করে তার। টিউটর বলেই হ্যাংলা, হা-পিত্যেশ মনে করিসনা বাবা। যাঃ, নিযে যা তোদেব পাঁপর-সন্দেশ, অনেক খাওয়া আছে ও সব। তবে চায়ের কথা আলাদা, চায়ের যেমন কোনও ফুড-ভ্যালু নেই, তেমনি কোনও সময়-অসময়ও নেই। চা-টা সুতবাং চলতে পারে। ছাত্র-বাড়ির চায়েতেও অবশ্য চূড়ান্ত অবহেলা দেখিয়ে থাকে সে। খাতা দেখছে তো দেখছেই, লেকচার দিচ্ছে তো দিচ্ছেই। ছাত্র-ছাত্রী এক সময়ে বলবে—কী হল পার্থদা! চা-টা তো বরফ হয়ে গেল!

—ওহ হো, যাকগে। এদিকে দেখোঁ, আবার সেই ভুল করেছো.....ঠাণ্ডা চা-টা এক চুমুকে খানিকটা খেয়ে মুখটা সামান্য বিকৃত করে কাপ নামিয়ে রাখে পার্থ।

—আরেক কাপ আনব? আনি?

—নাহ্, বেশি চা খাই না। এদিকে মন দাও তো দেখি.....

এই আচরণ করে পার্থর নিজেকে বেশ বড় বড়, গম্ভীর-গাম্ভার প্রতিষ্ঠিত, মর্যাদাবান মানুষ বলে মনে হয়। নিজের কাছে নিজেকে মর্যাদার যোগ্য মনে হওযাটা খুব জরুবি।

কেন এই বিশ্রী আত্মসচেতনতা? কবে থেকেই বা হল? চেষ্টা করেও এ রোগটা সে তাড়াতে পারছে না কেন?

মা ঢুকছে। এক কাপ দুধ এনে রাখল।

—কার? এটা?

—তোর। আবার কার? পাউরুটিগুলো শুকনো খাচ্ছিস!

—বাবাকে দাও না!

কেমন আহত চোখে তার দিকে তাকাল মা। পরক্ষণেই চোখের ভাব বদলে গেল। একটু যেন কঠিন।

—খেয়ে নে।

বাবা তড়বড় করে ঢুকে বলল—রিপাবলিক ডে বলে তিনটে কাগজ দিতে কি তুমি বলেছ?

মা বলল—না তো! তুই বলেছিলি নাকি পার্থ?

—ঘাড়ে ক'টা মাথা আমার?

মার চোখে তিবস্কার। বাবা বলল—দেখো তো! কেউ বলেনি, অথচ এক তাড়া কাগজ গুঁজে দিয়ে গেছে কোল্যাপসিবলের খাঁজে। দেখাচ্ছি মজা! এবার দাম দেব না এসব কাগজের।

এক চুমুকে দুধটা শেষ কবে দরজার দিকে পা বাড়াল পার্থ, বলল—দ্যাখো, হয়ত দাদাদের অর্ডার ছিল, ওখানে দিতে গিয়ে এখানে দিয়েছে!

সিঁড়ি ভাঙতে লাগল সে। চারতলায় ফ্লাট তাদেব। তার কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু বাবার হার্টের গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। অ্যানজাইনার ব্যথা হয়। বাবার পক্ষে এই চারতলার সিঁড়ি বোজ রোজ ভাঙা মোটেই ঠিক নয়। মায়ের হাঁটুর ব্যথা। শতকরা নিরানব্বই জন বাঙালি মহিলার এই আর্থারাইটিস জাতীয় কিছু একটা হবেই। তবুও চূড়ান্ত অদূরদর্শীর মতো বাবা এই ফ্লাটটা কিনল। বাড়িটা তাদের পুরনো হয়ে গিয়েছিল, আপাদমস্তক সারানো মানে পঞ্চাশ যাট হাজার টাকার ধাক্কা, সেটা বাবাব পক্ষে বার করা মুশকিল ছিল। সবই ঠিক। কিন্তু কথাটা হচ্ছে, বাড়িটা তো বাবা সে জন্যে বিক্রি করেনি! করেছে দাদার ম্যানেজমেণ্ট পড়বার টাকা জোগাড় করতে। এই ছোট্ট ফ্লাটটা কিনে দাদার পড়ার খরচটাও হযে যাবে বলে বাবা ঝট করে বাড়িটা ঝেড়ে দিল। দাদা এঞ্জিনিয়ারিং শেষ করতে না করতেই ভাল চাকরি পাচ্ছিল। তারাই কোনও সময়ে ওকে ম্যানেজমেণ্টের কোর্স করিয়ে নিত, কিন্তু দাদাব তর সইল না। সবচেযে দামি কোর্স করার জন্যে পরীক্ষা দিয়ে, ইণ্টারভিউ দিয়ে একেবারে গেট সেট গো। দাদা চাকরি করলে যে সুরাহাটা হত সেটা তো হলই না, উপরন্তু অতিরিক্ত টাকার ধাক্কা। ঠিক কত টাকা, বাবা-মা তাকে বলেনি কখনও। কিন্তু লাখেব যথেষ্ট ওপরে হবেই এ বিষয়ে তার কোনও সন্দেহ নেই। তাদের মতো পরিবারের ছেলের এই ধরনের গা-জোয়ারি উচ্চাকাঙ্ক্ষার কোনও যুক্তি আছে!

বাবার যুক্তি ছিল—তীর্থ ওখান থেকে পাশ করেই বিশাল একটা মাইনের চাকরি পাবে। পার্থর বলার ইচ্ছে হয়েছিল— াকরিটা তীর্থ পাবে বাবা, তুমি তো কিছুতেই পাচ্ছ না!

ইচ্ছে হলেও সব কথা বলা যায় না। পাঁচ বছর আগেকার কথা তার ওপর। বয়সটাও তো পাঁচ বছর কম ছিল! তবু কিছু কিছু বলতে সে ছাড়েনি। দাদাকেই বলেছিল—তোর একটা অ্যামবিশন পূর্ণ কববার জন্যে বাবাকে তার পিতৃপুরুষের বাড়ি বিক্রি করতে হচ্ছে, এটা তুই কেমন করে হতে দিচ্ছিস আমি জানি না দাদা।

দাদা অদ্ভুত একটা কথা বলেছিল, একেবারেই সেটা আশা করেনি কেউ, পার্থ না, বাবা না, মা তো না-ই।

দাদা বলেছিল—পিতৃপুরুষ তো আমারও, বাড়িটায় আমারও তো অংশ আছে!

বলে ফেলে খুব অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল দাদা—আমি প্রতিটি পাই পয়সা শোধ করে দেব বাবা, দেখো!

তা অবশ্য দিতে চেয়েও ছিল দাদা, বাবা এত বোকা, এত সেণ্টিমেণ্টাল যে নিল না। বোধহয় পিতৃপুরুষের বাড়িতে বড় ছেলের অংশ থাকার কথাটা বিঁধেছিল বুকে। হয়ত ভেবেছিল টাকাটা যদি ঋণও হয়, সে ঋণ শোধ না হলে ছেলের সঙ্গে সম্পর্কটা পোক্ত থাকবে। টাকাও হারালো, ছেলেও বাবা-মার থাকল না। টাকাটা থাকলে পার্থর ফটো-কপি মেশিন ও আনুষঙ্গিকের একটা সুরাহা হত। কিংবা কে জানে, বাবা হয়ত এক ছেলেকে দিয়ে ঠকেছে বলে আর এক ছেলেকে আর দিতই না।

নিজেকে এক সময়ে খুব নিচ মনে হল পার্থর। বাবা এই সেদিনও খেদ করছিল, পুরনো বাড়িটা থাকলে তার একতলার রাস্তার দিকের ঘরটায় পার্থর ফটো-কপি-মেশিন, ক্রমে ক্রমে অ্যামোনিয়া প্রিন্টিং মেশিন এ-সব বসতে পারত।

বাবা আসলে একেবারেই প্র্যাক্টিক্যাল নয়। বাড়িটা যতই পুরনো হোক, ছোট হোক, একটা গোটা বাড়ি। ছিলও কর্নার প্লটে। লোকেশনের একটা আলাদা মূল্য আছে। ফট করে যা পেল নিয়ে বেচে দিল। এই ফ্ল্যাটটা সাতশো স্কোয়ার ফুটের। দুটো ছোট ছোট শোয়াব ঘর। বসার ঘর ছাড়া এক চিলতে খাবার জায়গা আর দক্ষিণে এতটুকু একটা বাবান্দা। বিয়ে করে দাদার সুবিধেই হল আলাদা থাকবার। একই তলায় উল্টোদিকের ফ্ল্যাটটা খালি ছিল। সেটাই ভাড়া নিয়ে আছে। তবে শিগগিরিই দিল্লি কি বোম্বাইয়ে পোস্টিং পেয়ে যাবে। তারপর আর এই আবাসনে দাদা ফিরছে না। একথা বাবা-মা যদি না-ও জানে, পার্থ অভ্রান্তভাবে জানে।

সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে একটা বিশ্রী ঠোক্কর খেল পার্থ। কয়েকটা থান ইট সাবি বেঁধে রাখা। ছিটকে পড়ছিল পার্থ। খুব সামলে নিয়েছে। তিনটি বালক ঢুকছিল গেট দিয়ে। শাঁ-শাঁ করে ছুটে এল।

—চোট লাগল? পার্থদা? পচা বলল।

— কে রেখেছে এখানে থান ইটগুলো?

—আমরা—অপরাধী গলায় বলল ওরা, ছাদ থেকে নামিয়ে আনছিলুম....উইকেট হবে....

—চমৎকার! তা আমাকেই তো আউট করে দিচ্ছিলি। সঙ্গে সঙ্গে এগুলো সরাতে কী হয়েছিল?

—দ্যাখো না, দ্যাখো না, তিনজনে কলকল করে ওঠে—হাওয়াই চপ্পল দিয়ে বেল বানাচ্ছি রাজুটা ফালতু ফালতু তক্কো জুড়ল. .।

—কী তক্কো? পার্থ প্যান্টের ক্রিজ ঠিক করতে করতে বলল।

রাজু বলল—আচ্ছা পার্থদা, মোহব্বৎ ঔর প্যার, এক হী চীজ ক্যা? পচা বোলতা, প্রেম ভালোয়াসা হী এক। এক হী মত্‌লব। সচ্‌!

তৃতীয় খোকা মুন্না বলল, ওতো বলছে লভও এক

মুন্না এ বাড়ির কেয়াব-টেকাব কাম দাবোয়ান মিশিবজিব ছেলে। বাজু আব পচা ওব বন্ধু। দশ-এগারোব মধ্যে বয়স ওদের। শব্দগুলো ওদের মুখে খুবই কিম্ভুত শোনাচ্ছিল।

—তা তফাতটা কী? কী বলে মনে হচ্ছে? পার্থ কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল।

রাজু বলল—মোহাব্বৎ হচ্ছে দুখ, বহোৎ দুখ দেয়, লায়লা-মজনু জৈসা, ঔর প্যাব মিঠা মিঠা। সুহাগ রাত বনায় গা, ঘুংঘট উতারেগা।

—আর প্রেম ভালোবাসা?

—উও সব ফালতু কহানীতে থাকে। কোনও মানে নেই।

—বাঃ। আর লভ্?

এবার তিন বালক পরস্পরের দিকে কেমন অশ্লীল চোখে চাইল। দু আঙুল মুখে পুরে সিটি দিল রাজু।

মুন্না ছেলেমানুষের গলা হেঁড়ে করে গেয়ে উঠল—লব্ তুঝে লব মাঁয় করতা হুঁ।

রাজু বলল—বাস্। এহী চীজ।

পার্থ বলল—পথ ছাড়। যেতে দে।

—কে ঠিক বলল, বললে না?

—ওরকম বাজে সিটি-ফিটি দিলে বলছি না।

মুন্না বড় বড় চোখে চেয়ে বলল—ক্যা কসুর? অ্যাক্টিং তো!

—আরেক দিন বলব, আজ দেরি হয়ে গেছে—পার্থ পথে নেমে পড়ল।

বাস-রাস্তা, দুশ পনেরো নম্বরে গাদাগাদি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লাট খেতে খেতে অবশেষে সিট পাওয়া। একজনের পা মাড়িয়ে দেওয়া, কানা কিনা প্রশ্ন শোনা, হাওড়া ব্রিজে যথারীতি খানিকটা জ্যাম....চুপচাপ বসে থাকা অবশেষে হাওড়া ময়দান....পঞ্চাননতলার দিকে অভিযান। সারাক্ষণই পার্থর মনে রাজু-মুন্নার অভিনব ব্যাখ্যা ঘুরছে। প্যার মিঠা, মোহাব্বৎ বহোৎ দুখ দেয় আর প্রেম ভালবাসা ফালতু কহানীতে থাকে।

সবই কহানীতে থাকে বস্তুত। এবং সেই কাহিনী চিত্রের মাধ্যমে মূর্ত হলে তবেই তার একটা বোধগম্য অর্থ দাঁড়ায়। বোকা-বোকা প্রেম ভালবাসা, স্মার্ট-স্মার্ট প্যার-মোহাব্বৎ সবই কহানীর জিনিস, পুরাণে লোককথায় নৈর্ব্যক্তিক অবাস্তবতার আশ্রয়ে রয়েছে। এবং লভ? লভ কী? কোথায় দাঁড়িয়ে আছে? যেখানে যতেক মস্তানি, রোড-রোমিওগিরি, এমন কি রেপ, মুখে অ্যাসিড বালব্, ছাদ থেকে ঠেলে দেওয়া সব স-বই লভ এবং লভ্-জাত। লব্ তুঝে লব ম্যাঁয় করতা হুঁ।

রাজু—মুন্নারা ক্রমশই প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ, ব্যঞ্জনা, অনুষঙ্গ সম্পর্কে আরও আরও ওয়াকিবহাল হয়ে উঠবে। পার্থকে বা আর কাউকেই জিজ্ঞেস করতে হবে না, এমন দিন ওদের বেশি দূরে নেই।

ছাত্রী মধুমিতার বাবা একটা হাফ পাঞ্জাবি আর লুঙ্গি পরে নিজেদের বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়য়ে বাজখাঁই গলায় প্রতিবেশীর সঙ্গে গল্প করছেন। ওঁকে দেখলে শীত-গ্রীষ্ম বোঝা যায় না। পার্থকে দেখে বললেন—আজ রিপাবলিক ডে। বিশ্বসুদ্ধ সব্বার ছুটি, তোমার ছুটি গ্রান্ট হল না? সে কি হে?

—পরীক্ষা এবছর এগিয়ে এসেছে যে! পার্থ হাসল।

—ছাত্রী তো টিভি খুলে প্যারেড দেখছেন।

—এসে যাবে।

দু-তিন সিঁড়ি টপকে টপকে তিনতলায় উঠে গেল পার্থ। দোতলাটা পুরো মেয়েমহল। সবজি কাটা হচ্ছে, পান সাজা হচ্ছে, উচ্চৈঃস্বরে গল্পগাছা, কাজকর্ম হচ্ছে, মাছ-ভাজার গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে রয়েছে। তেলে ফোড়ন ছাড়বার চড়বড় শব্দ। কেমন যেন বে-আব্রু হয়ে যায় অন্দর, বাইরের কেউ এখান দিয়ে যাতায়াত করলে। এঁরা হাওড়ার বনেদি ধরনের মানুষ। বিরাট বিরাট চেহারা পুরুষদের। খোলা গলায় হাসেন, দরাজ গলায় বাড়ি কাঁপিয়ে কথা বলেন, পায়ের ওপর পা দিয়ে তাকিয়া কোলে ছুটির দুপুরে তাস খেলেন। তাসের আড্ডায় গোছা গোছা পান এসে যায়। এঁদের বাড়ির মেয়েরা টকটকে ফর্সা। বৃদ্ধারা মোটা, রোগা মহিলাগুলি বাড়ির বউ, উদয়াস্ত খাটেন। বাড়ির কাজ-কর্মে, অন্তত পার্থর চোখে, কোনও শৃঙ্খলা নেই। চা এবং পান তো সর্বক্ষণ তৈরি হচ্ছে। আর, কত

মিষ্টান্ন যে এঁদের ভাঁড়ারে মজুত থাকে তার ই'ত্তা নেই। নিজেরাও খান, অকাতরে বিলিয়েও যান।

অন্দরমহলের মাঝ মধ্যিখানে একখানা ঘরে ন পড়াত আগে। তখন অন্দরমহলের যাবতীয় শব্দ, যাবতীয় কার্য-কলাপ তার কর্ণগোচর হত। একদিন বাড়ির কোনও বউ, মধুমিতাব মা-কাকিদের কেউ নিজ শাশুড়ি ও তাঁর খাস দাসীর মুণ্ডপাত করছিলেন, মধুমিতা খুব লজ্জা পেয়েছিল। তারপব থেকে তিনতলার একটা একটেরে ঘরে পড়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

এখন সিঁড়ি টপকে টপকে সেই তিনতলার টুঙ্গি ঘরেই গিয়ে উপস্থিত হল সে। মেঝে চকচকে লাল। চকচকে কালো বর্ডার দেওয়া। মোজেইক, মার্বেল সব কিছুকেই হাব মানায় এদের এই চকচকে লাল মেঝে। লম্বা লম্বা গরাদ দেওয়া দরজার মতো জানলা সব। পুরোটা খুলে দিলে মনে হয় আকাশে বসে আছি। চারপাশের সব কিছুই দেখা যায়। সব কিছু অবশ্য খুব সুবিধের নয়। চাপ চাপ বাড়ি। সোজা এক লাইনে চলে গেছে। মাঝখানে বেশিরভাগই এতটুকু ফাঁক নেই। কোথাও বা খোলা নর্দমা চিকচিক করছে। অদূরে বাজার এবং তজ্জনিত ভিড়, বেসুরো হইচই।

টেবিলের ওপর বইপত্র সব গুছোনো। বিষয় ভাগ করা। মধুমিতা খুব গুছোনো মেয়ে, এটুকু বলতেই হবে। ওর দিদি দেবমিতা পড়াশোনায় খুবই ভাল ছিল, মধুমিতা তার ধার দিয়েও যায় না। কিন্তু খুব পরিপাটি। হাতের লেখাও চমৎকার, গোটা গোটা, ভুল গুলো নিয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

এই উকিল-তনয়াকে মাধ্যমিকের সময় থেকেই টেনে তুলছে পার্থ। সে সময়টায় বাড়ি বিক্রি আর ফ্ল্যাট তৈরির ফাঁকে তারা হাওড়ার সন্ধ্যা বাজারে বাস করছিল। হাতের কাছে এই ট্যুইশনিটা পেয়ে বেঁচে গিয়েছিল সে, দুই বোনেই পড়ত তখন। বড়টি তখন ফাইন্যাল ইয়ার, পলিটিক্যাল সায়েন্সে অনার্স। নিজেও পড়ুয়া মেয়ে ছিল, পার্থকেও প্রচুর খাটিয়ে নিত। দেবমিতার বিয়ে হয়ে গেলে এখন শুধু মধুমিতা! এখনও খাটুনি আছে তবে তার ধরন অন্যরকম। মধুমিতাকে এক জিনিস অন্তত তিনবার লেখাতে হয়। অথচ মধুমিতার বাবা তাকে ছাড়তে চান না। ছাত্রী সম্পর্কে তারও যে একটা দায়িত্ববোধ জন্মে যায়নি একথাও বলা যায় না। একটা রোখ। গ্র্যাজুয়েশনের গণ্ডিটা পার করিয়েই ছাড়বে।

কিছু টাস্ক দেওয়া ছিল। কিন্তু টেবিলের ওপরটা পরিষ্কার। সামনে কোনও খাতা দেখতে পেল না পার্থ। কিছুক্ষণ বসে বসে বিরক্ত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। লিখতে দিলেই মধুমিতা এই কীর্তি করবে। লিখতে নারাজ। করবে তো এ বই সে বই থেকে সংকলন। যাকে বলে পাইল দেওয়া। এই কাজটাই দেবমিতা করত চমৎকার। মধুমিতাকে সে প্রাণপাণে শেখাচ্ছে, পারছে না। বোধহয় পারবার ইচ্ছেটাই নেই। বাপের পয়সা-কড়ি আছে। আদুরে তার ওপর। এদের কোনও তাগিদ থাকে না পড়াশোনার। বইয়ের পাঁজায় একটা ময়ুরের পালক গোঁজা একটা খাতা এবার চোখে পড়ল পার্থর। টেনে বার করল খাতাটা। ঠিক। এটাই। ময়ুরের পালক, বট-পাকুড়ের পাতা, চাঁপা ফুল এই সব নিয়ে বই-খাতার মার্কা করা মধুমিতার রীতিই বটে। খাতাটা সামনে রাখতে কী হয়েছিল? উল্টে-পাল্টে দেখল পার্থ। নাঃ লিখেছে। তবে এডিটিং-এর কাজ আজও ভাল হয়নি। মাঝে মাঝে স্টার মার্ক দিয়ে লিখে দিতে হবে তাকে।

উত্তরটার শেষ পাতায় এসে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল পার্থ। ঘটা করে লেখা—সমাপ্তি। কিন্তু তারপর কোলন ড্যাশ দিয়ে যা লেখা তা কোনওমতেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রশ্নোত্তরের সমাপ্তি নয়।

পার্থদা, আপনি বোক.. না অন্ধ জানি না। যদি আমায় কোনওদিনই বুঝবেন না তবে আমার জীবনে এলেন কেন? আমার কিছুই ভাল না। সবই কত সুখী। আমার একারই খালি মন-খারাপ করে। নীরস বইগুলো শুধু আপনি পড়ান বলেই পড়ি। আপনা'ব তেতো বকুনিগুলোও একই কারণে দিনের পর দিন হজম করি। এ পাড়ার সুজনদা (চার্টার্ড), আমার বন্ধুব দাদা সিদ্ধার্থ (ওষুধের বিজনেস) আমার জন্যে পাগল। কিন্তু আমার কাউকেই ভাল লাগে না। আপনাকে ছাড়া কাউকেই ভাবতে পারি না। জানি, আপনি বলবেন—আপনার চাকরি নেই। কিন্তু এম.এ.বি.এল পাশ করেছেন। ইনকাম-ট্যাক্স প্র্যাকটিস করুন না। বাবাকে একটু ধরলেই হেলপ কববে (দয়া করে বকা দেবেন না)।

চোখ না তুলেও পার্থ বুঝল মধুমিতা এসে দাঁড়িয়েছে। কোনও লাল ড্রেস পরেছে বোধহয়, রোদ আড়াল করে লাল ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। আড়চোখে দেখে খাতার মধ্যে মুখ ডোবাল পার্থ। টকটকে ফর্সা মধুমিতা। একেবারে লাল হয়ে গেছে। চশমার আড়ালে চোখ দুটো স্তিমিত।

—আমি কি আসব? ক্ষীণ গলায় জিজ্ঞেস কবল।

পার্থ জবাব দিল না।

—আসব?—গলা কাঁপছে ওর।

—তোমার ঘরে তুমি আসবে না তো কি ইউ.এস.এ-র ফার্স্ট লেডি আসবেন? —খাতায় এটা কী করেছো?

মধুমিতা কেঁদে ফেলল।

—কী? বলো? নরমতর গলায় প্রশ্ন করল পার্থ।

—বলতে পারিনি বলেই তো লিখেছি।

—মানে কি এর? ইয়ার্কি? ফাজলামি?

—ইয়ার্কি নয়। কোনও মতে বলল মধুমিতা।

—তোমার বাবা আমাকে বিশ্বাস করেন। এ সব জানতে পারলে কী মনে করবেন বলো তো!

মুখ তুলে তাকাল মধুমিতা। চোখে তিরস্কার।

—বাবাকে জিজ্ঞেস করে কে কবে প্রেমে পড়েছে পার্থদা!

হঠাৎ পার্থর খুব হাসি পেয়ে গেল। বলল—প্রেম? না মোহাব্বৎ? না প্যার? ঠিকঠাক বলো তো!

—আমার ফিলিংস নিয়ে মজা করছেন?

—মজা করছি না, আজ এখানে আসার সময়ে আমাদের ফ্ল্যাটের দারোয়ানের পুঁচকে ছেলে আর তার পুঁচকে বন্ধুদের কাছ থেকে খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাখ্যা শুনছিলাম।

—যেমন?

—ওরা বলছিল—প্রেম-ভালবাসা ফালতু কহানীতে থাকে। কোনও মানে নেই এগুলোর।

মধুমিতার চোখে এখনও জল। মুখের লাল ভাবটা কেটেছে। বিনুনি ঝাঁকিয়ে বলল—আপনার দারোয়ানের ছেলের ব্যাখ্যা আমায় মানতে হবে নাকি!

—না তা নয়। তবে চতুর্দিকের রিয়্যালিটি ওই কথাই বলে। ফিল্‌ম আর জীবন তো এক নয়।

পার্থ অস্বস্তি ঢাকতে একটু ইতস্তত করেই উঠে দাঁড়াল।

—চলে যাচ্ছেন?

—তোমার লেখাগুলো কারেক্ট করে দিয়েছি। প্রচুর অ্যাসটারিক্স পড়েছে। আরও চওড়া মার্জিন রাখা উচিত ছিল।

—চলে যাচ্ছেন? জোর দিয়ে প্রশ্নটা আবারও করল মধুমিতা, চোখ নামিয়ে নিয়েছে, ঠোঁট কাঁপছে খুব। পার্থ দৃশ্যটার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

—টিউটরের সঙ্গে প্রেমটা কিন্তু সত্যিই খুব হ্যাকনীড, খুব বস্তা পচা মধুমিতা। ডোন্ট বি ক্যারেড অ্যাওয়ে।

—পাড়ার ছেলের সঙ্গে, বন্ধুর সঙ্গে, দাদার বন্ধুর সঙ্গে, ক্লাস ফেলোর সঙ্গে.......সব প্রেমই খুব পুরনো পার্থদা। —প্রেম জিনিসটাই অনেক অনেক পুরনো........

—ইনকাম-ট্যাক্স প্র্যাকটিস করবার কথা ভাবলেন?—মধুমিতার সাহস হু হু কবে বাডছে।

—তোমার বাবার জামাই আর জুনিয়র একসঙ্গে হওয়া হয়ে উঠবে না।

—কেন? মানে লাগবে?

—হ্যাঁ। তবে আমার নয়, তোমার। শোনো মধুমিতা, ব্যাপারটা ভাল করে ভেবে দেখো। ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দিও না। পস্তাবে।

পার্থ বেরিয়ে এল। তার অভ্যস্ত দ্রুততার সঙ্গে নামতে নামতে সে বুঝতে পারছিল, তার পা কাঁপছে। হাতের পাতা খুব ঘেমেছে। এদের বাড়িতে ছুটির দিনের নানাবিধ মজায় সবাই এমন মশগুল যে, কেউ খেয়ালও করল না, টিউটর তাব সময়ের আগেই চলে যাচ্ছে। টিউটরকে চা দেওয়া হল না। সে জুতো পায়ে গলাল। এক পায়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফিতে বাঁধল। বৈঠকখানা ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় বাজখাঁই গলার উল্লাসধ্বনি শুনতে পেল। —এই নাও, তোমার টেক্কা ট্রাম্পড্‌। একে বলে টেক্কার ওপর টেক্কা মারা—হাঃ হাঃ হাঃ হা হা।

এই বেঁচে থাকার, নিশ্চিন্তে খেয়েপরে রোজগার করে বেঁচে থাকার হাসি আনন্দ উল্লাস—এ খানিকটা আলাদা জগৎ। এ যেন এ দশকের জীবন নয়। এ শতকেরই নয়। অনেকদিন আগেকার অত্বরিত এ জীবনযাত্রা কোথাও কোথাও ফসিলের মতো রয়ে গেছে। পার্থদের উর্ধ্বশ্বাস জীবনের সঙ্গে এর কোনও মিল নেই। ওপরের ওই টুঙ্গি ঘবে লাল ঠোঁট সাদা পায়রার মতো ওই মেয়েটির চোখে অশ্রু—এ-ও যেন একটা এমন জগৎ যা বহুদিন আগেকার একটা স্মৃতির মতো। কোনওদিন নিশ্চয়ই সত্য ছিল, এখন অবাস্তব।

পার্থ মনে মনে চেঁচিয়ে হেসে উঠল। কী ভাববেন মধুমিতার বাবা মিহিরবাবু যদি ঘটনাটা জানতে পারেন! এমনিতে অতি সদাশয় ব্যক্তি। দেবমিতার বিয়ে হয়ে যাবার পর তার দক্ষিণা একটি পয়সাও কমাননি। পার্থ বলেছিল, তা সত্ত্বেও না।

—আরে তোমার মতো সিনসিয়ার টিচা' টাকাটা কিছুই না। জিনিসপত্রের দাম কি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে? হু-হু-হু-হু করে চড়ে যাচ্ছে সব। তারপর আসছও তো এখন অনেক দূর থেকে। তবে হ্যাঁ, আমি যদি অ্যাফোর্ড করতে না পারতুম তো নানান কথা বলতুম হয়তো তোমায়। তুমি মনে কোনও কিন্তু রেখো না পার্থ।

টিউটর হিসেবে, মানুষ হিসেবেও তাকে পছন্দ করেন উনি। কিন্তু মেয়ের প্রেমিক হিসেবে? ওঁব বড় জামাইকে দেখলে ওঁর পছন্দ বোঝা যায়। লম্বা, নধরকান্তি, বেশ জামাই-জামাই। হঠাৎ দেখলে যদি দুধ-ঘি খাওয়া ক্যাবলাকান্ত মনে হয়, সে মনে হওয়া ভুল। এম-এস ডাক্তার। শিগগিরই বিদেশ যাবে। তাব পাশে পার্থ বিশ্বাস? একটা এম-এ ডিগ্রি, একটা এল.এল.বি। কোনওটাই ভালো নয়। হাইট পাঁচ আট। রঙ মাঝারি। স্বাস্থ্য মোটামুটি। দাড়ি-গোঁফ দুই-ই থাকায় একটা বোহেমিয়ান বোহেমিয়ান চেহারা। বাবা-মার একটা সাতশ স্কোয়্যার ফুটের ফ্ল্যাট আছে উত্তর কলকাতায়। উদ্বৃত্ত পয়সা-কড়ি কিস্যু নেই।

হঠাৎ গোঁত্তা খেল পার্থ। আচ্ছা, মধুমিতা তার এই দাড়ি-গোঁফের প্রেমে পড়েনি তো? সে শুনেছে দাড়ি-গোঁফে তাকে খুব আঁতেল-আঁতেল, ভাবুক-ভাবুক দেখায়। অনির্বাণ তার বন্ধু বলে—হেভি অ্যাপীল তোর পার্থ।

ঘড়ি দেখল পার্থ। সাড়ে এগারোটাও বাজেনি। আজকের সকালটা দেওয়া ছিল মধুমিতাদের বাড়িকে। অপ্রত্যাশিত ছুটি মিলে গেল। কিন্তু এখনই বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না। অনির্বাণদের ওখানে গেলে হয় না? ব্যক্তিগত ব্যাপার কারও সঙ্গে আলোচনা করার ধাত নেই পার্থর। কিন্তু এ ব্যাপারটা এখনও খুব ব্যক্তিগত কী? একটু যেন পরামর্শর দরকার ছিল। তেমন বুঝলে চেপে যাওযা যাবে!

বেশির ভাগ বন্ধুই তার মোটামুটি সফল। জয় তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু এখানে কোথাও চান্স পেল না। বাঙ্গালোর থেকে মোটা টাকা ক্যাপিটেশন ফি দিয়ে এঞ্জিনিয়ার হয়ে বেরোল। হায়দ্রাবাদে আছে এখন। চিরঞ্জিৎ দিল্লী চলে গেল। সে-ও একগাদা খরচ করে সেলস ম্যানেজমেন্ট পড়ল। ওখানেই পোস্টেড। বিল্টু অতি সম্প্রতি অলটারনেটিভ মেডিসিন নিয়ে পড়াশোনা করে, আরামবাগে বসছে। করে খাচ্ছে। সে যখন পল সায়েন্সে অনার্স নিয়ে বি-এ পড়তে ঢুকল, তখনই বন্ধুরা বলেছিল হেভি মুশকিলে পড়বি। তার ভরসা ছিল রেজাল্ট ভাল হবে, অন্তত এডুকেশন লাইনে যেতে অসুবিধে হবে না। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তার সঙ্গী ছিল অনির্বাণ। সাধারণভাবে বি.কম করে মুখ চুন করে ঘুরে বেড়াত। ওর বাবা-জ্যাঠাতে মিলে শেষে মোটা টাকা বার করে দিলেন। হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়ল, এখন ডাঁটে কেটারিং-এর বিজনেস করছে। একমাত্র পার্থরই বাবার মোটা টাকা বার করবার ক্ষমতা নেই। খুব সম্ভব এবার ও বাতিলের দলে পড়ে যাবে।

ভেতরের তেতো ভাবটা এত বেড়ে গেল যে, অনির্বাণদের বাড়ি যেতে ইচ্ছে করল না আর। লঞ্চ ধরে বাবুঘাট গেল সে। তারপর উদ্দেশ্যহীন হাঁটতে লাগল দক্ষিণের দিকে, গঙ্গার ধার ধরে ধরে।

দুপুর দুটো নাগাদ পার্থর খেয়াল হল সে বাড়ি না ফিরলে মা-ও খেতে পারবে না। কিছু বলে আসেনি। একটা পে-বুথ থেকে সে ফোন করে দিল। ফোনটা দাদার বাড়িতে। দাদার লোক ধরেছিল। পার্থ কড়া গলায় বলেছে, এখুনি গিয়ে মাকে বলে আসতে সে আটকে গেছে। কোথাও খেয়ে নেবে।

ময়দানে বসে বসে ক্রিকেট দেখতে দেখতে সময়টা কেটে গেল। বসেই বসেই ঝালমুড়ি, ফুচকা, চটপটি খাওয়া হল কিছুক্ষণ সময় বাদ বাদ। রোদের রঙ বাসি মড়ার মতো হয়ে আসা অবধি পার্থ ময়দানেই বসে রইল। তারপর উঠে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল।

ক্যাথিড্রাল রোডের মোড় থেকে মানিকতলায় নিজেদের বাড়ি পর্যন্ত পুরো পথটা হাঁটতে থাকল পার্থ, যেন হেঁটে হেঁটেই নিজের ভিতরকাব চিন্তা, তিক্ততাগুলোকে ক্ষইয়ে ফেলবে।

বাড়িতে পৌছতে পৌছতে অন্ধকার গাঢ। সেই চারতলা। কত কিলোমিটাব হেঁটেছে আজ? জীবনে কখনও এতটা হেঁটেছে বলে মনে কবতে পাবল না পার্থ। কেন হাঁটল? গন্তব্য না থাকলে তবেই বোধহয় মানুষ এভাবে হাঁটে।

দাদার ফ্ল্যাটের দবজা খুলে গেল। বৌদি দাঁড়িয়ে। —তোমার একটা ফোন এসেছে পার্থ। দুপুরেও একবার এসেছিল। এখন বারান্দা দিয়ে ভাগ্যিস দেখতে পেলুম তুমি আসছ.....

ফোনটা তুলল পার্থ।

—হ্যালো ....

চুপ ও দিকটা। কিছুক্ষণ পর খুব ক্ষীণ গলা ভেসে এল।

—আমি মৌ, মানে মধুমিতা বলছি।

—বলো।

—আপনি বোধহয় আমাকে খুব.... মানে খুব খারাপ ভাবছেন?

পার্থ হাসল, নিজের কাছেই হাসিটা খুব নার্ভাস লাগল—ভাবার কোনও কারণ আছে কি?

—কী জানি? যেভাবে চলে গেলেন..... সাবাদিন বাড়ি ফেরেননি . . .

—আমার কাজ হয়ে গিয়েছিল, তা ছাড়া তোমাব তো কাজে মন ছিল না . .

পার্থর পা অবশ লাগছে, সে চেয়াব টেনে বসল।

—শুনুন, আপনি আমাকে ভাবতে বলেছিলেন, আমি ভেবেছি।.... আপনিও একটু ভাবুন!....একটু....' অনুনয়ের সুর গলায।

চুপ করে রইল পার্থ।

—কী হল? শুনছেন?

—শুনছি।

—ফোন ধবেই ভাবতে শুরু কবে দিলেন না কি?

—কী ভাবব তাই-ই তো জানি না।

—পার্থদা আপনার গলা শুনলে আমার ভেতরটা কেমন..মানে আমি কেমন হয়ে যাই।

—খুব ভালো। কী ভাবব, তা তো বললে না?

—এই আমাকে আপনি ভালো.....মানে আপনি আমাকে অ্যাকসেপ্ট কবতে পারবেন কি না। ..জানি এগুলো ভবে-চিন্তে হয় না। হবার হলে হয়, না হলে হয় না। তাই না? কিন্তু আমি আপনাকে এতটাই.. মানে....আমি রিস্‌ক নিতে রাজি আছি।

বলতে বলতে মধুমিতার গলা একেবারে ভেঙে গেল। পার্থ বুঝতে পারল ও অনেক কষ্টে কান্না সামলাচ্ছে।

সে দেখে নিল বউদি এ তল্লাটে নেই। তারপব মৃদুস্বরে বলল—ছি মউ, কেঁদো না। কেউ শুনলে?

—ভয়েই মরে যাচ্ছেন, না?

—না, ভয় না।

—তবে কী? লজ্জা? ঘেন্না?

—না। খুব জটিল ফীলিং মউ, তুমি বুঝবে না।

—চেষ্টা করলে আমিও কিছু কিছু বুঝতে পারি। শুনুন, আপনি ভেবে নিন, তারপরে আমি বাবাকে বলব।

—সর্বনাশ! কী বলবে?

—বলব। যা বলবার। আপনাকে জড়াব না। ভয় নেই।

ফোন কেটে দেবার শব্দ হল।

—বউদি, যাচ্ছি! পার্থ জানান দিল।

—ঠিক আছে, দরজাটা টেনে দিও।

বউদিদের দরজাটা টেনে দিয়ে নিজেদের দরজায় এসে পার্স থেকে চাবি বার করে দরজা খুলল পার্থ। এটা সে প্রায়ই করে। বাবার পক্ষে তাড়াতাড়ি ছুটে আসা ভালো না, মা পায়ের ব্যথার জন্য তাড়া করতে পারে না। দরজার বাইরে অপেক্ষা করতে তার ভালো লাগে না। তাই ডুপ্লিকেট চাবিটা সে রাখে।

দরজাটা বন্ধ করে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে উল্টো দিকে বারান্দায় চোখ পড়ল পার্থর। বসার ঘরে খুব মৃদু একটা আলো জ্বলছে। বসার ঘর আর বারান্দার মাঝখানে কাচের দরজা। ওদিকে অন্ধকার। মা বাবা দুজনে পাশাপাশি বসে আছে। পার্থ জানে না কী ছিল এ দৃশ্যটাতে, কেনই বা সে দাঁড়িয়ে গেল। মা-বাবা তো চুপচাপ বসেই আছে। পাশাপাশি। অন্ধকারে। মনে হতে পারত একা, পরিত্যক্ত, হতাশ। কিন্তু তা মনে হল না। সারাজীবন এই হিসেব করে করে চলা, এক পা এগোনো তো তিন পা পেছনো, ছেলের জন্যে পিতৃপুরুষের ভিটে বেচা, এক সন্তান স্বার্থপর, অন্যজন অকৃতী অধম, সামান্যতম সঞ্চয়, বড় কোনও অসুখ-বিসুখ করলে তেমন চিকিৎসার আশাও নেই। তবু কিসের জোরে যে মা-বাবা ওভাবে বসে থাকে. ওই অতটুকু বারান্দায়!

মাঝখানের দরজাটা খুলে যাচ্ছে।

মা।

কী করে যে টের পায় সে ফিরেছে!

—এলি! বাবার গলা।

—এলাম, বাবা।

মউ বলছিল ভাবতে। বলছিল সে রিস্‌ক নিতে রাজি।

পার্থর ভেতরটা টনটন করছে।

সে ভাবল সে-ও রাজি। রিস্‌ক নিতে।

অবস্থান

ওয়াজিদ? ওয়াজিদ? আলি শা? খিদিরপুরে থাকেন বললেন না?—কেমন উৎসাহিত উত্তেজিত গলায় বলল খুকিটি। ছুট্টে গিয়ে আজকালের সব টেপটাপ হয়েছে, সেই একখান চালিয়ে দিল—বাবুল মে· নৈহার ছুট হি জায়—ঘুরে ঘুরে মিহিন সানাইয়ের সুরে বাজতে লাগল টেপটা।

—ভাল লাগছে? আপনার ভাল লাগছে এই গান? জ্বলজ্বলে চোখে খুকি বলে।

কী করবে? মাথাটা তালে তালে নেড়ে দেয় সে। ভাল আসলে লাগছে না ততটা। কিন্তুক অত উৎসাহের আগুনে ক· কবে জল ঢালা যায় কি?

খুকি অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে থাকে।

—আপনার পূর্বপুরুষের লেখা গান। জানেন তো? নবাব ছিলেন ওয়াজিদ আলি শা। ঠিক আপনার নাম। এক্কেবারে হুবহু।

এত উৎসাহ, উত্তেজনা, গান-ফানের কিছুই বোঝে না সে।

—ওয়াজিদ নয় খুকি, আমার নাম ওযাজিব, ওয়াজির....। আলি নয়, শা নয়, মোল্লা—থেমে থেমে বলে সে। গলার আওয়াজটা বড়ে গোলামের মতো না হলেও বেশ জোয়ারিদার।

—মোল্লা? ওরে বাবা—খুকি যেন চমকে ওঠে।

—কেন? 'ওরে বাবা' কেন?

—সে আমি বলছি না—জেদি ঘাড় দোলায় খুকি।

—আমি বুজতে পেরেছি—ওযাজির মোল্লা দাড়িব ফাঁকে হাসে।

—বুঝতে পেরেছেন তো?—খুকির গলায় সোয়াস্তি। বস্তুত দু'জনেই হাসে। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ষড়যন্ত্রীর হাসি।

কিন্তু আপনাকে ওয়াজিদ আলি শা সাহেব বলেই ডাকব। কেমন?

—এটা কিন্তুক বুজলুম না খুকিসাহেব। ওয়াজির মোল্লা মন দিয়ে পাকা পুডিং, রজন জ্বাল দেয়। নুটি ঠিক করে মার্কিনের টুকরোর মধ্যে ঝুরো তুলো ভবে।

—খুকিসাহেব?—খুকিটি ভীষণ হাসি হাসতে থাকে। লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ছে একেবারে। এত হাসি! ওয়াজিব মোল্লা তাব পালিশের নুটি নিয়ে অপ্রস্তুত। এত কিছু মজাদারি আছে নাকি কথাটায়; নাকি সিরেফ জওয়ানি! যৌবনই এমন বাঁধভাঙা হাসি হাসায়!

খুকির বাবা একটুকুন আগে অফিস চলে গেছেন। এবার মা যাচ্ছেন। নাম্বা নাম্বা ইস্ট্র্যাপের ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে খুটখুট করে ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়ার মতো, না না ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়া হাত যাবেন কেন? কত বড়মানুষ; এতগুলিন সামানে ল্যাকর পালিশ দিবেন। বাপ্‌রে! সেন্টের গন্ধে ভেসে যাচ্ছে চাদ্দিক। চকচক কচ্ছে চামড়া। কত ল্যাকর কত জলুসের জান! ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়া কেন হতে যান! ইনি হলেন গিয়ে ভাল জাতের রেসের ঘুড্ডি। যেমনটি কুইনের পার্কের পাশে ঘোড়দৌড়েব বাজির মাঠে দেখা যায়! অতটা নাম্বাই-চওড়াই নেই। তা না-ই থাকল।

উনি বললেন—অত কী বকবক করছিস খুকি! কাজটা হবে কখন?

—আমার হাত কামাই নেই দিদিসাহেব! নুটি চালাতে চালাতে মোল্লা বলে।

—তা হোক, খুকি, বড্ড বিরক্ত করছ!

—না মা। ইনি একজন বিশেষ মানুষ। হিস্ট্রির লোক । এঁর নাম জানো? ওয়াজিদ, ওয়াজিদ আলি শাহ্। খিদিরপুরে থাকেন।

—তা-ই-ই! ভীষণ অবাক আবিষ্কারের দৃষ্টিতে কর্ত্রী তাকলেন।—চেহারাটাও দেখেছিস!

খুকি আবার হাসতে থাকে!—তুমি তো আমজাদের চেহারার কথা ভেবে বলছ। আসল মানুষটা তো নয়! তোমার যা হিষ্ট্রির সেন্স!

—আহা, আমরা লেম্যান তো ওইভাবেই জেনেছি! এ মিলটাও কি কম আশ্চর্যের!

ওয়াজির মোল্লা জানে না, কেন এই আশ্চর্য, কেনই বা আবিষ্কার। কিসের মিল। কেন মিল। ভুল নাম নিয়ে কেনই বা এত কচলাকচলি! তবে সে আর শুধরে দেয় না। কী দরকার! রুজি যাদের কাছে, একটা-আধটু ভুলভাল বলে তারা যদি খুশি থাকে, থাক।

—আমার মাকে দিদিসাহেব ডাকলেন কেন?

কর্ত্রী চলে যেতে খুকিটি আবার জিজ্ঞেস করে। প্রশ্নের তাঁর শেষ নেই।

—কেন? ভুল হয়েছে কিচু?

—না, ভুল নয়। সবাই তো মা, বউদি এ সব বলে। ও, আপনাদের 'বউদি' নেই, না?

ওয়াজির মোল্লা কাঁধের কিনাব দিয়ে চিবুক চুলকাতে চুলকাতে ভাবতে থাকে।—তাই তো? দিদিসাহেব কেন? এই ডাকগুলান মুখ দিয়ে আপ্‌সে বেরিয়ে যায়। এখন তার কার্যকারণ বাতলাও এই কৌতূহলী বালিকার কাছে।

মাথায় সিন্দুর নাই। ঘোমটা নাই। খাটো চুল গুছি গুছি পিঠ ঝেঁপে আছে। ঝুলঝুলে দুল। গলায় ঝুটো পাথরের দেখনাই হার। হাতেই বা কী? একটা হাতঘড়ি। একটা কাঠ না কিসের বালা। এমন ধারা শো হলে মা ডাকটা ঠিক হয় না। দিদিই ঠিক। কিন্তু এসব কথা খুকিকে বলা যাচ্ছে না। সে খানিকটা প্রশ্নের উত্তর বেমালুম উড়িয়ে-এড়িয়ে বলে—সাহেব মানে একটা মান, একটা সন্‌ভ্রম, সন্‌ভ্রম, বোঝেন তো?

খুকি আবারও প্রচুর হসে। সন্‌ভ্রম? কী বললেন? সন্‌ভ্রম?

খুকি বলতে ঠিক যতটা বাচ্চা হওয়া দরকার, এই খুকি কি ততটা? উলিঝুলি চুল। চক্ষু দুটি ডাগর। তাতে ভাসে কৌতুক, কুতুহল, কোশ্চেন। ছোট্টখাট্ট মানুষটি, সবই ঠিক। কিন্তু খুকি খুকি শো থাকলেও এঁর সোমত্থ বয়স হয়েছে। ঢলঢলে কামিজ তবু বোঝা যায়। তা ছাড়াও, চলন-বলন ছোটন-দাঁড়ান, কাজ-কম্মের একটা গোছ ধরন সবই ওই কথাই বলে।

—তুমি ইস্কুলে যাবে না?

— আমি কলেজে পড়ি, সেকেণ্ড ইয়ার।

—ওরে বাবা! সেকেন কেলাস একেবারে? তবে তো খুব ভুল হয়ে গ্যাছে খুকিসাহেব? তা আপনি কলেজে যাবেন না!

—টেস্ট হয়ে গেছে, এখন আর যেতে হয় না।

বা বা—বাহবাটা কেন দিল মোল্লা তা জানে না।

শীতের বাতাসে বেশ আঁচ লেগেছে। শুখুটে শুখুটে দিনগুলো। পুরনো সামান সব ঘষেমেজে, বাটালি দিয়ে চেঁছে ফেলে, নতুনের সঙ্গে তাকে মানিয়ে-গুনিয়ে কাজ। দরজার এড়ো, ক্যাবিনেটের পাওট্ সব নতুন করে বাদাম কাঠ মাপসই করে করা। এখন আর সব মিস্তিরি জব্বর, গোপাল, মুন্না—সব কটিকে বিদেয় করে দিয়েছে। একটু একটু করে সাজিয়ে তুলতে হবে এখন সব। একা একা। অভিনিবেশ চাই তো না কী? শীতের শুখো থাকতে থাকতে সারতে হবে।

যবে থেকে একলা কাজ করছে আপন মনে, খুকিটি সেই ইস্তক সেঁটে আছে। অবিশ্যি সেঁটে বলতে ঠিক সেঁটে নেই। মাঝে মাঝে একেবারে অদর্শন হয়ে যায়। তারপব ঘুবছে ফিরছে, কাছে এসে বসছে, এটা ওটা নাড়ছে চাড়ছে। আর ফুলঝুরির মতো কোশ্চেন।

—আরে সব্বনাশ, ও ঢাকা খুলেন না, খুলেন না।

—কেন?

—ইস্প্রিট সব ভোঁ হয়ে যাবে। পড়ে থাকবে পানি। জল।

—জল? স্পিরিটে জল?

—একটু আধটু ভেজালি এই লাইনে সবাই দিচ্ছে খুকি, কাকে ফেলে কাকে ধরবেন?

—কী করে বুঝলেন জল আছে?

—এই দ্যাখেন,—নিজের মোটা মোটা খসখসে আঙুলগুলি মেলে ধবে ওযাজির।

—চামড়া কেমন কুঁকড়ে উঠেছে দেখেছেন? এই হল গিয়ে পানির নিশানি।

মনোযোগ দিয়ে দেখে খুকি।

—স্পিরিট শুদ্ধ থাকলে কী হত?

—পেলেন থাকত চামড়া—স্পিরিটের মধ্যে গালা ঢালে ওয়াজির।

—কী দিলেন ওগুলো?

—গালা, কুসমি গালা, খুকিসাহেব।

—কুসমি? কুসমি কেন?

—ডিমের কুসুম দেখেন তো? তলতলে কাঁচা-সোনা কাঁচা-সোনা বর্ণ? সেইমতো হল গিয়ে বাজাবের সেবা গালা। ফার্নিচারে মারলে কাঠের ওরিজন্যাল রঙটিই ধববে। এমন ঝিলিকদার হবে যে, এদিক থেকে লাইট মাবলে ওদিকে পিছলে পড়বে।

—তা অ্যাত্তো সব হাঁড়ি-কুড়ি বাটি-ঘটি নিয়ে কী করছেন?

—খেলা করছি। রান্নাবাড়ি—ছোট ছেলেরা খেলে না?

—খেলাই তো!

—খেলা, কিন্তুক কেমন জানেন? পরাণপণের খেলা।

—কেন এর মধ্যে আবার প্রাণপণের কী হল?

—ও আপনি বুঝবেন না খুকিসাহেব। এ হল গিয়ে রং ফেরাবার খেলা। একেকটি খোরায় জানের একেকটি ধরে রাখছি।

—দেখি দেখি কেমন আপনার জানের রং!

—তো দ্যাকেন, এই রং মেহগনি, ডার্ক ব্রাউনের সঙ্গে ভুষো কালি, একটু এই অ্যাতোটুকু সিন্দুর....

—সিঁদুর?

—বাঃ, আপনারা সাজেন আর আপনাদের ফার্নিচার সাজবেন না! সিন্দুরে, আলতায়, কাজলে, সুর্মায় সাজবেন বই কী! তারপর কাপড় পড়বেন ঝা চকচক।

—কী কাপড়? সিনথেটিক তো? নাইলন! এতক্ষণে খুকি খেলাটা ধরতে পেরেছে।

—না খুকিসাহেব, ওবে কি কাপড় কয়? পরবে বেনারসি, তসর, মুগা, বিষ্ণুপুরের বালুচরি।

—ওরে বাবা! কই বেনাবসি, তসর এসব কই?

—বানাচ্ছি। খাপি মিহিন খোল। এমন গ্লেজ দেবে যে সিল্কেব সঙ্গে তফাত করতে পারবেন না। চোখে ঝিলিক মারবে।

—সবই তো দেখছি একবকম!

—আরে সাহেব, সবই একরকম হলে কি আর এত ছাবাছোবার দরকার হত? এই দ্যাখেন এরে কচ্ছে ওয়ালনাট। বড বড় হৌসে এই রং লাগায়। আই সি আই, আই টি সি, টাটা স্টিল..। ওয়ালনাটেরই কি আর একরকম? তিন-চার রকম আছে খুকি। আপনারা হয়তো দেখে কইবেন মেহগনি। যে জন জানে সে জন বুঝবে।

খুকি একটা কাঠের টুকরো তুলে নিল, বলল—বাঃ, খুব সুন্দর তো ধরিয়েছেন রঙটা।

—ধরাব না? আপনার মা-বাবা এসে স্যাংশন দিবেন তবে না? কাঠের পিসে সবরকমের ধরতাই দিয়ে বাখছি।

—এতে কী দিয়েছেন?

—কিচ্ছু না, কুসমি গালার রসের সঙ্গে এই অ্যাট্টুকুনি বেগনি বং।

—তাতেই এই টিন্টটা এসে গেল?

—তাতেই। তারপর আছে ঘষামাজা। আপনারা মাথা ঘষেন না? একবার দুবার। তারপর মুখে কিরিম দাও, মোছো, আবার মাখো, আবার মোছো....এই সুন্দরীদেরও তেমনি। মাখবেন, তুলবেন, মাখবেন, তুলবেন। তবে না গ্লেজ আসবে। মুণ্ডু ঘুরবে দেখনদারেব। এই তো সাইডটায় হাত দিয়ে দ্যাখেন!

—সত্যি তো! কী স্মুথ করে ফেলেছেন।

—আরও করব খুকিসাহেব। তারপব ফেরেঞ্চ চক মাখাব। পাউডার মাখবেন সোহাগি আমার।

তেমন তেমন লাগসই উপমাগুলো ওয়াজির মোল্লা খুকির সামনে বলা উচিত মনে করে না।—যত্ত চিকনচাকন হবে দেহখানি বিবির পালিশ তো তত্ত খুলবে! না কী?

তা এইটুকু শুনেই খুকির মুখ সামান্য লাল হয়। সে বলে ওঠে—দাঁড়ান, দাঁড়ান, আপনার চা-টা হল কি না দেখে আসি।

বড় গেলাসের চায়ে পাঁউরুটি ডুবিয়ে ডুবিয়ে তৃপ্তি করে খায় ওয়াজির মোল্লা।

—এ মা, বর্ডারগুলোতে কালো দিলেন কেন?

—উঁ হুঁ হুঁ! কালো নয়। কালো বলেন না। ও হল ডার্ক মেহগনি। যত শুকোবে তত

খোলতাই হবে। হাসতে থাকবে। এই যে ভেতরে? সব ওয়ালনাট ফিনিশ দিইছি। দেখে ন্যান, ধারে ধারে একটু অন্যতম রং চাই, বুজলেন? অন্যতম কিছু। আবার ধরেন আপনাদের শয়নের ঘরে একরকম, তো বসার ঘরে বিকল্প চাই। সবখানেই ওয়ালনাট মেহগনি হলে হবে না। রোজউড দেব ক্যাবিনেটটাতে, দেখবেন চোখ যেন স্তম্ভিত হয়ে থাকতে চাইবে। একেবারে বিকল্প।

খুকি অনেকক্ষণ ধরেই হাসছিল, বলল—আপনি লেখাপড়া জানেন, না?

—কই আর জানলুম খুকি!

খুকির বাবা এসে ডাকেন—মিস্ত্রি।

—জি!

—নতুন রং করা চেয়ারে বসলাম, গ্লেজ তো উঠে গেল।

—তা তো যাবেই সাহেব।

—সে কী! তাহলে এত কষ্ট করে খরচা করে পালিশ করার মানে কী!

—আহা এখনও তো ফিনিশ হয়নি। শেষ অস্ত্রে ল্যাকার পালিশ চড়াব। চক্ষে ধাঁধা লেগে যাবে।

—গ্লেজ?

—উঠবে না সাহেব। দশটি বচ্ছর চোখ বুজে থাকতে পারবেন।

—পারলেই ভাল—সাহেব গটমট করে চলে যান।

—হ্যাঁ কী যেন বলছিলেন! খুকি সুযোগ পেয়ে কাছিয়ে আসে।

—কী আবার!

—ওই যে অন্যতম, বিকল্প...ভাল ভাল কথা বাংলা রচনা বই থেকে?

—ওই সেই কথা? এই যেমন ধরুন, খুকিসাহেব আপনারা আজকালের মেয়েরা সব ম্যাচিং দ্যান না? ফলসা রঙের শাড়ি, তো সেই রঙের সায়া, সেই রঙের জামা। মনে কিছু করবেন না, সরবো চেহারা লেপেপুঁছে খেঁদিবুঁচি লাগে।

খুকি আর হাসি সামলাতে পারে না।

—আপনি হাসছেন? আমি যখন একেকটি ফার্নিচার সাজাই, তাকে জামা পরাই, সায়া পরাই, কাপড় পরাই, তখন আমার ওই লেপাপোঁছা মনে ধরে না। একটা কিছু অন্যতম খুঁজি। কেমন জানেন? লাহা বাড়িতে কাজ করতে গেছলুম। সে কি আজকার কথা! সে এক অন্যতম কাল! তা সে বাড়ির মেয়েরা সব হুরী রূপসী। আশি নম্বর একশো নম্বর কাগজ দিয়ে ঘষে ঘষে ঘষে তবে তেমনতর তেলা চামড়া হয় খুকি, তারপর খালি সবেদা দিয়ে সাদা গালার পোঁচ, সর-হলুদ বাটা আর কমলালেবুর খোসা,—গ্লেজ কী! চোখ পিছলে যায়।

—পিছলে যায়? আটকে থাকে না? খুকি হাসি চেপে দুষ্টু প্রশ্ন করে।

—উঁহু, রজন পাইল দিলে চিটে হবে, ওইখানেই তো পালিশের সরবো কারিগরি।

—আহা পালিশ নয়, ওই লাহা বাড়ির সুন্দরীদের কথা কী যেন বলছিলেন?

—ও হ্যাঁ, তা ওনারা পরতেন ধবধবে সাদা খোলের কাপড়। তাতে ভোমরা-কালো, কিংবা খুনখারাবি লাল রঙের পাড়। জামা পরতেন ছিটের। লালের মধ্যে হলুদ কালো সবুজ চিকিমিকি। আর সায়াটি থাকত ধোয়া গোলাপি।

—এ মা! কী বিচ্ছিরি!

—হাঁ হাঁ করে ওঠে ওয়াজির মোল্লা।—না না। একেবারে বিকল্প। ওই যে সবটি লেপাপোঁছা হল না, অন্যতম রঙের খোয়াব রইল, তাতেই রূপগুলি বিকল্প হয়ে উঠত। এই যে বর্ডার দিচ্ছি, একটা জমিনকে আলে আলে বেঁধে দিচ্ছি; এতে করে আপনার আপন হয়ে যাবে দ্রব্যটি। উদোম মাঠ নয়, যেটা বারোয়ারি। একটা ধরুন শস্যক্ষেত্র। কেমন? নয় কি?

খুকি এখন আর হাসছে না। অভিনিবেশ সহকারে শুনছে। একটু পরে সে উঠে গেল।

বাড়িটি চমৎকার সেজে উঠেছে। ওয়াজির মোল্লাসাহেব দেখছেন। ঘরের মধ্যে যেন চাঁদনি। এমন ধারা চাঁদনিতে মানুষের প্রকৃত মুখটি এই ধরা পড়ে, তো এই পড়ে না। একঘর আলো, তা বুঝি তার কতকগুলান উঁচার দিকে মুখ। মানুষগুলিকে মনে হয় খোয়াবে দেখা হুরী পরী জিন জাদুকর। হ্যাঁ জাদুকরও আছে। মোল্লাসাহেব বড় আয়নায় দেখেছেন, তিনি নিজেই যেন জাদুর মানুষ। ভুষো কালি আর শ্বেত গালাতে মিলে মিশে ছোট দাড়ি। হাতের কালচে চাম ইস্প্রিটের অ্যাকশনে উঠে উঠে যাচ্ছে, কাজের লুঙ্গি আর গেঞ্জিটি আলাদা করে রাখলেও ছাপছোপ পুরোপুরি এড়াতে পারেননি। পেন্টুলে একটু আধটু নানা রঙের পোঁচ লেগেছে। হলঘরটি যেন সিনেমা হল। তার মধ্যে ফার্নিচারে আলো ঠিকরোয়, ভাল গোমেদ পাথরের কাটিং যেন।

দুটো হাঁড়ি ওপর ওপর বসানো। ফর্সা পুরনো কাপড়ে বেঁধে দিচ্ছেন কর্ত্রী।

—মিস্ত্রিসাহেব, ছেলেমেয়ে বিবিদের দেবেন গিয়ে।

—কী আছে মা এতে? দাত্রী রমণীকে আজ মা ডাকতে ইচ্ছে যায়।

—লেডিকেনি আছে। আর রসগোল্লা... ভালবাসেন তো?

—হ্যাঁ মা...চমৎকার ভালবাসি সব।

—সন্ধে হয়ে গেল আজ শেষ দিনে আপনার.....আর এই শাড়িখানা....পছন্দ হয়?

—আপনার পছন্দ হয়েছে মা—ওয়াজির চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখেন, দেখান।

—খু-ব। আবার দরকার পড়লে ডাকব আপনাকে।

—খোদা করুন, ডাকবার দরকার না হয় মালিক। বিশ বচ্ছরের কাম ফতে করে গেছি। রাখতে যদি পারেন। পানি আর রোদ্দুর এই দুই হল পালিশের দুশমন। পাতলা কাপড় দিয়ে মোলায়েম করে মুছে দেবেন, বাস। আর পাড়া-পড়োশন, ভাই-বহেন এঁদের কাছে যদি সুপারিশ করেন তো....আজকাল তো পালিশ লোকে করায় না, সব তেল রং আর পেলাস্টিক রং, হাউহাউ চিৎকার করছে। পালিশের কদর ওই বনেদি বাবুরাই করেন। বিকল্প কিছু....।

শাড়িটা প্যাকেট থেকে খুলে বার করেন মোল্লাসাহেব। ছাপের কাপড়। নানান রঙের হোরিখেলা। বিবি পরবেন ভাল। মোল্লাসাহেবের তত মনোমত হয় না। কিন্তু তিনি বলেন, সুন্দর, চমৎকার। হেসে উঠছে কাপড়, আপনার এই বাড়ির মতো। সালাম, সালাম। কাঁধে ঝোলাঝুলি নিয়ে নীচে নেমে যান মোল্লাসাহেব।

—ও ওয়াজিদ আলি শা সাহেব.....একটু দাঁড়ান, একটু দাঁড়ান।

হাঁফাতে হাঁফাতে ছোট্ট জমি দিয়ে ছুটে আসে খুকিসাহেব।

ঘাসের জমিতে সবুজ টিলটিল করছে। বেগুনি আভা সাঁঝের গায়ে। মিহি কাঞ্চন রঙের সিল্কের শাড়ি পরেছে খুকি। চওড়া জাম রঙের পাড়। ভেতরে জরির সুতো, কালো সুতো চমকাচ্ছে। আর জামাতে বেশ খলখলে হাসকুটে কালো, কালো না মেহগনি, বুঝি খুকিও ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছে। কোনও উৎসবে যাবে বোধহয়।

—'অন্যতম' হয়েছে ?

হাসি দাড়ি বেয়ে টাপুর টুপুর ঝরে।

—হয়েছে, হয়েছে।

—আর 'বিকল্প' ?

চতুর্দিকে হাতড়ান মোল্লাসাহেব। 'বিকল্প'টি কি ঠিক হল ? 'বিকল্প' বলে কি তিনি সবসময় এক কথাই বোঝাতে চান ? 'বিকল্প' মানে এখন, এখান 'অবিকল্প'। সেরকমটি ? হয়েছে কি ?

খুকি রিনরিন করে হাসে। বোঝার চোখে তাকায়।

—বিকল্পটা ঠিক হল না, না শা সাহেব ?

—হল না কি ?—হাঁ হাঁ করে ওঠেন ওয়াজির মোল্লা—এখন একেবারে বেগমসাহেবা। হানডেড পার্সেন। দু'জনেই ষড়যন্ত্রীর মতো হাসতে থাকেন। একটা যে রঙ্গ হয়ে গেল সেটা উভয়েই বুঝেছে। শিল্পীর চোখে বিকল্প অর্থাৎ অবিকল্প ? তাও কি সম্ভব ?

—আচ্ছা চলি বেগমসাহেবা....

—আবার আসবেন ওয়াজিদ আলি শা সাহেব.....

ওয়াজির মোল্লা কিছু দূর চলে গিয়েছিলেন। ঘুরে দাঁড়ান।

—ওয়াজিদ নয় কিন্তুক। ওয়াজির....ওয়াজির মোল্লা। খিদিরপুরে বাস নয়, কাজ-কাম করি ওখানে, নাহারবাবুদের ফ্যাকটরিতে। সাকিন ন'পাড়া বাগনান, সাউথ ইস্টার্ন রেলোয়ে।

নিজস্ব শিল্পভাবনার অবিকল্প নিশানখানা কাঁধের ওপর প্রশান্ত গর্বে তুলে ধরে নতুন পাড়ার দিকে রওয়ানা দ্যান ওয়াজির মোল্লা। কোনও ইতিহাস, পুরাণ, কিংবদন্তীর সঙ্গে অন্বিত হতে চান না। কিছুতেই।